গ্রন্থাবলী সিরিজ

দামোদর-গ্রন্থাবলী

[তৃতীয় ভাগ]

দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত—
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

গ্রন্থাবলী সিরিজ

দামোদর-গ্রন্থাবলী

১। যোগেশ্বরী, ২। দুই ভগ্নী, ৩। শান্তি।

[তৃতীয় ভাগ]

দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিনে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত।

১২৬৯ বঙ্গাব্দ।

যোগেশ্বরী

প্রথম খণ্ড—আলোক

প্রথম পরিচ্ছেদ

দর্শন

শ্রীযুক্ত নীলরতন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রবীণ ব্যক্তি। বয়স পঞ্চাশ অতিক্রম করিয়াছে। শরীরে পাপের ও দুষ্ক্রিয়ার অধিকার না থাকায় শরীরটি আছে ভাল। স্বকীয় বিদ্যা-বুদ্ধি-বলে প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়া সম্প্রতি তিনি পরিবারাদি-সহ কাশীবাস করিতেছেন। সঙ্গে বিধবা ভগ্নী কালীতারা, গুণবতী পতিপরায়ণা ভার্য্যা আনন্দময়ী এবং একমাত্র কন্যা অন্নপূর্ণা আছেন। এতদ্ব্যতীত দাস ও দাসী, সেবক ও সেবিকা, আশ্রিত ও প্রতিপাল্য, অনেক লোকে নীলরতন বাবুর বৃহৎ ভবন পরিপূর্ণ। কাশীতে দশাশ্বমেধ ঘাটের সন্নিকটে তাঁহার বাস।

বেলা প্রায় এক প্রহর। নীলরতন বাবু স্নান সমাপ্ত করিয়া পূজাপাঠে প্রবৃত্ত হইবার উদ্যোগ করিতেছেন; তাঁহার বিধবা সহোদরা কালীতারা পূজার আয়োজন করিয়া দিতেছেন এবং পতি-পরায়ণা সহধর্ম্মিণী আনন্দময়ী পূজা-সমাপ্তির পর পতিদেবতার জলযোগের ব্যবস্থা করিতেছেন। অন্নপূর্ণা কক্ষান্তরে বসিয়া রামায়ণ পাঠ করিতেছেন।

বহির্ব্বাটীর অঙ্গন হইতে কোমল বালক-কণ্ঠ-নিঃসৃত সুস্বর-সংযুক্ত মধুবর্ষী সঙ্গীত-ধ্বনি সহসা সকলেরই কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। সকলেই স্ব স্ব কর্ম্ম বিস্মৃত হইলেন। বালিকা অন্নপূর্ণা রামায়ণ বন্ধ করিয়া বহির্ব্বাটীতে আগমন করিলেন এবং নিরতিশয় আনন্দ সহকারে সঙ্গীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। গায়ক গাহিতেছে,—

"পাইব বলিয়ে, আশা করিয়ে,
হরি! শরণ লয়েছি তোমার হে।
ভক্তি-ভিখারী, আমি হে তোমারি,
তুমি ছাড়া, কেহ নাহি আমার হে॥
জ্ঞানীর জ্ঞেয়ান, যোগীর ধ্যেয়ান,
তোমার চরণ সকলের সার হে।
(তুমি) জগতের গুরু, বাঞ্ছাকল্পতরু,
অধম সেবকে কর পার হে॥
জনক-জননী নন্দন-নন্দিনী,
তুমি ছাড়া বিশ্বে সকলই অসার হে।
ছেড়েছি সম্পদ, ছাড়িব না পদ,
লভিয়ে করুণা তরিব সংসার হে॥"

গীত সমাপ্ত হইল। অন্নপূর্ণা গায়কের নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি এমন গান কোথায় শিখিলে?"

গায়ক উত্তর দিলেন,—"আমি গান গাহিয়া ভিক্ষা করি। কোন্ গান কোথা হইতে শিখিয়াছি, তাহা মনে নাই। বোধ হয়, এ গানটি আমার গুরুদেবের নিকট শিখিয়া থাকিব।"

অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি ভিক্ষা কর? আকৃতি দেখিয়া তোমাকে ভিক্ষুক বলিয়া কখনই মনে হয় না।"

গায়ক বলিলেন,—"আকৃতি সকল সময়ে ঠিক হয় না। আমি জ্ঞান-লাভের পর হইতে এ পর্য্যন্ত ভিক্ষাই করিয়া আসিতেছি।"

অন্নপূর্ণা আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"কি ভিক্ষা কর তুমি?"

গায়ক উত্তর দিলেন,—"দয়া করিয়া যিনি যাহা দেন।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"দাঁড়াও তুমি, আমি শীঘ্রই আসিতেছি; বাবাকে মাকে তোমার কথা বলিয়াই আসিব। তুমি যাইও না যেন।"

ভিক্ষুক মস্তক আন্দোলন করিয়া অন্নপূর্ণার অনুরোধ-পালনে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। দ্রুতপদে অন্নপূর্ণা প্রস্থান করিলেন।

অন্নপূর্ণা যাহা বলিয়াছেন, তাহা যথার্থ। ভিক্ষুকের

আকৃতি বাস্তবিকই রাজপুত্রের ন্যায়। তাঁহার মস্তকের মসৃণ ও সমুজ্জ্বল কুঞ্চিত কেশরাশি স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। সমুন্নত ললাট-প্রদেশ বিভূতি-সমাচ্ছন্ন হইলেও তাঁহার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিতেছে। উজ্জ্বল প্রশস্ত নেত্র, লাল টুকটুকে অম্লান ওষ্ঠাধর, ঈষৎ বক্রাগ্র সূক্ষ্ম নাসিকা সকলই অপূর্ব্ব শোভার কারণ হইয়াছে। বদন-মণ্ডল প্রীতি ও সন্তোষে সমুদ্ভাসিত, বিশাল বক্ষে রুদ্রাক্ষ ও তুলসীমালা বিলম্বিত, তন্নিম্নে অতি পরিষ্কার যজ্ঞসূত্র শোভমান। দেহের বর্ণ তপ্ত-স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল গৌর! পরিধান এক গৈরিক-রাগরঞ্জিত বসন, তদ্রূপ এক উত্তরীয় বাম-স্কন্ধের উপর হইতে দক্ষিণ-বাহুর নিম্ন দিয়া নিবদ্ধ। মস্তকে এক নামাবলী উষ্ণীষাকারে সুশোভিত। গায়কের বয়স অষ্টাদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বড়ই পরিণত, সুসংবদ্ধ ও শক্তি-সম্পন্ন।

গায়ক অধোবদনে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। অনতিকালমধ্যে অন্নপূর্ণা প্রত্যাগমন করিলেন এবং গায়কের অতি নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—"তুমি আমাদের বাড়ীর মধ্যে এস; বাবা, মা, পিসীমা সবাই তোমাকে দেখিতে চাহিতেছেন।"

ভিক্ষুক বলিলেন,—"অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষা করা আমার গুরুদেবের নিষেধ। আমি আপনার মা ও পিসীমাতা ঠাকুরাণীকে উদ্দেশে বার বার প্রণাম করিতেছি। আমাকে দয়া করিয়া যদি ভিক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এই স্থানে আনিয়া দিলেই চরিতার্থ হই।"

অন্নপূর্ণার মুখ বিষণ্ণ হইল। তিনি কাতরভাবে বলিলেন,—"বাটীর ভিতরে যাওয়া নিষেধ? আপনাকে সঙ্গে লইয়া যাইব বলিয়া আসিয়াছি। তা হউক, আপনার নিয়মভঙ্গ করিয়া কাজ নাই। আমি আবার যাইতেছি, এবার আপনার ভিক্ষা সঙ্গে লইয়া আসিব, আপনি যাইবেন না যেন।"

অন্নপূর্ণা আবার প্রস্থান করিলেন। ভিক্ষুক অতৃপ্ত-নয়নে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, এত মাধুর্য্য তিনি ইহার পূর্ব্বে আর কোথাও দেখেন নাই। ভিক্ষুক-যুবকের এ সিদ্ধান্ত অমূলক নহে। বাস্তবিকই বৃদ্ধ বা যুবা, নর বা নারী, যে যখন অন্নপূর্ণাকে দেখিয়াছে, সেই সবিস্ময়ে মনে করিয়াছে, কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! অন্নপূর্ণা বালিকা; বয়স দশ পার হইয়া একাদশে পড়িয়াছে মাত্র; সুতরাং এখনও একটু চঞ্চল। তাঁহার দ্রুতগতি ও ব্যস্তভাব বড়ই মধুর বলিয়া বোধ হয়। অন্নপূর্ণা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী; তাঁহার দেহের কুত্রাপি অপূর্ণতা নাই এবং এইটি হইলে এই অঙ্গ আরও একটু ভাল হইত বলিয়া বিধাতাকে নিন্দা করিবার কোনই অবসর নাই। অন্নপূর্ণা পিতামাতার একমাত্র সন্তান; সুতরাং সযত্ন-পালিতা ও সুখ-সেবিতা। তিনি লেখা-পড়া শিখিয়াছেন; কিন্তু কুৎসিত বা কুরীতিপ্রবর্ত্তক কোন পুস্তকই তিনি পাঠ করেন নাই। রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি ধর্ম্ম-উপদেশপূর্ণ পুস্তকই তাঁহার আলোচ্য। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ও অসরল ব্যবহার কাহাকে বলে, অন্নপূর্ণা তাহা জানেনও না।

অন্নপূর্ণার অদ্যাপি বিবাহ হয় নাই। বিবাহের কাল উত্তীর্ণ হইতেছে জানিয়াও স্নেহময় পিতা মনের মত পাত্র না পাওয়ায় কন্যার বিবাহ দিয়া উঠিতে পারেন নাই; ভগবানের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস এবং মানবের কর্ত্তৃত্বাভিমান নিতান্ত অসার, ইহা তাঁহার বদ্ধমূল সংস্কার। সুতরাং তিনি জানেন, সমুচিত সময়ে বিধাতা সকল বিষয়েই সুব্যবস্থা করিয়া দিবেন। এইরূপ ভগবন্নিয়ন্তৃত্বের উপর ঐকান্তিক নির্ভর থাকায় কন্যার বিবাহকাল উত্তীর্ণ হইতেছে দেখিয়াও চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ উদ্বিগ্ন নহেন।

অন্নপূর্ণার ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া, ভিক্ষুক আবার গান ধরিলেন—

"কিবা রূপ আ মরি!
নয়নে নিরখি, পরাণেতে রাখি,
ঝরে অবিরাম লোচন-বারি।
(তব) পীত ধড়া, মোহন চূড়া,
করে মোহ নাশ হে মুরলীধারী॥
ভাবিলে শিহরে, পুলকেতে পূরে,
অবশিত হয় শরীর আমারি॥
রহি তব দাস, হ'ক্ সর্ব্বনাশ,
বিকাইয়ে থাকি চরণে তোমারি॥"

আবার সেই গীত-ধ্বনি চারিদিকে মধু বর্ষণ করিতে লাগিল।

গীত-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই অন্নপূর্ণার অলৌকিক মূর্ত্তি দরিদ্র ভিক্ষুকের নয়নপথবর্ত্তী হইল। এবার কিন্তু অন্নপূর্ণা একাকিনী নহেন। পিতা, মাতা ও পিতৃ-ষসাকে সঙ্গে লইয়া তিনি উপস্থিত হইয়াছেন। এক জন দাসী পাত্রে করিয়া বিস্তর চাউল, দাইল; আর এক জন ঘৃত, লবণ-তৈলাদি উপকরণ লইয়া সঙ্গে আসিয়াছে। অন্নপূর্ণার হস্তে একযোড়া নূতন বস্ত্র ও দুইটি টাকা।

নীলরতন বাবু এবং তাঁহার পত্নী ও ভগ্নী প্রত্যেক-কেই ভিক্ষুক অবনতমস্তকে প্রণাম করিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই ভিক্ষুককে নমস্কার করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহার কমনীয় কান্তি ও অপার্থিব শ্রী দেখিয়া নারীগণের নয়ন স্নেহার্দ্র হইয়া আসিল। নীলরতন বাবু ভিক্ষুকের পরিচয়জিজ্ঞাসু হইয়া প্রথমতঃ নাম জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভিক্ষুক উত্তর দিলেন—"উমাশঙ্কর।"

ধাম-সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তরে ভিক্ষুক বলিলেন—"গুরুদেব ঘনানন্দ স্বামীর আশ্রমই আমার ধাম।"

নিজের অন্য কোন পরিচয়ই ভিক্ষুক জানেন না। কে তাঁহার পিতা-মাতা, কোথায় তাঁহার পূর্ব্ব-নিবাস ইত্যাদি কোন সংবাদই ভিক্ষুক বলিতে পারিলেন না। শাস্ত্রালোচনা, গুরুসেবা, উপদেশানুরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান ও ভিক্ষা-সংগ্রহ ব্যতীত তাঁহার আর কার্য্য নাই; গুরুদেব ব্যতীত তাঁহার আর আত্মীয় নাই।

অন্নপূর্ণা ভিক্ষুকের সঙ্গে যাইয়া তণ্ডুলাদি আশ্রমে দিয়া আসিতে দাসীদিগকে আজ্ঞা করিলেন এবং অর্থ ও বস্ত্র স্বয়ং উমাশঙ্করের হস্তে প্রদান করিতে অগ্রসর হইলেন।

তখন উমাশঙ্কর করযোড়ে আনন্দময়ী দেবীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"মা! প্রয়োজনের অধিক ভিক্ষা লইতে আমার প্রতি গুরুদেবের আদেশ নাই। আপনারা যে সামগ্রী আনিযাছেন, পনের দিনেও আমরা তাহা শেষ করিতে পারিব না। দুই দিনের সামগ্রী সংগ্রহ করাও আমার নিষেধ। অতএব আমাকে অর্দ্ধসের চাউল ও তদুপযোগী কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উপকরণ দিয়া অবশিষ্ট সামগ্রী অন্য ভিক্ষুকের জন্য রাখিয়া দেন। আর অর্থভিক্ষা আমরা মোটেই গ্রহণ করি না। বস্ত্র ভিক্ষা করি বটে, কিন্তু অভাব না হইলে লই না; এখন আমাদের বস্ত্র আছে। যখন প্রয়োজন হইবে, তখন আমি চাহিয়া লইব।"

নীলরতন বাবু বলিলেন,—"তোমায় নিয়ম ভঙ্গ করিতে অনুরোধ করিব না। এই সকল সামগ্রী হইতে তুমি নিজের আবশ্যকমত জিনিস উঠাইয়া লও।"

উমাশঙ্কর আবার বিনীতভাবে উত্তর দিলেন,—"স্বহস্তে ভিক্ষাদ্রব্য উঠাইয়া লওয়া নিষেধ; আপনারা দয়া করিয়া কিঞ্চিৎ সামগ্রী আমার এই ঝুলিতে ফেলিয়া দেন।"

কালীতারা বলিলেন,—"বাবা, তুমি, শাপ-ভ্রষ্ট দেবতা!"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"মা! আমি আপনাদের চরণের দাস।"

আনন্দময়ী বলিলেন,—"বল বাবা! তুমি এই সামান্য ভিক্ষার জন্য প্রতিদিন নানা স্থানে ঘুরিয়া কষ্ট করিবে না? তোমাকে প্রত্যহ আমাদিগের বাটী হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"এ অঙ্গীকার আমি করিতে পারি না মা! প্রতিদিন একস্থানে ভিক্ষা গ্রহণ আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ।"

আনন্দময়ী বলিলেন,—"তুমি আমাকে মা বলিয়াছ। মাতৃ-আজ্ঞা সন্তানের অবশ্য প্রতিপাল্য। বল তুমি, আমাকে সতত দেখা দিতে আসিবে? ভিক্ষা লও বা না লও, একবার করিয়া আমাদিগের বাটীতে আসায় কোন ক্ষতি হইবে না বোধ হয়।"

উমাশঙ্কর উত্তর দিলেন,—"প্রতিদিন না পারিলেও আমি প্রায়ই আসিব মা! আমার নিয়মিত কর্ম্ম শেষ করিয়া যখন অবকাশ পাইব, তখনই আপনাদের শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসিব। এক্ষণে বিদায় হই।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"কালি আসিবেন?"

উমাশঙ্কর 'আসিব' বলিয়া সকলকে প্রণাম করিলেন এবং কিঞ্চিন্মাত্র তণ্ডুলাদি লইয়া প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গুরু ও শিষ্য

বেলা দ্বিপ্রহরের পর ঘনানন্দ স্বামীর আশ্রমে উমাশঙ্কর পাঠ অভ্যাস করিতেছেন। বেদান্তশাস্ত্রের আলোচনা হইতেছে। মূর্ত্তিমান্ জ্ঞান-স্বরূপ ঘনানন্দ এক কুশাসনে উপবিষ্ট। তাঁহার পার্শ্বে কুণ্ড-মধ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত। সম্মুখে তাল-পত্র-লিখিত পুথি নিপতিত। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি বিলেপিত, মস্তকে বিপুল জটাভার, কটিদেশে কৌপীন, হস্তে লোহার চিমটা। তাঁহার দেহ সুদীর্ঘ, বাহু-যুগল প্রায় আজানুলম্বিত, নেত্রদ্বয় অতীব উজ্জ্বল; সমস্ত শরীর কৃশ। তাঁহার সম্মুখে এক মৃগচর্ম্মাসনে ভুবনমোহন উমাশঙ্কর বসিয়া একান্তমনে গুরুদেবের মুখনিঃসৃত শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণ করিতেছেন। ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের প্রথম কয় সূত্রে পূর্ব্বপক্ষ অবলম্বন করিয়া ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যেরূপ প্রণালীতে কর্ম্মাপেক্ষা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহারই ব্যাখ্যা হইতেছে।

পাঠ-সমাপ্তির পর উমাশঙ্কর বিনীতভাবে গুরুদেবের নিকট, নীলরতন বাবুর বাড়ীতে ভিক্ষাগ্রহণের আমূল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।

সমস্ত শুনিয়া ঘনানন্দ বলিলেন,—"এ ব্যাপারে তোমার সকল ব্যবহারই সুসঙ্গত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাকে আর কিছু বলিতে ইচ্ছা কর কি?"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আমি সময়ে সময়ে তাঁহাদিগের আলয়ে গমন করিতে স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছি। এ সম্বন্ধে প্রভুর কিরূপ অনুমতি, জানিতে বাসনা করি।"

ঘনানন্দ কহিলেন,—"আমি নীলরতন চট্টোপাধ্যায়কে বিশেষরূপ জানি। তিনি ও তাঁহার পরিবারবর্গ সকলেই জ্ঞানার্থী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ। তোমাকে অনেক শাস্ত্র ও অনেক ক্রিয়া শিখাইয়াছি। অভ্যাসবলে কাল-সহকারে তুমি বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করিবে, তাহাতে আমার কোনও সন্দেহ নাই। তুমি আজন্ম আমার আশ্রমে প্রতিপালিত; গৃহীর প্রকৃতি ও নিয়ম কিছুই শিখিবার তোমার সুযোগ ও অবসর হয় নাই। তৎসম্বন্ধে তুমি কিছু শিক্ষা লাভ কর, ইহাই আমার বাসনা। ধার্ম্মিক গৃহস্থের নিকট যাতায়াত করিয়া গৃহী জনের ব্যবহার শিক্ষা করাই উচিত। তদনুরূপ সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় আমি আনন্দিত হইতেছি। তোমাকে অনুমতি দিতেছি, তুমি অবসর পাইলেই যখন ইচ্ছা, তখনই নীলরতনের গৃহে গমন করিতে পারিবে।"

উমাশঙ্কর পুনরায় বলিলেন,—"নীলরতন বাবুর স্ত্রী ও ভগ্নী বড়ই স্নেহময়ী। তাঁহারা আমাকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ-সহকারে পুরমধ্যে লইয়া যাইতে, আসন গ্রহণ করিতে ও ভোজন করিতে আগ্রহ করিলেও করিতে পারেন। এ সম্বন্ধে প্রভুর কি আদেশ?"

ঘনানন্দ স্বামী বলিলেন,—"কেবল নীলরতনের বাটীতে তোমার পুরপ্রবেশ ও আসন-গ্রহণের অনুমতি থাকিল। ভোজন নিষিদ্ধ।"

গুরুচরণে প্রণাম করিয়া উমাশঙ্কর উঠিবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া ঘনানন্দ বলিলেন,—"বৎস! আসন গ্রহণ কর। তোমাকে আজি একটি শুভ সংবাদ শুনাইব।"

উমাশঙ্কর সাগ্রহে গুরুদেবের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। ঘনানন্দ বলিতে লাগিলেন,—"বৎস! বহুদিন পরে দেবী যোগেশ্বরী আবার দেখা দিয়াছেন।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"বটে! বড়ই সুসংবাদ, সন্দেহ নাই। কিন্তু বাবা, আমার তাহাতে দুঃখই হইতেছে। আপনার মুখে সর্ব্বদা তাঁহার নাম শুনিতে পাই, আপনি মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পান, ইহাও শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু আমি এমনই হতভাগ্য যে, এ পর্য্যন্ত আমার অদৃষ্টে সেই দেবীর দর্শনলাভ ঘটিল না।"

উমাশঙ্কর নিতান্ত বিষণ্ণভাবে বদন বিনত করিলেন। ঘনানন্দ বলিলেন,—"এ সম্বন্ধে তুমি দুঃখিত হইতে পার বটে; কিন্তু যে কারণে এত দিন তোমার সহিত যোগেশ্বরী দেবীর সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে নাই, তাহা যখন তোমাকে বুঝাইয়া দিব, তখন আর তুমি দুঃখ করিবে না। বৎস! তুমি এত দিন বালক ছিলে। যোগেশ্বরী দেবীর তত্ত্ব প্রণিধান করা ও তাঁহার দুজ্ঞের্য় চরিত্র উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে এখনও সময়ে সময়ে অসম্ভব হইয়া পড়ে। তুমি ইহার পূর্ব্বে তাঁহার মহিমা কিছুই অনুভব করিতে পারিতে না। সুতরাং এত দিন আমি তোমার সহিত তাঁহার পরিচয় ও সাক্ষাতের বিশেষ চেষ্টা করি নাই।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"ভগবন্! এখনও কি আর সেইরূপ অজ্ঞান বালক আছি?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"না বৎস, বয়োবৃদ্ধির সহিত তোমার যেরূপ জ্ঞানের পরিপক্কতা হইয়াছে, তাহাতে সেই দেবীর রহস্য-পূর্ণ লীলা প্রণিধান করিতে এখন তুমি সম্পূর্ণ সমর্থ হইয়াছ বলিয়া আমি মনে করি।"

উমাশঙ্করের মুখ প্রফুল্ল হইল। ঘনানন্দ বলিতে লাগিলেন,—"আর এক কথা, যোগেশ্বরী দেবী এ পর্য্যন্ত যেরূপ স্থানে ও যেরূপ সময়ে আমাকে দেখা দিয়াছেন বা আমার সহিত দেখা করিয়াছেন, তোমার পক্ষে তাঁহার সহিত আলাপ-পরিচয়ের তাহা অনুকূল ছিল না। তোমার বয়স ও কোমলতা বিবেচনা করিয়া আমি তোমাকে সে সকল সময়ে ও সে সকল স্থানে উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করি নাই।"

উমাশঙ্কর জিজ্ঞাসিলেন,—"ভগবন্! এখনও কি আমি সেরূপ অসময়ে সেরূপ স্থানে যাইবার অনুপযুক্ত আছি?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"না বৎস! তোমার বয়স ও প্রকৃতি এখন আর তদ্বিষয়ের অনুপযোগী বলিয়া আমি মনে করি না।"

উমাশঙ্করের মুখ আবার প্রফুল্ল হইল। ঘনানন্দ বলিলেন,—"আজি গভীর রাত্রিকালে একটি নির্দ্ধারিত স্থানে তাঁহার সহিত দেখা করিবার নিমিত্ত তিনি আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। এই জন্যই

অদ্য আমি এই প্রসঙ্গ তোমার নিকট উত্থাপিত করিলাম। আজি আমি তোমাকে সঙ্গে লইয়া তথায় যাইব মনে করিয়াছি।"

উমাশঙ্কর গুরুদেবের চরণে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"এ অধমের প্রতি ভগবানের অপরিসীম দয়া। আজি আমার জীবন সার্থক হইবে।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"কিন্তু বৎস! এ কথা এ সময়েই বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, তাঁহার কোন ব্যবহারেরই স্থিরতা নাই। তাঁহার সহিত সাক্ষাতের ব্যবস্থা স্থির থাকিলেও হয় তো তাঁহার সাক্ষাৎলাভ না ঘটিতে পারে এবং কোন সম্ভাবনা না থাকিলেও হয় তো তাঁহার সাক্ষাৎলাভ ঘটিতেও পারে।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আমার অদৃষ্ট।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"তাঁহার অন্যান্য বৃত্তান্ত ও ব্যবহারের বিষয় তোমাকে যথাসময়ে জানাইব। তুমি সমস্ত শুনিলেই বুঝিতে পারিবে যে, তাঁহার প্রকৃতি কিরূপ রহস্যজালে জড়িত।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আমার প্রতি কৃপা করিয়া তিনি আমার সহিত বাক্যালাপ করিবেন না বোধ হয় কি?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"এ কথার উত্তর দিতে আমার সাধ্য নাই। তাঁহার কখন্ কি ভাব হয়, তাহা অন্যের দুরধিগম্য। তবে তোমার ন্যায় সন্তানকে স্নেহ না করা তাঁহার অসাধ্য হইবে বলিয়া আমার বোধ হয়।"

উমাশঙ্কর আবার বলিলেন,—"আমার অদৃষ্ট।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জাহ্নবী-তটে।

মাতর্গঙ্গে! তুমি বিষ্ণুর পাদ-পদ্ম হইতে বিগলিত হইয়া ব্রহ্মার কমণ্ডলু-মধ্যগত হইয়াছিলে; তদনন্তর মহেশ্বরের মস্তকে স্থান গ্রহণ করিয়া নারকী নরকুলকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছ। তোমার উৎপত্তির এই বৃত্তান্ত অনেকেই কবি-কল্পনা বলিয়া মনে করেন। তোমার এই ইতিহাস যথার্থ অথবা কাল্পনিক, তাহার বিচারে আমাদের কোনই প্রয়োজন নাই; কিন্তু তুমি যে ভূলোক-তারিণী, তাহার আর সন্দেহ কি? তোমার অমৃত-কল্প বারি পান করিয়া মনুষ্য স্বাস্থ্য-সুখ সম্ভোগ করিতেছে; তোমার পবিত্র নীরে অবগাহন করিয়া মানবকুল সন্তোষ ও প্রসন্নতা সঞ্চয় করিতেছে এবং তোমাকে জড়াতীতা প্রত্যক্ষরূপা দ্রবময়ী দেবী জ্ঞান করিয়া তাহারা ভক্তি, ধর্ম্ম ও জ্ঞানার্জ্জন করিতেছে। তোমার প্রসন্ন সলিলরাশি যে যে প্রদেশ বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, তত্তৎসন্নিহিত জনপদ-সমূহ গৌরবপদবী লাভ করিয়াছে এবং তৎপ্রদেশের অধিবাসিবর্গ সর্ব্বত্র সমাদর উপভোগ করিয়াছে এবং তত্রত্য কণ্টকাকীর্ণ ভূমিখণ্ডও পুণ্যতীর্থরূপে সম্পূজিত হইয়া আসিতেছে। কত কালের কত সুকীর্ত্তি ও কুকীর্ত্তির চিহ্ন তোমার কলেবরের সহিত সম্পৃক্ত রহিয়াছে। যখন সত্যবতীনন্দন ভূতলে কৈলাসকল্প বারাণসীধামের প্রতিষ্ঠা করেন, তখন মা, তুমিই সেই সুকীর্ত্তির সাক্ষী। আবার যখন পিতৃদ্রোহী আওরঙ্গজেব বিশ্বেশ্বরের দেবমন্দির বিচূর্ণিত করেন, তখন মা, তুমিই তাহার সাক্ষী। যখন শত্রুভীত নৃপকুলগ্লানি লাক্ষণেয় সেন স্বকীয় স্বাধীন রাজদ্বার যবনদিগের নিমিত্ত উন্মোচন করিয়া কম্পিত-কলেবরে পলায়ন করেন, তখন মা, তুমিই তাহার সাক্ষী। আবার যখন মুষ্টিমেয় সৈন্য-সাহায্যে ভাগ্যবান্ লর্ড ক্লাইভ পলাশী-প্রান্তরে ইংলণ্ডের বিজয়-ভেরী নিনাদিত করেন, তখনও মা, তুমিই তাহার সাক্ষী। তোমার যে প্রসন্ন সলিলের উপর দিয়া মল্লিকামালা-বিশোভিত কলেবর যুবক-যুবতী মলয়-মারুত-সাহায্যে তরণীযোগে হাস্যের লহর তুলিয়া ভাসিতেছে, তোমার সেই সৈকতে চিতায় নবীন স্বামীর বিগত-জীব কলেবর সংস্থাপিত করিয়া কিশোরী কামিনী বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে হাহাকার-রবে বসুন্ধরা বিদীর্ণ করিতেছে। তোমার যে জলে আচমন করিয়া ধর্ম্মনিষ্ঠগণ পবিত্রতা উপভোগ করিতেছেন, মা, তোমার সেই সলিল-গর্ভে নরহত্যাকারী নিহত শব সমাহিত করিয়া আপনার পাপের চিহ্ন সংগোপন করিতেছে। মাতর্গঙ্গে! এ সংসারের নিষ্কাম-ধর্ম্ম-শিক্ষার তুমিই একমাত্র অতুলনীয় স্থল। পাপ ও পুণ্য, শুভ ও অশুভ সর্ব্বত্র তুমি সমদর্শী। পুণ্যবানের সদনুষ্ঠান, দুরাত্মার দুষ্কর্ম্ম, তোমারই সমক্ষে, কখনও বা তোমারই বক্ষের উপর সম্পন্ন হইতেছে। তুমি কিন্তু নির্ব্বাক, নির্লিপ্ত ও নির্ব্বিরোধ। তোমাকে দেখিলে, শুভাশুভ সর্ব্ববিষয়ে তোমার এই অভিনন্দন ও দ্বেষ-বিরহিত ভাব পর্য্যবেক্ষণ করিলে উপদেশলাভের নিমিত্ত আর সৎসঙ্গের প্রয়োজন থাকে না, শাস্ত্রের মর্ম্মগ্রহণের নিমিত্ত ব্যাকুল হয় না এবং ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত বলিয়া হতাশ হইতে হয় না। অয়ি দ্রবময়ি পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে! এই ভক্তাধম

ধর্ম্মজ্ঞানবিহীন পাষণ্ডকে তুমি কৃপা কণিকা প্রদান করিয়া ধন্য করিবে না কি?

অনন্ত-প্রবাহিণী ভাগীরথীর কূলে দাঁড়াইয়া দুই সন্ন্যাসী। যে স্থানে সন্ন্যাসিদ্বয় দণ্ডায়মান, তাহা কাশীধাম হইতে এক ক্রোশেরও একটু বেশী দূরবর্ত্তী। স্থানটি নির্জ্জন, শান্তিপূর্ণ ও মনোহর। এই স্থানের সন্নিকটে একটি ক্ষুদ্র অরণ্য। সন্ন্যাসিদ্বয় আমাদের পরিচিত ঘনানন্দ ও উমাশঙ্কর।

ঘনানন্দ বলিলেন,—"এই স্থানে এই সময়ে যোগেশ্বরী দেবী আজি আগমন করিবেন কথা আছে। তাঁহার অন্যান্য কথা তোমাকে ক্রমশঃ জানাইব। তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি যে, তাঁহার কোন কার্য্যেই বিশেষ স্থিরতা নাই; সুতরাং এ স্থানে আসিবার কথা থাকিলেও তিনি হয় তো না আসিতেও পারেন।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আমার যেরূপ দুরদৃষ্ট, তাহাতে হয় তো সে দেবীর দর্শনলাভ আমার ভাগ্যে না ঘটিতেও পারে। প্রভুর নিকট পুনঃ পুনঃ তাঁহার নাম ও মহিমার কথা শুনিয়া আসিতেছি, প্রভুর সহিত তাঁহার প্রায়ই সাক্ষাৎ হয়, ইহাও শুনিয়াছি; কিন্তু দুরদৃষ্ট-ক্রমে এ পর্য্যন্ত তাঁহাকে দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিবার সুযোগ আমার অদৃষ্টে ঘটিল না। প্রভু আমাকে এত দিন তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অনুপযুক্ত বলিয়াই বোধ করিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রভু দয়া করিয়া সে আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন। অতঃপর আমার অদৃষ্ট।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"বৎস। বার বার অদৃষ্টের নিন্দা করিও না। তোমার বয়স যখন এমন অবস্থায় উপনীত হইতেছে যে, এ সময়ে তোমাকে অনেক কথা জানাইবার প্রয়োজন হইয়াছে। যত দিন তোমার চরিত্র গঠিত হয় নাই, যত দিন তুমি দৃঢ়-চিত্ত ও প্রকৃষ্টরূপ হৃদয়-বলে বলীয়ান্ হও নাই, তত দিন অনেক কথা তোমাকে জানাই নাই। এক্ষণে ভগবানের কৃপায় আমার সে সকল আপত্তি বিগত হইতেছে; এ জন্য ক্রমে ক্রমে অতঃপর অনেক কথা তোমাকে জানাইব স্থির করিয়াছি, আমি বুঝিয়াছি, তুমি সাধারণ মনুষ্য নহ। এক সঙ্গে ধর্ম্মানুষ্ঠান ও বিষয়-ভোগ এতদুভয়ের অভ্যদ্ভুত সম্মিলন তোমাতে সংঘটিত হইবে। কি উপায়ে বা কি প্রণালীতে তাহার সুযোগ উপস্থিত হইবে, তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারিতেছি না; কিন্তু তাহা যে ঘটিবে, সে সম্বন্ধে আমার কোনই সন্দেহ নাই। সুতরাং বৎস! তোমার অদৃষ্ট অতীব শুভ।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"কি ঘটিবে না ঘটিবে, সে সম্বন্ধে আমার কোনই চিন্তা নাই। শুভাশুভ কিছুই আমি জানি না প্রভো! আপনার চরণের দাসত্ব না ঘুচিলেই জীবনের সকলই শুভ বলিয়া মানিব। এক্ষণে দেবীর দর্শনলাভ আমার প্রাণের একান্ত কামনা হইয়াছে।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"অবশ্যই তাহা সিদ্ধ হইবে, কিন্তু কতক্ষণে বা কখন্ ঘটিবে, তাহা বলা ভার। অতএব আইস, আমরা এই নদী-তীরে ধুনি জ্বালিয়া উপবেশন করি ও কথা-বার্ত্তায় সময় কাটাইতে থাকি।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জ্ঞান।

কৃষ্ণপক্ষের রজনী—অন্ধকার। সেই অন্ধকারে জাহ্নবীতটে বনপার্শ্বে দুই সন্ন্যাসী উপবিষ্ট, সন্ন্যাসিদ্বয়ের নিকটে ধুনি জ্বলিতেছে। তাহারই আলোকে তাঁহাদের বদনমণ্ডল এক একবার দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। স্থানটি ভয়ানক হইলেও সন্ন্যাসিদ্বয় নির্ভীক।

যুবক উমাশঙ্কর ঘনানন্দ স্বামীকে জিজ্ঞাসিলেন,—"প্রভো! তার পর?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"বৎস! তার পর জ্ঞান এই জ্ঞান কেবল শাস্ত্রালোচনা বা সদুপদেশলভ্য নহে, ইহা যোগের ফল।"

উমাশঙ্কর জিজ্ঞাসিলেন,—"সে যোগ কিরূপ? আপনি বলিয়াছেন যে, প্রাণায়ামাদির অনুষ্ঠানই প্রকৃত যোগ নহে। তাহাতে অন্যান্য অনেক উপকার এবং সঙ্গে সঙ্গে দেহের উপর মনুষ্যের যথেষ্ট ক্ষমতা জন্মিতে পারে; কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি চিত্তের একাগ্রতা-সাপেক্ষ। তবে এখন জ্ঞানের নিমিত্ত যে যোগের কথা বলিতেছেন, তাহা আবার কি যোগ?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"তাহা চিত্তের একাগ্রতা। যোগ শব্দ অনেকার্থে ভগবান্ ব্যবহার করিয়াছেন। যোগ বলিলেই যে কুম্ভক-সাহায্যে দেহকে ঊর্দ্ধে তুলিতে হইবে বা বাম ও দক্ষিণ-নাসায় বায়ু-সঞ্চালনের কৌশল-বিশেষ অভ্যাস করিতে হইবে, এমন নহে। সে সকল প্রক্রিয়াও যোগের সহায় বটে, কিন্তু চিত্তের একাগ্রতাই মুখ্য যোগ। এই চিত্তের একাগ্রতা সাধিত করিতে হইলে অভ্যাসই প্রধান সহায়। ইহার পূর্ণতা ঘটিলে আত্ম-জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী। এ কাল পর্য্যন্ত অনেক সাধুর সহিত আমার সাক্ষাৎকার

ঘটিয়াছে ; সুতরাং আমি নানারূপ যোগী দেখিয়াছি। কোন কোন ব্যক্তি বায়ু-নিরোধ ও অন্যান্য প্রক্রিয়া দ্বারা সুদীর্ঘকাল দেহকে যুবার ন্যায় স্বচ্ছন্দ রাখিয়াছেন। কেহ কেহ আহারাদি-বিষয়ে এতই অল্পতা অভ্যাস করিয়াছেন যে, রোগ তাঁহাদিগের দেহকে কখনই স্পর্শ করিতে পারে না। কেহ অণিমাদি অষ্ট-সিদ্ধির কোন সিদ্ধিলাভ করিয়া অলৌকিক ব্যাপার সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছেন। আবার কেহ কেহ কুপথে সাধনা করিয়া বৃথা জীবনের সুখ-শান্তি বিনষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত যে জ্ঞান, তাহা অনেকেরই আয়ত্ত হয় নাই। মনুষ্যসমাজ তাঁহাদিগের ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া, তাঁহাদিগকে অলৌকিক ক্ষমতা-সম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া পূজা করিলেও তাঁহাদিগের নিজের চিত্ত তাদৃশ কোন সম্মানেই আর পরিতৃপ্তি লাভ করিতেছে না। প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে তাঁহারা আপনাদিগকে অধম বলিয়াই মনে করিতেছেন।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"বুঝিলাম, প্রকৃত জ্ঞান-লাভই প্রার্থনীয় এবং একাগ্রতাই তাহার সাধন ; কিন্তু শাস্ত্রে যমনিয়মাদি যে সকল ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়, একাগ্রতালাভের নিমিত্ত তাহার কি প্রয়োজন নাই?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"শাস্ত্র কখনই মিথ্যা নহে। যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গই যোগ। যেমন মনুষ্য নানা পদার্থ ভোজন করিয়া জীবনধারণ করিতে পারে, সেইরূপ নানা উপায়ে জ্ঞানলাভ করা যাইতে পারে। অভ্যাসের প্রাবল্যে কেহ ভোজ্যবিশেষের অনুরাগী হয় এবং তাহাই অনুকূল আহার বলিয়া গ্রহণ করে। সেইরূপ শিক্ষা ও সংসর্গের প্রাবল্যে যোগিগণ নানা পথ গ্রহণ করেন। শাস্ত্রবিহিত অষ্টাঙ্গ-যোগ তাহার অন্যতম। তাহারও পরিণাম-ফল একাগ্রতা। কিন্তু স্বতন্ত্র চক্ষে দেখিলে তাহাতেও অপূর্ণতা দৃষ্ট হয়। কারণ, তাহা ভক্তিবিরহিত। কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান এই তিনটি পরস্পর সাপেক্ষ। কর্ম্ম ও ভক্তিপ্রভাবে যে একাগ্রতা জন্মে, তাহা বড়ই মধুর এবং তজ্জনিত যে জ্ঞান, তাহাই প্রার্থনীয়।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"তাহাও বুঝিলাম। কিন্তু ইন্দ্রিয়-সংযমাদি বিষয়ে যে সকল শাস্ত্রবিহিত ব্যবস্থা আছে, তাহা কতদূর প্রতিপাল্য?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"সে সকল ব্যবস্থা অমূল্য এবং অবশ্য প্রতিপাল্য। কিন্তু তৎসম্বন্ধে আমরা যেরূপ আতিশয্য করিয়া থাকি, তাহা শাস্ত্রের অনুমোদিত হইতে পারে না। আমরা ইন্দ্রিয়াদিসংযম সম্বন্ধে এককালে তৎসমস্ত পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করি, কিন্তু শাস্ত্রের কদাপি তাহা তাৎপর্য্য নহে। ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তিসমূহ জগদীশ্বরের বিধি-বিহিত। তৎসমস্ত পরিত্যাগ করিলে বৈধ ব্যবস্থার উল্লঙ্ঘন করা হয়। যেমন কিঞ্চিন্মাত্র আহার না করিলে শরীর-ধারণ অসম্ভব, সেইরূপ এককালে ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিলে জীবসংস্থিতি রক্ষিত হওয়া অসম্ভব এবং দেহ ও মনকে সুস্থ রাখাও সুকঠিন। স্ত্রীসংসর্গ-বিরহিত হওয়া অনেকেই ধর্ম্ম-মার্গের প্রধান অবলম্বনীয় বলিয়া মনে করেন ; কিন্তু শাস্ত্রের তাহা তাৎপর্য্য নহে। জীবপ্রবাহ রক্ষণার্থ ঐ অত্যাবশ্যক উদ্ভব হইয়াছে, তাহার পরিবর্জ্জন ঐশ্বরিক প্রবৃত্তির নিয়মের বিরোধী। তাহার অবৈধ ব্যবহারের নিরোধই সংযম শব্দের লক্ষ্যীভূত। যাহাতে সামাজিক বিশৃঙ্খলা না ঘটে, যাহাতে কাহারও অন্তরে ক্লেশের উদ্ভব না হয়, যাহাতে প্রবঞ্চনা, স্বার্থপরতা বা নিন্দিত ব্যবহারের সুযোগ উপস্থিত না হয়, এরূপ ভাবে বৈধ স্ত্রী-সংসর্গ নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু সাধকের এমন সময় ও অবস্থা উপস্থিত হইতে পারে, যখন তাঁহাকে আর কোন নিয়মেরই অধীন থাকিতে হয় না এবং কোন নিয়ম তাঁহাকে শাসনাধীন রাখিতে পারে না। তখন তিনি প্রবৃত্তিমাত্র-পরিশূন্য হইয়া বিমলানন্দ উপভোগ করিতে থাকেন। এইরূপ আহার-সংযম বিষয়েও নিরন্তর উপবাস ব্যবস্থা নহে। অত্যাহার ও অবৈধ ভোজনই পরিবর্জ্জনীয়। অন্যান্য সকল ইন্দ্রিয়-ব্যাপারেই এইরূপ নিয়ম বুঝিতে হইবে। যোগের অবস্থা-বিশেষে সকলই স্বতঃ নিরুদ্ধ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাদৃশ অবস্থাপ্রাপ্তির পূর্ব্বে বলপূর্ব্বক বৈধ ইন্দ্রিয়-ব্যবহারের একান্ত নিরোধ হইলে দৈহিক অসুস্থতা, চিত্তচাঞ্চল্য, নিরুৎসাহ, অবসাদ প্রভৃতি যোগের প্রতিকূল দুর্লক্ষণসমূহ অবশ্যই উপস্থিত হয় এবং হিতে বিপরীত ঘটে।"

উমাশঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে প্রভো! উপদেষ্টা আচার্য্যগণকে শাস্ত্রাচারের সর্ব্বত্র সমান ব্যাখ্যা করিতে দেখা যায় না কেন?

ঘনানন্দ উত্তর দিলেন,—"শাস্ত্রের বিরুদ্ধ অর্থ কল্পনা করায় আর্য্য-ধর্ম্ম ক্রমে নানা স্থানে নানারূপ উৎকট আকার ধারণ করিয়াছে। বঙ্গদেশের ধর্ম্মের সহিত কাশীপ্রদেশবাসিগণের ধর্ম্মগত প্রভূত বৈলক্ষণ্য। এইরূপ মহারাষ্ট্রে ও পঞ্জাব প্রদেশের ধর্ম্মগত পার্থক্যও ভয়ানক! শাস্ত্রার্থকে বিভিন্নভাবে গ্রহণ করায় এই সকল ধর্ম্মাচারের বিভিন্নরূপে অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।"

সহসা দূরাগত নারী-কণ্ঠ-নিঃসৃত অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময় হাস্যধ্বনি উভয়েরই কর্ণে প্রবেশ করিল। তাঁহারা চমকিত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

ঘনানন্দ বলিলেন,—"বৎস! তোমার আশা সফলিত হইবার সম্ভাবনা উপস্থিত। নিকটেই যোগেশ্বরী দেবীর আবির্ভাব হইয়াছে। এ স্বর্গীয় হাস্যধ্বনি তাঁহারই কণ্ঠনিঃসৃত। তুমি নীরবে আমার অনুসরণ কর।"

উমাশঙ্করের দেহ পুলকিত হইয়া উঠিল। তিনি ধীরে ধীরে নিরতিশয় আশান্বিত-হৃদয়ে ঘনানন্দের অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যোগেশ্বরী।

ক্রমে অন্ধকারাচ্ছন্ন নভোমণ্ডল আলোকিত হইল এবং বিমল জ্যোৎস্নায় সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ঘনানন্দ স্বামী ও উমাশঙ্কর ধীরে ধীরে অরণ্য-পথে অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলেন, দূরে এক বিস্রস্ত-বসনা, আলুথালুবেশা, মলিনা সুন্দরী দাঁড়াইয়া উর্দ্ধমুখে আকাশের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন। সুন্দরী মলিনা ও বসনভূষণ-বিহীনা হইলেও তাঁহার অলৌকিক শ্রীতে সন্নিহিত প্রদেশ যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। সুন্দরী সধবা; কারণ, তাঁহার সীমন্তে অতি সুলোজ্জ্বল সিন্দূর-বিন্দু। তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া তাঁহাকে উন্মাদিনী বলিয়াই বোধ হয়।

সবিস্ময়ে অনুচ্চস্বরে উমাশঙ্কর বলিলেন,—"প্রভো! ইনিই কি সেই দেবী?"

ঘনানন্দও অনুচ্চস্বরে বলিলেন,—"বৎস! ইনিই যোগেশ্বরী। ইঁহার মর্ম্ম প্রণিধান করিতে পারিলে নির্লিপ্ত ধর্ম্মময় জীবন-ব্যাপারের অনেক রহস্য বুঝিতে পারিবে। ইঁহার জীবন দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় এবং অত্যদ্ভুত প্রহেলিকাবৎ। ইনি কখনও জ্ঞানময়ী পণ্ডিতা, কখনও বা বোধ-বিহীনা উন্মাদিনী। কখনও পৌর নারীর ন্যায় লজ্জাবতী, কখনও বা বিগলিত-বসনা লজ্জাহীনা। কখনও ধীরা, কখনও বা চঞ্চলা। কখনও গম্ভীরা, কখনও বা প্রগল্‌ভা। তুমি আজি ইঁহাকে এই ভাবে দেখিতে পাইতেছ; ক্রমশঃ ইঁহার আরও অনেক ভাব তোমার চক্ষুতে পড়িবে। যতই ইঁহাকে দেখিতে থাকিবে, ততই বিস্ময়ে তোমার হৃদয়-মন পরিপূরিত হইতে থাকিবে। ইনি লোভস্পৃহা-বিবর্জ্জিতা, লালসা ও আকাঙ্ক্ষাবিহীনা, নিষ্কাম ধর্ম্মের অত্যদ্ভুত উদাহরণ; কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের অদ্ভুত সম্মিলনস্থল।"

উমাশঙ্কর ভক্তিপূর্ণভাবে জিজ্ঞাসিলেন,—"কে এই দেবী?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"ইনি কে, তাহা আমি জানি না। কিন্তু ইঁহার এক অলৌকিক পরিচয় আমি বলিতে পারি। ইনি আমার স্ত্রী; অথচ অজ্ঞাতকুলশীলা ও অবিবাহিতা। এই দাম্পত্য-সম্বন্ধের মধ্যে কোন পক্ষেই কামের সংস্পর্শ নাই এবং গৃহীর ব্যবহারও নাই। তথাপি এই দেবীর বিশ্বাস—ইনি আমার ধর্ম্মপত্নী! কোনরূপ সমাজ-সঙ্গত বা ধর্ম্ম-সঙ্গত বিবাহের বন্ধন ঘটে নাই এবং স্ত্রীপুরুষোচিত কোন ব্যবহারের বাসনাও কদাপি কোন পক্ষের মনে উদয় হয় নাই। তথাপি এই সৌন্দর্য্যময়ী যুবতী আমার আশ্রয়-বিহীন গৃহহীন, এবং সংস্থান-শূন্য গৃহের গৃহ-লক্ষ্মী।"

আবার উমাশঙ্কর সবিস্ময়ে বলিলেন,—"তবে তো সত্যই উনি আমার মা। অহো! কি ভাগ্য! মা আমার সর্ব্বদা কোথায় থাকেন বাবা? কত দিন হইতে উনি প্রভুর সহিত এই অদ্ভুত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"বৎস! তোমার এই অদ্ভুত মা কখন্ কোথায় থাকেন, তাহার স্থিরতা নাই; কিন্তু যেখানেই যখন থাকুন, অনেক সময়েই ইনি আমাকে দেখা দেন। কখনও কখনও এমনও ঘটে যে, দুই চারি দিবস ইনি অবিচ্ছেদে আমারই সঙ্গে বিচরণ করেন। আমি অতীব প্রচ্ছন্নভাবে দেশান্তরে গমন করিয়াছি, জানি না, কোন্ শক্তিবলে ইনিও সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া আমাকে দর্শন দান করিয়াছেন। স্ত্রীমাত্রই পুরুষের প্রতিপাল্য; কিন্তু আমার এই স্ত্রীর কোন দায়িত্বই আমার স্কন্ধে নাই। ইঁহার ভরণ-পোষণাদির কোন ভারই আমাকে কখনও বহন করিতে হয় না। কখনও কখনও আমি ইঁহার ছিন্ন বসন দেখিয়া, নূতন বসন সংগ্রহ করিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছি; ইনি তৎক্ষণাৎ হাসিতে হাসিতে আমার নিকট হইতে প্রস্থান করিয়াছেন এবং অনতিকালমধ্যে হয় তো মহার্ঘ্য কৌষিক-বস্ত্র পরিধান করিয়া আমার সমীপাগত হইয়াছেন। কখনও ইঁহাকে দুর্ব্বল বোধ করিয়া আহারের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছি; ইনি তখনই হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিয়া অনতিকাল-মধ্যে রাশীকৃত বহুবিধ মিষ্টান্নাদি আনিয়া আমার চরণ-সমীপে স্থাপন করিয়াছেন। কোথাও ইঁহার ভাণ্ডার নাই—দ্রব্যাদি রাখিবার কোন স্থান নাই;

তথাপি প্রয়োজন হইবামাত্র দ্রব্য-সমূহের সঙ্কুলান কিরূপে হয়, তাহা আমি নির্ণয় করিতে পারি নাই। সংসারে ইহার কিছুই নাই অথচ সকলই আছে।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"কি অলৌকিক ব্যাপার। হায়, কোন্ পাপে আমি এত দিন এই মাতৃদর্শনে বঞ্চিত ছিলাম?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"বৎস! সকল কার্য্যেরই সমুচিত সময় আছে। তোমার মাতৃদর্শনের উপযুক্ত সময় এত দিন হয় নাই। এক্ষণে কেমন করিয়া কোথায় এই দেবীর সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়, বলি, শুন। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে মথুরার ধ্রুবঘাটে এই দেবী প্রথমে আমার নিকটাগতা হন। তখন ইঁহার বয়স ষোড়শ বর্ষ। তদবধি ইনি আমাকে স্বামি-সম্ভাষণ করিয়া আসিতেছেন এবং সর্ব্বপ্রকার আকাঙ্ক্ষাবিরহিত-ভাবে আমার অনুগামিনী হইয়াছেন। প্রথমতঃ আমি ইঁহাকে কুলটা কামিনী বলিয়া মনে করিয়াছিলাম; তদনন্তর ইঁহাকে উন্মাদিনী বলিয়া বোধ হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে ইঁহাকে শাপভ্রষ্টা দেবী ব্যতীত আর কিছুই মনে হয় না। ইঁহার নাম, পিতৃমাতৃবৃত্তান্ত, জাতি, কুল, পূর্ব্বাবস্থা কিছুই আমি জানি না। একটা জানা না থাকিলে অনেক সময় অসুবিধা হয় দেখিয়া আমি ইঁহার যোগেশ্বরী নামকরণ করিয়াছি।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"ভগবন্! আজ আমার জীবন সার্থক; আজি আমি সাক্ষাৎ যোগেশ্বরী মাতার সজীব মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। কিন্তু ভগবন্! এ অধম সন্তান কি ঐ দেবীর সহিত বাক্যালাপের সাহস করিতে পারে না?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—অবশ্যই পার। কিন্তু হয় তো প্রথম সুযোগে কথাবার্ত্তা না ঘটিতেও পারে। যোগেশ্বরীর প্রকৃতি রহস্য-জালে বিজড়িত। তিনি কখন্ কোন্ ভাবে থাকেন, তাহার স্থিরতা নাই; সুতরাং কখন্ কথা কহিবেন, কখন্ না কহিবেন, তাহা স্থির বলা যায় না। তুমি আমার সঙ্গে আইস, আমি যোগেশ্বরীর সহিত তোমার পরিচয় করাইবার চেষ্টা করিব।"

ঘনানন্দ ও উমাশঙ্কর আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া যোগেশ্বরীর নিকটস্থ হইলে ঘনানন্দ ডাকিলেন,—"যোগেশ্বরি!"

যোগেশ্বরী চমকিত হইয়া দাঁড়াইলেন। অন্তমনস্কভাব যেন কোথায় বিদূরিত হইয়া গেল, অপূর্ব্ব আনন্দে তাঁহার দেহ যেন কণ্টকিত হইয়া উঠিল এবং প্রেমাবেশে তাঁহার বদনমণ্ডল রঞ্জিত হইল। তিনি ভক্তিভাবে ঘনানন্দকে প্রণাম করিয়া তত্রত্য কিঞ্চিৎ ধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক মস্তকে স্থাপন করিলেন। ঘনানন্দ স্বামীর এই অলৌকিক পত্নী কখনই স্বামীকে স্পর্শ করিতেন না। দর্শনমাত্রেই দূর হইতে স্বামি-চরণের উদ্দেশে তিনি প্রণাম কতিতেন এবং তত্রত্য কিঞ্চিৎ ধূলি লইয়া স্বামীর পদ-রজঃ জ্ঞানে ভক্তি সহকারে মস্তকে, রসনায় বা বক্ষঃস্থলে অর্পণ করিতেন।

বীণাধ্বনির ন্যায় সুমধুর স্বরে যোগেশ্বরী বলিলেন,—"স্বামিন্! আমি তোমাকে এতক্ষণ আকাশে দেখিতেছিলাম। তুমি কি বিশ্বব্যাপী? তোমার সঙ্গে কে এই সাধু বালক?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"দেবি! এটি আমার পুত্র—উমাশঙ্কর।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"না। তোমার পুত্রে কাজ নাই। তোমার পুত্র হইলে আমাকেই তাহার ভার লইতে হইবে; সুতরাং তাহাকে স্নেহ-মমতারও ভাগ দিতে হইবে। আমার হৃদয়ে যাহা কিছু ছিল, সকলই আমি স্বামি-দেবতাকে সমর্পণ করিয়াছি, তাহা হইতে অংশ করিয়া আর কাহাকেও কিছুই দিবার উপায় নাই। তুমি গৃহীর ছেলে কেন লইয়াছ? যাহাদের ছেলে, তাহাদিগকে ফিরাইয়া দাও; আমাদের ছেলের কাজ নাই।"

উমাশঙ্কর তৎক্ষণাৎ দেবীর চরণ-সমীপে নিপতিত হইয়া কাতর-স্বরে বলিলেন,—"মা! মা! কোন পিশাচ জননীও তো সন্তানকে পরিত্যাগ করে না, তুমি তো দেবী। আমি অতি শৈশবে মাতৃহীন; মাতৃ-স্নেহ ভোগ করা আমার অদৃষ্টে কখনই ঘটে নাই। অপরিসীম পুণ্যফলে আজি আমি জগৎ-জননী মা পাইয়াছি। তুমি আমাকে দূর করিয়া দিলেও আমি তোমার পদাশ্রয় কখনই ছাড়িব না মা!"

যোগেশ্বরী কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"ঠিক কথা! ঐ আকাশে অনেক মেঘ থাকে, তাহা হইতে কত স্থানে কতই বৃষ্টি হয়। তা হউক, তুই আমার ছেলে। কিন্তু তুই বড় ভাগ্যবান্ ছেলে। যে গুরু লাভ করিয়াছিস, তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ। অনেক জন্মের সঞ্চিত সুকৃতি না থাকিলে এরূপ ভগবান্‌কে গুরুরূপে কেহই পাইতে পারে না। সার্থক তোর সাধনা।"

তাহার পর সেই দেবী সহসা নয়ন মুকুলিত করিয়া নিস্পন্দভাব ধারণ করিলেন। ললাট হইতে যেন জ্যোতিঃ নিঃসৃত হইতে থাকিল, লোচনযুগল হইতে অবিরল-ধারায় অশ্রুপ্রবাহ নিপতিত হইতে লাগিল; তাহার পর ঘনানন্দকে লক্ষ্য করিয়া দীর্ঘ

নিশ্বাস সহ করযোড়ে কহিলেন,—"ধন্য প্রভুর দয়া! ধন্য ঐ শিষ্য বালক।"

তাহার পর উমাশঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"প্রভুর কৃপায় ভাগ্যফলে তোর মত ছেলে পাইলাম। বড় শান্ত-শিষ্ট ছেলে তুই। তুই পরে রাজা হইবি। আমি রাজ-মাতা। তোর জন্য আমি অনেক জিনিস রাখিয়াছি। তুই লইবি আয় বাবা।"

এই বলিয়া যোগেশ্বরী উমাশঙ্করের হস্তধারণ করিয়া অরণ্যমধ্যে অগ্রসর হইতে থাকিলেন। ঘনানন্দ ধীরে ধীরে তাঁহাদের অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড—অন্ধকার

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রতাপ।

অতঃপর পাঠক মহাশয়কে আমাদের সঙ্গে পুণ্যভূমি বারাণসী হইতে বঙ্গদেশের সোণাপুর নামক গ্রামে আসিতে হইতেছে এবং ধর্ম্ম-প্রদীপ্ত, ভস্মাচ্ছাদিত সন্ন্যাসীর সামান্য কুটীর ত্যাগ করিয়া সম্প্রতি তাঁহাকে পাপপঙ্কিল বিলাস-উন্মত্ত শ্যামলাল বাবুর শোভাময় সৌধমধ্যে প্রবেশ করিতে হইতেছে।

রাত্রি প্রায় এক প্রহর হইবে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, টিপি-টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে। পল্লীগ্রামের জনগণ সকলেই স্ব স্ব আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে; পথ জনশূন্য।

শ্যামলাল বাবুর সুসজ্জিত বৈঠকখানায় সুরম্য আলোকাধারে অত্যুজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছে। দুগ্ধফেন-নিভ-শয্যায় শ্যামলাল ও হরিচরণ নামক তাঁহার জনৈক বন্ধু বসিয়া আছেন। মদের বোতল ও গেলাস লইয়া রামা খানসামা দূরে দাঁড়াইয়া আছে এবং আদেশমাত্র সুরা ঢালিয়া শ্যামলাল বাবু ও তাঁহার বন্ধুকে গ্লাস প্রদান করিতেছে।

শ্যামলাল কৃষ্ণবর্ণ, স্থূলদেহ ও খর্ব্বাকার। তাঁহার নাক মোটা, চক্ষু ছোট, ঠোঁট পুরু, বগলের নীচে ও পিঠে দুই চারিখানা দাদ। কিন্তু তাহাতে কি যায় আইসে? শ্যামলাল পিত্রার্জ্জিত বিপুল বিষয়-বিভবের অধিকারী। তাঁহার সম্পত্তির আয় প্রায় চারি লক্ষ টাকা। হাতী-ঘোড়া বিস্তর, বহুবিস্তৃত মনোহর অট্টালিকা অনেক এবং পরম শোভাময় উদ্যান যথেষ্ট। ঘটনাক্রমে সুবিধাজনক জন্মলাভ করায় মনুষ্যলোকে যে কিছু পদার্থ সুখসাধক বলিয়া পরিগণিত, তিনি সমস্তই বিনা আয়াসে প্রচুর পরিমাণে লাভ করিয়াছেন।

শ্যামলালের আকৃতি নিতান্ত ইতর-জাতীয়ের ন্যায় হইলেও তাঁহার কোমরে অতি মলিন উপবীত; পরিধানে সুচিক্কণ সিমলার ধুতি। দেহের আর কোথায়ও কোন বেশভূষার পারিপাট্য নাই। মস্তকের কেশ শূকরের লোমের ন্যায় কঠিন, সুতরাং টেড়ির জ্বালা তাহাকে কখনই উপভোগ করিতে হয় না।

শ্যামলাল মূর্খ। পিতা অন্যান্য সম্পত্তির সহিত সন্তানকে বিদ্যাধন প্রদান করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু গুণধর শ্যামলালের বুদ্ধি এতই সূক্ষ্ম যে, অক্ষরপরিচয়রূপ কঠোর ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেই তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। যেটুকু বাকী থাকিল, ঘষিয়া সরু করিতে গেলে মূলটুকুও ক্ষয় হইয়া যাইবে দেখিয়া সন্তানবৎসল পিতা পুত্রকে বিদ্যাদানের আশা পরিত্যাগ করিলেন।

শ্যামলালের বয়স পঁচিশ বা ছাব্বিশ হইতে পারে। পিতা-মাতা অনেক দিন সংসার ত্যাগ করিয়াছেন; সুতরাং তিনি এক্ষণে সম্পূর্ণ স্বাধীন। শ্যামলালের বিবাহ হইয়াছে, ইহা তিনি জানেন এবং অন্তঃপুরে একটি রমণী তাঁহার পত্নী পরিচয়ে বাস করেন, ইহাও তিনি বিশ্বাস করেন। এতদ্ব্যতীত স্বকীয় স্ত্রী-সম্বন্ধীয় অন্য কোন জ্ঞান শ্যামলালের নাই। স্ত্রীর সহিত শ্যামলালের কখনই সাক্ষাৎ হয় না; কারণ, তিনি রসিক। বহু ফুলের মধু খাইতে অভ্যাস না থাকিলে সে ভ্রমরকে কি কেহ রসিক বলে? আর যে ব্যক্তি পরকীয় রসে নিরন্তর প্রমত্ত না থাকে, সে কি আবার মানুষ?

শ্যামলালের বন্ধু হরিচরণ তাঁহারই আশ্রিত ও প্রতিপাল্য। তোষামোদ তাহার ব্যবসায়। তাহার মাথায় তিন ভাঁজ টেড়ি এবং সকল প্রকার নেশায় তাহার সিদ্ধবিদ্যা; এজন্য চিকাগো একজিভিসন হইতে সে মেডেল পাওয়ার উপযুক্ত। এই হরিচরণ শ্যামলালের নিতান্ত বিশ্বাসভাজন ও রঙ্গরস-বিষয়ের প্রধান মন্ত্রী। বয়সে এ ব্যক্তি শ্যামলাল অপেক্ষা কিছু বড়। লেখা-পড়ায় সে শ্যামলালেরই

দাদা। কিন্তু শ্যামলালের ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন নির্ব্বোধ নহে।

শ্যামলালের দুষ্কর্ম্মের সীমা নাই। তাঁহার অত্যাচারে গ্রামের দীন-দুঃখিগণের স্ত্রী-কন্যা লইয়া বাস করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। অনেক কুলকামিনী তাঁহার দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তিরূপ হুতাশনে আপনাদের ধর্ম্মধনকে আহুতি প্রদান করিয়াছে। যে নারী তাঁহার লালসাপূর্ণ-নয়ন-পথবর্ত্তিনী হইয়াছে, তাহাকেই হয় স্বেচ্ছায়, না হয় লোভবশবর্ত্তিতায় অথবা অত্যাচারের উৎপীড়নে বাধ্য হইয়া, শ্যামলালের করে আত্মসমর্পণ করিতে হইয়াছে। অনেক ভদ্রপরিবারও এ নিদারুণ অত্যাচারের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই। অদ্য শ্যামলাল এক গুরুতর পাপানুষ্ঠানের উদ্যোগ করিয়াছেন।

রঘুনাথ সার্ব্বভৌম মহাশয় সোণাপুরনিবাসী হইলেও বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র সম্মানিত ও সুপ্রসিদ্ধ। তিনি অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা, সুশীলতা ও বিজ্ঞতা অতুলনীয়। এই রঘুনাথের একমাত্র পুত্র নবীনকৃষ্ণ পিতার নিকট এখনও শাস্ত্রাভ্যাস করিতেছেন। সার্ব্বভৌম-নন্দনের ষোড়শ-বর্ষীয়া পত্নী সুহাসিনী দুরদৃষ্টক্রমে দৈবাৎ এক দিন শ্যামলালের পাপ-নয়নের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। সেই সতীত্ব-তেজঃ-প্রদীপ্তা ব্রাহ্মণ-কন্যার অলোক-সামান্য রূপরাশি দর্শন করার পর হইতে তাঁহাকে হস্তগত করিবার নিমিত্ত শ্যামলাল নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়াছেন। শ্যামলালের দূতী সুন্দরীর নিকট গমন করিয়া অর্থ-অলঙ্কারাদি বিবিধ প্রলোভনের ফাঁদ পাতিয়াছিল; কিন্তু অভিমানিনী নবীনা অবজ্ঞার সহিত সে প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়াছেন; অধিকন্তু সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট সমস্ত কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। নিরীহ সার্ব্বভৌম প্রবলপ্রতাপান্বিত ভূস্বামীর সহিত বিরোধ অসম্ভব জানিয়া অচিরে পুত্র-বধূকে পিত্রালয়ে প্রেরণ করিবার আয়োজন করিতেছেন; শ্যামলালও সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া সুন্দরীর পিত্রালয়-গমনের পুর্ব্বেই বলপূর্ব্বক বাসনা-সিদ্ধির সংকল্প করিয়াছেন। গদা নামে এক দুর্বৃত্ত চণ্ডাল শ্যামলালের এইরূপ কার্য্য-সংসাধনের সহায়। অদ্য এই অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীতে গদা দল-বল লইয়া বলপূর্ব্বক সার্ব্বভৌমের পুত্র-বধূকে বাবুর বৈঠকখানায় ধরিয়া আনিবার নিমিত্ত যাত্রা করিয়াছে। শ্যামলাল নিতান্ত আগ্রহের সহিত গদার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

শ্যামলাল গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন,—"গদা এত দেরী কেন করিতেছে? এরূপ বিলম্বের কোনই কারণ নাই তো।"

হরিচরণ বলিলেন,—"বোধ হয়, সুযোগ পায় নাই।"

ক্রুদ্ধ-স্বরে শ্যামলাল বলিলেন,—"সুযোগ! কিসের সুযোগ? যে প্রতিবন্ধক হইবে, তাহাকে প্রাণে মারিতে পর্য্যন্ত হুকুম দিয়াছি। লুকাইয়া কাজ করিতে তো আমি বলি নাই।"

হরিচরণ বলিলেন,—"কিছুই করিতে হইবে না, সহজেই সব কাজ মিটিয়া যাইবে। ছুঁড়ীকে নিয়ে গদা আইসে আর কি।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"তাঁহার রূপের অহঙ্কার, সতীত্বের গৌরব, আজ সব চূর্ণ করিব। আমি গোপনে লোক পাঠাইলাম, তাহা ভাগ্য বলিয়া না মানিয়া অপমান! দেখি, তোর এ সতীত্ব কোথায় থাকে!

হরিচরণ বলিল,—"অপমানটা কিন্তু মনের সঙ্গে নয়; তুই একটা চালাক মেয়েমানুষ এই রকমই করিয়া থাকে। এই রকমে তাহারা আপনাদের দর বাড়ায়। মনে খুব ইচ্ছা আছে, কেবল লোকদেখান একটু কায়দা মাত্র। আপনার কাছে আসিবার জন্য সীতা সাবিত্রী পর্য্যন্ত পাগল! তা সার্ব্বভৌমের পুত্রের বৌ তো কোথায় লাগে।"

শ্যামলালের স্থূল অধর-প্রান্তে একটু হাসি দেখা দিল। বলিলেন,—"যাই বল, গদার বড় অন্যায় দেরী হইতেছে। রামা, তুই একটা দরোয়ানকে গদার খবর আনিবার জন্য সার্ব্বভৌম ঠাকুরের বাড়ীতে পাঠাইয়া দে দেখি। শীঘ্র যা।"

রামা প্রস্থান করিল।

হরিচরণ বলিলেন,—"আপনি এ দেশের রাজা, বিশেষতঃ রসিক-চূড়ামণি। আপনার কাছে যে আসিতেছে, সে কি ভাল রকম সাজগোজ না করিয়া আসিতে পারে? চুল বাঁধিবে, টিপ কাটিবে, পাণ খাইয়া ঠোঁট রাঙ্গা করিবে, পায়ে আলতা লাগাইবে, ভাল কাপড় পরিবে, আতর-গোলাপ মাখিবে, তবে তো আসিবে। ইহাতে একটু বিলম্ব হইবারই কথা।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"কথাটা বলিয়াছ নিতান্ত অসঙ্গত নয়। অবশ্য তাহারও ত সখের প্রাণ! তা তুমি ততক্ষণ একটু মদ ঢাল; ফুর্ত্তি করা যাউক।"

হরিচরণ ত্বরিত শ্যামলালের হস্তে সুরাপাত্র প্রদান করিলেন। তিনি নিঃশব্দে পাত্রস্থিত পদার্থ

গলাধঃ করিয়া বলিলেন,—"কিন্তু ভাই, তাহার যে রূপ, তাহাতে সাজ-গোজ নিতান্তই অনাবশ্যক। সে রূপ দেখিলে মুনি-ঋষিরও মন বিচলিত হয়।"

হরিচরণ বলিলেন,—"দেখেছি, দেখেছি এক দিন। তা সে জিনিস হুজুরেরই যোগ্য বটে।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"তবে দেখেছ তুমি। আরে, তেমন না হ'লে কি আর আমি পাগল হই? গদা বেটা বড় দেরী কচ্ছে; যা হউক, একটা খবর দেওয়া উচিত ছিল।"

শ্যামলাল প্রকোষ্ঠমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে এক প্রকাণ্ড দর্পণ-সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া স্বকীয় ভল্লুক-তুল্য শ্রী দেখিতে দেখিতে মনে মনে ভাবিলেন যে, চেহারাটা কমই বা কিসে? ইহার জন্য নারীজাতি যে পাগল হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি?

সহসা দূরে পদ-শব্দ শুনিয়া শ্যামলাল ব্যস্ততা সহ দ্বার-সন্নিধানে আগমন করিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, "কে ও? গদা?"

দূর হইতে উত্তর আসিল,—"না মহারাজ! হামি দুবে আছে।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"রামচরণ দুবে! খবর কি? এ দিকে এস। গদা কোথায়।"

দোবে ঠাকুর সম্মুখাগত হইয়া উত্তর দিলেন,—"গোদা নেই আছে মহারাজ!"

শ্যামলাল সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিলেন,—"নেই আছে? কোথা গেল সে?"

দোবে বলিল,—"সে বাত কোই নেই জান্‌ছে মহারাজ। কাঁহা ভাগল বা।"

শ্যামলাল জিজ্ঞাসিলেন,—"সে কি কথা। আর ভট্‌চার্য্যির বৌ?"

দোবে বলিল,—"ওবি নেই আছে হুজুর। গোদার সাথে চলিয়ে গেছে। বাড়ীমে সব লোক কান্না কর্‌ছে, গোল কর্‌ছে, চিল্লাচ্ছে।

শ্যামলালের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। বলিলেন,—"কি সর্ব্বনাশের কথা! বাড়ীতে সার্ব্বভৌমের পুত্রবধূ নাই, গদা তাকে নিয়ে পালিয়েছে; অথচ এখানে আসেনি। তারে কোথায় নিয়ে গেল? নিশ্চয়ই একটা কুমতলব আছে। গদা! আজ তোরই এক দিন আর আমারই এক দিন।"

ক্রোধান্ধ শ্যামলাল বেগে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। হরিচরণ ও দোবে ঠাকুর তাঁহার অনুসরণ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পতন

অপরাহ্ণে শ্যামলালের অন্তঃপুর-সংলগ্ন ছাদের উপর তাঁহার পত্নী বিধুমুখী দেবী পরিভ্রমণ করিতেছেন। বিধুমুখীর বয়স অষ্টাদশ বর্ষ হইতে পারে। সুন্দরী নিখুঁত না হইলেও বড়ই লাবণ্যময়ী এবং পূর্ণাঙ্গী। দূর হইতে তাঁহাকে দেখিলে সুন্দরীর শিরোমণি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু নিকটস্থ হইলে তাঁহার দৈহিক অনেক সামান্য সামান্য ত্রুটি উপলব্ধি হইতে থাকে। তাঁহার বর্ণ গৌর, কিন্তু রক্তিমাভা-বিবর্জ্জিত; কিছু ফিকে; আর একটু লাল হইলে ভাল হইত। চক্ষুর্দ্বয় বৃহৎ আয়ত, কিন্তু সরলতা-পূর্ণ দৃষ্টি-বিরহিত, যেন কটাক্ষ-শরের অক্ষয় তূণ। নাসিকা উন্নত, কিন্তু একটু স্থূল নাসারন্ধ্রদ্বয় আর একটু স্থূল হইলে ভাল হইত; মুখ-গহ্বর একটু বেশী আয়ত; লোচন-তারা আর একটু কালো হইলে ভাল হইত। অধরোষ্ঠ একটু বেশী স্থূল। সর্ব্বাঙ্গের গঠন সুপরিণত, কিন্তু একটু কঠোর; যেন পৌরুষ-ব্যঞ্জক তথাপি বিধুমুখী সুন্দরী। প্রথম দর্শনে তাঁহার হাব, ভাব ও বিলাসিতা-সংবলিত রূপরাশি দর্শকের চিত্তকে অভিভূত করে। বিধুমুখী সুন্দরী বলিয়াই পরিচিতা এবং স্বয়ং সৌন্দর্য্য-গর্ব্বে গর্ব্বিতা। তিনি বিলাসিনী। অনেক সাবান তাঁহার দেহের সহিত সংঘর্ষণে বিলীন হইয়া যায়, অনেক ফুলের তৈল তাঁহার কেশের মধ্যে আশ্রয় পাইয়া চরিতার্থ হয়। অনেক আতর তাঁহার সঙ্গসুখ সতত সম্ভোগ করে; অনেক অলঙ্কার তাঁহার দেহের সহিত দেহ মিশাইয়া আপনারা অলঙ্কৃত হইয়া থাকে। নানা সময়ে নানা প্রকার বস্ত্রাদি তাঁহার শ্রী-অঙ্গ আবরণ করিবার সুযোগ পাইয়া ধন্য হয়। সমস্ত দিন বিধুমুখী বিলাসিতা ও দৈহিক পারিপাট্য লইয়া ব্যস্ত থাকেন।

অদ্য বিধুমুখী পূর্ণশোভা বিস্তার করিতে করিতে পরিক্রমণ করিতেছেন এবং চিন্তা করিতেছেন। ভাবিতেছেন কি? ভাবিতেছেন—তাঁহার এই রূপ, এই যৌবন, সকলই বৃথা। যাহার তৃপ্তি হইলে, যে বিনোদিত হইলে এ সকলের সার্থকতা হইতে পারিত, সে একবারও এ দিকে ফিরিয়া দেখে না; কখনও একটা কথা কহে না; ভ্রমেও আলাপ করে না; এ নিগ্রহ অসহনীয়। কিন্তু যদি এরূপ নিগ্রহ না হইয়া অনুগ্রহই হইত, তাহা হইলেই কি বিধুমুখী সুখী হইতেন? এরূপ প্রশ্ন সুন্দরী আপনাকে আপনি

অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং মনে মনে অনেক তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা করিয়া ইহার উত্তরও স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। বিধুমুখী মীমাংসা করিয়াছেন, শ্যামলাল বানর, তাহার কণ্ঠে এ মুক্তামালা কখনই শোভা পাইতে পারে না। শ্যামলাল ঘৃণিত পশু; এ রত্নের মাহাত্ম্য প্রণিধান করা তাহার সাধ্যাতীত। শ্যামলালের ন্যায় শূকরের নিমিত্ত এ দেব-ভোগ্য পদার্থের সৃষ্টি হয় নাই। মনুষ্য-সমাজ তাঁহাকে শ্যামলালের ভাগ্যসূত্রে বিজড়িত করিয়া দিয়াছে বটে; কিন্তু সে অদূরদর্শী সামাজিক নিয়মে বাধ্য থাকিতে তাঁহার আর বাসনা নাই। শ্যামলাল কি সেই নিয়মের সম্মান রক্ষা করিয়াছে?—না। সে সকল নিয়ম, সকল শিষ্টাচারের মস্তকে পদাঘাত করিয়া নিত্যই ধোপা, বাগ্‌দী, মুচি, চাঁড়াল প্রভৃতি নানা-জাতীয় নূতন নূতন রঙ্গিণীর সহিত প্রেমানন্দে কাল-পাত করিতেছে। তবে তিনিই কেন সেই কুৎসিত অবিচারপূর্ণ সামাজিক নিয়মের অধীন থাকিবেন? এ কথা বিধুমুখী স্বীকার করেন যে, শ্যামলাল-রূপ গর্দ্দভের সহিত বিবাহ হওয়ায় তাঁহার বেশ-ভূষা ও বিলাসিতার যথেষ্ট উপকরণলাভের বিলক্ষণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু এ জন্য শ্যামলালের প্রতি কৃতজ্ঞতার কোনই কারণ তিনি দেখিতে পান না। এ সকল সুখ-সৌভাগ্য তাঁহার বিধিনিয়োজিত ফল বলিয়া তিনি মনে করেন এবং শ্যামলালের পরিবর্ত্তে কোন ভিক্ষুকের গৃহিণী হইলেও তাঁহার এতাদৃশ প্রার্থনীয় পদার্থ-প্রাপ্তির ব্যাঘাত হইত না বলিয়া মনে মনে বিশ্বাস করেন।

বলা বাহুল্য যে, বিধুমুখী নারীকুলের কলঙ্কস্বরূপা এবং পাপীয়সীগণের শীর্ষস্থানীয়া। আমাদের দুরদৃষ্ট যে, এরূপ কলঙ্কিনী কামিনীর প্রসঙ্গও লিপিবদ্ধ করিতে হইতেছে। এ স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, অন্তরে যাহাই হউক, বাহ্যতঃ বিধুমুখী স্বকীয় চরিত্র এ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। তিনি যাহাকে শূকর ও বানরবৎ মনে করেন, সেই শ্যামলালের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া তাহাকে নিজের করিবার জন্যও সুন্দরী অনেক বিফল-চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার পর বিধুমুখী পাপে গা ভাসাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

বিধুমুখী যখন স্বকীয় অদৃষ্ট-বিষয়ক নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে ক্রমশঃ পাপপঙ্কিল বাসনার প্রশ্রয় দিতেছেন, সেই সময়ে তাঁহার অলক্ষিতভাবে পশ্চাদ্দিক হইতে আর এক নারী তথায় প্রবেশ করিল। নবাগতার বয়স পঁয়ত্রিশ হইতে পারে। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন; হাব-ভাব, চাল-চলন বড়ই কৃত্রিমতা-মাখা; গায়ের রঙটি উজ্জ্বল-শ্যাম, মুখখানি বেশ সরস হাসি হাসি; মাথায় সযত্ন-বিন্যস্ত খোঁপা, পাত্‌লা ফিন্‌ফিনে কালাপেড়ে ধুতি পরা, হাতে দুগাছি টক্‌টকে সোনার বালা; কোমরে এক ছড়া রূপার গোট।

এই স্ত্রীলোক অনেকক্ষণ বিধুমুখীর পশ্চাদ্দিকে নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিল; তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—"আমি যদি পুরুষ হইতাম।"

বিধুমুখী তৎক্ষণাৎ গালভরা হাসি হাসিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন,—"তাহা হইলে কি হইত সারদা?

সারদা উত্তর দিল,—"তাহা হইলে ঐ চরণের দাস হইয়া জন্ম সার্থক করিতাম।"

বিধুমুখী সগর্ব্বে বলিলেন,—"পুরুষের সঙ্গে মিলন আমার অদৃষ্টে নাই; পুরুষকে দাস করা একটা সুখ বটে; কিন্তু সে সুখভোগ করিতে আমার জন্ম হয় নাই। তুই পুরুষ হইলে আমি তোর পানে ফিরিয়াও চাহিতাম না।"

সারদা বলিল,—"তাহা হইলে আমি তোমার সম্মুখে বুকে ছুরি মারিয়া প্রাণ বাহির করিতাম।"

বিধুমুখী একটু বিষণ্ণ স্বরে বলিলেন,—"প্রাণ বাহির করা তো দূরের কথা, একটা মনের কথা কহিবার লোকও এ পর্য্যন্ত পাইলাম না।"

সারদা বলিল,—"পেলে না সে সে কেবল নিজের মনের গুণে। যার কথা বলি, তাকেই মনে ধরে না।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"যাহাকে মনে ধরে, তাহার বুঝি আমাকে মনে ধরে না?"

সারদা বলিল,—"মনে ধরে না আবার! পাগ্‌লা ভাত খাবি, না হাত ধুব কোথায়।"

বিধুমুখী আরও নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"দেখা হইয়াছিল!"

সারদা বলিল,—দেখা হয়েছিল, কথা হয়েছে।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"ঠিক হইয়াছে?"

সারদা বলিল,—"আজ রাত্রে নটবর হরিচরণ বিধুমুখীর কুঞ্জে এসে দাসখতে সহি করিবেন।"

আনন্দিত-বদনে বিধুমুখী বলিলেন,—"তুমি দ্রৌপদী হও।"

হাসিতে হাসিতে সারদা বলিল,—"গালি দেও কেন বৌদিদি? অত কমে গরিবদের চলে কি?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"তবে না হয় উর্ব্বশী হও।"

অনেকক্ষণ বিধুমুখী নিতান্ত চিন্তিতভাবে এক-স্থানে অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর আপন মনে বলিলেন,—"জানি না, পাপ-পুণ্য কি?

কিন্তু যে পথে আমি পা দিতেছি, তাহা হইতে কিছু-তেই ফিরিব না। যদি মানব-জীবন পাইয়াছি, তাহা হইলে সকল সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিব কেন? কিসের অনুরোধে এই সাধের জীবনকে দুঃখে ডুবাইয়া রাখিব? বড়ই বেদনা পাইয়াছি। এ বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিব।"

তাহার পর সারদার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"এখন আয় ঘরের ভিতর। কি কি কথা হইল, কি কি বন্দোবস্ত করিতে হইবে, শুনি গে চল্।"

এই দুই পাপ-নিমগ্না নারী প্রস্থান করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উপদেশ।

প্রত্যুষে শ্যামলাল ভবন-সংলগ্ন উদ্যানে পরিভ্রমণ করিতেছেন; তাঁহার পশ্চাতে তাঁহার দেওয়ান হরকুমার চক্রবর্ত্তী। হরকুমার প্রবীণ ব্যক্তি, বয়স পঞ্চাশ ছাড়াইয়া গিয়াছে। বড়ই শান্ত, সৌম্য ও বিজ্ঞতাব্যঞ্জক প্রিয়দর্শন মূর্ত্তি। শ্যামলালের মূর্ত্তি অধুনা নিতান্ত উগ্র এবং গতি ও ভাব অস্থির।

হরকুমার নিকটস্থ হইয়া বিনীতভাবে বলিলেন,—"আপনি উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া দেখুন, কাজটা ভাল হইতেছে না।"

শ্যামলাল ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন,—"আমি উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়াছি, কাজটা ঠিক হইয়াছে। আপনার যদি অন্য কোন কথা বলিবার দরকার থাকে, বলুন। এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার আবশ্যক নাই।"

হরকুমার বলিলেন, "আপনি আবশ্যক নাই বলিয়া মনে করিতেছেন; কিন্তু আমি বুঝিতেছি, আপনাকে এ ব্যাপার হইতে নিরস্ত করা আমার প্রধান কর্ত্তব্য। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও তাঁহার পুত্র নবীনকৃষ্ণ নির্ব্বিরোধী এবং বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত লোক। তাঁহাদিগকে কয়েদে পুরিয়া আপনি যে কষ্ট দিতেছেন, ইহাতে আপনার নিন্দার সীমা থাকিবে না।"

অতীব ক্রোধ সহকারে শ্যামলাল বলিলেন,—"নিন্দা! আমায় নিন্দা করে, এমন লোক এ প্রদেশে কোন্ বেটা আছে? কেবল আপনার মুখেই আমার নিন্দা আর দুর্নামের কথা শুনিতে পাই; কিন্তু আপনার এ ব্যবহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। নবীনের স্ত্রী কোথায় আছে, গদা তাহাকে সঙ্গে করিয়া কি মতলবে কোথায় লইয়া গিয়াছে, এ সকল কথা নিশ্চয়ই সার্ব্বভৌম আর নবীন জানে। তাহারা এত বড় বদ্মায়েস যে, আমি কোন প্রকারে এ পর্য্যন্ত তাহাদের মুখ হইতে এই খবরটা বাহির করিতে পারিলাম না। আপনি যদি তাহাদের জন্য বড়ই কাতর হইয়া থাকেন, তা হইলে তাহাদের নিকট থেকে এই খবরটা জানিয়া আসিয়া আমাকে বলুন, আমি তৎক্ষণাৎ তাহাদের ছাড়িয়া দিতেছি।"

হরকুমার বলিলেন,—"আমি সে সংবাদ জানিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু তাঁহারা এ বিষয়ের কিছুই জানেন না। গদা রাত্রি দশটার সময় নবীনের স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া আসিয়াছে; তাহার পর কি ঘটিয়াছে, সে সম্বন্ধে তাঁহারা কোন কথাই বলিতে পারেন না।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"মিথ্যা কথা! আপনার যত বয়স বাড়িতেছে, ততই বুদ্ধি কমিতেছে; তাই আপনি এই স্পষ্ট মিথ্যা কথাটাকে সত্য বলিয়া মনে করিয়াছেন। এ ভট্টাচার্য্য আর তার ছেলে কতদূর মিথ্যাবাদী, তাহা আপনাকে কালি দেখাইব। আজি সমস্ত দিনের মধ্যে যদি তাহারা আমাকে নবীনের স্ত্রীর খবর না জানায়, তাহা হইলে কালি সকালে খোদাবক্স কোচ্ম্যানকে দিয়া ভাত রাঁধাইয়া মুরগীর ঝোল মাখিয়া তাহাদের মুখে গুঁজিয়া দিব। তখন দেখিতে পাইবেন, আসল কথা বাহির হয় কি না।"

হরকুমার সভয়ে বলিলেন,—"নারায়ণ! নারায়ণ! এমন অত্যাচারের কথা আপনি মনেও কল্পনা করিবেন না। আমি আপনার সংসারে বহুদিন থাকিয়া প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছি। আপনার স্বর্গীয় পিতৃদেব আমাকে কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। তাঁহার শেষ আদেশমতে আমি অদ্যাপি আপনার কর্ম্মে নিযুক্ত আছি। আপনার হিতাহিত দেখিবার জন্য তিনি আমাকে হাতে ধরিয়া অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন। সেই জন্যেই সকল বিষয়েই আপনাকে সৎপরামর্শ দেওয়া আমার প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করি। আমার দুরদৃষ্ট, আপনি আমার কোন কথাই শুনেন না; বাড়ার ভাগ বিরক্ত হন।"

শ্যামলাল বাধা দিয়া বলিলেন,—প্রতিপালকের অনুরোধ আপনি বেশ রক্ষা করিতেছেন দেখিতেছি! যাহাতে আমি সুখী হই, আনন্দ পাই, ভাল থাকি, তাহাতেই আপনি প্রাণপণ যত্নে বাধা দেন। এই তো আপনার হিত চেষ্টা! কথা শুনিব কিরূপে? কথার মত কথা বলিলে অবশ্যই শুনা

যায়। আপনি দেখিতেছেন, নবীনের স্ত্রীকে না পাইলে আমার সংসারের সকল সুখ নষ্ট হইবে। তাহার কোন উপায় না করিয়া আপনি কেবল বিরুদ্ধ ব্যবহারই করিতেছেন।”

হরকুমার মনে মনে ভাবিলেন, “এ লজ্জাহীন, কাণ্ড-জ্ঞান-বিরহিত পাষণ্ডের অন্ন যাহারা ভোজন করে, তাহারাও ঘোর পাপাত্মা। স্বর্গীয় কর্ত্তার অনুরোধে অনেক দিন এ দুরাত্মার অধীনে যাপন করিলাম; কিন্তু অতঃপর এ নরাধমের সংসর্গ অসহনীয় হইয়া পড়িয়াছে।” প্রকাশ্যে বলিলেন, “আপনার সহিত তর্ক করা অনাবশ্যক। কারণ, আপনি ধর্ম্মসঙ্গত, যুক্তিসঙ্গত কোন কথাতেই কর্ণপাত করেন না। তথাপি যাহা বলা আমার কর্ত্তব্য, আমি তাহা বলি; শুনা না শুনা আপনার ইচ্ছা। নবীনের স্ত্রীকে না পাইলে আপনার বিশেষ কষ্ট হইবে বলিতেছেন; কিন্তু সে পর-স্ত্রী, তাহাকে গ্রহণে আপনার অধিকার কি?”

শ্যামলাল বলিলেন,—“অধিকার আমার সম্পূর্ণ। আমি ধনবান্, আমি বলবান্, আমি জমীদার। সহজে না আসিলে জোর করিয়া আনিতেও আমার অধিকার আছে।”

হরকুমার বলিলেন,—“আপনি অনেক কারণে আপাততঃ ধনবান্, জমীদার হইয়াছেন বটে, কিন্তু ঘটনা অন্যরূপ দাঁড়াইলে এ সৌভাগ্য না ঘটিয়া অন্যরূপ ঘটিলেও ঘটিতে পারিত। সে যাহাই হউক, এইরূপ অন্যায় অধিকার আপনার কখনও নাই। আইন আছে, রাজা আছেন, সমাজ আছে, ধর্ম্ম এবং সর্ব্বোপরি ঈশ্বর আছেন। এ সকলের কোন ব্যবস্থাতেই কাহারও প্রতি এরূপ অন্যায় অধিকার দেওয়া হয় নাই। এক জনের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক একখানা ছেঁড়া নেকড়া কাড়িয়া লইতেও কাহারও অধিকার নাই। জোর করিয়া কুলের কুলবধূ আনা তো অনেক দূরের কথা।”

শ্যামলাল বলিলেন,—“বা রে! আমি চিরদিন এই কাজ করিয়া আসিতেছি। এ পর্য্যন্ত ভাল মন্দ কত ঘরের ঝি-বউ আমি ধরিয়া আনিয়াছি। আমার অধিকার না থাকিলে এরূপ হয় কি?”

হরকুমার মূর্খ শ্যামলালের যুক্তি ও তর্কের প্রণালী আলোচনা করিয়া মনে মনে হাস্য করিলেন; বলিলেন—“মানিলাম, আপনি অনেক দিন হইতে এইরূপ কাজ করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু যাহা অন্যায় কর্ম্ম, তাহা অনেকবার করা হইলেও চিরদিনই অন্যায়। এক জন লোক চিরদিন চুরি করে, তাই বলিয়া চৌর্য্যকার্য্যে তাহার অধিকার হয় না এবং সে কাজ ভাল বলিয়াও পরিগণিত হয় না।”

শ্যামলাল বলিলেন,—“আমার এ কাজ মন্দ কিসে, তাই তো আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আমি যাহাকে যখন ধরিয়া আনি, তখনই তাহাকে বিশেষরূপ পুরস্কার দিয়া বিদায় করি। এটাও তাহাদের পক্ষে এক রকম সৌভাগ্য।”

হরকুমার বলিলেন,—“আমার তর্কে আপনি বিরক্ত হইতেছেন এবং ক্রমে আরও অসন্তুষ্ট হইবেন বুঝিতেছি; তথাপি উচিত কথা আপনাকে বলাই আবশ্যক। মনে করুন, আপনার অন্তঃপুরে আপনার সুন্দরী পত্নী আছেন। এ সংসারে আপনার অপেক্ষা ধনবল ও ক্ষমতাসম্পন্ন অনেক লোক আছেন, ইহা আপনার অবিদিত নাই। সেইরূপ কোন ব্যক্তি দৈবাৎ কোন প্রয়োজনানুরোধে এই গ্রামে আসিয়া পড়িলে, মনে করুন, আপনার স্ত্রী কোন প্রকারে তাঁহার চক্ষে পড়িলেন। সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ আপনার সঙ্গের সিপাহী, লোকজন ও ফৌজদিগকে আজ্ঞা করিলেন,—“যেমন করিয়া পার, এই সুন্দরী যুবতীকে কাড়িয়া লইয়া আইস।” তাঁহার অধীনস্থ লোকেরা আপনার উপর ভয়ানক নির্য্যাতন করিয়া আপনার গৃহিণীকে সেই পাপাত্মার নিকট লইয়া গেল এবং সেই ধনবান্ আপনার পত্নীর সর্ব্বনাশ করিয়া, আপনার কখনও দেখিবার সম্ভাবনা নাই, এরূপ অনেক মণি-মুক্তা পুরস্কার প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে বিদায় করিল। এরূপ ঘটিলে আপনি কি মনে করেন?”

শ্যামলাল আপনাকে সর্ব্বপ্রকারে জগতে অদ্বিতীয় বলিয়া মনে করে, সুতরাং সহজেই উত্তর দিল,—“এরূপ ব্যাপার কাজে করা দূরে থাকুক, মনেও করিতে পারে, এমন লোক দুনিয়ায় আর কেহ নাই। শ্যামলালের নাম শুনিলে ভয় পায় না, এমন লোক থাকিতেই পারে না।”

হরকুমার আবার মনে মনে হাসিলেন। বলিলেন,—“তাহাই যেন হইল, কিন্তু তাই বলিয়া অনুগত লোকের প্রতি অত্যাচার করা কি আপনার উচিত? আপনি দেশের রাজা, সকলের রক্ষক, আপনার কি এরূপ অত্যাচার শোভা পায়?”

শ্যামলাল বলিলেন,—“অত্যাচারটা কি?”

হরকুমার বলিলেন,—“অত্যাচার নয় কি? আপনি যে সকল যুবতীর সর্ব্বনাশ করিতেছেন, তাহাদের সহিত এক আধ দিনের বেশী আপনি আমোদ-আহ্লাদ করেন না। দুই দিন পরে তাহাদের নাম, আকৃতি কিছুই আপনার মনে থাকে না।

আপনার এই ক্ষণিক আমোদ, কিন্তু তাহাদের চির-স্থায়ী সর্ব্বনাশ! তাহাদের জাতি যায়, সমাজ যায়, ধর্ম্ম যায় এবং সংসারে সকল সুখ যায়। কেবল যে সেই স্ত্রীলোকদের এইরূপ সর্ব্বনাশ হয়, এমন নহে; তাহাদের আত্মীয়-স্বজন, বাপ-মা, ভাই-ভগ্নী প্রভৃতি সকলকেই চিরদিন মর্ম্মান্তিক ক্লেশে মাথা হেঁট করিয়া থাকিতে হয়।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আমি আপনার এরূপ বৃথা তর্কের কোনই অর্থ দেখিতেছি না; ভগবান আমাদের সকল উপায় করিয়া দিয়া পাঠাইয়াছেন, এ কি কেবল, কে কি মনে ভাবিবে, কে কি কষ্ট পাইবে, তাহাই ভাবিয়া চুপ করিয়া থাকিবার জন্য? আপনার ও সকল ব্যবস্থা সামান্য লোকের জন্য, আমাদের মত বড়লোকের ব্যবস্থা অন্যরূপ। এখন যান আপনি, যেমন করিয়া হউক, নবীনের স্ত্রী কোথায় আছে, সংবাদ লইয়া আসুন।"

হরকুমার মনে মনে ভাবিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! নরাধম অবশেষে আমার উপরও এই সকল ঘৃণিত কাজের ভার দিতে আরম্ভ করিল। আমি উহার পিতৃবয়স্ক, পিতৃবন্ধু এবং পিতৃতুল্য। নারায়ণের ইচ্ছায় এখন মানে মানে এ পাপ-পুরী হইতে বাহির হইতে পারিলে হয়।" বলিলেন,—"আমার দ্বারা এরূপ কোন সংবাদ সংগ্রহ হওয়া অসম্ভব। আর আমাকে এরূপ কার্য্যের ভার দেওয়াই আপনার লজ্জার কথা।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"কেন? আপনি কি আমার চাকরী করেন না, মাহিয়ানা খান না? আমার যখন যেরূপ কাজের দরকার হইবে, তাহাই করিতে সকল কর্ম্মচারীই বাধ্য; আপনিও বাধ্য।"

হরকুমার আবার মনে মনে ভাবিলেন, "তোমার সর্ব্বনাশ অতি নিকট। এ পাপের শাস্তি অবশ্য শীঘ্রই ঘটিবে।" প্রকাশ্যে বলিলেন,—"আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, অনেক দিন আপনাদের অন্ন খাইয়াছি। এক্ষণে আমার দ্বারা সকল কাজ সম্পন্ন হইয়া উঠিতেছে না দেখিতেছি। অতএব দয়া করিয়া আমাকে এক্ষণে কর্ম্ম হইতে অবসর দিলেই ভাল হয়।"

শ্যামলাল হাঃ হাঃ শব্দে হাস্য করিয়া বলিলেন,—"তুমি যে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়াছ, ইহা আমি অনেক দিন বুঝিয়াছি। এক্ষণে স্বয়ং বিদায় প্রার্থনা করিতেছ, ইহা তোমার সৌভাগ্য। নচেৎ হয় তো তোমাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিতে হইত। আমার লোক ঠিক করা আছে। হরিচরণ সকল বিষয়েই অতি উপযুক্ত লোক, তাহাকেই দেওয়ানী দিব স্থির করিয়াছি। তুমি অদ্যই তাহাকে কাগজ-পত্র বুঝাইয়া দিয়া বিদায় হইবে।"

হরকুমার বলিলেন,—"যে আজ্ঞা।"—মনে মনে ভাবিলেন, 'একে প্রভু এই পাপের অবতার, তাহাতে দ্বিতীয় কলিস্বরূপ হরিচরণ হইবে প্রধান মন্ত্রী। এবার বিষয়-আশয় সকলি রসাতলে গেল! যাহা হইবার হউক, আমি দূরে সরিয়া যাইতে পারিলেই বাঁচি।' ধীরে ধীরে হরকুমার বাবু প্রস্থান করিলেন।

ঠিক সেই সময় অপর দিক্ দিয়া দুর্ব্বৃত্ত হরিচরণ তথায় উপস্থিত হইল এবং দূর হইতেই বলিল,—"নবীনের স্ত্রীর সন্ধান হইয়াছে, আমার কাছ থেকে কতক্ষণ লুকাইয়া থাকিতে পারে?"

সাগ্রহে শ্যামলাল জিজ্ঞাসিলেন,—"কোথায়? কোথায়?"

হরিচরণ বলিল,—"অনেক দূর! আমাদের এলাকার বাহিরে এক কুটুম্ব-বাড়ীতে তাহাকে গদা রাখিয়া আসিয়াছে। তা হউক এলাকার বাহিরে, সেখান থেকেই তাহাকে ধরিয়া আনিয়া তবে অন্য কাজ।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"নিশ্চয়। এতে যত টাকা খরচ হয়, তাহাই আমার পণ!"

হরিচরণ বলিলেন,—"বড় দুষ্টলোক এই সার্ব্বভৌম আর তাহার ছেলে, ইহারা নিশ্চয়ই সব জানে। অথচ কিছুতেই স্বীকার করিল না। ইহাদের বিলক্ষণ সাজা দিতে হইবে।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"অন্য যত পার সাজা দিও, তাহাতে আমার আপত্তি নাই; কিন্তু একটা সাজা দেওয়াই চাই। যখন নবীনের স্ত্রীকে লইয়া আমোদ-প্রমোদ করা যাইবে, তখন সার্ব্বভৌম আর নবীন-টাকে হাত-পা বাঁধিয়া সেই ঘরে বসাইয়া রাখিতে হইবে।"

হরিচরণ বলিল,—"আচ্ছা মতলব্ বাহির করিয়াছেন ধর্ম্মাবতার! নিশ্চয়ই তাহা করিতে হইবে।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"তোমার ব্যবহারে ও কার্য্যতৎপরতায় আমি নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। আজি হইতে তোমাকে আমার দেওয়ান নিযুক্ত করিলাম। এখনই ঐ বুড়া হরকুমার বেটার কাছ থেকে কাগজপত্র বুঝিয়া লইয়া কাজে প্রবৃত্ত হও গিয়া।"

এই সংবাদ-শ্রবণে হরিচরণ কিয়ৎকাল স্তম্ভিত হইল। যাহার বিদ্যা-বুদ্ধি কিছুই নাই, তোষামোদ ও ঘৃণিত পরিচর্য্যা যাহার অবলম্বন, সামান্য গোমস্তাগিরী নির্ব্বাহ করাও যাহার পক্ষে অসম্ভব, সে আজ এই বিপুল বিভবের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইল। অনেকক্ষণে

তাহার আপনার অবস্থা-বিষয়ক হৃদবোধ জন্মিল। তখন সে করযোড়ে বলিল,—"অতি উপযুক্ত কর্ম্মের ভার হুজুর এবার আমাকে দিয়াছেন। বিষয়-কর্ম্মে হরিচরণ কেমন মজবুত, তাহার প্রমাণ ধর্ম্মাবতার এই-বার দেখিতে পাইবেন। নিকটে দশ ক্রোশের মধ্যে কোন লোকের ঝি-বউ যাহাতে নিখুঁত না থাকে, তাহার ব্যবস্থা হরিচরণ প্রথমেই করিবে।"

হরিচরণের এইরূপ সাধু সঙ্কল্প ও কর্ত্তব্যপরায়ণ-তার পরামর্শ শ্রবণ করিয়া শ্যামলাল নিরতিশয় প্রীত হইলেন। তাঁহারা এই সকল শুভকার্য্যের মন্ত্রণা করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। গমনকালে হরিচরণ ভাবিতে লাগিল, "এই বিপুল বিভবের এখন হইতে আমিই একরকম মালিক। এই রাজ্যের যিনি রাজেশ্বরী, তিনি আমার চরণ-সেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন। এখন শ্যামলাল কণ্টককে কোন প্রকারে দূর করিতে পারিলেই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। হইবে, হইবে; ক্রমে তাহা না করিয়াই কি ছাড়িব? আজি বিধুমুখীর সন্তোষের সীমা থাকিবে না।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সঙ্কল্প।

হরকুমার বাবু বিশেষ আনন্দের সহিত উদ্যান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। হরকুমার অতি বাল্যকাল হইতে শ্যামলালের পিতা স্বর্গীয় রাধাবিনোদ বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয়ের অনুগ্রহে প্রতিপালিত। হরকুমার নিতান্ত দরিদ্রের সন্তান; বাল্যকাল হইতে অধ্যয়না-নুরাগ বড়ই প্রবল ছিল; কিন্তু পাঠের গ্রন্থ সংগ্রহ করা বা অধ্যাপক লাভ করা উভয়ই তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। ঘটনাচক্রে বিপুল বিভব-শালী রাধাবিনো-দের সহিত এই সময়ে তাঁহার দৈবাৎ আলাপ হয়। এই আলাপেই তাঁহার জীবনের গতি নির্ণীত হয় এবং তাঁহার সকল বিষয়ের যাবতীয় অসুবিধাই বিগত হয়। রাধাবিনোদ বাবু এই বুদ্ধিমান ও প্রিয়দর্শন বালককে স্বকীয় ভবনে স্থান প্রদান করেন এবং স্বকীয় অধ্যা-পকের নিকট একসঙ্গে তাঁহার পাঠাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন। হরকুমারের অপেক্ষা রাধাবিনোদ কিছু বয়ো-জ্যেষ্ঠ ছিলেন; তথাপি একত্রাবস্থান একত্রাধ্যয়নাদি হেতু উভয়ের অবস্থাগত বিশেষ বিভিন্নতা থাকিলেও ক্রমশঃ যথেষ্ট বন্ধুতার উদ্ভব হয়। হরকুমার স্বকীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে যথেষ্ট বিদ্যার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং ধীর বুদ্ধি ও সদ্বিবেচনার নিমিত্ত বিশেষ প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন। রাধাবিনোদের পিতৃ-বিয়োগ হইলে তিনি স্বয়ং বৈষয়িক কার্য্যপরিচালনায় ব্যাপৃত হইলেন। হরকুমারকে তখন হইতে স্বকীয় প্রতিপালক ও প্রভুর বিষয়-কর্ম্মে সহায় হইতে হইল। ক্রমশঃ হরকুমারের বিষয়-বুদ্ধি বিশেষ পরিপক্ক হইয়া উঠিল। রাধাবিনোদ তদবধি সকল কর্ম্মভার হরকুমারের হস্তে প্রদান করিয়া স্বয়ং এক প্রকার বিষয়-ব্যাপার হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন।

উত্তরোত্তর কর্ম্মদক্ষতার সহিত হরকুমার দেওয়ান হইলেন এবং ক্রমশঃ মাসিক পাঁচ শত টাকা বেতন পাইতে থাকিলেন। হরকুমারের বাসবাটী হইল এবং বিবাহাদি করিয়া তিনি যথারীতি সংসারী হইলেন। হরকুমার নিঃসন্তান।

রাধাবিনোদের সহিত হরকুমারের প্রণয় নিতান্ত ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল এবং পরস্পর প্রভু-ভৃত্যবৎ ব্যবহার একান্তভাবে তিরোহিত হইয়াছিল।

কাল সহকারে রাধাবিনোদ প্রাণহীন হইলেন। মৃত্যুকালে তিনি হরকুমারের হস্তেই সকল বিষয়ের কর্ত্তৃত্ব নির্ভর করিয়া গিয়াছিলেন। পুত্র শ্যামলালের ভবিষ্যৎ-জীবন নিতান্ত নিন্দনীয় হইবে বলিয়া তাঁহার অনুমান ছিল। তিনি সেই জন্য বার বার শ্যামলালকে সর্ব্বতোভাবে হরকুমার বাবুর উপদেশাধীন থাকিতে ও তাঁহাকে পিতার ন্যায় জ্ঞান করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। শ্যামলাল পিতৃপ্রদত্ত এই উপদেশ কিরূপে পালন করিতেছেন, তাহা পাঠকগণ দেখিয়াছেন।

তিন বৎসর হইল, রাধাবিনোদ কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী একমাত্র পুত্র শ্যামলাল বিষয়-কর্ম্ম স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। হর-কুমার বাবু বৈষয়িক সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করেন, শ্যামলাল কেবল অর্থ সমস্ত গ্রহণ করিয়া অপব্যয়িত করিতে থাকেন। হরকুমার এ বিষয়ের প্রতিবাদ ও বিরুদ্ধ চেষ্টা করিয়া কেবল অপমানিত হইয়া আসিতেছেন।

এক বৎসর হইল, শ্যামলালের জননী ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। তাহার পর হইতে শ্যাম-লালের অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে।

হরকুমার প্রতিপালক ও শুভাকাঙ্ক্ষী পরলোক-গত সুহৃদের বাসনা-পরতন্ত্র হইয়া অতি কষ্টে তিন বৎসর কাল এই সংসারে শ্যামলালের আজ্ঞাধীন থাকিয়া কাটাইয়া আসিতেছেন। কিন্তু আর এ পাপের সংস্রবে অতিবাহিত করা তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মভীরু লোকের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে

তিনি নিরন্তর অবসর গ্রহণ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। অদ্য সেই সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় তিনি পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সযত্ন-রক্ষিত ও বহুদিন-সেবিত এই বিপুল সম্পত্তি যে অতঃপর ধ্বংস-দশায় উপস্থিত হইবে, ইহা মনে করিয়া তাঁহার দুঃখ হইল না, এমন নহে; কিন্তু সে বিষয়ে তাঁহার আর হাত নাই।

হরকুমার উদ্যান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কাছারী-ঘরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। উদ্যান হইতে কাছারী একটু দূরে অবস্থিত। মধ্যে উভয় পার্শ্বে বড় বড় বৃক্ষযুক্ত প্রশস্ত পথ। সেই পথ দিয়া অনেক লোক যাতায়াত করিতেছিল। সকলেই তাঁহাকে দর্শনমাত্র সসম্ভ্রমে প্রণামাদি করিয়া দূরে এক পার্শ্বে দাঁড়াইতে লাগিল। এক বলিষ্ঠ-কলেবর অথচ ধবল-কেশ পরিষ্কৃত-পরিচ্ছদধারী মুসলমান তাঁহাকে অবনত-মস্তকে সেলাম করিয়া, দূরে দাঁড়াইল। সে ব্যক্তি এই সংসারের প্রধান কোচ্‌ম্যান এবং বহুদিনের পুরাতন ভৃত্য। তাহাকে দর্শনমাত্র হরকুমার বলিলেন,—"জরিফ! আজি হইতে তোমাদের নূতন দেওয়ান হইলেন। আমি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলাম।"

জরিফ বলিল,—"কি সর্ব্বনাশ! হুজুর ইচ্ছা করিয়া এ কাজ করিলেন কি?"

হরকুমার বলিলেন,—"ইচ্ছা না করিয়া করি কি? আর দশ দিন ইচ্ছা না করিলে অপমানিত হইয়া যাইতে হইত।"

জরিফ বলিল,—"সে কথা ঠিক। এ সংসারে হুজুরের মত লোকের থাকা অসম্ভব। কিন্তু ইহার পর এ সংসারের কি হইবে?"

হরকুমার বলিলেন,—"যাহা ভগবানের মনে আছে, তাহাই হইবে। অতি কষ্টে তিন বৎসর কাটাইয়াছি; আর তো এক দিনও কাটান যায় না।"

জরিফ বলিল,—"কাহার হাতে এখন হইতে কাজের ভার পড়িবে, তাহা ধর্ম্মাবতার জানিতে পারিয়াছেন কি?"

হরকুমার বলিলেন,—"হাঁ, তাহা জানিয়াছি। হরিচরণ বাবু অতঃপর তোমাদের দেওয়ান হইবেন।"

জরিফ জিজ্ঞাসিল,—"কে সে?"

হরকুমার বলিলেন,—"তাঁহাকে চেন না তুমি? তিনি সর্ব্বদাই বাবুর সঙ্গে থাকেন, বাবুর সকল কর্ম্মেই তিনি আছেন।"

জরিফ বলিল,—"ওঃ, সেই বেটা! যে হতভাগা বাবুর সঙ্গে সর্ব্বদা মদ খায়, আর বদ্‌মায়েসী করে?"

হরকুমার বলিলেন,—"হাঁ।"

জরিফ বলিল,—"বলেন কি ধর্ম্মাবতার? সেই জানোয়ারটা এই বৃহৎ সংসারের দেওয়ানী করিবে? কি সর্ব্বনাশ! তবে হুজুর হুকুম দেন, আমরাও বিদায় হুজুর না থাকিলে আমরা আর কাহার কাছে কাজ করিব?"

হরকুমার বলিলেন,—"না জরিফ! তোমার যাওয়া হইবে না। তুমি আর আমি এ সংসারের বড়ই পুরাতন চাকর। তুমি কোচ্‌ম্যান হইলেও সকল বিষয়ই জান। স্বর্গীয় কর্ত্তা তোমার গুণে তোমাকে বড়ই ভালবাসিতেন। হঠাৎ কর্ম্ম ছাড়িও না। তবে যেরূপ কাণ্ড শীঘ্র ঘটিবে, তাহাতে বিষয়-সম্পত্তি কিছুই থাকিবে বোধ হয় না। তখন কাজেই তোমাদের সকলকেই সরিতে হইবে কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কাজ ছাড়িও না। তুমি থাকিলে আমি অনেক কথা জানিতে পারিব এবং ঈশ্বর যদি মুখ তুলিয়া চাহেন, তাহা হইলে অনেক কথা জানিবার দরকারও হয় তো ঘটিতে পারিবে।"

জরিফ বলিল,—"হুজুরের হুকুম মাথা পাতিয়া পালন করিব। কিন্তু এখন হইতে যত দিন এখানে থাকিতে হইবে, তত দিন প্রাণে মরিয়া থাকিব জানিবেন। সে যাহা হউক, এখন ধর্ম্মাবতার কোথায় থাকিবেন স্থির করিয়াছেন?"

হরকুমার বলিলেন,—"এখন যত শীঘ্র পারি, এ দেশ ছাড়িব এবং আমাদের প্রধান তীর্থ কাশীতে গিয়া বাস করিব স্থির করিয়াছি।"

জরিফ বলিল,—"হুজুরকে আমার মনে করাইয়া দিতে হইবে না! মহাশয় না জানেন কি? সুযোগ উপস্থিত হইলে, সে বিষয়টার সন্ধান করিতে ধর্ম্মাবতার ভুলিবেন না। তাহা না করিলে আমাদের পাপ হইবে।"

হরকুমার বলিলেন,—"এক দিনও ভুলি নাই, কখনও ভুলিব না। সেরূপ দিন উপস্থিত হইলে তোমাকে সর্ব্বাগ্রে সংবাদ দিব। এই জন্যই তোমাকে এখানে থাকিতে বলিতেছি। অনেক দরকার পড়িতে পারে। এক্ষণে আসি। যাইবার পূর্ব্বে আবার তোমার সহিত দেখা হইবে।"

জরিফ অবনত-মস্তকে প্রায় ভূমিতে হাত স্পর্শ করিয়া সেলাম করিল। হরকুমার প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় খণ্ড—রৌদ্র ও ছায়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

ধর্ম্মে কলঙ্ক।

বেলা দ্বিপ্রহরকালে বিলাসপুর নামক পল্লীগ্রামে ৺রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভবনস্থিত একখানি ঘরে অধোমুখে একটি যুবতী বসিয়া আছেন। যুবতী নিতান্ত ম্লানমুখী ও উদ্বিগ্ন-হৃদয়া। এই সুন্দরী সার্ব্বভৌমের পুত্রবধূ—নবীনকৃষ্ণের স্ত্রী সুহাসিনী। সুন্দরী বাস্তবিকই সুন্দরী। সুহাসিনীর সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যময়। তাহাতে রৌদ্রের প্রখরতা নাই, বিদ্যুতের চঞ্চলতা নাই, ভাদ্রগঙ্গার বেগ নাই, প্রভঞ্জনের গতি নাই। তাহাতে আছে চন্দ্রকিরণের স্নিগ্ধতা, মলয়-মারুতের শীতলতা, কমলিনীর সৌরভ এবং দূরাগত বিহঙ্গম-রবের মধুরতা। তাঁহার উজ্জ্বল আয়ত লোচন সরলদৃষ্টি ভিন্ন জানে না; সুতরাং কুটিল-কটাক্ষ-বর্জ্জিত। তাঁহার বাক্য পবিত্রতা-সংশ্লিষ্ট; সুতরাং কুৎসিত-প্রসঙ্গ-বিবর্জ্জিত। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন গঠনের উপর যেন লজ্জার একটি স্বতন্ত্র আচ্ছাদন সংযুক্ত। তাঁহার সুহাসিনী নামটি বস্তুতই অন্বর্থ হইয়াছে। তিনি যখন হাস্য করেন, তখন সে হাসিতে উচ্চ-রোল উঠে না, মুখের শোভা বিদূরিত হয় না মুখ-গহ্বর ব্যাদিত হইয়া রাশি রাশি দন্ত পরিদৃষ্ট হয় না এবং গাম্ভীর্য্যের পরিবর্ত্তে তাহা প্রগল্‌ভতার পরিচয় প্রদান করে না। তাঁহার হাস্য ধীরে ধীরে অধরোষ্ঠের প্রান্তভাগে মিশিয়া যায়; কদাচিৎ দুই তিনটি মুক্তা-বিনিন্দিত দন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার চক্ষু, কপোল ও গণ্ডদেশ সে হাসিতে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। সে হাস্য দর্শকের হৃদয়ে বড়ই আনন্দজনক স্থায়ী ভাবের সঞ্চার করে।

সুহাসিনী অধোমুখে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে এক প্রৌঢ়বয়স্কা বিধবা নারী তথায় আগমন করিলেন। তিনি আসিয়াই দূর হইতে জিজ্ঞাসিলেন, "তা এখন কি কর্‌বে মনে কচ্ছ বাছা?"

সুহাসিনী বলিলেন,—"কি যে কর্‌ব, মাসী-মা, তা আর কিছুই ভেবে পাই না। তোমরা ছাড়া এখানে আমার আর কেহ নাই। যা তোমরা বল্‌বে, তাই আমি করব।"

মাসী-মা বলিলেন,—"বল্‌ব যে আমরা মাথা মুণ্ড কি, তাও বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। তুমি কুটুম্বের মেয়ে। এমন যে খুব নিকট-কুটুম্ব, তাও নয়। তোমার মা আমার পিস্‌তোত বোন্। তা সম্পর্ক যাই কেন হউক না, বিপদে প'ড়ে ভদ্রলোকের মেয়ে এসেছ, দশ দিন থাক্‌লে ক্ষতি ছিল না; কিন্তু আমাদের দশ জনকে নিয়ে ঘর কর্ত্তে হয়, আমরা কিছু লজ্জা পাচ্ছি।"

সুহাসিনী বলিলেন—"লজ্জা! লজ্জা কি জন্য?"

বিধবা উত্তর দিলেন,—"লজ্জার কাজই যে তুমি করেছ বাছা। তুমি শ্বশুরবাড়ী হইতে চ'লে এসেছ, তাঁরা কেউ কিছু জানেন না। তা হলেই লুকিয়ে পালিয়ে আসা বল্‌তে হয়। এসেছ এক বেটা ভয়ানক চাড়ালের সঙ্গে—রাত্রিকালে। বল্‌ছ, জমীদারের ভয়ে পালিয়ে এসেছ। সে লোকটা খুব মন্দ, এ কথা আমরাও শুনেছি; কিন্তু পালিয়ে এলে, অথচ বাড়ীর লোক কেহ টের পেলে না, এ তিন দিনেও কেহ একটিবার খোঁজ কল্লে না, এই বা কেমন কথা! চারিদিক্ দেখ্‌তে গেলে দশ জনে দূষ্যভাব মনে কর্‌বেই তো! আমরা তোমার শ্বশুরের কাছে, স্বামীর কাছে খবর পাঠিয়ে দেবার কথা বল্‌ছি, তাতেও তুমি বল্‌ছ, খবর পেলে তাঁদের ভয়ানক বিপদ্ হ'তে পারে। এই সকল কাণ্ড আমরা কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না; কোন লোককেও কিছু বল্‌তে পাচ্ছি না। কাজেই আমাদের লোকের কাছে লজ্জা পেতে হচ্ছে।"

সমস্ত কথা সুহাসিনী ধীরভাবে শ্রবণ করিলেন। এতক্ষণে তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার অন্তরের ভাব যাহাই কেন হউক না, বাহ্য-ব্যবহার সাধারণের দৃষ্টিতে বাস্তবিকই দোষাবহ হইয়াছে। তিনি অধোমুখে কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন, তাঁহার লোচননিঃসৃত দুই বিন্দু অশ্রু ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইল। কিন্তু তিনি অধিক কথা কহিতে অক্ষম। বিশেষতঃ আপনার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার জন্য বাগাড়ম্বর বিস্তার করা তাঁহার অসাধ্য। তিনি কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসিলেন,—"এক্ষণে আপনারা আমাকে কি করিতে বলেন?"

বিধবা মাসী উত্তর দিলেন,—"বল্‌ব আমরা আর কি? তোমারও ত বুদ্ধি আছে, তুমিই কেন বুঝে দেখ না, এখন কি করা উচিত। ভাল, শ্বশুরবাড়ী যাওয়া যদি এখন অসম্ভব হয়, বাপের বাড়ী তো আছে, সেইখানেই কেন যাও না।"

আবার সুহাসিনী অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। সুহাসিনী পিতৃহীনা; বিধবা জননী ছাড়া পিত্রালয়ে

আর কেহ নাই। তাঁহাদের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে বটে, কিন্তু পিত্রালয় শ্যামলাল বাবুর জমিদারীর মধ্যে। সুতরাং সেখানে গিয়া আপনার ধর্ম্ম বজায় রাখা কোনক্রমেই সম্ভব হইবে না। দুর্বৃত্ত শ্যামলাল যখন তাঁহার সর্ব্বনাশ-সাধনে কৃত-সংকল্প হইয়াছে, তখন সে বাসনাসিদ্ধির নিমিত্ত কোন কার্য্যেই পশ্চাৎপদ হইবে না, সুহাসিনী মনে মনে এ সকলই বুঝিলেন; সুতরাং পিত্রালয়ে গমন অসম্ভব বলিয়া তিনি স্থির করিলেন। এইরূপ চিন্তা করিয়াই তিনি ধর্ম্ম বজায় রাখিবার অভিপ্রায়ে এই কুটুম্বালয়ে পলাইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এত কথা সুহাসিনী পরকে বুঝাইয়া বলিতে পারেন না। এত কথা পরের সম্মুখে তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হওয়া অসম্ভব।

তিনি ইহাও বুঝিলেন যে, তাঁহার জন্য এই দুর-কুটুম্বগণকে বাস্তবিকই লজ্জিত হইতে হইতেছে। ইহাও তাঁহার মনে হইল যে, তাঁহার ব্যবহার বাস্তবিকই সুসঙ্গত হয় নাই। কিন্তু কি করিলে ইহার অপেক্ষা ভাল হইত, তাহা তিনি এখনও স্থির করিতে পারিলেন না। বুঝিলেন, তাঁহার চরিত্র লোকের চক্ষে কলঙ্কিত হইয়াছে! লজ্জায়, ক্ষোভে, ঘৃণায় তাঁহার হৃদয় ফাটিতে লাগিল। কিন্তু তিনি তখনই মনে করিলেন, বাহ্য-কলঙ্ক মারাত্মক নহে, অন্তরে কলঙ্ক না ঘটিলেই রক্ষা! বড় অসময়ে ইঁহাদের আশ্রয়ে আসিয়া জাতি-ধর্ম্ম বজায় রাখিয়াছি। আমার জন্য ইঁহাদের লজ্জা পাইতে হইতেছে। আমার অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে; কিন্তু ইঁহাদিগের কষ্টের কারণ আর কোনমতেই হইব না। বলিলেন,—"তাহাই হইবে মাসী-মা; আমি কালি প্রাতে এখানে আর থাকিব না।"

মাসী-মা গাত্রোত্থান করিলেন। গমনকালে বলিয়া গেলেন,—"তাই যা হয় একটা কিছু কর বাছা, আমাদের যেন মাথা হেঁট না হয়।"

বিধবা প্রস্থান করিলেন। সুহাসিনী ভাবিতে লাগিলেন, এখানে আর কোনমতে থাকা হইবে না। কিন্তু কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, সুন্দরী ভাবিয়া তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। গদার কথা তাঁহার মনে পড়িল। বড় অসময়ে সে বড়ই উপকার করিয়াছে। সুহাসিনী তখন বুঝিলেন যে, শ্যামলালের অত্যাচার হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে তাঁহার শ্বশুর, স্বামী বা আর কাহারও সাধ্য নাই। তখন তিনি অন্তরালে ডাকিয়া গদাকে আপনার অলঙ্কারের বাক্স দেখাইলেন। তাঁহার স্বর্ণ ও রৌপ্যালঙ্কার প্রায় এক হাজার টাকার ছিল। তাঁহাকে বিলাসপুরে মুখুয্যেবাড়ী নির্ব্বিঘ্নে রাখিয়া আসিলে, বাক্স সমেত সমস্ত অলঙ্কার তিনি গদাকে দিতে স্বীকার করিলেন। গদা ভাবিয়া দেখিল, একসঙ্গে এরূপ লাভের উপায় তাহার জীবনে কখন ঘটে নাই, ভবিষ্যতে ঘটিবারও কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব এরূপ লাভের বিনিময়ে ফাঁকতালে একটা পুণ্যকর্ম্ম করিয়া লওয়া সে অপরামর্শ বলিয়া মনে করিল না। শ্যামলাল বাবু রাগ করিবেন, তাহাতে ক্ষতিই বা কি? গদার এক ভাঙ্গা কুঁড়ে। না হয় সে দেশে আর ফিরিবে না।

সুহাসিনীকে সঙ্গে লইয়া গদা বিলাসপুরে আগমন করিল এবং তাঁহাকে যথাস্থানে নির্ব্বিঘ্নে পৌছিয়া দেওয়ার পর প্রণাম করিয়া ও গহনার বাক্স লইয়া পলায়ন করিল; আর দেশে ফিরিল না।

সতীত্ব বজায় রাখিবার নিমিত্ত গদার সহিত সুহাসিনী প্রস্থান করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার এই পলায়নবার্ত্তা সার্ব্বভৌম বা তাঁহার পুত্র কিছুই জানিতে পারিলেন না। সকলেই বুঝিলেন, পাপাত্মা শ্যামলালের দৌরাত্ম্যে আজ তাঁহাদের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল।

গদা কোথায় গিয়াছে, তাহা সুহাসিনী জানেন না। এ অসময়ে তাহাকে আর একবার পাইলে হয় তো অনেক উপকার হইতে পারিত। সে তাঁহাকে মা বলিয়াছে এবং সন্তানের ন্যায় যথেষ্ট উপকার করিয়াছে; কিন্তু সেই বা এখন কোথায়?

সুন্দরী অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং বলিলেন,—"কেহ না থাকে, বিপন্নবান্ধব নারায়ণ তো আছেন, তিনি অবশ্যই দুঃখিনীকে রক্ষা করিবেন।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গঙ্গা-যমুনা-সম্মিলন

অতি প্রত্যুষে বিলাসপুর হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দক্ষিণে মাঠের মধ্যে এক বটবৃক্ষমূলে এক ভুবনমোহিনী সুন্দরী একাকিনী বসিয়া আছেন। এই সুন্দরী সুহাসিনী। আত্মীয়গণের লজ্জা ও ক্লেশের কারণ হওয়ার অপেক্ষা স্বকীয় জীবনকে বিপন্ন করাও শ্রেয়ঃ বলিয়া তিনি মনে করিয়াছেন; তাই তিনি নিশীথিনীর অন্ধকারে রূপ-রাশি প্রচ্ছন্ন করিয়া, একাকিনী বিলাসপুরের আশ্রয় হইতে চলিয়া আসিয়াছেন। বুঝিয়াছেন তিনি, তাঁহার বিপদ্ ক্রমেই গাঢ়তর হইয়া আসিতেছে। যে আশ্রয়ে তিনি ছিলেন, সেখানে কোন নূতন বিপদের সম্ভাবনা ছিল না। সুহাসিনী

নিঃসহায়া, নিতান্ত অল্পবয়স্কা; কিন্তু বিপদ্ চারিদিকেই অসীম, কোথায় জননী, কোথায় শ্বশুর? নিঃসহায়া কামিনী একাকিনী, ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভোজ্য নাই, বস্ত্র নাই, একটি পয়সা নাই, আশ্রয় নাই! কলঙ্ক চারিদিক্ হইতে মাথা তুলিয়া তাঁহার কুৎসা কীর্ত্তন করিতেছে। ঘটনা সকলই প্রতিকূল হইয়া তাঁহার দুর্নাম রটনা করিতেছে; কিন্তু সে সকলই মিথ্যা কথা। এতক্ষণ পর্য্যন্ত বস্তুতঃ তিনি পবিত্রতা বজায় রাখিয়াছেন। হউক না কেন মিথ্যা দুর্নাম, মন তো এখনও অপবিত্রতার অনুতাপে দগ্ধ হইতেছে না। সুহাসিনী শত বিপদের মধ্যেও এখনও তেজস্বিনী ও প্রসন্নতাপূর্ণা। কিন্তু তার পর?

তার পর যে কি, তাহাই এখন বিষম সমস্যা। অন্ধকার পলায়ন করিয়াছে; নবোদিত ভাস্করের মধুরোজ্জ্বল কিরণ তাঁহার রূপরাশি সমুদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। বট-বৃক্ষ-মূলে যেন বনদেবী সজীবভাবে বসিয়া আছেন। নিকটে পথ, পার্শ্বে প্রকাণ্ড সরোবর। এখনই ত লোক এই পথে যাতায়াত করিবে। এখনই কত লোক নানা প্রয়োজনে এই জলাশয়ে আসিবে। ভাল মন্দ কত লোকের দৃষ্টিপথেই তাঁহাকে পড়িতে হইবে। তখন কি হইবে? যা করেন ভগবান্।

ঐ কিসের শব্দ! ঐ কার পদশব্দ! ঐ কে আসিতেছে? আসিতেছে সত্য; কিন্তু স্ত্রীলোক।

সুহাসিনী হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। স্ত্রীলোক আসিল, কিন্তু খুব নিকটে আসিল না। ফিরে দাঁড়াইয়া কিয়ৎকাল নিস্পন্দভাবে সুহাসিনীর অলোকসামান্য রূপরাশি সে দর্শন করিতে লাগিল। ক্রমে সাহসে ভর করিয়া সে নিকটস্থ হইল। তাহার কক্ষে এক প্রকাণ্ড মাটীর কলসী; পরিধান স্থূল মলিন বস্ত্র; হাতে কড়; দেহের অন্য কোথাও ভূষণের নামমাত্রও নাই। কালো শক্ত বলিষ্ঠ গঠন; টিকল মুখখানি; পূর্ণ-যুবতী। বয়স চব্বিশ পঁচিশ ছাড়ায় নাই। এই নবীনা সুহাসিনীর নিকটস্থ হইয়া কাঁখের কলসী নামাইল এবং বলিল,—"যদি পুরুষ হইতাম, তাহা হইলে আজ জীবনের সুখের দিন বলিয়া মনে হইত। তবু আজ আমার সুপ্রভাত সন্দেহ নাই।"

সুহাসিনী বলিলেন—"আমার কিন্তু আজি বড়ই কুপ্রভাত।"

স্ত্রীলোক বলিল,—"তাহা তো রকমেই বুঝিতেছি। নতুবা অসময়ে এখনে কেন? গলায় ছুরি দেওয়ার ব্যবসা থাকিলে এরূপ দুর্দ্দিন ঘটিতে পারে; লক্ষণ দেখিয়া তোমার ভাই সে ব্যবসা আছে বলিয়া বোধ হয় না। তবে এ দশা কেন?"

সুহাসিনী বলিলেন,—"গলায় ছুরি দিতে গিয়া এই অবস্থা ঘটে নাই। চোরে সর্ব্বস্ব চুরি করিতে আসিয়াছিল; তাই বাঁচাইতে গিয়া এই দশায় পড়িয়াছি।"

স্ত্রীলোক বলিল,—"চোর তাড়াইবার লোক ছিল না?"

সুহাসিনী বলিলেন,—"ছিলেন—আছেন। কিন্তু চোর বড় বলবান্।"

স্ত্রীলোক বলিল,—"বুঝিয়াছি। পুরুষ হইলে আমিও হয় তো এ ধনীর সর্ব্বস্ব চুরি করিবার চেষ্টা করিতাম; এমন রত্ন লুঠিবার জন্য ডাকাইত তো পড়িবারই কথা। এখন উপায়?"

সুহাসিনী বলিলেন,—"ভগবান্।"

স্ত্রীলোক বলিল,—"তিনি তো আছেনই, কিন্তু হাতে-কলমে আমাদেরই তো সব কত্তে হবে।"

সুহাসিনী বলিলেন,—"তবে উপায় তুমি।"

স্ত্রীলোক বলিল,—"আমিও তাই ভাব্ছি। তবে বইস তুমি, আমি এক কলসী জল লইয়া আসি।"

স্ত্রীলোক প্রস্থান করিল এবং অবিলম্বে এক কলসী জল লইয়া পুনরাগমন করিল; বলিল,—"চেহারা দেখিয়া বুঝিতেছি, নিশ্চয়ই তুমি বামুনের মেয়ে। আমি কিন্তু কৈবর্ত্ত। তাতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। দয়া ক'রে আমার সঙ্গে এস।"

সুহাসিনী জিজ্ঞাসিলেন,—"তা যেন চলিলাম; কিন্তু কি বলিয়া তোমায় ডাকিব বলিয়া দেও।"

স্ত্রীলোক বলিল,—"দাসী বলিয়া—"

সুহাসিনী বলিলেন,—"না, তা কেন? তুমি আমার দিদি।"

স্ত্রীলোক বলিল,—"তা হ'লে এক মস্ত বোনাই জুটে যাবে। সে হয় তো তোমাকে মালা ক'রে বুকে ঝুলিয়ে ফেলিবে ভাই।"

সুহাসিনী বলিলেন,—"আর তোমাকে টুকনি হাতে ক'রে হরিনাম করতে হবে?"

স্ত্রীলোক বলিল,—"তা না হয় মিনষের কপালই সুপ্রসন্ন হবে। তোমাকে কি ব'লে ডাক্‌ব ভাই?"

সুহাসিনী হাসিয়া বলিলেন,—"অভাগিনী ব'লে।"

স্ত্রীলোক বলিল,—"বালাই! না ভাই! আমরা গঙ্গা-যমুনা। তুমি ভাই গঙ্গা, আর এই কালো কৈবর্ত্ত মাগীটা যমুনা। কেমন?"

সুহাসিনী সেই মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"বেশ।"

স্ত্রীলোক যে দাসী বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছিল, তাহা মিথ্যা নহে; তাহার নাম হরিদাসী, কি রামদাসী, কি রাখালদাসী, কি এই রকম একটা কিছু হইতে পারে। সাধারণতঃ সে দাসী নামেই পরিচিতা।

দাসী অগ্রসর হইল। সুহাসিনী নতমুখে তাহার অনুসরণ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভবিষ্যতের আভাস।

সার্ব্বভৌম ও তাঁহার পুত্র নবীনকৃষ্ণকে দুর্বৃত্ত শ্যামলাল ছাড়িয়া দিয়াছে। হরিচরণের কথা শুনিয়া সে বুঝিয়াছে যে, বাস্তবিকই পিতা-পুত্র সুহাসিনীর পলায়ন-বৃত্তান্ত জানেন না। ইহাও সে বুঝিয়াছে যে, দুরাত্মা গদা বেটাই এই অনিষ্টের মূল; সুতরাং গদার উপর তাহার এক্ষণে ক্রোধের সীমা নাই। যে ব্যক্তি গদাকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় তাহার নিকট হাজির করিয়া দিবে, তাহাকে প্রভূত পুরস্কার দিতে শ্যামলাল প্রতিশ্রুত হইয়াছে। কিন্তু গদার কোনই সন্ধান নাই। গদার স্ত্রী নাই, পুত্র নাই; আছে কেবল এক উপপত্নী, সেও সেই সংবাদ শ্রবণের পর হইতে পলাতকা।

সার্ব্বভৌম ও নবীনকৃষ্ণ মুক্তিলাভ করিয়াছেন বটে; কিন্তু তাঁহাদের উপর নির্য্যাতনের কোনই ত্রুটি হয় নাই। তাঁহাদের অঙ্গে প্রহারের চিহ্ন পড়িয়াছে। মুক্তিলাভের পর তাঁহারা আসিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের বাস-ভবন ভস্মীভূত হইয়াছে। পৌর-নারীগণ কে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, ঠিক নাই। গাভী এবং বৎসের কতক অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ হারাইয়াছে, কতক পলাইয়াছে, অথবা গো-চোরের পালে মিশিয়াছে। পৈতৃক শালগ্রামশিলা ভস্মসাৎ হইয়াছেন; তৈজসপত্র, শয্যা, গৃহোপকরণ কিছুই নাই। পিতা-পুত্র পথের ফকীর হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

গ্রামের কোন লোক তাঁহাদের কোন সাহায্য করিতে ভরসা করিল না, অগত্যা তাঁহারা গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া শ্যামলাল বাবুর এলাকার বাহিরে গ্রামান্তরে এক কুটুম্বের ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সার্ব্বভৌমের বিশ্বাস—তাঁহার পুত্র-বধূ গদার হস্তে পড়িয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহার চিরসমাদৃত কুলে কালি দিয়াছেন। আর সে পাপীয়সীর সন্ধানের প্রয়োজন নাই—তাহার মৃত্যুসংবাদই এক্ষণে প্রার্থনীয়। সুহাসিনীর সম্বন্ধে নবীনকৃষ্ণের কিন্তু এরূপ বিশ্বাস একবারও মনে স্থান পায় নাই। তিনি জানিতেন, তাঁহার সুহাসিনী রূপে গুণে অতুলনীয়া। তাঁহার বিশ্বাস—সুহাসিনী অনিবার্য্য ধর্ম্মনাশ আশঙ্কায় নিশ্চয়ই কোন নিরাপদ্ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, অথবা প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া আপনার ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন; ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সুহাসিনী কখনই আপনার দেহের পবিত্রতা বিধ্বংসিত হইতে দেন নাই। তাঁহার পিতা যখন তাঁহাকে ডাকিয়া সুহাসিনীর চিন্তা হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন করিতে আজ্ঞা করিলেন এবং তৎসম্বন্ধীয় স্বকীয় ধ্রুব বিশ্বাসের বিষয় পরিব্যক্ত করিলেন, তখন নবীনকৃষ্ণের হৃদয় ফাটিয়া গেল: কিন্তু তিনি নিতান্ত পিতৃ-ভক্ত, এ জন্য পিতৃ-বাক্যের কোন প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না: অবনত-মস্তকে তাঁহার আজ্ঞা-পালনে সম্মত হইলেন।

সরলে সুহাসিনি! ধর্ম্ম-ধন বজায় রাখিবার জন্য তুমি কতই হৃদয়-বলের ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছ। কত বিপদকে তুমি অবলীলাক্রমে আলিঙ্গন করিয়াছ; কিন্তু সতি! তোমার এই আয়াসসাধ্য আয়োজন কি ফল প্রসব করিল, তাহা তুমি দেখিতেছ কি? আজি আত্মীয়সমাজে কলঙ্কিতারূপে পরিগণিতা, দেবোপম শ্বশুরের ঘৃণার সামগ্রী, অশ্রাব্য কুৎসিত নিন্দার সম্পদ্ এবং তোমার হৃদয়দেবতাস্বরূপ স্বামী কর্ত্তৃক পুনর্গ্রহণ-সম্ভাবনা বিরহিতা। চারিদিক্ হইতে কল্পনাতীত বিপদ তোমাকে গ্রাস করিয়াছে ও করিতেছে। (তা করুক;) নিন্দুকের পাপ-রসনা তোমার কলঙ্ক রটনা করুক; প্রতিকূল ঘটনা-সমূহ তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করুক; মানবের যুক্তি তোমাকে কু-পথগামিনী বলিয়া অবধারণ করুক; কিন্তু ধর্ম্ম—বিশ্বব্যাপী ধর্ম্ম-দেবতা দেখিতেছেন, তুমি সতী নারীর আদর্শ। আর যাহাকে তুমি অত্র পরত্র মুক্তির সেতুস্বরূপ পরমদেবতা জ্ঞান কর, তোমার সেই নবীনকৃষ্ণের হৃদয়ে তোমার সততা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে সাধ্বি! তুমি আর কি চাও? যাও সুহাস! নিন্দার মস্তকে পদাঘাত করিতে করিতে, ঘটনা সকলকে বিদলিত করিতে করিতে সাধ্বি, তুমি নির্ভাবনায় আপনার ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে থাক। কিসের ভয়? ধর্ম্ম অবশ্যই তোমার সহায় হইবেন।

শ্যামলাল! পাপ-মগ্ন শ্যামলাল! তোমার অবিবেচনায়, তোমার প্রভুতার অযথা ব্যবহারে আজ এক স্বর্গের দেবী অশেষ বিপদ্-সাগরে, অযথা কলঙ্কনীরে

ভাসিতেছেন; আর এক নিরীহ দেশ-মান্য পরিবার আশ্রয়হীন, সম্পদহীন, বিত্তহীন, ভক্ষ্যহীন, ভিক্ষুকরূপে পরিগণিত হইয়াছে। নরাধম! তুমি কি মনে করিয়াছ, এ পাপের কখনই প্রায়শ্চিত্ত হইবে না?

বিচার কবে হইবে কি না হইবে, তাহা দুর্জ্ঞেয় ভবিষ্যতের অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বর-নিহিত; কিন্তু সম্প্রতি তোমার দুর্দ্দশা বস্তুতই শোচনীয়। তোমার রূপবতী ভার্য্যা অবিশ্বাসিনী, তোমারই এক ঘৃণিত দাসের অঙ্কশায়িনী; তোমার বিপুল বিভবরাশি অদ্য পর-হস্তগত। তোমার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ও অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপা ধর্ম্মপত্নী তোমার সর্ব্বনাশ-সাধনে কৃতসংকল্প। অহো! তোমার ভবিষ্যৎ যাহাই হউক, তোমার বর্ত্তমান অতীব পাষণ্ডকে এবং পরম শত্রুকেও ব্যথিত-হৃদয় করিতে সক্ষম। পাপের ঘৃণিত সংসর্গে তুমি হিতাহিতজ্ঞান-শূন্য, ভোগের অভিনব উপকরণ আহরণার্থ তুমি বিষয়ান্তরে দৃষ্টি-বিহীন, স্বকীয় সুখ-সন্তোষের নিমিত্ত পরকীয়-সর্ব্বনাশসাধনে তুমি হৃদয়হীন। এই জন্যই হে নরপ্রেত! ন্যায়ময় নারায়ণ তোমাকে এই দুরবস্থায় আনয়ন করিয়াছেন। তুমি এখনও আপনার বর্ত্তমান অবস্থার উপলব্ধি করিতে পার নাই। ভরসা করি, তোমার দুর্দ্দশার চিত্র কালে আরও কঠোরতর, আরও বিভীষিকাময় হইবে না, কে জানে?

দুরাত্মাগণের হৃদয় পাষাণবৎ কঠিন হইলেও কখন কখন তাহার অতি নিভৃত প্রদেশে একটি নিতান্ত কোমল অমৃত-ধারা প্রচ্ছন্নভাবে প্রবাহিত থাকিলেও থাকিতে পারে; কোন সময়ে কোন শুভ সুযোগে, তাহা প্রবল বলসম্পন্ন হইয়া সমস্ত অন্তর-প্রদেশকে প্লাবিত ও মধুময় করিয়া দিতে পারে এবং তাহার প্রভাবে সেই দুর্ভেদ্য পাষাণও এক মুহূর্ত্তে নিতান্ত কোমল ও নিরতিশয় প্রেমময় হইয়া উঠিতে পারে। সহসা সেই পাপ-প্রপীড়িত, দুষ্ক্রিয়াকলুষিত হৃদয়ে শান্তির আবির্ভাব ও সুখের সমাবেশ ঘটিতে পারে।

অধম শ্যামলাল! তোমার ব্যবহার দেখিয়া তাদৃশ সুখময় পরিবর্ত্তনের আশা কেহই মনে স্থান দিতে পারে না। জানি না, তোমার ন্যায় পাপাত্মার পরিণাম কি ভয়াবহ হইবে।

চতুর্থ খণ্ড—জ্যোৎস্না

প্রথম পরিচ্ছেদ

যোগ ও ভোগ।

অপরাহ্নে কাশীধামস্থিত নীলরতন বাবুর ভবনের একতম প্রকোষ্ঠে শ্যামলাল বাবুর দেওয়ান, আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত হরকুমার বাবু, নীলরতন এবং উমাশঙ্কর বসিয়া আছেন। তাহারই অব্যবহিত পার্শ্বে প্রকোষ্ঠান্তরে আনন্দময়ী, কালীতারা, অন্নপূর্ণা এবং হরকুমারের স্ত্রী ভবসুন্দরী বসিয়া রহিয়াছেন।

শ্যামলাল কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া হরকুমার বাবু সপরিবারে কাশী চলিয়া আসিয়াছেন। নীলরতন বাবু তাঁহার বাল্য-বন্ধু। হরকুমার পরিবারাদি সহ কাশী আগমন করায় নীলরতন পরমানন্দিত হইয়াছেন এবং আপনার নিকটে বাসা ঠিক করিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে সযত্নে রাখিয়াছেন। প্রবীণ-বয়স্ক বন্ধুদ্বয় জীবনের শেষভাগে পুণ্য-ক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছেন। হরকুমার বাবু দিনমানের অনেক সময়ই নীলরতন বাবুর বাটীতে অতিবাহিত করেন এবং উভয়ের পরিবারবর্গ পরস্পরের বাটীতে যাতায়াত করিয়া পরম সুখে সময়-পাত করেন। ঘৃণিত শ্যামলালের সংস্রব ত্যাগ করিয়া হরকুমার যেন নূতন জীবন লাভ করিয়াছেন। তিনি মিতব্যয়িতা ও সদ্বিবেচনা সহকারে যে বিত্ত সঞ্চয় করিয়াছেন, তাঁহার স্বচ্ছন্দভাবে জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের পক্ষে তাহা যথেষ্ট। ধর্ম্ম-চিন্তা ও সাধু-সঙ্গই এই দুই বন্ধুর প্রধান কার্য্য। কাশীতে আগমন করার পর হরকুমারের সহিত উমাশঙ্করের পরিচয় হইয়াছে। নীলরতন বাবুর বাটীতে তিন চারি দিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে এবং ধর্ম্মবিষয়ক বহু বাদানুবাদ হইয়াছে। ক্রমশঃ হরকুমারের সহিত উমাশঙ্করের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে এবং এই নবীন সন্ন্যাসীর বিজ্ঞতা, সচ্চরিত্রতা ও আন্তরিক তেজ সন্দর্শনে তিনি বিমোহিত হইয়া উঠিয়াছেন।

অধুনা নানা প্রকার কথায় ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে এবং উমাশঙ্কর শ্রোতৃগণের সমক্ষে তৎসম্বন্ধে স্বকীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত

করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,—"শ্রীকৃষ্ণ বস্তুতঃ পূর্ণব্রহ্মরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন কি না, তাহা আমি জানি না এবং সে বিষয়ের কোন বাদানুবাদ করিবার প্রয়োজনও আমি দেখি না। আর্য্যদিগের ব্রহ্ম দ্বিবিধ;—সগুণ ও নিগুর্ণ। সগুণ ব্রহ্মের আরাধনারূপ পথ দিয়া নিগুর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের উদ্ভব হয়; এ তত্ত্ব বস্তুতই অতীব সারবান্ ও পরম শ্রদ্ধেয়। নিগুর্ণ ব্রহ্মের উপলব্ধির পর আর সগুণ ব্রহ্মের কোনই প্রয়োজনীয়তা থাকে না। সুতরাং সগুণোপাসনা একটি সোপান মাত্র। নিগুর্ণোপলব্ধিরূপ সৌধে আরোহণ করার পর সগুণ সোপানের আর কোনই আবশ্যকতা নাই। সুতরাং সোপান যাই কেন হউক না, তাহার সহিত বিশেষ কোন সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে না। কেবল সোপানের দৃঢ়তা, স্থায়িত্ব ও সরলতাই বিশেষ বিচার্য্য। এরূপ স্থলে দুইটি সোপান আমি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি। সে দুই—শ্রীকৃষ্ণ ও শিব। যেরূপ কর্ম্ম-মার্গ অবলম্বন করিলে জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী, শ্রীকৃষ্ণ তাহা সম্যক্‌রূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। যেরূপ প্রণালীতে কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের সম্মিলন সম্ভাবিত, শিব তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব এই উভয় সোপানই পরম সমাদরণীয়। কেহ যদি এতদুভয়কে ব্যাসের কল্পনা বলিয়া মনে করেন, তাহাতে আমাদের কোনই আপত্তি নাই। সূর্য্যের আলোক পরিদৃশ্যমান সত্য। সূর্য্য কি পদার্থ, তাহা নির্ণয় করিতে না পারিলেও আলোকের কোনই অন্যথা হয় না। তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ ও শিব কি পদার্থ, তাহা নির্ণয় করিতে না পারিলেও তাঁহাদিগের প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে আমাদিগের মতদ্বৈধ হইবার কোনই কারণ নাই।"

হরকুমার বলিলেন,—"আপনি শিব ও শ্রীকৃষ্ণ এই যে দুই দেবতার উল্লেখ করিতেছেন, আমাদের দৃষ্টিতে তদুভয় সম্পূর্ণ ভিন্ন-ভাবাপন্ন। শিব ঘোর যোগী—পরম সন্ন্যাসী। শ্রীকৃষ্ণ ঘোর বিষয়ী, পরম ভোগী। এতদুভয়ের চরিত্র আলোচনায় একরূপ পরমার্থ কি প্রকারে সাধিত হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতেছি না।"

উমাশঙ্কর উত্তর দিলেন,—"একটু অনুধাবন করিলে দেখা যায়, উভয়েরই জীবন এক। এক জন ভোগের মধ্যে সন্ন্যাসী; আর এক জন সন্ন্যাসের মধ্যে ভোগী। শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য সুখবিধায়ক পদার্থ-পরিবৃত হইয়াও নির্লিপ্ত। আর শিব যোগমার্গের পূর্ণ সাধক হইয়াও লিপ্ত। উভয়েরই জীবন সমান শিক্ষাপ্রদ। যে ব্যক্তি কামনাপূর্ণ হইয়াও নিষ্কাম অথবা যে ব্যক্তি নিষ্কাম হইয়াও সকাম, তিনি অবশ্যই জ্ঞানের পূর্ণ অধিকারী।"

হরকুমার জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সুসঙ্গত হইলেও শ্রীকৃষ্ণ ও শিবের চরিত্রে তাহার স্ফূর্তি কোথায়? শ্রীকৃষ্ণ ঘোরতর ভোগী, তাঁহার নির্লিপ্ততা কোথায়? শিব ঘোরতর ত্যাগী; তাঁহার লিপ্ততা কোথায়?"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ-গোপাঙ্গনাগণের প্রাণ-ধন, নয়নের মণি; তাঁহাদিগের সহিত তাঁহার প্রেম অতুলনীয়! তাঁহার প্রেমলীলা সন্দর্শনে পশু পক্ষী বিমোহিত হইয়াছে। প্রেমময়ী গোপীরা মান-ভরে তিলেক তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলে তিনি প্রলয় জ্ঞান করিয়াছেন ও আপনাকে হতভাগ্যের অগ্রগণ্য বলিয়া মনে করিয়াছেন। এই ব্যাপার দেখিয়া কৃষ্ণকে পরম ভোগী ব্যতীত আর কিছুই মনে হয় না। কিন্তু যেমন কংস-দূত অক্রূর আসিয়া তাঁহাকে ধনুর্যজ্ঞের নিমন্ত্রণ করিলেন, অমনিই শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে গুরুতর কর্ত্তব্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হইল। তখন যে গোপাঙ্গনাগণের দীর্ঘনিশ্বাসে সৃষ্টি রসাতল যাইত, যাহাদের বিষণ্ণ-বদন দেখিলে বিশ্বসংসার অন্ধকার হইত, তাঁহাদের আর্ত্তনাদ ও সকাতর অনুরোধ উপেক্ষিত হইল; তাঁহাদিগের রথচক্রাবরোধ গণনায় আসিল না। ভোগে নির্লিপ্ততার অলৌকিক উদাহরণ। আমি একটা ব্যাপারের উল্লেখ করিলাম মাত্র। এইরূপ দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের পর্য্যালোচনা করিলে আপনারা দেখিতে পাইবেন যে, তাঁহার জীবনের সর্ব্বত্র ভোগে নির্লিপ্ততার উদাহরণ দেদীপ্যমান। আবার দেখুন, শিব শ্মশান-বাসী, বিভূতি-বিলেপিত-কলেবর, সর্ব্বত্যাগী এবং কঠোর যোগ-নিরত; অথচ তাঁহার অঙ্কে সুন্দরী-শিরোমণি, সর্ব্বালঙ্কার-বিভূষিতা, নবীনা কামিনী। ত্যাগে লিপ্ততার অলৌকিক উদাহরণ। আমি একটা ব্যাপারের উল্লেখ করিলাম মাত্র। আপনারা এইরূপভাবে পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন, শিবের জীবনের সর্ব্বত্র এইরূপ বৈরাগ্যমধ্যে লিপ্ততার অত্যদ্ভুত উদাহরণ দেদীপ্যমান।"

নীলরতন বলিলেন,—"আপনার প্রদর্শিত উভয় দৃষ্টান্তই অতীব সুন্দর। বুঝিতেছি যে, ভোগ করায় দোষ নাই; কিন্তু নির্লিপ্ত হওয়াই আবশ্যক এবং সন্ন্যাসে দোষ নাই; কিন্তু লিপ্ত থাকা আবশ্যক। যে সকল ব্যক্তি নির্লিপ্তভাবে ভোগ করিতে পারেন

অথবা লিপ্তভাবে সন্ন্যাস করিতে পারেন, তাঁহারাই চরম ফলের অধিকারী হন।"

হরকুমার বলিলেন,—"তাহা হইলে নির্লিপ্ত সন্ন্যাস অপেক্ষা লিপ্ত সন্ন্যাসই শ্রেষ্ঠ এবং সকাম ভোগী অপেক্ষা নিষ্কাম ভোগীই প্রশংসনীয়।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আমার অভিপ্রায় আপনারা সম্যগ্‌রূপে প্রণিধান করিয়াছেন, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য।"

হরকুমার বলিলেন,—"কিন্তু আপনার উপদেশের মর্ম্ম প্রণিধান করিয়া সুখী হইতেছি না; কারণ, উপদেষ্টা স্বয়ং অপূর্ণ। আপনার জীবনে কেবল সন্ন্যাসই আছে—ভোগ নাই। কেবল ত্যাগ আছে—লিপ্ততা নাই। সুতরাং আপনি যে উপদেশ প্রদান করেন, তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিতে অক্ষম।"

উমাশঙ্কর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং কিয়ৎকাল অধোমুখে থাকিয়া উত্তর প্রদান করিলেন,—"আপনার বাক্য ঠিক হইলেও আমার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য নহে। আমি আজন্ম সন্ন্যাসী; কারণ, শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন; সন্ন্যাসীর আশ্রমে পালিত, সন্ন্যাসীর শিষ্য এবং সন্ন্যাসীর অনুকরণপরায়ণ। এইরূপ ব্যক্তির ভোগের কোনই সুযোগ বা সম্ভাবনা নাই এবং এতাদৃশ জীবনে বিষয়-ভোগেরও কোন অবসর নাই। অতএব কথিত অভিপ্রায়ের সহিত আমার জীবনের সামঞ্জস্য হইতে পারে না।"

হরকুমার বলিলেন,—"আপনার জীবন বাস্তবিকই বিস্ময়াবহ। কোথায় আপনার পিতৃনিবাস ছিল, কে আপনার পিতা-মাতা ছিলেন, তাহার কিছুই কি আপনি জানেন না?"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"কিছু না। কে পিতা, কোথায় নিবাস, সে সকল বৃত্তান্তের কিছুই আমি জানি না। মাতৃ-দেবীর সামান্য স্মৃতি কখনও কখনও ছায়ার ন্যায় আমার মনে উদিত হয় বটে; কিন্তু তাহা নিতান্ত অস্পষ্ট।"

হরকুমার জিজ্ঞাসিলেন,—"বোধ হয়, ঘনানন্দ স্বামী আপনার পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত-ঘটিত কিছু কিছু রহস্য জানিতে পারেন। অন্ততঃ ব্রাহ্মণকুলে আপনার জন্ম; ইহা না জানিলে তিনি কখনই আপনাকে সন্ন্যাসাশ্রমে গ্রহণ করিতেন না।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"সম্ভব। আমার জননী বোধ হয় আমাকে গুরুদেবের হস্তেই সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। নচেৎ আমার প্রতি তাঁহার এরূপ অসামান্য কৃপার আর কোনই কারণ দেখিতে পাই না। আমাকে গুরুদেবের হস্তে সমর্পণ করার কালে জননী কিছু পরিচয় প্রদান করিয়া থাকিলেও থাকিতে পারেন; কিন্তু গুরুদেবের মুখে তদ্বিষয়ক কোন সংবাদই আমি কখনও শ্রবণ করি নাই?"

হরকুমার বলিলেন,—"নিশ্চয়ই আপনার জীবনের সহিত কোন অলৌকিক ব্যাপার প্রচ্ছন্ন আছে। যাহাই হউক, আজন্ম পিতামাতার স্নেহরূপ পরম রসে বঞ্চিত থাকায় আপনার জীবন সন্ন্যাসরূপ শুষ্কতায় মিশিয়া গিয়াছে। প্রেমে মনুষ্য-হৃদয়কে যে কোমলতা প্রদান করে, তাহার লাভ আপনার জীবনে ঘটে নাই।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আমি পূর্ব্বে তাহা বুঝিতে পারি নাই। কারণ, যে যাহা কখনও ভোগ করে নাই, সে তাহার মর্ম্মগ্রহণে অক্ষম। সম্প্রতি আমার এই মরুভূমির ন্যায় কঠোর জীবনের বড়ই মধুর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কৃপা সহকারে ভগবতী স্বয়ং আমার জননীরূপে আবির্ভূতা হইয়া আমাকে কোলে লইয়াছেন। তাঁহার স্নেহে আমার শুষ্ক অন্তঃকরণ সরস ও মধুময় হইয়া উঠিয়াছে। এখন আমি এ বিশ্বসংসারকে অভিনব চক্ষে দেখিতেছি। সকল পদার্থ যেন অধুনা অধিকতর সুমিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আমার সেই মাকে আপনারাও দেখিয়াছেন। তিনি যোগেশ্বরী।"

হরকুমার বলিলেন,—"পূর্ব্বজন্মের অনেক সুকৃতি ছিল, তাই তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছি এবং দুই তিন দিন তাঁহার আচরণাদি দেখিয়া শুনিয়া যে জ্ঞানলাভ করিয়াছি, এত বয়সের মধ্যে তাদৃশ জ্ঞানোপার্জ্জনের সুযোগ আর কখনও হয় নাই।"

নীলরতন বলিলেন,—"যোগেশ্বরী মাতা কৃপাপূর্ব্বক এক দিন এই ভবনেও পদধূলি দিয়া আমাদিগকে পবিত্র ও চরিতার্থ করিয়াছেন। আমার কন্যা অন্নপূর্ণা তাঁহার যুগপৎ সুসঙ্গত ও অসঙ্গত, সলজ্জ ও নির্লজ্জ, প্রলাপবৎ ও সারপূর্ণ বাক্যে ও ব্যবহার দর্শনে তাঁহার একান্ত অনুরক্তা হইয়াছে। তিনিও অন্নপূর্ণাকে কন্যার ন্যায় স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছেন।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"স্নেহ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। আমি এক্ষণে বিদায় হই। বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে। আশ্রমের অনেক কার্য্যের সময় উপস্থিত।"

নীলরতন বলিলেন,—"আমাদিগের প্রতি আপনার কৃপা অসীম। অন্নপূর্ণা আপনাকে প্রণাম করে নাই। প্রণাম করিতে না পাইলে সে বড়ই কাতর হয়। অতএব একবার পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে

পদার্পণ করিলে, সে আপনাকে প্রণাম করিতে পারে।"

নবীন সন্ন্যাসীর বদন-মণ্ডল যেন একটু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল এবং তাঁহার স্থির-গম্ভীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন একটু বিচঞ্চল হইল। তিনি ধীরে ধীরে নারীগণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন এবং কালীতারা ও আনন্দময়ীকে ভক্তি সহকারে প্রণাম করিলেন। অন্নপূর্ণা লজ্জাবনতমুখী; দূর হইতে সন্ন্যাসীকে একটি প্রণাম করিলেন, কিন্তু তাঁহার দিকে একবার চাহিয়া দেখিতেও তাঁহার ভরসা হইল না; একটি কথাও বলিতে পারিলেন না। অন্নপূর্ণার সহিত দুই একটি কথা কহিবেন ইচ্ছা করিয়াও সন্ন্যাসী কিছুই বলিয়া উঠিতে পারিলেন না। কালীতারা ও আনন্দময়ীর সহিত সময়োচিত দুই একটি কথা কহিয়া বাহিরে আসিলেন। অন্নপূর্ণা মনে মনে বলিলেন,—"এ সন্ন্যাসী কখনই মানুষ নহেন। ইনি দেবতা।"

নীলরতন ও হরকুমারের নিকট হইতে বিহিত বিধানে বিদায় গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী বাহিরে আসিলেন এবং আশ্রমাভিমুখে চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিলেন,—"স্বভাব, চরিত্র ও রূপ সকল বিষয়ের আলোচনা করিলে নীলরতন বাবুর এই কন্যাকে দেবী ভিন্ন আর কিছুই মনে হয় না।"

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলে নীলরতন বলিলেন,—"এই আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব-বিরহিত আজন্ম আশ্রম-পালিত বালক যেমন প্রিয়দর্শন, তেমনই জ্ঞানবান্। নিশ্চয়ই এই নবীন যোগী কোন মহাপুরুষের সন্তান।"

হরকুমার বলিলেন, "আমার বোধ হয়, সাধু উমাশঙ্করের জীবন কোন অত্যদ্ভুত রহস্যজালে জড়িত। আমি ইহার তথ্যানুসন্ধান করিব। এই নবীন যোগীর ব্যবহার ও জ্ঞানগর্ভ বাক্যাবলী আমাকে উত্তরোত্তর এতই বিমোহিত করিয়াছে যে, স্বতই ইহার সম্বন্ধে আমার একপ্রকার আন্তরিক অনুরাগ জন্মিয়াছে। যত দিন ইহার অপরিজ্ঞাত জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে না পারি, তত দিন আমার চিত্ত সুস্থির হইবে না।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অপূর্ব্ব-দর্শন

উমাশঙ্কর ধীরে ধীরে আশ্রম-প্রদেশে উপনীত হইয়া দেখিলেন, অপূর্ব্ব-দর্শন। আশ্রমবেদিকার উপর সর্ব্বালঙ্কার-বিভূষিত-কায়া, কর-ধৃত-কমলা, হসন্মুখী এক সজীব দেবী-প্রতিমা; সেই প্রতিমা যোগেশ্বরী। যোগেশ্বরী একাকিনী ও নির্ব্বাক্‌ভাবে হস্তস্থিত কমল-বৃন্ত দ্বারা ভূপৃষ্ঠে নানা প্রকার রেখাপাত করিতেছেন। তাঁহার স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের জ্যোতিতে সন্নিহিত প্রদেশ যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। অঙ্গের ভূষণসমূহ তাঁহার প্রদীপ্ত শোভার সান্নিধ্য হেতু যেন নিষ্প্রভ হইয়াছে। উজ্জ্বল আয়ত লোচনদ্বয় যেন আপনিই হাসিতেছে; অপরূপ ওষ্ঠাধর যেন প্রগাঢ় আনন্দ-জনিত হাস্য প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারিতেছে না। মুক্তামালা-বিজড়িত বেণী পৃষ্ঠদেশ হইতে আসিয়া অঙ্কোপরে স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়াছে। অপূর্ব্ব যৌবন-শ্রীতে যোগেশ্বরীর দেহ ঢল ঢল করিতেছে। এই অলৌকিক শোভা ও যৌবন-শ্রী সন্দর্শনে দম্ভগত প্রাণের কথা দূরে থাকুক, চিরন্তন পাষণ্ডের হৃদয়েও ভক্তি ভিন্ন অন্য কোন ভাবের আবির্ভাব হয় না। যোগেশ্বরীকে দর্শনমাত্র স্বতই হৃদয়ে গাম্ভীর্য্য-সংবলিত প্রগাঢ় ভক্তি সমুদিত হয়।

এই দেবীমূর্ত্তি দর্শনমাত্র উমাশঙ্কর আপনাকে ধন্য ও চরিতার্থ জ্ঞান করিলেন এবং ধীরে ধীরে নিকটস্থ হইয়া ভূপৃষ্ঠে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন তৎক্ষণাৎ যোগেশ্বরীর দৃষ্টি উমাশঙ্করের প্রতি সঞ্চালিত হইল এবং তিনি হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসিলেন—"কে—ও? ছেলে! আচ্ছা, বল দেখি, মা ভাল, কি ছেলে ভাল?"

উমাশঙ্কর বিনীতভাবে বলিলেন,—"মার গুণের কি সীমা আছে? ছেলে যতই ভাল হউক, মার মত কখনই হয় না।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"তবে আমি তোর ভাল মা?"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"তা আর বলিতে? আপনি দেবী; এই দেবী আমার মা। সার্থক আমার জন্ম যে, মাতৃহীন হইয়াও আমি আমার এমন মা পাইয়াছি।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"আমি অনেক অলঙ্কার পরিয়াছি, এইগুলো আজ বিলাইয়া দিব। তুই লইবি?"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আমি সন্ন্যাসী; অলঙ্কারে আমার কি প্রয়োজন?"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"তুই সন্ন্যাসী ছিলি, কিন্তু তোকে গৃহী হইতে হইবে। অতএব অলঙ্কারে তোর দরকার আছে।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আপনার কথা শুনিয়া আমি ভয় পাইতেছি! আমাকে গৃহী হইতে হইবে।

এমন মা ছাড়িয়া আমি কোথাও যাইতে পারিব না।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"মা ছাড়িবে কেন বাবা ? মা কি কখন ছেলে ছাড়িয়া থাকিতে পারে ? তুমি গৃহী হইলে তোমার মাও গৃহে গিয়া তোমাকে দেখিয়া আসিবে।"

উমাশঙ্কর হাসিয়া বলিলেন,—"এমন মায়ের আশ্রয়ে থাকিলে কোথাও অসুখের সম্ভাবনা নাই। মা যদি সহায় থাকেন, তাহা হইলে এ অধম সন্তান সর্ব্বত্র গমন করিতেই সম্মত আছে।"

যোগেশ্বরী একে একে দেহের আভরণ উন্মুক্ত করিতে লাগিলেন। সমস্ত খোলা হইলে বলিলেন,—"নেও বাবা! এ সকল ভূষণ তোমার।"

উমাশঙ্কর আবার বলিলেন,—"কেন মা, এই সকল পদার্থ আমাকে দিতেছেন? আমি এ সকল কি করিব? কোথায় রাখিব?"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"না রাখিতে পার, কাহাকেও দেও গে।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"কাহাকে দিব?"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"যাহাকে বড় ভালবাস।"

উমাশঙ্কর জিজ্ঞাসিলেন,—"যাহাকে বড় ভালবাসি? সে কে?"

হাসিতে হাসিতে যোগেশ্বরী কহিলেন,—"অন্নপূর্ণা।"

উমাশঙ্কর চমকিত হইয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, 'আমি অন্নপূর্ণাকে ভালবাসি সত্য। মা কেমন করিয়া এ কথা জানিলেন? এ বৃত্তান্ত স্বয়ং অন্নপূর্ণা জানেন না—জগতের আর কেহই জানে না। জননী যোগেশ্বরী—দেবী। সুতরাং তাঁহার পক্ষে এ রহস্য পরিজ্ঞাত হওয়া অসম্ভব নহে।' তাহার পর আরও মনে করিলেন, 'অন্নপূর্ণাকে আমি ভালবাসি সত্য; কিন্তু মা বলিতেছেন, আমি অন্নপূর্ণাকে বড় ভালবাসি। মার কথা মিথ্যা হইতে পারে না। কিন্তু তাঁহার এ অনুমানটি যেন ঠিক হয় নাই।'

ভ্রান্ত উমাশঙ্কর! তুমি শাস্ত্রজ্ঞ, বিচারনিপুণ ও জ্ঞানবান্। তথাপি তুমি এখনও অল্প-বয়স্ক ও বহুদর্শিতাবিহীন। তাই তুমি প্রেমের এই এক অদ্ভুত তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারিতেছ না। প্রেমটি বড়ই আশ্চর্য্য সামগ্রী, ইহা কোথা হইতে, কিরূপে তিল তিল করিয়া সঞ্চিত হয়, তাহা অনেক সময়ই ঠিক করা যায় না। অনেক সময় এমনও ঘটে যে, প্রেমাস্পদ ব্যক্তির প্রতি প্রেমের আকর্ষণ সঞ্জাত হইয়াছে কি না, ইহা অনুমান করাই যায় না। যখন কোন ঘটনা-বিশেষ বা কোন ব্যাপার হেতু সহসা সেই প্রেম উপলব্ধ হয়, তখনই বুঝা যায় যে, তাহার পরিমাণ কত। অনেক সময় এমনও ঘটে যে, ব্যক্তিবিশেষের প্রতি প্রেমের পরিমাণ কিরূপ, তাহা অনুধাবন করিতে না পারিয়া প্রেমিক তাহাকে আপনার বন্ধুবর্গের সমশ্রেণীস্থ বলিয়া মনে করেন; কিন্তু সহসা একটি আঘাত বা একটি ক্ষুদ্র ক্রিয়া তাঁহার দর্শন-শক্তি উন্মীলিত করিয়া দেয়, তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে, যাঁহাকে সাধারণ প্রেমাস্পদ বলিয়া পূর্ব্বে জ্ঞান ছিল, তাঁহারই প্রেমে হৃদয়, মন ও কলেবর বিভোর হইয়া গিয়াছে; বসুন্ধরা যেন তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তিনি যেন প্রেমাস্পদের অনন্ত প্রেমসাগরে ডুবিয়া আছেন। অতএব সাধু উমাশঙ্কর! অন্নপূর্ণার সম্বন্ধে তোমার প্রেমের প্রকৃত পরিমাণ তুমি প্রণিধান করিতে পারিয়াছ বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি না এবং তোমার ভালবাসা বড় ভালবাসা কি না, এ সম্বন্ধে তোমার মীমাংসা সমীচীন বলিয়াও আমরা গ্রহণ করিতে পারি না।

উমাশঙ্কর যখন যোগেশ্বরীর বাক্য-সমূহের উল্লিখিতরূপ আলোচনা করিতেছেন, সেই সময়ে সেই দেবী তাঁহার নিকটস্থ হইলেন এবং অতীব স্নেহপূর্ণ-ভাবে তাঁহার হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, "বাবা! গঙ্গায় কত ঢেউ যাইতেছে, আমাকে গণিয়া বলিয়া দিতে হইবে; আমার বড় দরকার।"

উমাশঙ্কর বলিলেন, "সে কি কথা! এও কি কেহ বলিতে পারে মা?"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"পারে না? মানুষের হৃদয় একটা প্রকাণ্ড সমুদ্র। তাহার সকল ভাব যদি কেহ বুঝিতে পারে, তাহা হইলে সে ক্ষুদ্র গঙ্গার তরঙ্গ কয়টা গণিয়া বলিতে পারিবে না, এ বড় আশ্চর্য্যের কথা! তা বাবা, তুমি গঙ্গার ঢেউ গণিতে পার বা না পার, আপনার হৃদয়ের তরঙ্গগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিও। বলিতেছিলাম কি, কুটীরের মধ্যে এক পাত্র বরফি আনিয়া রাখিয়াছি; কিছু খাবে কি?"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আমরা আশ্রমে দিনান্তে একবারমাত্র ভিক্ষান্ন পাক করিয়া খাই। তবে অসময়ে বরফি কিরূপে খাওয়া হইতে পারে?"

যোগেশ্বরী হা! হা! শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"এরূপ ভোজনে কি ধর্ম্ম যাইবে?"

উমাশঙ্কর বলিলেন, "জানি না মা, কি হইবে। কিন্তু ধর্ম্ম-হানির আশঙ্কা না থাকিলে এরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে কেন?"

যোগেশ্বরী বলিলেন, "ব্যবস্থা নানা প্রকার, ব্যবস্থার কর্ত্তাও অনেক ; কিন্তু এ সকলই সামাজিক ব্যবস্থা। সামাজিক ব্যবস্থাপরিপালনও ধর্ম্ম। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্ম সামাজিক ব্যবস্থার বশবর্ত্তী নহে ; বরং তদপেক্ষা অনেক দূরে অবস্থিত। ভোজনাদি বিষয়ের অনেক ব্যবস্থাই সামাজিক ধর্ম্ম-সঙ্গত। সুতরাং প্রকৃত ধর্ম্মের সহিত তাহার বিশেষ সম্বন্ধ নাই।"

উমাশঙ্কর বলিলেন, "আমরা সন্ন্যাসী—সামাজিক নিয়মের বহির্ভূত। তবে কেন মা! আমাদের সম্বন্ধেও ভোজনাদি-বিষয়ক অবধারিত নিয়ম প্রচারিত আছে ?"

যোগেশ্বরী বলিলেন, "না বাবা! আমরা সমাজবহির্ভূত নহি। সন্ন্যাসীরাও মনুষ্য-অংশ! সাধারণের সহিত আহার-ব্যবহার, আদান-প্রদান না থাকিলেও সন্ন্যাসীরা বহু প্রকারে সমাজের সহিত সংবদ্ধ; সুতরাং সামাজিক নিয়মের অধীন। সন্ন্যাসীদিগেরও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সমাজ আছে। সন্ন্যাসিগণ আপন আপন সমাজ-প্রচলিত নিয়ম-পরিপালনে বাধ্য। এই জন্যই তুমি সন্ন্যাসাশ্রমের মধ্যে সামাজিক মনুষ্যের ন্যায় বিশেষ বিশেষ নিয়ম দেখিতে পাও।"

উমাশঙ্কর জিজ্ঞাসিলেন, "এ সকল নিয়মের কোনই সার্থকতা নাই কি মা?"

যোগেশ্বরী উত্তর দিলেন, "বিশেষ সার্থকতা আছে বাবা! কি গৃহস্থাশ্রমের সামাজিক নিয়ম, কি সন্ন্যাসাশ্রমের ব্যবস্থা সকলই নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও সার্থক। এই জন্য প্রত্যেক আশ্রমেই আশ্রমোচিত নিয়মপরিপালনই ধর্ম্ম নামে অভিহিত। কোথাও স্বাস্থ্যের অনুরোধে, কোথাও সমাজের অনুরোধে, কোথাও শান্তির অনুরোধে, কোথাও জ্ঞানলাভের অনুরোধে, কোথাও যোগ-শক্তিপ্রাপ্তির অনুরোধে, কোথাও ভক্তিসাধনের অনুরোধে বিশেষ বিশেষ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইতেছে। সেই সকল নিয়ম দৈবশক্তিসম্পন্ন মনীষিগণ বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক অবধারিত করিয়াছেন। সুতরাং তাহার পরিবর্ত্তন বা অপরিপালন কোন আশ্রমের পক্ষেই বৈধ ব্যবস্থা নহে।"

উমাশঙ্কর বলিলেন, "তবে মা! এ অসময়ে আপনি আমাকে এ অবৈধ ভোজন করিতে আজ্ঞা করিতেছেন কেন ?"

যোগেশ্বরী বলিলেন, "তুমি রাজা হইবে। যে আশ্রমে তুমি এক্ষণে অধিষ্ঠিত, তাহা তোমার বয়স, অবস্থা কিছুরই অনুরূপ নহে। তোমার জন্য বিধাতা আপাততঃ স্বতন্ত্র ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, অতএব সন্ন্যাসাশ্রমের নিয়ম অপরিপালন তোমার পক্ষে দোষাবহ নহে।"

উমাশঙ্কর বলিলেন, "মা! আপনার এ রহস্য-পূর্ণ বাক্যের তাৎপর্য্য আমি কোনরূপেই প্রণিধান করিতে পারিতেছি না।"

যোগেশ্বরী বলিলেন, "কেহ পাঁচ বৎসর বয়সে মরে, কেহ এক শত বৎসর বাঁচিয়া থাকে, কেহ দীনহীন ভিক্ষুক হয়, কেহ বিপুল ধনশালী হয়, কেন ? তুমি জান ? যাহা যখন হইবে, তাহাই হইতে দেও। প্রতিকূল চেষ্টা করিও না। দৈহিক কঠোরতা, ত্যাগস্বীকার, শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতির অনুষ্ঠান দ্বারা তোমার হৃদয় জ্ঞানবান্ হইয়াছে। তুমি যখন রাজা হইবে, তখন জ্ঞানের সহিত বিষয়-সম্মিলনে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটিবে।"

সবিস্ময়ে উমাশঙ্কর আবার বলিলেন,—"জননি! আপনি এ প্রহেলিকা পরিত্যাগ করুন। কেন আপনি এ ভিক্ষুক বালককে রাজ-পদাভিষিক্ত করিবার কল্পনা করিতেছেন ? বিড়ম্বিত বিষয়ব্যাপারে সন্ন্যাসীর প্রয়োজন কি মা ?"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"প্রয়োজন কি, তাহা আমি জানি না। তুমি আমগাছে কখনও তেঁতুল ফলাইতে পার কি ? তোমার অদৃষ্টে রাজভোগ অপরিহার্য্য দেখিতেছি। তবে তুমি রাজ-ভোগ খাইবে না কেন বাবা ?"

এই বলিয়া যোগেশ্বরী তাহার হস্তধারণ করিয়া বলিলেন,—"আইস।"

উমাশঙ্কর নীরবে দেবীর সহিত গমন করিলেন। কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বাস্তবিকই তথায় এক থালা অত্যুৎকৃষ্ট বরফি রহিয়াছে।

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"খাও বাবা।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"নিয়ম অনিয়ম কিছুই জানি না। আপনি স্বর্গের দেবতা—আমার জননী। আপনার আজ্ঞাই আমার সকল নিয়মের সার। আপনি যখন আজ্ঞা করিতেছেন, তখন ভোজ্য-গ্রহণে আমার আর কোনই ইতস্ততঃ নাই। কিন্তু মা! অপরিসীম পুণ্য না থাকিলে জননীর প্রসাদ-ভোজন সন্তানের অদৃষ্টে ঘটে না। মাতৃহীন অভাগা আবার মাতৃ-স্নেহ লাভ করিয়াছে। কিন্তু মাতার ভোজনরূপ সৌভাগ্য তাহার অদৃষ্টে ঘটিতে পারে না কি ?"

যোগেশ্বরী উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন,—"সন্তানের বাসনা পূরণ করিতে জননী বাধ্য।"

এই বলিয়া সেই দেবী পাত্রস্থ একখণ্ড বরফি তুলিয়া লইলেন এবং স্বকীয় কুন্দ-কুসুম-বিনিন্দিত দন্তে

তাহার কিয়দংশ কাটিয়া লইয়া অবশিষ্ট ভাগ থালায় রাখিয়া দিলেন এবং বলিলেন,—"এখন খাও বাবা!"

তখন উমাশঙ্কর গললগ্নীকৃতবাসে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—"আজ অভাগা ধন্য হইল। জীবন সার্থক হইল, দেহ-মন পবিত্র হইল।"

ভক্তিভাবে যোগেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া উমাশঙ্কর উচ্ছিষ্ট বরফিখণ্ড প্রথমে মস্তকে, তদনন্তর বক্ষে স্থাপন করিয়া মুখে প্রদান করিলেন।

কিন্তু কোথায় যোগেশ্বরী! উমাশঙ্কর চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, যোগেশ্বরী কোথাও নাই।

অলঙ্কাররাশির কি হইবে? উমাশঙ্কর কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া গুরুদেবের আগমন-প্রতীক্ষায়, আশ্রম-বেদিকার পার্শ্বে, অলঙ্কার-সমূহের সন্নিকটে দাড়াইয়া রহিলেন।

পঞ্চম খণ্ড—বিষ-বীজ

প্রথম পরিচ্ছেদ

গাঢ়তা

সোনাপুরে শ্যামলাল বাবুর অন্তঃপুরমধ্যে অপরাহ্ণকালে বিধুমুখী একখানি ক্লিওপেটরা কৌচের উপর অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় পড়িয়া আছেন। তাঁহার সূক্ষ্ম-বস্ত্রের কিয়দংশ কার্পেটের উপর লুটাইতেছে। শরীর নিতান্ত অলসিত ও অবসিত, নেত্রদ্বয় মুকুলিত, বেশ-ভূষা বিস্রস্ত, কেশ-পাশ বিমুক্ত, বেণী বিগলিত। এইরূপ সময়ে সারদা তথায় প্রবেশ করিল। সারদার সম্পত্তি কিছু বাড়িয়াছে; রূপার গোট, সোনার বালা তাহার পূর্ব্বেই ছিল। এবার তাহার বাহুতে সোনার তাগা ও কানে সোনার মাকড়ি শোভা পাইতেছে। প্রভু-পত্নী পরিতুষ্ট হওয়ায় তাহার সুখসম্পদ্ অনেক বাড়িয়াছে। সারদা আসিয়াই বলিল,—"তুমি যে রকম ভাবে শুইয়া আছ বউ-দিদি, তা যদি হরিচরণ বাবু একবার এ সময়ে দেখতে পেতেন, তা হ'লে বোধ হয়, পাগল হয়ে যেতেন!"

বিধুমুখী অবসিতভাবে ঈষৎ হাসির সহিত মিশাইয়া বলিলেন,—"এই সে হতভাগা এখান থেকে যাচ্ছে। সেই ত আমাকে এ রকম ক'রে ফেলে রেখে গিয়েছে। পাগল সে হয়েছে বটে; দুদিন থেকে বল্‌তে আরম্ভ করেছে, আমাদের এ প্রেমের ব্যাপার লোক-জানাজানি হয়েছে। একটু আধটু কথা বাবুর কানেও ঢুকেছে। হরিচরণ কৌশল ক'রে বাবুকে তা মনে ভাবতেও দেয়নি।"

সারদা সভয়ে বলিল,—"এটা তো বাস্তবিকই বড় ভয়ের কথা! তা হ'লে কি হবে?"

বিধুমুখী ঘৃণাসূচক হাস্যের সহিত বলিলেন,—"হরিচরণ ভয়ে পাগল হয়েছে; তুইও ক্ষেপ্‌লি দেখছি! জেনে থাকে জেনেছে; তার অত ভয় কি?"

সারদা বলিল, —"না বউ-দিদি! একটু সাবধান থাকা ভাল। দিন নেই, রাত নেই, সকল সময়েই হরিচরণ বাবু যাওয়া আসা কচ্ছেন। আমরা আপনার লোক—সকল কথা ঢেকে রাখছি, কিন্তু সকলে তো সমান নয়? অনেকে এ কথা নিয়ে অনেক রঙ্গও কচ্ছে। কাজেই ক্রমে ঢাকে কাঠি পড়েছে। তাই বল্‌ছি, একটু সাবধান হওয়া ভাল।"

বিধুমুখী সরোষে জিজ্ঞাসিলেন, "কি রকম সাবধান?"

সারদা বলিল,—"সাবধান আর কি, দিনে দুপুরে যখন তখন যাওয়া আসা না ক'রে, হরিচরণ বাবু যদি একটু বেশী রাত্রে সময়মত আসেন, তা হ'লেই দেখ্‌তে শুন্‌তে ভাল হয়, লোকও বড় টের পায় না; বড় গোলও হয় না।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"বিলক্ষণ! হরিচরণ সারাদিন আমার কাছে থাকিলেও বোধ হয় আমার আশা মিটে না; সে যে কাজ-কর্ম্মের জন্য অনেকক্ষণ কাছারীতে থাকে, আমি আর তা সহ্য কত্তে পারি না। 'এখনই আস্‌ব' ব'লে গিয়েছে। কিন্তু বড়ই দেরী কচ্ছে।"

সারদা বলিল,—"এই গিয়েছেন, আবার এখনই আস্‌বেন। তিনি এখন দেওয়ান। বাবু আর কোন বিষয়ে কিছু দেখেন না, হরিচরণ বাবুর হাতেই সকল বিষয়ের সকল ভার। তা তাঁকে বিষয়-কর্ম্ম দেখ্‌তে হবে তো!"

বিধুমুখী বলিলেন,—"বিষয়-কর্ম্মে ছাই পড়ুক। যদি আমার কাছে ব'সে কাছারীর কাজ কত্তে পারে, তবেই তো তার দেওয়ানী করা হবে, নইলে তার দেওয়ানী ঘুচিয়ে দিব।"

সারদা বলিল,—"বউ-দিদি! বাড়াবাড়ি ক'র না। সবই বেশ চল্‌ছে। বল্‌তে গেলে হরিচরণ বাবুই এখন বিষয়-আশয়ের সর্ব্বময় কর্ত্তা। বাবু তোমার হাতের একটা কলের পুতুল; হরিচরণ বাবু তোমার পায়ের ছুঁচো; সুতরাং তুমিই সর্ব্বময়ী। এই সুখের অবস্থা যেন নষ্ট না হয়।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"হরিচরণকে পাইয়া আমার জীবনের শুষ্ক-তরু মুঞ্জরিত হয়েছে, প্রাণে সুখের ফোয়ারা ছুটিয়াছে, আমোদে হৃদয় ভোর হয়েছে, জগতের কোন বিপদই এখন আমাকে এ আনন্দ হইতে নিরস্ত করিতে পারিবে না। কোন ভয়ে আমি পশ্চাৎপদ হইব না, কোন কথাই আমি কানে শুনিব না। বিষয়-আশয় এখন সকলই আমাদের হাতে, হতভাগা বাবু প্রতিবাদী হইলে নিজেই কষ্ট পাইবে।"

সারদা বলিল,—"তা একরকম ঠিক কথা। তোমরা ইচ্ছা করিলে যে বাবুর সর্ব্বনাশ করিতে পার, তাহার ভুল নাই। যাতে ভাল হয়, তাই কর। আমরা তোমার ভাল দেখিলেই সুখী, তা আমি এখন আসি বউ-দিদি! আমার সেই তাবিজের কথা দয়া ক'রে মনে রাখবেন।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"তা মনে আছে। যাবার সময় কাছারীতে গিয়ে হরিচরণকে শীগ্‌গির আস্‌তে ব'লে যাস্‌।"

সারদা প্রস্থান করিল। বিধুমুখী অলসিতভাবে সেই কৌচে পড়িয়া রহিলেন।

এইরূপ সময়ে হরিচরণ তথায় আগমন করিল। হরিচরণের চুলের পারিপাট্য অনেক বাড়িয়াছে, পোষাক-পরিচ্ছদ ভদ্রলোকের ন্যায় হইয়াছে, চেহারা একটু চকচকে দেখাইতেছে, কিন্তু জ্ঞান, পবিত্রতা ও শিক্ষাপ্রভাবে কুৎসিত আকৃতিও যেরূপ উজ্জ্বলতা ধারণ করে, তাহার দেহের কোথাও তাহা হয় নাই। হরিচরণ বিষণ্ণ; যেন একটু উৎকণ্ঠিত। তাহাকে আসিতে দেখিয়াই বিধুমুখী উঠিয়া বসিলেন এবং কৃত্রিম রোষ সহকারে বলিলেন,—"এই বুঝি তোমার এখনই আসা?"

হরিচরণ বলিলেন,—"বেশী দেরী হইয়াছে কি? না! এই তো যাচ্ছি, তা যাহা হউক, রকমটা বড় ভাল বোধ হচ্ছে না।"

সাগ্রহে বিধুমুখী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিসের রকম?"

হরিচরণ বলিলেন,—"বাবুর রকম আর কি! তিনি যেন সব বুঝতে পাচ্ছেন বলে বোধ হচ্ছে।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"পাল্লেই বা। সে আমাদের হাতে, না আমরা তাহার হাতে? চুপ ক'রে সব সয়ে থাকতে পারে ভাল, না পারে. তারই অমঙ্গল।"

হরিচরণ বলিলেন,—"তা ঠিক। বিষয়-আশয় সব এক রকম আমাদেরই; কিন্তু তবুও তো তিনি মালিক—দরওয়ান, লাঠিয়াল, লোক-লস্কর সবই তাঁর হুকুমের তলে। তিনি একবার রেগে হুকুম করলে গর্দ্দান বাঁচান ভার হইবে।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"তুমি তাহাদের হাত কত্তে পার না? টাকাকড়ি, বহাল-বরতরপ, মাইনাপত্র সকলই তোমার হাত। তুমি ইচ্ছা করলে অনায়াসেই সব লোকজনকে এমন বশ কত্তে পার যে, তোমার হুকুম পেলে তারা সকলে ঐ জাম্বুবান বাবুটার মাথা এনে তোমার পায়ে ফেলে দিতে পারে।"

হরিচরণ একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—"তা পারা যায় না, এমন নয়, কিন্তু তাতে হেঙ্গামা ঢের। তার চেয়ে একটা সোজা মতলব আমি ঠিক করেছি। তোমার হুকুম পেলেই তার উদ্যোগ করি।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"আমাদের সুখের পথ সোজা করবার জন্য যে মতলব করবে, তাতেই আমি খুব রাজি। বল কি মতলব?"

হরিচরণ বলিলেন,—বিষয়-সম্পত্তি, তোমারই পরামর্শমতে অধিকাংশই বাকী খাজনায় নীলাম ঘটাইয়া আমি নিজ নামে বা তোমার নামে খরিদ করিয়া ফেলি। কতক কতক সম্পত্তি, টাকার অপ্রতুল ব'লে বেনামী ক'রে বন্ধক দিয়া ফেলি, নগদ টাকা-কড়ি, দামি জিনিসপত্র অনেকই সরাইয়া ফেলা যাউক। গয়না প্রভৃতি আর অন্দরের দামি জিনিস-পত্র সে সকল তো তোমারই হাতে আছে। তাহার পর আমরা যদি এখান থেকে স'রে পড়ি, তা হলে মন্দ হয় না। তুমি কি বল?"

বিধুমুখী কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন—"মন্দ হয় না বটে; কিন্তু দরকার কি তাতে? আমাদের এখানে কোন সুখেরই ব্যাঘাত নাই। তবে কেন আমরা পাতান ঘরকন্না ছেড়ে দূরে যাই?

হরিচরণ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"আমি তখনই জানি, আমার বামন হয়ে চাঁদ ধরিবার সাধ; তুমি রাজ-রাজেশ্বরী, আমার মত ক্ষুদ্র কীটকে তুমি যে ভালবাসবে, এ কখনই সম্ভব নয়। হাজার

হউক, বাবু তোমার আপনার; সে টান কোথায় যাবে? কিন্তু ভাই, এরূপ ভয়ে ভয়ে প্রাণ হাতে ক'রে প্রেম করা আমার আর পোষাচ্ছে না। তাই ভাব্‌ছিলাম যে, দূরে গিয়ে দুজনে নিষ্কণ্টকে স্বামি-স্ত্রীর মত সুখে থাক্‌ব! অভাগার সে সাধ পূরিবে কেন?"

পুনরায় দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া হরিচরণ নীরব হইল। বিধুমুখীর মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি কাতরভাবে হরিচরণের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—"হরিচরণ, প্রাণেশ্বর! তোমাকে আমি কত ভালবাসি, তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারি না। এক তিল তুমি কাছছাড়া হইলে আমার সংসার শূন্য বোধ হয়। তথাপি তুমি আমার ভালবাসায় সন্দেহ কর। এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কিছুই নাই। দিন-রাত্রি নিষ্কণ্টকে তোমার কাছে থাকিব, তার অপেক্ষা বেশী সুখ আর কি হইতে পারে? তুমি এখনই তার ব্যবস্থা কর। তুমি যেখানে যেতে বল্‌বে, আমি ছায়ার মত সঙ্গে যাইব। আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বার দরকার নাই। তুমি যা ভাল বুঝ কর।"

একমুখ হাসি হাসিয়া, ঘৃণিত কুক্কুরাধম হরিচরণ সেই সুন্দরী পাপীয়সীকে আলিঙ্গন করিল। এ পাপ চিত্রের অন্যান্য অংশ প্রদর্শনে আমরা অক্ষম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মধুকর।

বাস্তবিক মূর্খ ও কাণ্ডজ্ঞানহীন হরিচরণ বিষয়-কর্ম্মের বিস্তর অব্যবস্থা করিয়া ফেলিয়াছে। এই বিপুল সম্পত্তির পরিচালনা করা কি তাহার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তির সাধ্য? দুই এক জন বহুদর্শী কর্ম্মচারী স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে কর্ম্মের উপদেশ দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; কেহ কেহ তাহাকে কোন্ মোকদ্দমার কিরূপ তদ্বির করা উচিত, কোন্ বিষয়ে কিরূপ হুকুম দেওয়া উচিত, কাহার সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করা উচিত ইত্যাদি বিষয়ের পরামর্শ দিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন; কিন্তু মূর্খ হরিচরণ সে সকল কথায় কর্ণপাত করে নাই। পরের পরামর্শ লইয়া কাজ করা, বিশেষতঃ অধীনস্থ লোকের মন্ত্রণা গ্রহণ করা নিতান্ত মূর্খতা বোধে সে কাহারও কোন কথাই শ্রবণ করে নাই। বাড়ার ভাগ তাহার সময়ও নিতান্ত অল্প। বিধুমুখীর নিকট সে দিবারাত্রি কাটায়, মদে সে অনেক সময় বেহুঁস হয়; সুতরাং কাজকর্ম্ম ভাল করিয়া দেখিয়া ও বুঝিয়া ক্রমে শিখিয়া লইবার সুযোগও তাহার হইল না। সে যাহা মনে আইসে, তাহাই হুকুম দেয়, যে কাগজ পায়, তাহাতেই সহি করে। মাতাল অবস্থায় কি করিতে কি করিয়া বইসে, তাহার ঠিক থাকে না; পূর্ব্বকৃত কার্য্যের বৃত্তান্ত পরে মনে পড়ে না।

অতি অল্পকালের মধ্যেই বিষয়-কর্ম্মের বড়ই বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া উঠিল। লাটের খাজানা যায় না, কর্ম্মচারীরা বেতন পায় না, হাতী-ঘোড়া দানা পায় না, মফঃস্বলে গোমস্তা-নায়েবের উপর রীতিমত তাগাদা হয় না, চারিদিকে বিভ্রাট বাধিয়া উঠিল। অনেক দেনা হইতে লাগিল, পত্তনী মহালের খাজানার জন্য নালিশ হইতে থাকিল, চাকর-বাকর কর্ম্মে অমনোযোগী হইয়া পড়িল, অনেক গোল উপস্থিত হইতে লাগিল।

একটা বিষয় হরিচরণ কিন্তু ঠিক চালাইতে লাগিল। শ্যামলাল বাবুর সুরা, রঙ্গরসের অন্যান্য উপকরণ, মোসাহেবদের খরচ, হরিচরণ অব্যাঘাতে সুন্দররূপ যোগাইতে থাকিল। বরং প্রয়োজনের পূর্ব্বে আবশ্যকের অনেক আগে শ্যামলালের পদার্থপুঞ্জ সংগৃহীত ও সমানীত হইতে লাগিল।

চারিদিকে যাহাই হউক, শ্যামলাল কিন্তু হরি-চরণের কার্য্য-তৎপরতায় নিতান্ত সন্তুষ্ট। বৃদ্ধ হর-কুমারের পরিবর্ত্তে এই বুদ্ধিমান ও কর্ম্মজ্ঞানসম্পন্ন যোগ্যতর ব্যক্তি কর্ম্মভার গ্রহণ করার পর হইতে শ্যামলাল সর্ব্বতোভাবে সুখী হইয়াছেন। হরিচরণ যাহা বলিয়াছিল, তাহা প্রায় সমাপিত করিয়াছে। সে নিত্য অনেক দুলে-বাগ্‌দীর কন্যা নানা স্থান হইতে আনাইয়া শ্যামলালের নিকট হাজির করিতেছে।

বিধুমুখীর সহিত হরিচরণের ঘনিষ্ঠতার এক আধটু কথা শ্যামলাল শুনিয়াছিল সত্য; কিন্তু সে তাহা বিশ্বাস করে নাই। হরিচরণ তাহাকে বুঝাইয়াছে, বাবুর কাজ তাহার দ্বারা ভাল চলিতেছে এবং বাবু তাহার উপর বিশেষ দয়া করিয়া থাকেন, এই হিংসায় অনেকে তাহার শত্রু হওয়া সম্ভব এবং অনেকে বাবুর মন ভারি করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ ঘটাইবার নিমিত্ত নানা প্রকার মিথ্যা কুৎসা প্রচার করাও সম্ভব। আর বিষয়কর্ম্ম রীতিমত চালাইতে হইলে অনেকেরই সহিত পদে পদে শত্রুতা ঘটে। সে সকল লোক নানা প্রকারে তাহাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিবেই করিবে। সুতরাং বাবুর কর্ণে তাহার সম্বন্ধে নিতান্ত ক্রোধজনক নিন্দার

অনেক কথাই প্রবেশ করিবে। বাবু বুদ্ধিমানের চূড়ামণি; স্বার্থপর ধূর্ত্তেরা যে তাঁহার কাছে আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া হরিচরণের সর্ব্বনাশ ঘটাইতে পারিবে, এ বিশ্বাস নাই। তবে তাহার অদৃষ্ট। শ্যামলাল এ সকল কথা বড়ই সঙ্গত বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং দৈবাৎ যে ব্যক্তি হরিচরণের বিপক্ষে কোন কথা বলিয়াছে, তাহাকেই দণ্ড দিয়াছেন, সুতরাং হরিচরণ নিষ্কণ্টক।

হরিচরণ নিরন্তর শ্যামলালের চারিদিকে আপনার মনোনীত ও পক্ষপাতী মোসাহেব লাগাইয়া রাখিয়াছে। তাহারা নিরন্তর হরিচরণের অসংখ্য গুণেরই কীর্ত্তন করে, দোষমাত্রই দেখিতে পায় না বা দেখাইবার সুযোগও উপস্থিত হইতে দেয় না। সেই সুকৌশলী পারিষদ্‌গণ শ্যামলালকে সর্ব্বতোভাবে হরিচরণের গুণমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

একটা কাজ হরিচরণ এখনও করিয়া উঠিতে পারে নাই। সুহাসিনী যেখানেই থাকুক, সে ধরিয়া আনিবে বলিয়াছিল। কিন্তু এখনও তাহা ঘটে নাই। শ্যামলালের সর্ব্বদা সে কথা মনে পড়ে না; কখন মনে পড়িলে, হরিচরণ শীঘ্রই বাসনা সিদ্ধ করিবে, সে কথা সর্ব্বদা তাহার মনে জাগিতেছে, ইত্যাদিরূপ আশ্বাস দিয়া শ্যামলালকে নিরস্ত করিয়া থাকে।

প্রভুর পরম বিশ্বাসভাজন, প্রভুপত্নীর হৃদয়বল্লভ হরিচরণ মধ্যাহ্নকালে বিধুমুখীর মহলে প্রবেশ করিলেন। বিধুমুখী তখন পর্য্যঙ্কের উপর শয়ন করিয়া গাঢ়-নিদ্রায় নিমগ্না। হরিচরণ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ না করাইয়া ধীরে ধীরে নিঃশব্দে বারান্দায় আগমন করিল। সে তথায় দাঁড়াইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল,—"যে ব্যক্তি একবার সুহাসিনীকে দেখিয়াছে, সে-ই মরিয়াছে। মেয়েমানুষ তো বলি তাকেই। তাহাকে হস্তগত করিতে পারি, তবেই জীবন সার্থক। সন্ধান করিয়াছি, লোক লাগাইয়াছি, কৌশলে কাজ শেষ করিতে হইবে। কোনই ত্রুটি হইবে না। দোষ সকলই শ্যামলালের ঘাড়ে চাপাইব। কিন্তু সে জিনিস হস্তগত হইলে শ্যামলালকে কখনই দিব না। এখন বাসনা সিদ্ধ হইলে হয়।" কিয়ৎক্ষণ পরে সে আবার বলিল—"বিধুমুখী সুন্দরী বটে, কিন্তু আর ভাল লাগে না। হাতে থাকায় সর্ব্বপ্রকার সুবিধা আছে সন্দেহ নাই; সুতরাং হাতে রাখিতে হইবে। কিন্তু এমন করিয়া এক জনের গোলাম হইয়া থাকা আমার অসাধ্য। ধন, পদ, ক্ষমতা সকলই এখন আমার যথেষ্ট। ইহার যদি ইচ্ছামত ভোগ না হইল, তবে সকলই বৃথা।"

হরিচরণ-পশু যখন এইরূপ চিন্তামগ্ন, তখন হাসিতে হাসিতে সারদা তথায় আসিয়া বলিল,—"এ কি, দেওয়ানজী মহাশয় যে! এখানে একা দাঁড়াইয়া?"

দেওয়ানজী বলিলেন,—"সারদা, তোকে দেখিয়া দেখিয়া আমি আর পারি না। তুই কি মানুষ খুন করিয়া ফাঁসী যাইবি?"

সারদা হাসির সহিত মিশাইয়া মিশাইয়া বলিল,—"আমরা গরীব দুঃখী চাকরাণী। বাবুর চক্ষু এ দিকে আসে কেন? আমি বউ-দিদিকে সব ব'লে দিব!"

হরিচরণ বলিলেন,—"তা যা হয় হবে। এখন তোর জ্বালায় কি বিরাগী হব?"

সারদা বলিল,—"বালাই! সাধের পাতান হাট, কে লুটে নেবে। তা গরীবকে এত ঠাট্টা কেন? না হয় আমিই আর এ দেশে থাকিব না।"

সারদা এক কটাক্ষ-শরে হরিচরণকে বিদ্ধ করিয়া চলিয়া গেল। হরিচরণও তাহার অনুসরণ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জাল।

সন্ধ্যার পর শ্যামলাল বাবু স্বকীয় সৌধের দক্ষিণ-প্রবাহী বারান্দায় বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে কিঞ্চিৎ দূরে অন্যান্য চেয়ারে আরও দুই তিন জন পারিষদ বসিয়া তাঁহার সেই বিকটদর্শন কলেবরে কন্দর্পকান্তির আরোপ করিতেছে, তাঁহার সেই কর্কশ-কণ্ঠে কোকিল-ঝঙ্কারের আবির্ভাব করাইতেছে, সেই কাণ্ডজ্ঞানহীন মস্তিষ্কে শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধির সমাবেশ করাইতেছে, তাঁহার সেই হৃদয়হীন কার্য্যাবলীতে যুধিষ্ঠিরের ব্যবহার সন্দর্শন করিতেছে এবং তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারে আদর্শপুরুষরূপে পরিকীর্ত্তিত করিতেছে। শ্যামলাল আনন্দের অট্টহাসি হাসিতেছেন এবং প্রীত-মনে সেই চরিত্র-হীন স্তাবকগণের বাক্য-সুধা পান করিতে করিতে তাহাদিগকে বিচক্ষণগণের অগ্রগণ্য মনে করিয়া আপনাকে পরম ভাগ্যবান্ বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন।

রামা এ ক্ষেত্রে উপস্থিত আছে এবং সোডাওয়াটার-বিমিশ্রিত হুইস্কি ঘন ঘন সরবরাহ করিতেছে। সুরা স্বকীয়-কার্য্য-সাধনে আলস্যশূন্য। দেহ, মস্তিষ্ক, বাক্য সকলই তাহার প্রভাবে জড়তাপূর্ণ হইয়া আসিতেছে।

এইরূপ সময়ে মণি-কাঞ্চন-সংযোগ সংঘটিত হইল। কারণ, শ্যামলাল বাবুর দেওয়ান হরিচরণ তথায় দর্শন দিলেন। শ্যামলাল তাঁহাকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন,—"কাজের কোন কথা যদি বলিতে আসিয়া থাক, তাহা হইলে এখন তাহা থাকিতে দেও। এখন আমার সে সকল কিছু ভাবিবার সময় নাই। যদি কিঞ্চিৎ হুইস্কি সেবন করিতে চাও, তাহা হইলে আইস।"

এক জন পারিষদ বলিয়া উঠিল,—"হুজুরকে কাজের জন্য যখন তখন ত্যক্ত করিবার কোনই দরকার নাই। আপনার ন্যায় উপযুক্ত লোকের হস্তে যখন তিনি সমস্ত ভার দিয়া রাখিয়াছেন, তখন সে জন্য বার বার হুজুরকে বিরক্ত করিবার প্রয়োজনই বা কি?"

সাধু হরিচরণ বলিলেন,—"আমার প্রতি হুজুরের দয়ার সীমা নাই; আমিও সাধ্যমত হুজুরের কাজে অবহেলা করি না। সরকারী কাজের জন্য প্রাণ দিতে হইলে আমি তাতেও প্রস্তুত। তবে কি জান, হাজার হউক আমি চাকর। কোন কোন বিষয়ে বাবুর পরামর্শ লওয়া আমার পক্ষে নিতান্তই দরকার হইয়া পড়ে। সেই জন্যই সময়ে সময়ে বাবুকে ত্যক্ত না করিলে চলে না।"

আর এক জন পারিষদ বলিল,—"তা তো বটেই। হুজুরের যেরূপ সূক্ষ্ম বুদ্ধি, এরূপ আর দ্বিতীয় নাই; সুতরাং গোলমালের ব্যাপার উপস্থিত হইলে হাজার উপযুক্ত লোক হইলেও দেওয়ানজীকে হুজুরের সহিত পরামর্শ করিতেই হয়।"

উভয়প্রকার বাদানুবাদ শ্রবণ করিয়া শ্যামলাল আনন্দিত হইলেন। বলিলেন,—"এখন তুমি কি জানিতে চাহ, বল। বেশীক্ষণ বিষয়-কর্ম্ম ভাবিবার আমার সময় নাই, এ কথা আমি আগেই বলিয়া রাখিতেছি।"

হরিচরণ বলিলেন,—"বড় কঠিন বিষয়ে হুজুরের পরামর্শ লইতে আসিয়াছি। সংবাদ মন্দ; হাই-কোর্টের আপীলে সোনার চরের মোকদ্দমায় আমাদের হারি হইয়াছে। সুদে ওয়াসিলাতে, দাবীতে এবং খরচায় আমরা প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার দায়ী হইয়া পড়িয়াছি।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"কুচ্ পরওয়া নাই; ফের আপীল কর।"

হরিচরণ বলিলেন,—"তাহার উপায় নাই। আমি উকীলের সহিত পরামর্শে জানিয়াছি, এ মোকদ্দমা বিলাত-আপীল চলিবে না।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"তা হইলে ডাকাইত লাগাইয়া বাদী বেটাদের খুন করিয়া ফেল।"

হরিচরণ বলিলেন,—"তাতেই বা উপকার কি? দুই চারি জনকে খুন করিলেও তো সব শেষ হইবে না। যে কেহ উত্তরাধিকারী খাড়া হইবে, সে-ই ডিক্রীজারি করিয়া সব টাকা আদায় করিবে।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"তখন দেখা যাইবে।"

হরিচরণ বলিলেন,—"আমার কিন্তু ইচ্ছা, বেটাদের কখন কিছু না দেওয়া। বেটারা যাহাতে কোনমতেই এক পয়সাও না পায়, তাহাই আমার মতলব।"

শ্যামলাল সমুৎসাহে বলিলেন,—"বটে! এমন কোন উপায় হইতে পারে কি? তাহা হইলে তো বড়ই ভাল হয়। এ মত্‌লবে আমাকে যাহা করিতে বলিবে, আমি তাহাতে রাজি আছি।"

হরিচরণ বলিলেন,—"মত্‌লব যে নাই, এমন নহে। তবে হুজুরের বুদ্ধির কাছে কেহই কল্কে পান না। হুজুর যদি বুঝিয়া শুঝিয়া সে মন্ত্রণা ভাল বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে করা যাইতে পারে।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"বল দেখি, কি তোমার পরামর্শ?"

হরিচরণ বলিলেন,—"আর কিছুই নয়, সমস্ত বিষয়টা এই সময়ে বেনামী করিয়া রাখা। তাহা হইলে ডিক্রীদার এক দম ফাঁকে পড়িলেন।"

এক জন পারিষদ বলিল,—"সাবাস! সাবাস! আচ্ছা মত্‌লব এঁটেছ।"

আর এক জন বলিল,—"যেমন রাজা, তাঁর তেমনই মন্ত্রী, নহিলে কি আর রাজ্য চলে দাদা?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"মন্ত্রণা করেছ মন্দ নয়, কিন্তু কার নামেই বা বেনামী করা যায়?"

হরিচরণ বলিলেন,—"কেন? আপনার স্ত্রী। এতে কোন দিকেই কোন গোল হওয়ার সম্ভাবনা নাই। আপনার ধনে তাঁর অধিকার, তাঁর ধনেও আপনার অধিকার। লোকেও কোন কথা বল্‌তে পার্‌বে না। স্ত্রীর হাতে স্বামীর ধন থাকাই সুব্যবস্থা। তাতে ঘরের বিষয় ঘরেই থাক্‌ল, অথচ ডিক্রীদার বেটাদের সকল আশায় ছাই পড়্‌ল।"

এক জন পারিষদ বলিল,—"মন্ত্রণা যাকে বল্‌তে হয়! স্ত্রীর নামে বিষয় হ'লে সম্পূর্ণরূপে স্বামীরই থাক্‌ল। স্বামী কর্ত্তা, মালিক; তাঁর উপরে স্ত্রীর কোনই জোর খাট্‌বে না। স্বামীর যা ইচ্ছা, তাই হবে; মাঝামাঝি বিষয়টা পাকা হয়ে থাক্‌ল। কেহ কখন আর কোন প্রকারে অনিষ্ট কর্ত্তে পার্‌বে না।"

হরিচরণ বলিলেন,—"এই ডিক্রীটা বলেই যে কেবল কথা, এমনও নহে তো। বিষয়ী লোকের পাঁচটা ঝঞ্ঝাট পাঁচ সময়ে জুটেও থাকে, জুট্‌তেও পারে। এই এক চাল চেলে রাখ্‌লে সকল দায় থেকেই নিশ্চিন্ত।"

এক জন পারিষদ বলিল,—"ঠিক্, ঠিক! খুব মৎলব দেওয়ানজী মহাশয়।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"তা কথাটা বলেছ মন্দ নয়! কিন্তু আমার স্ত্রী এ বিষয়ে রাজি হবে তো?"

হরিচরণ বলিলেন,—"কেন হবেন না? এতে তাঁর তো কোনই ক্ষতি নাই। বরং হুজুরের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে এ উপলক্ষে দেখাসাক্ষাৎ, কথাবার্ত্তা হবে; এও তাঁর একটা প্রকাণ্ড লাভ।"

এক জন পারিষদ বলিলেন,—"গিন্নী ঠাকরুণ যেরূপ সতী-সাবিত্রী, তাতে স্বামীর বিষয়কর্ম্মে মিশ্‌লে এক একবার স্বামীর চরণ দেখ্‌তে পাবেন, এও তাঁর কম সৌভাগ্য নয়।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"কিন্তু দেখো ভাই, পুনঃ পুনঃ গিন্নীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়ে, শেষটা আমার আমোদ-আহ্লাদের পথটা যেন বন্ধ না হয়।"

হরিচরণ বলিলেন,—"রাধাকৃষ্ণ! তা কেন হবে? তা বন্ধ কর্‌তে তাঁর এক্তার কি?"

এক জন পারিষদ বলিল,—"হুজুর রসের সাগর, রসিকের চূড়ামণি। এরূপ গুণবান্ স্বামীর পত্নী হওয়া অনেক পুণ্যসাপেক্ষ। গিন্নী মা-ঠাকরুণ হুজুরের নানা ফুলে ভ্রমণ কখনই বন্ধ কর্‌তে পারবেন না, কর্‌বেনও না।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"তবে তো দেখ্‌ছি তার সঙ্গে আলাপ কর্‌তে হবে। শুনেছি, সে না কি সুন্দরী। তা হউক, তা ব'লে যেন তোমরা দশ জনে মিলে আমাকে শেষে ঘরের কোণে বেঁধে দিও না।"

এক জন পারিষদ বলিল,—"তা আমরা কখনই হ'তে দিব না। আরে ছিঃ! সে রকম কুণো বেঙ হওয়া কি হুজুরের মত লোকের শোভা পায়?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"তবে যা হয় কর হরিচরণ, এর জন্য আর আমাকে জিজ্ঞাসা কেন? যা ভাল হয় কর্‌বে—বলা কওয়ার কোন অপেক্ষা নাই। এখন যাও, তোমার কাজ দেখ গে—আমাদের একটু আয়েস কর্‌তে দেও।"

'যে আজ্ঞা' বলিয়া হরিচরণ প্রস্থান করিল।

পরদিন প্রাতে রীতিমত ষ্ট্যাম্পের উপর লিখিত এক দলিল আনিয়া হরিচরণ উল্লিখিত পারিষদ্‌গণের সমক্ষে শ্যামলাল বাবুর সহি করাইয়া লইল। পারিষদগণ তাহাতে সাক্ষিরূপে স্বাক্ষর করিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই দলিল রেজিষ্টারি হইয়া গেল। শ্যামলাল বাবুর প্রভূত সম্পত্তি অতঃপর তাঁহার পত্নীর হইল।

ষষ্ঠ খণ্ড—ক্রমোৎকর্ষ

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাথার।

বিলাসপুরের প্রায় তিন ক্রোশ দক্ষিণে চণ্ডীতলা গণ্ডগ্রাম! গ্রামখানি নিতান্ত সামান্য। মোটে পঁচিশ ত্রিশ ঘর লোকের বাস। দুই ঘর ব্রাহ্মণ, অবশিষ্ট গৃহস্থেরা নানাজাতিতে বিভক্ত। সকলেরই কৃষিকার্য্য প্রধান অবলম্বন এবং দুই একটি ধানের গোলা ও গোশালা প্রতি গৃহেই বর্ত্তমান। গ্রামে একখানিও পাকা-বাড়ী নাই; সকলই খড়ের ঘর; কিন্তু বড়ই পরিচ্ছন্ন। প্রত্যেকের প্রশস্ত অঙ্গন অতীব পরিষ্কারভাবে সংরক্ষিত। গৃহস্থগণের বাসভবন পরস্পর ঘেঁসাঘেঁসি নয়।

এই গ্রামের এক পার্শ্বে রামহরি কৈবর্ত্তের বাস। রামহরির তিনখানি খড়ের ঘর, একটু বাগান, দুইটি গোলা, দুইখানি লাঙ্গল, পাঁচটি বলদ এবং দুগ্ধবতী গাভী আছে। তাহার ক্ষেতসকল বাটী হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে। সে প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়াই লাঙ্গলগরু লইয়া ক্ষেতে যায়; বেলা দুই তিনটার সময় ফিরিয়া আসিয়া স্নানাহার করে। আবশ্যক থাকিলে আবার ক্ষেতে গিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাটাইয়া আইসে, নচেৎ বাড়ীতে থাকিয়া বাগানের বেড়া বাঁধে, পাটের দড়ি কাটে, ইত্যাকার গৃহ-কর্ম্ম লইয়া ব্যাপৃত থাকে।

রামহরির বাসবাটীর প্রান্তবর্ত্তী একখানি ঘর হইতে বেলা দ্বিপ্রহরকালে এক সুন্দরী কামিনী নির্গতা হইলেন এবং অঙ্গনের এক পার্শ্বে আসিয়া হস্ত-মুখাদি

প্রক্ষালন করিতে লাগিলেন। অপর একখানি ঘর হইতে আর এক নারী এক বাটি দুধ লইয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিল এবং সুন্দরীকে মুখপ্রক্ষালনে নিযুক্ত দেখিয়া বলিল,—"কি আক্কেল তোমার গঙ্গা ঠাকরুণ! আমি তোমার জন্য দুধ আন্‌তে গিয়েছি, এরি মধ্যে উঠে পড়েছ?"

গঙ্গা ঠাকরুণ মুখ ধৌত করিয়া বলিলেন,—"এ গঙ্গায় দুধই ঢাল, আর জলই ঢাল, সকলই সমান কথা। তা কেন ভাই যমুনা! দুধটুকু নষ্ট করবে?"

বলা বাহুল্য, এই দুই রমণী আমাদের পূর্ব্বপরিচিতা সুহাসিনী ও দাসী। প্রথম সাক্ষাতের দিন হইতেই ইহারা গঙ্গা-যমুনা সম্বন্ধ করিয়াছেন এবং তদবধি এ পর্য্যন্ত পরস্পরকে সেই সম্ভাষণই করিয়া আসিতেছেন। কৈবর্ত্ত-কামিনী দাসী, ব্রাহ্মণ-নন্দিনী সুহাসিনীকে স্বকীয় আবাসে আনয়ন করিয়া বড়ই যত্নে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। সুহাসিনীর জন্য স্বতন্ত্র ঘর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। সুহাসিনী তথায় স্ব-হস্তে পাক করিয়া আহার করেন; দাসী সমস্ত আয়োজন করিয়া দেয় এবং সহোদরার ন্যায় যত্নে তাঁহাকে সুখী করিবার চেষ্টা করে। দাসী রাত্রিতে সুহাসিনীর গৃহে শয়ন করে এবং তাঁহাকে বিনোদিত করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করে। দাসীর স্বামী রামহরি কৈবর্ত্ত কদাপি লজ্জাশীলা সুহাসিনীর ঘরের দিকেও আইসে না। প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় দূর হইতে উচ্চ শব্দ করিয়া সুহাসিনীকে প্রণাম করে এবং সুহাসিনীর প্রয়োজনে, আপনার শতকর্ম্ম ক্ষতি করিয়াও সময় ও অর্থ ব্যয়িত করে। সুহাসিনী দৈবাৎ কোন কঠোর গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছেন বুঝিতে পারিলে, রামহরি আপনার স্ত্রীকে অনুযোগ করে এবং সেই ব্রাহ্মণ-কন্যার পদধূলিপ্রাপ্তি হেতু আপনাদিগকে ধন্য ও চরিতার্থ বলিয়া জ্ঞান করে।

যদি চিত্ত-প্রসন্নতার কোনই সম্ভবনা থাকিত, তাহা হইলে সুহাসিনী তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থায় অবশ্যই প্রসন্না হইতেন। কিন্তু হায়! যাহার গৃহে ফিরিবার আশা নাই, পতি-পদ-সেবার সম্ভাবনা নাই, সমাজে স্থান পাইবার উপায় নাই, লোকাপবাদের হস্ত হইতে অব্যাহতি-লাভের পন্থা নাই, তাহার জীবনে আর আছে কি? নিরপরাধী হইলেও সুহাসিনী অপরাধী, নিষ্পাপ হইলেও পাপীয়সী, পুণ্যময়ী হইলেও অপবিত্রা, সতীত্বস্বরূপা হইলেও কুলটা। কি ভয়ানক! কি বিসদৃশ অবস্থা! তাই সুহাসিনীর অধরপ্রান্ত হইতে সেই ভুবনমোহন হাসি শুকাইয়া গিয়াছে, সেই কোমলতাময় বদনে চিন্তার কালিমা পড়িয়াছে, সেই লাবণ্যোজ্জ্বল কলেবর বিশুষ্ক হইয়াছে।

সুহাসিনীর প্রকৃত অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া রামহরি স্বয়ং সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকটে গমন করিয়াছিল এবং সমস্ত কথা তাঁহাকে নিবেদন করিয়া পুত্র-বধূর বিহিত ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিয়াছিল। নিরীহ সমাজ-ভীত সার্ব্বভৌম পুত্রবধূকে নিরপরাধী বলিয়া স্বীকার করিতে সাহস করেন নাই এবং তাঁহার সম্বন্ধে কোন বিহিত উপায়ও অবধারণ করিতে পারেন নাই। তিনি বুঝিয়াছেন, হইতে পারে, সুহাসিনী নিরপরাধা সতী; হইতে পারে শ্যামলালের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিবার বাসনায় গদার সাহায্যে সুহাসিনী স্থানান্তরে পলায়ন করিয়াছেন; কিন্তু বস্তুতঃ শ্যামলালের আক্রমণ অথবা গদার সহিত পলায়ন এতদুভয়ই লোকতঃ তুল্য। এই পলায়ন-ব্যাপার প্রচার করিলে শত্রু-মিত্র কেহই তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে না। কেবল অধিকতর অপবাদ ঘটিবে। এইরূপ অনেক যুক্তির বশবর্ত্তী হইয়া সার্ব্বভৌম পুত্র-বধূর পুনর্গ্রহণ সম্বন্ধে কিছুই অবধারণ করিতে পারেন নাই এবং তদ্বিষয়ে কোনই আশ্বাসবাক্যও বলিতে পারেন নাই।

রামহরি প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সকল সংবাদ সুহাসিনীর গোচর করিয়াছে এবং ইহাও বলিয়াছে যে, এখনও সে হতাশ হয় নাই। অদ্য আবার এক নূতন কল্পনায় অতি প্রত্যূষে সে গৃহত্যাগ করিয়াছে।

সুহাসিনীর আহারের আয়োজন হইয়াছে দেখিয়া দাসী দুধ আনিতে গিয়াছিল, সুহাসিনী নামমাত্র আহার করেন; সুতরাং বসিতে বসিতেই ভোজন-সমাপ্তি হইয়া গেল। দাসীর দুধের বাটি হাতেই রহিল।

এ স্থলে সুন্দরী পাঠিকাকুল ও কবিতাগতপ্রাণ পাঠকগণ বড়ই বিরক্ত হইয়া এই গ্রন্থকে কু-কাব্য বিবেচনায় দূরে নিক্ষেপ করিতে পারেন! তাঁহারা বলিতে পারেন যে, সুহাসিনীর ন্যায় কুন্দ-কলিকা কাব্যনায়িকার অন্ন-ব্যঞ্জন স্বহস্তে পাক করিয়া বদন-ব্যাদান পূর্ব্বক দন্তে দন্তে চর্ব্বণ করিতে করিতে তৎসমস্ত পদার্থ উদরস্থকরণরূপ বীভৎস ব্যাপার নিরতিশয় ঘৃণাজনক, ধিক্কারজনক এবং গ্রন্থকারের একান্ত কু-রুচির পরিচায়ক। সুহাসিনীর আহার! অহো! কি ঘৃণিত! কি নিন্দনীয় কল্পনা! যাহার এত রূপ, এমন মধুর হাসি, এমন কোমলতা, সে আবার পাক করে! শুধু পাক করে না, পাক করিয়া আবার খায়! ছি! ছি!! ভোজন-ব্যাপারটাই একটা

বীভৎস কাণ্ড। সুহাসিনীর ন্যায় কোমলপ্রাণা কামিনীর উপর সেই বীভৎস কাণ্ডের আরোপ নিরতিশয় হৃদয়হীন ব্যবহার। সুহাসিনীর না খাইয়াই বাঁচিয়া থাকা সম্পূর্ণরূপ সুসঙ্গত ও কবি-কল্পনার অনুমোদিত। আরও অনেক কাব্য, উপন্যাস আছে। বল দেখি, কোথায় কোন্ নায়িকা ভোজন করিয়াছে? কাব্যে কোমলপ্রাণা নায়িকার ভোজন করিতে নাই। তিনি আদৌ আহার না করিয়া স্বচ্ছন্দরূপে প্রেমালাপ, দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ, প্রেমিকের চিন্তা, উদ্যানবিহার, সরসী-জলে সন্তরণ, উপন্যাস পাঠ, স্বপ্নদর্শন, রোদন সকলই করিতে পারেন; আবশ্যক হইলে অশ্বারোহণ বা অসিধারণ করিয়া দেশোদ্ধার করিলেও করিতে পারেন; কিন্তু কুত্রাপি আহারের কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই। তবে যদি নিতান্তই নায়িকাকে কিছু আহার করাইতেই হয়, তাহা হইলে একটু একটু মধুর মধুর মলয়-মারুত-মাখান পূর্ণিমার চাঁদের জোৎস্না দেওয়া যাইতে পারে; অথবা মল্লিকা-ফুলের গন্ধে ভাজিয়া বসন্ত কোকিলের একটু পঞ্চম তান আহারের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে; অথবা প্রাতঃসূর্য্যের মধুর আলোক-সিক্ত দূরাগত বংশীধ্বনি ভোজন করিতে দেওয়াতেও হানি নাই। কিন্তু অন্নব্যঞ্জন—আবার দুধ—নায়িকাকে আহার করিতে! রাধা-কৃষ্ণ!

বাস্তবিক কবি-জনোচিত ব্যবহার-পরিভ্রষ্ট হইয়া আমরা অপরাধী হইয়াছি সত্য; কিন্তু যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার আর হাত নাই।

সুহাসিনী আপনার ঘরে প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দাসী দুধের বাটি লইয়া তাঁহার অনুসরণ করিল এবং বলিল,—"এখন এই দুধটুকু খাও দিদি!"

গঙ্গা বলিলেন,—"যাহা খাইয়াছি, তাহারই দাম নাই। আবার দুধ কেন? এইটুকু যমুনার জলে ঢেলে দেও।"

যমুনা বলিলেন,—"যমুনার কালো জলে সাদা দুধ মিশ খাবে না; গঙ্গায় ঢাল দিদি, দুধে দুধ মিশ্‌বে ভাল।"

গঙ্গা বলিলেন,—"এ কলিকালের গঙ্গায় কিছুই মিশে না বহিন! মিশ খাওয়া জিনিসও তফাৎ হয়ে যায়, নূতন জিনিসের তো কথাই নাই।"

যমুনা বলিলেন,—"যে মিশিয়াছে, সে আপনাকে হারিয়েছে। সে কি আর আলাহিদা হয় বহিন্?"

গঙ্গা বলিলেন,—"তবে আমার প্রাণের মেশা সামগ্রীকে পাই না কেন?"

যমুনা বলিলেন,—"কোথায় পাও না? প্রাণে না বাহিরে?"

গঙ্গা বলিলেন,—"বাহিরে।"

যমুনা বলিলেন,—"প্রাণে পাও ত?"

গঙ্গা বলিলেন,—"সর্ব্বদা।"

যমুনা বলিলেন,—"তবে তো তুমি রাজ-রাজেশ্বরী! কাজ কি ছার বাহির খুঁজিয়া। এখন এই দুধটুকু খাও দেখি সোনামণি।"

অগত্যা সুহাসিনী দাসীর হস্ত হইতে দুধের বাটি লইয়া ধীরে ধীরে পান করিতে লাগিলেন।

আরে ছ্যাঃ! ছুঁড়ীটার কোনই কাণ্ডজ্ঞান নাই! অনায়াসে চক্ চক্ করিয়া এক খোরা দুধ গিল্‌লে গা!

দাসী সুহাসিনীকে উঠিতে না দিয়া, তাঁহার ভোজনাবশেষ সমস্ত তুলিয়া লইয়া স্থানটি গোময়াদি সহযোগে পরিষ্কার করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আশা।

"রামে রাম—রাম, রামে রাম—রাম, রামে রাম—দুই, দুইয়ে রাম—দুই, দুইয়ে রাম—তিন, দুইয়ে রাম তিন, তিনে রাম চারি।" ইত্যাদি ক্রমে রামহরি ধান মাপিতেছে। তাহার সুবিস্তৃত অঙ্গনের একদেশে স্তূপাকার ধান ঢালা রহিয়াছে; রামহরি তাহা গোলা-জাত করিবার পূর্ব্বে মাপ করিয়া দেখিতেছে।

রামহরি লোকটা বড় লম্বা-চওড়া নহে। কৃষ্ণকায়—বলিষ্ঠ গঠন—দেহটি নাতিস্থূল, নাতি-কৃশ। বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ। দেহের বর্ণ ঘনকৃষ্ণ। মাথার চুলগুলি ছোট করিয়া কাটা, ওষ্ঠের উপর প্রকাণ্ড একযোড়া গোঁপ, দাড়ি কামান। তাহার পরিধান-বস্ত্র জানুপ্রদেশ ছাড়াইয়া নামে না। মাথায় একখানা গামছা জড়ান।

রামহরি চাষা বিপুল পরিশ্রম সহকারে সেই রাশীকৃত ধান্য মাপিয়া ফেলিল এবং তদধিক পরিশ্রম সহকারে ধামায় করিয়া গোলায় তুলিল। তাহার পর মাথার গামছা খুলিয়া দেহের ধূলা ঝাড়িল এবং ঘরের দাওয়ায় উঠিয়া চক্‌মকি ঠুকিয়া কয়লা ধরাইল এবং তামাক সাজিয়া তদ্গতচিত্তে ভড়র ভড়র শব্দে ধূমপান করিতে লাগিল।

রামহরি চাষা; সে নাড়া-চাড়া করে ধান। এরূপ লোকের ও এরূপ ব্যবসায়ের প্রসঙ্গ বর্ণন করিতে গ্রন্থের স্থান ব্যয় করা উচিত কি না, ইহা

বাস্তবিক বিবেচ্য বিষয়। প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে, রামহরি উলঙ্গ। তাহার পরিধান-বস্ত্র নিতান্ত সঙ্কীর্ণ, গায়ে জামা নাই, পায়ে জুতা নাই; এরূপ লোককে উলঙ্গ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? তার পর সে ব্যক্তি কৃষিজীবী অর্থাৎ চাষা। সুতরাং স্বহস্তে লাঙ্গল ঠেলে, বলীবর্দ্দের পুচ্ছ মর্দ্দন করে, কঠোর শারীরিক পরিশ্রম সম্পাদন করে এবং শীত-বাতাতপ সহ্য করে: অতএব ছোট লোক। তার পর সে ব্যক্তি অসভ্য; কারণ, সে উলঙ্গ; অপিচ, সে পরোপকারী। অধিকন্তু সে আত্মসুখে অমনোযোগী। তার পর সে মূর্খ, সে ইংরাজী জানে না, খবরের কাগজ পড়ে না, ঔপন্যাসিক প্রণয়ের ধার ধারে না, বক্তৃতা করিতে বা শুনিতেও জানে না। বাস্তবিকই এরূপ অধম জনের বিষয় গ্রন্থের বর্ণনীয় না হওয়াই উচিত। তাহাও যাহা হউক, সঙ্গে আবার ধানের কথা। ধান যদিও রূপান্তরিত হইয়া ভদ্রলোকের উদরস্থ হয় বটে, কিন্তু তাহার জন্মপ্রণালী কখনই ভদ্রের জ্ঞাতব্য নহে। শুনা যায়, ধান্য লতিকা ভূ-পৃষ্ঠ বিদার করিয়া উত্থিত হয় এবং সেই লতিকা হইতে যে ফল জন্মে, তাহাই রূপান্তরিত হইয়া তণ্ডুলাকারে পরিণত হয়। সেই তণ্ডুল ভারতবর্ষেয় প্রধান ভক্ষ্য সামগ্রী: কিন্তু তাই বলিয়া ধান্যের প্রসঙ্গ ভদ্রলোকের আলোচনা করিবার কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না; জগদীশ্বর তাহা ভাবিবার জন্য কৃষক নামক নিকৃষ্ট শ্রেণীর এক প্রকার জীব সৃষ্টি করিয়াছেন; এ কার্য্যে তাহারাই নিযুক্ত আছে। সুতরাং রামহরি বা তাহার অবলম্বিত ধান্যের প্রসঙ্গ গ্রন্থমধ্যে এরূপভাবে আলোচিত হওয়া কখনই উচিত নহে। এ স্থলে কেহ কেহ এরূপ আপত্তি করিতে পারেন যে, ধান্য বা কৃষক নিতান্ত ঘৃণিত পদার্থ বোধে উপেক্ষিত হইবার যোগ্য নহে। কেন না, যদি কোন বৎসর কৃষকের চেষ্টা নিষ্ফল হয় এবং ধান্য না জন্মে, তাহা হইলে অন্নাভাবে দেশে হাহাকার উত্থিত হয় এবং অনেকেই যমালয়ে গমন করে। কংগ্রেসের অনেক চেষ্টাই ক্রমাগত নিষ্ফল হইতেছে, তাহাতে দেশের বিশেষ কোন সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে বলিয়া বোধ হয় না। সমস্ত মিউনিসি-প্যালিটী ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড বিফল-প্রযত্ন হইয়া এক দিনে উঠিয়া গেলেও ভারতের বিশেষ অসুবিধা হইবে, এরূপ অনুমান হয় না। যাহা যাহা হিতানুষ্ঠান ও শুভানুষ্ঠান বলিয়া পরিগণিত, তাহার ভূরিভাগই বিফল, সেই সকল অনুষ্ঠান যদি উঠিয়া যায়, তাহা হইলে কাল্পনিক ক্ষতি ভিন্ন প্রকৃত কোন ক্ষতি উপলব্ধ হয় না। কিন্তু কৃষকের যত্ন, উদ্যম, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা যদি ফল-প্রসূ না হয়, তাহা হইলে দেশের প্রত্যক্ষ ও পরিদৃশ্যমান দুর্দ্দশার সীমা থাকে না: নিদারুণ দুর্ভিক্ষ বদনব্যাদান করিয়া সকলকেই গ্রাস করিতে আইসে; হাহাকার রবে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত হয় এবং যমদূতেরা রাশি রাশি মানবকে গ্রহণ করিয়া পলায়ন করে। অতএব ধান্য ও কৃষক উপেক্ষার বিষয় নহে। এই আপত্তির উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, দুর্ভিক্ষ হয় বলিয়া ইতর ব্যবসায় ও অসভ্য কৃষককে আমরা কখনও সম্মানের চক্ষে দর্শন করিতে বাধ্য নহি। সত্য বটে, দুর্ভিক্ষ হইলে দেশহিতৈষিতার অনুরোধে আমরা চীৎকার ধ্বনিতে বসুন্ধরা বিদারিত করিয়া থাকি, কিন্তু সে দেশ-হিতৈষিতা আমাদিগের মুখের কথা-মাত্র, প্রাণে সে পাপ-প্রবৃত্তির অঙ্কমাত্রও আমরা প্রলিপ্ত হইতে দিই না। গবর্ণমেণ্ট স্বার্থানুরোধে সে জন্য ব্যাকুল হন এবং নানা উপায়ে তাহার প্রতীকার করিবার প্রযত্ন করিয়াও থাকেন বটে, কিন্তু আমরা যে সে জন্য চীৎকার করি, সে কেবল কিঞ্চিৎ সম্মানের আশায়। আমরা সে জন্য দুচারি টাকা খরচ করি বটে, সে কেবল গবর্ণমেণ্ট-প্রদত্ত টাইটেলের লোভে। এক পক্ষে বিবেচনা করিতে গেলে দুর্ভিক্ষ অনেকেরই সম্মাননা-লাভ, উপাধি-প্রাপ্তি, নাম জাহির করা ও রাজ-পুরুষগণের সহিত মেশামেশির একটা প্রকৃষ্ট উপায়। সুতরাং এই হিসাবে দুর্ভিক্ষ বড় অমঙ্গলজনকও নহে। অতএব ধান্য ও ধান্য-উৎপাদক কৃষক উভয়কেই ভারত উদ্ধারের শত্রু বলিয়া জ্ঞান করা যাইতে পারে। তাহারা যদি যত্ন করিয়া ধান্য উৎপাদন না করে, তাহা হইলে নিরন্তর দেশহিতৈষী মহাত্মগণের সমক্ষে উল্লিখিতরূপ শুভ সুযোগসমূহ উপস্থিত হয়। সুতরাং এরূপ নিন্দিত প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া গ্রন্থ-কলে-বর বর্দ্ধিত না করাই বিধেয়। কথাটা যে সম্পূর্ণরূপ সত্য, তাহার আর কোনই ভুল নাই। কিন্তু আমাদের কপাল মন্দ, তাই পেটের দায়ে উপন্যাস লিখিতে হয়। উপন্যাস লিখিতে হইলে ছোট বড় সকলই লাগে, কাজেই এই অপরিহার্য্য অপরাধ।

রামহরি বিহিত-বিধানে অনন্যমনে তামাকু সেবন করিল; ঠোঁটের পাশ দিয়া, গোঁফের ফাঁক দিয়া, নাক-মুখের ছিদ্র দিয়া অনেক ধূম সে ত্যাগ করিল। পটমধ্যে চিত্রিত মেঘের ন্যায় চারিদিক্ দিয়া রাশি রাশি তাল-বাঁধা ধূম শূন্যপথে ভাসিতে ভাসিতে মিশিতে লাগিল। ক্রমে ধূমের মাত্রা কমিয়া আসিল। তখন রামহরি বুঝিল যে, তামাকুর

পরমায়ু শেষ হইয়াছে। সে অগত্যা হুঁকা রাখিয়া দিল।

এইরূপ সময়ে দাসী তাহার নিকটস্থ হইয়া বলিল, "কালি হইতে তোমাকে গোঁফ কামাইয়া, সাড়ী পরিয়া বাড়ীর সব কাজ করিতে হইবে, আর বাহিরের যত কাজ সে আমি করিব।"

রামহরি বলিল,—"আমার মত ছোট কাপড় পরিয়া খালি গায়ে, মাথায় গামছা জড়াইয়া পুরুষ সাজিতে হইবে কিন্তু!"

দাসী বলিল,—"ছিঃ! তা কেন?"

রামহরি বলিল,—"তবে আমিই বা মেয়ে সাজিব কেন? আর সাজিই যদি, তাহা হইলে তোমার গঙ্গা ঠাকুরাণী আমাকে যমুনা ভাবিয়া কখনই কাছে ঘেঁসিতে দিবেন না। সুতরাং ব্রাহ্মণ-কন্যার শতেক জ্বালার উপর আবার ঘরের কাজকর্ম্ম পর্য্যন্ত নিজের করিতে হইবে।"

দাসী বলিল,—"এই ব্রাহ্মণ-কন্যার কষ্ট ভাবিয়াই তো তোমাকে মেয়ে সাজাতে চাহি! কয়দিন খোঁজ করিয়া গদা চাঁড়ালের সন্ধান করিতে পারিলে না, তবে তুমি কিসের পুরুষ?"

রামহরি বলিল,—"আজ সন্ধ্যার মধ্যেও যদি গদা না আসে, তাহা হইলে তিন দিন তুমি আমার সঙ্গে আর কথা কহিও না।"

দাসী হাসিয়া বলিল,—"তবে তো তোমার বড়ই ক্ষতি!"

রামহরি বলিল,—"তবে না হয় আমিই কথা কহিব না।"

দাসী বলিল,—"থাকিতে পারিবে তো?"

রামহরি বলিল,—"কপালে যাহা থাকে হইবে। এখন সে কথা যাক্; ব্রাহ্মণ-কন্যার জন্য তোমার এত ভাবনা কিসের? তোমাকে বলি শুন। এই সতী লক্ষ্মীর যাতে ভাল হয়, তা আমাকে কর্‌তেই হবে। এর জন্যে খরচপত্র, পরিশ্রম কিছুতেই আমি পিছ-পা হইব না। বাস্তু-ভিটে, জমি-জমা, গরু, লাঙ্গল, ধান সব বেচিয়া যদি এজন্য তোমার হাত ধরিয়া পথে দাঁড়াইতে হয়, সেও স্বীকার।"

দাসী বলিল,—"আচ্ছা, আচ্ছা! তোমার এই কর্ম্মের কথা শুনে বড়ই খুসী হইয়াছি; তাই আপাততঃ তোমাকে চারটি মুড়ি, আর একটু গুড় বক্‌সিস দিচ্ছি —তুমি খেয়ে জল খাও।"

দাসী প্রস্থান করিল এবং অবিলম্বে প্রায় এক কাঠা মুড়ি, খানিকটা গুড় ও এক ঘটি জল আনিয়া রামহরির সম্মুখে রাখিয়া দিল। রামহরি মুখে হাতে একটু জল দিয়া পরমানন্দে মুড়ি ও গুড় চর্ব্বণ করিতে লাগিল। আমরাও আপাততঃ এই সকল ইতর লোকের বর্ণনায় ক্ষান্ত হইলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আবার।

রামহরি যাহা বলিয়াছিল, তাহা করিয়াছে। গদা চাঁড়াল আসিয়াছে। রামহরি, দাসী ও সুহাসিনী তিন জনে স্থির করিয়াছিলেন যে, সুহাসিনী সম্বন্ধে তাঁহার শ্বশুর ও স্বামীর মনে যে বিরুদ্ধ সন্দেহ জন্মিয়াছে, তাহা অমূলক হইলেও দৃশ্যতঃ অসঙ্গত নহে। এই ভ্রম বিদূরিত করিবার উপায় গদা চাঁড়ালের কথা। গদা চাঁড়াল যদি সমস্ত কথা ব্যক্ত করে ও সকল ঘটনা যথাযথরূপে বুঝাইয়া দেয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সার্ব্বভৌম ও তাঁহার পুত্রের মন হইতে সকল সন্দেহ তিরোহিত হইয়া যাইবে। যে তিন ব্যক্তি মিলিত হইয়া এই মীমাংসা করিয়াছেন, সেই তিন জনই নিতান্ত সাধু-স্বভাব ও সরলপ্রকৃতি। গদার ন্যায় হীনজনের সাক্ষ্যে যে এতাদৃশ কলঙ্ক প্রক্ষালিত হওয়া সম্ভাবিত নহে, ইহা একবারও তাঁহাদিগের মনে হয় নাই। বিশেষতঃ গদা যখন এই ব্যাপারে সংলিপ্ত এবং অপরাধিরূপে পরিগণিত, তখন তাহার সমর্থন-বাক্যের কোনই মূল্য থাকিতে পারে না, ইহা তাহারা একবারও ভাবে নাই। রামহরি বহু আয়াসে গদার সন্ধান করিয়াছে ও তাহাকে আপন গৃহে আনয়ন করিয়াছে। গদা লোকটা অতীব ভয়ানক। অর্থলাভই তাহার জীবনের মূলমন্ত্র। অর্থলাভে সে করিতে না পারে, এমন কর্ম্মই নাই। তাহার প্রার্থনামত অর্থ-প্রদানে সম্মত হইলে অনায়াসে কল্পনাতীত দুষ্ক্রিয়াও সম্পাদিত করিতে সে প্রস্তুত। কার্য্যের পরিমাণ বা বৈধতা বিষয়ে সে সর্ব্বতোভাবে উদাসীন। প্রার্থনানুরূপ অর্থপ্রাপ্তি ও তাহার বিনিময়ে আদেশানুরূপ কার্য্যসম্পাদনমাত্র তাহার সম্বন্ধ। তদনন্তর কার্য্যের ফলাফলের সহিত সে সম্বন্ধশূন্য।

সুহাসিনীকে শ্যামলালের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া গ্রামান্তরে নিরাপদ্ স্থানে আনয়ন করায় গদার প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব না থাকাই সঙ্গত। কারণ, তাহার এ কাজটা ভাল কাজ বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। গদা কিন্তু ভাল-মন্দ কিছুই বিবেচনা না করিয়া এই

কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে। শ্যামলাল তাহাকে সার্ব্বভৌমের পুত্র-বধূ হরণের নিমিত্ত নিয়োজিত করিয়াছিলেন, সেই কার্য্য সম্পন্ন করিলে গদা নিশ্চয়ই শ্যামলালের নিকট হইতে পুরস্কারস্বরূপ অর্থলাভ করিত। সে পুরস্কারের মাত্রা কুড়ি টাকা ছাড়াইয়া যাইত না, ইহা তাহার বেশ জানা ছিল। দুরাত্মা গদা এই সামান্য অর্থের লোভে অনায়াসে এই ভয়ানক কার্য্য-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইল এবং বাস্তবিকই সুহাসিনীকে আয়ত্তাধীন করিল। তাহার পর সুহাসিনী যখন অন্যূন হাজার টাকার অলঙ্কার পুরস্কার দিতে সম্মত হইলেন, তখন গদা আবার অনায়াসে শ্যামলালের আদেশ উপেক্ষা করিয়া সুহাসিনীর বাসনানুরূপ কার্য্য সম্পাদন করিল। প্রথমটা পাপকার্য্য, দ্বিতীয়টি পুণ্যকর্ম্ম, এরূপ বিবেচনা গদার কখনই মনে হয় নাই এবং সেরূপ বিচার করিয়া গদা কখনও কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়ও না।

শ্যামলালের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য না করিয়া সুহাসিনীকে লইয়া স্থানান্তরে আগমন করায় গদাকে বিলক্ষণ বিপন্ন হইতে হইয়াছে। সে জানে, শ্যামলাল ভদ্রবংশসম্ভূত হইলেও দুর্ব্বৃত্ততায় তাহার বড় ভাই। গদার প্রযত্নে এই ব্যাপারে বিফলমনোরথ হওয়ায় তিনি যে গদার সর্ব্বনাশের কিছুই বাকী রাখিবেন না, তাহা সে ভালরকমই বুঝিয়াছে। সুতরাং এই ঘটনার পর সে আর গ্রামে ফিরিয়া যায় নাই; স্থানান্তরে প্রচ্ছন্নভাবে সে বাস করিতেছে।

এই মহাপুরুষ গদা চাঁড়ালকে সরলপ্রাণ রামহরি দুইটি সরলা নারীর পরামর্শক্রমে প্রধান অবলম্বন বলিয়া মনে করিয়াছে এবং অতীব সমাদরে তাহাকে বাটীতে স্থান দিয়াছে। রামহরির মুখে সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া গদা বলিয়াছে যে, বামনঠাকুরদের কাছে তাঁহাদের বউ ঠাকরুণকে সঙ্গে লইয়া যাইতে এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত কথা বিশেষরূপে বুঝাইয়া বলিতে তাহার কোন আপত্তি নাই; কিন্তু তাহার হাতে কাজ অনেক—ঝঞ্ঝাট ঢের। বিশেষ লাভ না হইলে সে সকল ক্ষতি স্বীকার করিয়া গদা কখনই এই গোলে সময় নষ্ট করিতে পারিবে না।

তাহার সহিত বাদানুবাদ করিয়া রামহরি বুঝিয়াছে, এক শত টাকা না পাইলে গদা এ বিষয়ে সাহায্য করিবে না। গদাও জানে এবং রামহরিও বুঝিয়াছে যে, সুহাসিনীর হাতে সিকি পয়সাও নাই। সুতরাং ১০০৲ এক শত টাকা দেওয়া কোনমতেই সম্ভব নহে। কিন্তু গদা কোন যুক্তিতেই কর্ণপাত করে না। অগত্যা রামহরি তাহাতেই স্বীকৃত হইয়াছে।

দাসীর নিকটে আসিয়া রামহরি সমস্ত কথা জানাইল। শুনিয়া দাসী বলিল,—"তা ত সব বুঝিলাম; এখন এত টাকার যোগাড় হইবে কিরূপে?"

রামহরি বলিল,—"ঠাক্‌রুণের কিছু নাই; তাঁহাকে কোন কথা বলিবারও দরকার নাই। কালি সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া দুগোলা ধান মজুত করিয়াছি। আমি মহাজন ডাকিতে যাইতেছি, এখনই তাহা বিক্রয় করিব।"

দাসী বলিল,—"কত ধান বেচিলে একশ টাকা হইবে?"

রামহরি বলিল,—"যেরূপ গরজ, তাহাতে দর হইবে বোধ হয় না। যাহা মজুত আছে, তাহা সকলই বেচিতে হইবে।"

দাসী বলিল,—"ধান যাহা মজুত হইয়াছে, তাহাতে লোকজনকে দেওয়া, অতিথ পতিত লইয়া সংবৎসরের খোরাক আর বীজধান হইত। তাহার কিছুই থাকিবে না। কি রকমে দিন কাটিবে?"

রামহরি বলিল,—"দিন কাটাইবার কর্ত্তা ভগবান্। সে ভাবনা পরে ভাবিলে ক্ষতি হইবে না। আপাততঃ ব্রাহ্মণ-কন্যার ভাবনাই ভাবিতে হইতেছে। এখন সমস্ত ধানগুলি বেচিয়া একশ টাকা হইলে বাঁচি।"

রামহরি চলিয়া গেল এবং অবিলম্বে মহাজন সঙ্গে করিয়া আসিয়া সমস্ত ধান বেচিয়া ফেলিল। ধানের মূল্য একশ ছয় টাকা আট আনা হইল। গোলা হইতে ধান বাহির করিয়া ও মাপিয়া বস্তাবন্দী করিয়া দিতে দিনের অবশিষ্ট ভাগ তাহাকে ভূতের ন্যায় পরিশ্রম করিতে হইল। যখন হিসাব করিয়া ধান্যের মূল্য এক শত টাকা ছাড়াইয়া গেল, তখন রামহরি আপনাকে মহা দায়মুক্ত বলিয়া পরমানন্দিত হইল।

সুহাসিনী এইরূপে ধান বাহির করিতে দেখিয়া দাসীকে জিজ্ঞাসিলেন,—"কালি কর্ত্তা সারাদিন পরিশ্রম করিয়া ধান গোলাজাত করিয়াছেন, আজ আবার বাহির করিতেছেন কেন?"

দাসী উত্তর দিল, "কাহাকে ধার দিবেন বুঝি।"

সুহাসিনী বুঝিতে পারিল না যে, তাঁহারই জন্য এই কৃষক-দম্পতি আপনাদিগের সংবৎসরের সম্বল আধা কড়িতে বেচিয়া ফেলিল। গদা আপনার টাকা অগ্রেই বুঝিয়া লইল। পরদিন রামহরি প্রাতে আপনার গরুর গাড়ী জুতিয়া উত্তমরূপে ছই আঁটিয়া দিল এবং তাহার মধ্যে অনেক খড় বিছাইয়া বিছানা পাতিল। বাটীতে তাহার অনুপস্থিতিকালে থাকিবার লোকের ব্যবস্থা করা হইলে, সে আপনার

পত্নীকে ডাকিয়া গঙ্গাঠাকুরাণীকে সঙ্গে লইয়া গাড়ীতে উঠিতে বলিল। প্রায় ১৫ ক্রোশ পথ যাইতে হইবে, সুতরাং আর বিলম্ব করা উচিত নহে। রামহরির এইরূপ তাগাদা করিলে অগত্যা গঙ্গা-যমুনা গাড়ীতে উঠিলেন। রামহরি সম্মুখে বসিয়া গরু তাড়াইতে লাগিল; গদা গাড়ীর পার্শ্বে পার্শ্বে হাঁটিয়া চলিতে লাগিল।

অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম, প্রান্তর ও জলাশয় অতিক্রম করিয়া মধ্যাহ্নকালে তাহারা একটি সামান্য দোকানে জলযোগ করিল এবং পুনরায় চলিতে থাকিল।

বেলা অপরাহ্ন হইয়া আসিল। যাত্রিগণ এক অরণ্যমধ্যস্থ পথ দিয়া চলিতে লাগিল। নিকটে কোন দিকেই এক ক্রোশের মধ্যে গ্রাম নাই। পথে বা মাঠে কোথায়ও মনুষ্য নাই। সহসা দড়াম করিয়া এক পিস্তলের আওয়াজ হইল। সঙ্গে সঙ্গে "বাবা গো" শব্দে রামহরি গাড়ীর উপর হইতে মাটীতে পড়িয়া গেল। গরু দুইটি বিচলিত হইয়া উঠিল। শকটমধ্যস্থ নারীদ্বয় কাঁদিয়া উঠিল এবং গদা বেগে পলায়ন করিল।

তৎক্ষণাৎ প্রকাণ্ড পাগড়ী-আঁটা দাড়িওয়ালা এক পুরুষ শকটের আচ্ছাদন বস্ত্রের কিয়দংশ উত্তোলন পূর্ব্বক কর্কশকণ্ঠে বলিল,—"যদি প্রাণের মায়া থাকে, তবে চুপ করিয়া থাক, নতুবা দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না।"

সুহাসিনী বলিলেন—"কখনও না। দুর্দ্দশা আমাদের যথেষ্ট হইয়াছে, ইহার উপর যাহা হয় হউক, তোমার কথা আমরা কখনই শুনিব না।"

বিপদে পড়িয়া সুহাসিনীর সাহস বিপুল পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে এবং লজ্জা ও কোমলতা হেতু বাক্য-কথনের সঙ্কোচ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। রমণীদ্বয় উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ ও সেই শ্মশ্রুধারী পুরুষের সহিত বিতণ্ডা করিতে লাগিলেন এবং শকট হইতে অবতরণ করিয়া রামহরির নিকটে ধূলায় পড়িয়া কাতরকণ্ঠে রোদন করিতে থাকিলেন। বন্দুকধারী পুরুষ উচ্চৈঃস্বরে বলিল,—"আইস।"

তৎক্ষণাৎ পার্শ্বস্থ বৃক্ষের অন্তরাল হইতে চারিজন ভয়ানক পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইল। বন্দুকধারী পুরুষ আদেশ করিল—"কাপড় দিয়া এই দুই স্ত্রীলোকের মুখ বন্ধ করিয়া দেও এবং হাত-পা বাঁধিয়া গাড়ীতে উঠাইয়া দেও।"

আদেশ প্রচারিত হইবামাত্র অনুরূপ কার্য্য সম্পন্ন হইল। বন্দুকধারী ব্যক্তি গাড়ীর সম্মুখে বসিয়া চাকাইতে আরম্ভ করিল। আর দুই জন রামহরির দেহ উঠাইয়া লইয়া পার্শ্বস্থ জঙ্গলে ফেলিয়া দিল। এই সকল ভয়ানক ব্যাপার অতি অল্পকালের মধ্যেই শেষ হইয়া গেল। বনভূমি নিস্তব্ধ হইল, গাড়ী অনেক দূর অগ্রগামী হইতে লাগিল।

সপ্তম খণ্ড—অমৃত

প্রথম পরিচ্ছেদ

অবনতি

যোগানন্দ ও উমাশঙ্কর অপরাহ্নকালে বারাণসী-ধামে আপনাদের কুটীরের বহির্ভাগে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। উমাশঙ্কর জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি বলিতেছিলেন, বর্ত্তমান কালে যাহা হিন্দুধর্ম্ম নামে পরিচিত, তাহা এক নূতন ধর্ম্ম, শাস্ত্রাদিতে তার মূল নাই এবং বেদবেদান্তে তাহার উল্লেখ নাই। তবে এ অভিনব ধর্ম্মের উৎপত্তি কিরূপে হইল?"

যোগানন্দ বলিলেন,—"উৎপত্তি কিরূপে হইল, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে, তোমাকে এই পর্য্যন্ত আমি বলিতে পারি, তুমিও স্বয়ং তাহা দেখিয়াছ যে, বর্ত্তমান কালের হিন্দুগণ যে সকল গ্রন্থকে আপনাদের ধর্ম্মশাস্ত্ররূপে উল্লেখ করেন, তাহার কোথাও হিন্দু শব্দের উল্লেখ নাই এবং হিন্দু-জাতি বা হিন্দু-ধর্ম্ম নামক কোন জাতি বা ধর্ম্মেরও বৃত্তান্ত নাই। আমাদের এই জাতি, গ্রন্থাদির কোন কোন স্থানে আর্য্য-জাতি নামে অভিহিত হইয়াছেন এবং একমাত্র ধর্ম্ম-শব্দ দ্বারা আমাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণবিধায়ক সমস্ত ব্যবস্থাই লক্ষিত হইয়াছে। এই উভয় শব্দ মিলাইয়া আমরা আমাদের ধর্ম্মকে আর্য্য-ধর্ম্ম বলিতে পারি বটে, কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম বলিবার কোনই কারণ দেখা যায় না। বস্তুতঃ হিন্দু শব্দটা

শাস্ত্রবহির্ভূত নূতন শব্দ। এই শাস্ত্রবহির্ভূত নূতন শব্দ যেমন এখন আমাদের ধর্ম্মের পরিচায়ক হইয়াছে, তেমনই বর্ত্তমান কালের ধর্ম্মও এক শাস্ত্রবিরুদ্ধ অত্যাশ্চর্য্য বেশ ধারণ করিয়াছে। আর্য্যের সার ধন ষড়ঙ্গ বেদ। তাহার আলোচনা এখন হিন্দুদের নাই বলিলেও হয়। আর্য্যের লক্ষ্য ব্রহ্মজ্ঞান, হিন্দুর লক্ষ্য অপ্সরঃ-সম্বলিত স্বর্গভোগ। আর্য্যের অবলম্বন সনাতন পরম-পুরুষের বদনবিগলিত অপৌরুষেয় শাস্ত্র, হিন্দুর অবলম্বন ঋষিবিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষ-প্রণীত গ্রন্থ। আর্য্যের লক্ষ্য আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন, হিন্দুর লক্ষ্য অত্র ও পরত্র আত্মসুখ। আর্য্যের কামনা সগুণের পথ দিয়া নির্গুণের উপলব্ধি, হিন্দুর কামনা কেবল সগুণ। আর্য্যের বিশ্বাস মৃত্যু নাই, হিন্দু মৃত্যুর ভয়েই অবসন্ন। আর্য্য সকলের হিতকামনাই সার বলিয়া জানিতেন, হিন্দু নিজের সুখই সার লক্ষ্য মনে করে। আর্য্য অন্তর্নিহিত এবং অনুশীলন দ্বারা উন্নতিসাধিত হৃদ্বৃত্তিকে ধর্ম্ম বলিয়া জানিতেন, হিন্দু কতকগুলি অনুষ্ঠানমাত্রকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। এইরূপ দেখিলেই তুমি বুঝিবে যে, হিন্দু-ধর্ম্মের সহিত আর্য্য-ধর্ম্মের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। ইহা এক অভিনব কাণ্ড।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"বুঝিতেছি, বর্ত্তমান কাল-প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম প্রত্যুত এক নূতন কাণ্ড। কিন্তু ইহার কি কোন শাস্ত্রীয় মূল নাই?"

যোগানন্দ বলিলেন,—"আছে বই কি! প্রথম কালের পর ক্রমশঃ লোকের প্রবৃত্তি ও অনুরাগের পরিবর্ত্তন হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে অনুকূল শাস্ত্রও প্রণীত হইতে থাকে। এই সকল নবীন শাস্ত্রের বাসনায়, কতক বা তাহার ব্যাখ্যায়, কতক বা লোকের অনুরাগানুসারে কালসহকারে মূলের এতই পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে যে, ইহা নূতন কাণ্ডরূপেই পরিণত হইয়াছে।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"যে সকল আধুনিক শাস্ত্র-কারের অভিপ্রায়ানুসারে বর্ত্তমান হিন্দু-ধর্ম্ম এই আকার ধারণ করিয়াছে, তাঁহাদের যুক্তিপ্রণালী কি সম্পূর্ণরূপে মূল-বহির্ভূত?"

যোগানন্দ বলিলেন, "না বৎস! সম্পূর্ণ বহির্ভূত নহে। প্রথম প্রথম যে সকল মহাত্মা লেখনী ধারণ করেন, তাঁহারা মূলের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া কল্পনাকে মিশ্রিত করেন, কিন্তু কালে টীকাকারকগণের ও ব্যাখ্যাকারকগণের কৃপায় ক্রমশঃ মূল সঙ্গতি ঢাকিয়া আইসে এবং উত্তরোত্তর ব্যক্তি সাধারণ মূলের আলোচনা ত্যাগ করার ও ভুলিয়া যাওয়ার পর নূতন নূতন শাস্ত্রকার আবির্ভূত হইতে থাকেন এবং মূলশাস্ত্র এককালে পরিত্যাগ করিয়া কেবল স্ব স্ব কল্পনারই প্রশ্রয় দেন। এইরূপে বর্ত্তমান কালের ধর্ম্মের সহিত মূল আর্য্যধর্ম্মের আকাশ-পাতাল তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"এই সকল নূতন শাস্ত্রকার কি কোন প্রকার অসদভিসন্ধির বশবর্ত্তী হইয়া এই সকল অভিপ্রায় প্রচার করিয়াছিলেন?"

যোগানন্দ বলিলেন,—"না বৎস! প্রথম প্রথম অতীব শুভ-সঙ্কল্প সহকারে শাস্ত্রকারগণ স্ব স্ব অভি-প্রায় প্রচার করিয়াছিলেন। মনুষ্যের প্রবৃত্তি, রুচি ও অধিকারিত্ব আলোচনা করিয়া তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মানুষ্ঠান-ব্যাপার অপেক্ষাকৃত সরল সহজসাধ্য না হইলে সাধারণে তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে না। তদর্থে তাঁহারা মূলশাস্ত্র-সমূহের অভিপ্রায়সমূহ অপেক্ষা-কৃত বিশদ ও সর্ব্বজন-প্রণিধান-যোগ্য করিবার অভি-প্রায়ে অতীব শুভ-সঙ্কল্পের বশবর্ত্তী হইয়াই লেখনী ধারণ করেন। কালে অনন্ত শাস্ত্রকার আবির্ভূত হওয়ায় মূল বিলুপ্ত, বিস্মৃতি-সলিলে নিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল এবং ধর্ম্মাকাশ বর্ষার মেঘের ন্যায় কাল্পনিক ধর্ম্মমতে সমাচ্ছন্ন হইয়া সারধর্ম্মরূপ দিবাকরকে ছাইয়া ফেলিল।"

উমাশঙ্কর জিজ্ঞাসিলেন,—"এ দারুণ দুর্দ্দৈব কি আর অপগত হইবে না? আবার কি আর্য্যধর্ম্মের বিমল জ্যোতিঃ এই হিন্দুধর্ম্মরূপ কুহেলিকা ভেদ করিয়া প্রদীপ্ত হইবে না?"

যোগানন্দ বলিলেন,—"বড় সুকঠিন, বড় ঘনান্ধ-কার ভারতের ধর্ম্মাকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। এখন সকলেই ধর্ম্ম-ব্যাখ্যাতা। সকলেই মনে করে, তাহারা দ্বিতীয় বেদব্যাস। সকলেই জানে, যে যাহা বুঝিয়াছে, তাহাই অভ্রান্ত। এ অবস্থায় কে বা কাহাকে বুঝায়, কে-ই বা কাহার কথা শুনে। বাড়ার ভাগ এক নূতন বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। ইহারা এই বিকৃত ও কুৎসিত ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনাদের সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে, এ কথা যদি ইহা-দিগকে বুঝাইতে কেহ অগ্রসর হয়, তাহা হইলে ইহারা সেই পরমহিতৈষী মহাত্মাগণকে ধর্ম্মবিদ্বেষী, আচার-ভ্রষ্ট, অসাধু বলিয়া লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিতে থাকিবে। তাঁহার কথা শ্রবণ করা দূরে থাকুক, তিরস্কারস্রোতে তাঁহাকে হয় তো ভাসাইয়া দিবে।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"তবে উপায়?"

যোগানন্দ বলিলেন,—"উপায়ের যিনি কর্ত্তা,

তাঁহার কৃপা না হইলে আর উপায় নাই। এইরূপ দুরবস্থা আলোচনা করিয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ একবার ধর্ম্ম-ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বসুন্ধরার অধর্ম্মান্ধকার বিদূরিত করিয়া বিমল সুস্নিগ্ধ আলোক বিকীর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে অর্জ্জুনের সারথ্যভার গ্রহণ করিয়া তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতারূপ পরম দিবাকর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই গীতা অভ্রান্তরূপে সনাতন ধর্ম্মের পথ নিয়তই প্রদর্শন করিতেছে।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"সেই গীতা তো এখনও আছে এবং এখনও লোক সমাজে তাহার বিশেষ আলোচনা চলিতেছে। তথাপি লোকের ভ্রমান্ধকার যায় না কেন?

যোগানন্দ বলিলেন,—"গীতার আলোচনা চলিতেছে বটে, তাহা সম্যক্ নহে। বহুলোক-সমাকীর্ণ ভারতে কয়জন গীতা পড়ে? কয়জনই বা গীতার মতানুসারে জীবনকে গঠিত করিতে প্রয়াসী হয়? কেবল শ্লোকাবৃত্তি হয় তো অনেকেই করে, কিন্তু ধর্ম্ম হয় তো অনেকেই প্রণিধান করে না। আবার ধর্ম্ম প্রণিধান করিলেও হয় তো অনেকেই তাহার অভিপ্রায়ানুসারে স্বকীয় কার্য্যকলাপ পরিচালিত করে না। সুতরাং গীতার যে আলোচনার কথা তুমি বলিতেছ, তাহা আলোচনাই নহে। গীতার সম্বন্ধে আরও ভয়ানক দুর্দ্দৈব দেখিতেছি। সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যাজালে গীতা ঢাকা পড়িয়াছে। দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি সম্প্রদায়ী মহাত্মারা স্ব স্ব মতানুসারে গীতার অর্থ করিয়া থাকেন। ইহাতে শাস্ত্রের সত্যাভিপ্রায়-নির্ণয়ের সমূহ ব্যাঘাত ঘটে। যাহা প্রকৃত সত্য, তাহার অবস্থান্তর বা অর্থান্তর অসম্ভব। গীতাকে যদি সত্য ও ভগবদুক্তি বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তাহার বহুবিধ অর্থ কখনই হইতে পারে না। তবে যে নানা সম্প্রদায় তাহার নানারূপ অর্থ করিয়া থাকেন, সে কেবল স্ব স্ব মতের শ্রেষ্ঠতা-প্রতিপাদনার্থ পাণ্ডিত্য-প্রকাশ মাত্র। তাহাতে শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে এবং অল্পবুদ্ধি মানব কোন্‌টি যথার্থ অর্থ এবং কোন্‌টিই বা গ্রহণীয়, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া বিব্রত হইয়া উঠিতেছে। তথাপি গীতার আলোচনাই এই দুর্দ্দিনে আমাদের প্রধান ভরসা। কারণ, সত্য স্বপ্রকাশ। নিরন্তর সত্যান্বেষণ করিতে থাকিলে, একান্তমনে সত্যপ্রাপ্তির কামনা করিলে অবশ্যই সত্যলাভ ঘটে। গীতার মধ্যে সত্য নিহিত আছে সন্দেহ নাই। সেই সত্য-নির্ণয় অভিলাষে গীতার শরণাগত হইলে, অনন্যমনে গীতার ভজনা করিলে, অবশ্যই স্বপ্রকাশ সত্যের দর্শনলাভ ঘটিতে পারে।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"তাহা হইলে এ দারুণ দুঃসময়ে আপনি কি মনুষ্যগণকে গীতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পরামর্শ প্রদান করেন?"

যোগানন্দ বলিলেন,—"তৎপক্ষে কোনই সন্দেহ নাই। অনন্যমনে গীতার আলোচনায় প্রবৃত্ত থাকিলে অবশ্যই মানবকুল সৎপথ দেখিতে পাইবে এবং চরমে সদ্‌গতি লাভ করিবে, ইহাই আমার ধ্রুব বিশ্বাস!"

এই সময়ে হরকুমার বাবু তাঁহাদের সম্মুখাগত হইলেন এবং ভক্তি সহকারে যোগানন্দকে প্রণাম করিলেন। যোগানন্দ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন।

তিনি উমাশঙ্করকে বলিলেন,—"তিন দিন আপনাকে দেখিতে পাই না কেন? শরীর ভাল আছে তো?"

উমাশঙ্কর উত্তর দিলেন,—"প্রভুর কৃপায় শরীর তো কখনই অসুস্থ বলিয়া অনুভব করি না। গুরুদেব যে সকল নিয়ম পালন করিতে উপদেশ দিয়াছেন, যত দিন তাহা পালন করিতে অবহেলা না করিব, তত দিন শারীরিক অসুস্থতা কাহাকে বলে, তাহা জানিতে পারিব না। অন্যান্য কার্য্যানুরোধে কয়দিন আপনাদের ওদিকে যাওয়া হয় নাই!"

তাহার পর নতমুখে জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনাদের উভয় বাটীর কুশল?"

হরকুমার উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, কুশল বটে। তবে আজি প্রাতঃকাল হইতে অন্নপূর্ণা একটু অসুস্থ হইয়াছেন।"

এ কি সন্ন্যাসীর মন! অন্নপূর্ণার অসুস্থতার সংবাদ শুনিয়া উমাশঙ্করের চিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। তিনি বাক্য ও ব্যবহারে তাহা ব্যক্ত করিলেন না। অন্নপূর্ণার কি অসুখ, কেমন অবস্থা ইত্যাদি সংবাদ জানিবার নিমিত্ত তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা হইল; কিন্তু তাহাও তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন না।

যোগানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নীলরতন বাবুর কন্যার কি অসুখ হইয়াছে? এখন তিনি কেমন আছেন, দেখিয়া আসিয়াছেন?"

হরকুমার বলিলেন,—"সামান্য জ্বর হইয়াছে। বিশেষ কাতরতা ঘটে নাই। আমি তাঁহাকে বসিয়া মহাভারত পড়িতে দেখিয়া আসিয়াছি।"

উমাশঙ্করকে লক্ষ্য করিয়া যোগানন্দ বলিলেন, —"তুমি কয় দিন নীলরতন বাবুর বাড়ী যাও নাই

কেন ? আজি এখনই যাও এবং অন্নপূর্ণার পীড়ার বৃত্তান্ত সবিশেষ জানিয়া আইস।"

উমাশঙ্কর সবিনয়ে গুরুদেবের পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

তিনি প্রস্থান করিলে ঘনানন্দ বলিলেন,—"এই সন্ন্যাসী বালক নীলরতন-তনয়াকে বড়ই ভালবাসে। ইহার এই প্রণয় কোন্ দিকে প্রধাবিত হইবে, তাহা আমি জানি না। কেবল ভালবাসা বড় সুমিষ্ট সামগ্রী; কিন্তু তাহার সহিত ইন্দ্রিয়-লালসা কালে মিশিতে পারে। তখন শত প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়া ইহার নিদারুণ মনস্তাপের কারণ ঘটিতে পারে, অথবা তদপেক্ষাও দুর্দৈব সমস্ত উপস্থিত হইয়া ইহার জীবন ও শিক্ষা সকলই অনর্থময় করিয়া দিতে পারে।"

হরকুমার বলিলেন,—"নীলরতনের বালিকাও এই সাধুকে বড়ই ভালবাসে। এই দুইটির এই আন্তরিক আকর্ষণ দেখিয়া মিলন বাঞ্ছনীয় হয় বটে, কিন্তু বহু ব্যাপারই সে কল্পনার বিরোধী। প্রথমতঃ বালকটি সন্ন্যাসী. দ্বিতীয়তঃ বালকটি অজ্ঞাতকুলশীল। মহাশয়ও ইঁহার পিতৃমাতৃ-পরিচয় জানেন না।"

যোগানন্দ বলিলেন, "সন্ন্যাসীর শিষ্য হইলেও উমাশঙ্কর স্বয়ং সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। অতি অল্পবয়স হইতে এই বালক আমার নিকট প্রতিপালিত ; সুতরাং সন্ন্যাসীর আচার-পরতন্ত্র। তাই বলিয়া ইনি সন্ন্যাসী নহেন। ইঁহার অদৃষ্টে প্রভূত বিষয়ৈশ্বর্য্য উপভোগ হইবার সম্ভাবনা আছে। জানি না, কোন্ অলক্ষিত সূত্রে তাহা উপস্থিত হইবে ! কিন্তু আমি সেই কারণে ইঁহাকে অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক বিষয়-ব্যাপারেরও উপদেশ প্রদান করিয়া আসিতেছি। ইনি ব্রাহ্মণ, তাহা আমি শ্রবণ করিয়াছি।"

হরকুমার বলিলেন,—"আপনি বলিয়াছিলেন, ইঁহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত আপনি বেশী কিছু জানেন না। কিছু বিশেষ বৃত্তান্ত জানিবার প্রয়োজন হইলে এক উপায়ে সন্ধান হইতে পারে বলিয়াছিলেন। সে উপায় আমার নিকট এক দিন ব্যক্ত করিবেন ভরসা দিয়াছিলেন।"

যোগানন্দ বলিলেন,—"সে অতি অল্প কথা। সোনামণি-নাম্নী এক বৃদ্ধা বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যা কাশীবাস করিত। সে আমাকে বড় ভক্তি করিত ও সর্ব্বদা এই বালকটিকে ক্রোড়ে লইয়া আমার আশ্রমে আসিত ; আমিও কখন কখন তাহার বাটীতে গিয়া এই শিশুটিকে দেখিয়া আসিতাম। শিশুটি সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত দেখিয়া আমি গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছিলাম যে, পরিণামে এই বালক বহুবিধ সম্পত্তিশালী ও পরম ধার্ম্মিক হইবে। অনতিকালমধ্যে সোনামণির কঠিন পীড়া হইল এবং আসন্নকাল নিকটস্থ বুঝিয়া সে আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইল। তথায় সে আমাকে বুঝাইয়া দিল যে, এই শিশুর এক বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণবংশে জন্ম। শিশু মাতৃহীন। ইহার পরিচয় যদি কখন জানিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে বঙ্গদেশের রামনগরে গঙ্গামণি-নাম্নী এক বিধবার নিকট সন্ধান করিতে হইবে। তাঁহার নিকট অনেকগুলি কাগজপত্র আছে ; তাহা দেখিলেই এই বালকের পিতৃমাতৃঘটিত সমস্ত বৃত্তান্তই জানিতে পারা যাইবে। এক্ষণে তাহার অন্তকাল উপস্থিত। এখানে তাহার আর কেহ আত্মীয় নাই। সুতরাং আমার স্কন্ধে এই শিশুপালনের ভার প্রদান করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। তদবধি এই গৃহীজনোচিত কর্ত্তব্যের দায়িত্ব আমাকেই গ্রহণ করিতে হইল। এই গুণবান্ বালক সেই সময় হইতে আমার নিকটেই আছেন। আমি বিহিত যত্নে ইঁহাকে শাস্ত্রাদির শিক্ষা প্রদান করিয়াছি এবং বিবিধ প্রযত্নে ইঁহার চরিত্রগঠনের সহায়তা করিয়াছি। কিন্তু ইঁহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত জানিবার কোন চেষ্টাই আমি করি নাই ; এ পর্য্যন্ত তাহার কোন প্রয়োজন বা সুযোগও আমার উপস্থিত হয় নাই। বালকের ভবিষ্যৎসম্বন্ধে দুইটি বিশ্বাস ছিল। এক ইঁহার ধর্ম্মময়তা। তৎসম্বন্ধে আমার সন্দেহ নাই। অপর ইঁহার বিষয়ৈশ্বর্য্য উপভোগ। তাহার কোন সূচনা আমি এখনও দেখিতেছি না।"

হরকুমার বলিলেন,—"বালক যে অসাধারণ ভাগ্যবান্, আপনার ন্যায় মহাপুরুষের আশ্রয়লাভই তাহার নিদর্শন। আপনি বলিতেছেন, রামনগর নামক গ্রামে গঙ্গামণি নাম্নী এক নারীর নিকট কতকগুলি কাগজপত্র আছে, তাহাতেই এই বালকের পিতৃমাতৃ-বৃত্তান্ত পাওয়া যাইবে। সে স্ত্রীলোকের আর কোন পরিচয় আপনি জানেন ?"

যোগানন্দ বলিলেন,—"কিছু না। আমি কখন তাহার সন্ধান করি নাই। অদ্যাপি সে নারী জীবিত আছে কি না, তাহাও আমি জানি না।"

হরকুমার অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, তাহার পর বলিলেন, "জানি না, এই ভাগ্যবান্ শিশুর জীবন কি দুর্জ্ঞেয় রহস্যজালে বিজড়িত। যাহাই হউক, অনুসন্ধান অবশ্যই করিতে হইবে। আমি অতঃপর তাহাই আমার প্রধান কর্ত্তব্যরূপে অবলম্বন করিব। আশীর্ব্বাদ করিবেন, যেন কৃতকার্য্য হই।"

যোগানন্দ কহিলেন,—"আপনার প্রবৃত্ত যে

সফলিত হইবে, তৎসম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। বালকের ভাগ্যসূত্র নিশ্চয়ই একটি উপলক্ষ্য ধরিয়া সকল ঘটনাই অনুকূল করিয়া লইবে।"

হরকুমার জিজ্ঞাসিলেন,—"এই রামনগরটা কোথায়, তাহাও কি প্রভু জানেন না?"

যোগানন্দ বলিলেন,—"না।"

হরকুমার বলিলেন,—"রামনগর অনেক আছে। তাহা হউক, সকল রামনগরেই সন্ধান করিব। অবশ্যই প্রভুর আশীর্ব্বাদে বাসনা সফল হইবে।"

অন্যান্য কথা-বার্ত্তার পর হরকুমার বাবু যথারীতি বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্রহ্মানন্দ।

কুটীরমধ্যে যোগানন্দ একাকী ধ্যান-মগ্ন। উমাশঙ্কর ভিক্ষার্থ বা অন্য কোন প্রয়োজনে স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন। ধ্যানাবস্থায় সন্ন্যাসীর সমুজ্জ্বল কলেবর অধিকতর জ্যোতিষ্মান্ হইয়া উঠিয়াছে এবং তাঁহার বদনমণ্ডল অপার্থিব আনন্দ-জ্যোতিতে প্রদীপ্ত দেখাইতেছে। বাহ্যজ্ঞানবিরহিতভাবে, স্তম্ভিত-নয়নে, পদ্মাসনাসীন সাধু ধ্যান-নিরত।

ধীরে ও নিঃশব্দে যোগেশ্বরী তথায় প্রবেশ করিলেন। শোভা ও জ্যোতিঃ যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সেই কুটীরে সমুদিত হইল। যোগেশ্বরী প্রবেশ করিয়া ভক্তিভাবে ভূতলে ললাট সংলগ্ন করিয়া প্রণাম করিলেন, তদনন্তর তত্রত্য ধূলি গ্রহণ করিয়া মস্তকে, রসনায় ও বক্ষে স্থাপন করিলেন। তাহার পর করদ্বয় যুক্ত করিয়া নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দভাবে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বহুক্ষণ ধ্যানমগ্ন থাকার পর যোগানন্দ নয়ন উন্মীলন করিলেন এবং যোগেশ্বরীর সেই দেবকান্তি সম্মুখে দর্শন করিয়া সানন্দে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কি! দেবী যোগেশ্বরী? তুমি কতক্ষণ?"

যোগেশ্বরী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এখান থেকে বিশ্বেশ্বরের মন্দির যতদূর, ততক্ষণ।"

যোগানন্দ বলিলেন, "দূরের সহিত সময়ের পরিমাণ কিরূপে হইবে?"

যোগেশ্বরী বলিলেন, "সময়ের পরিমাণ আপনার কাছে কিছুতেই হয় না। আপনি অনন্ত, সময়ও অনন্ত। তাহার পরিমাণ কে করিবে? আমরা খুব ছোট—অতিশয় ক্ষুদ্র—তাই আমাদের সময়ের মাপ চাই! তা দূরের সহিত সময়ের পরিমাণ হয় না কেন? সেখানে যাইতে যতটা সময় লাগে, তাহাই তাহার পরিমাণ।"

যোগানন্দ বলিলেন,—"তাহাতে ঠিক পরিমাণ হয় না। কারণ, তুমি যতক্ষণ এখান হইতে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে যাইতে পার, আর এক জন হয় ত তাহার অপেক্ষা অনেক কম সময়ে যাইতে পারে, আবার কেহ হয় ত অনেক বেশী সময় না হইলে যাইতে পারে না। সুতরাং এই দূরত্বের অনুসারে পরিমাণ সকলের পক্ষে কখনই সমান হইতে পারে না। বিশেষতঃ এক ব্যক্তি হয় ত সময়ে প্রয়োজনানুরোধে বিশেষ দ্রুত যাইতে পারে, সুতরাং সময় অল্প লাগিতে পারে; আবার কোন সময়ে হয় ত কোন প্রয়োজন না থাকায় ধীরে ধীরে গমন করিতে পারে, সুতরাং সময় বেশী লাগিতে পারে। অতএব এক ব্যক্তির সম্বন্ধেও দূরত্বানুসারে সময়ের পরিমাণ সকল সময়ে ঠিক হইতে পারে না।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"স্বামিন্! হৃদয় দেবতা! এত কথা আমি বুঝি না তো। জানি আপনাকে—দেখি সর্ব্বত্র আপনাকে—প্রাণ-মন সকলই আপনি; তথাপি আপনি অনেক—অনেক দূর। কত কাল —কত যুগ আপনাকে পাইবার জন্য দৌড়িতেছি; তথাপি আপনি এখনও অনেক দূর। পাই পাই, ধরি ধরি করিয়াও ধরা ঘটে না—পাওয়া ঘটে না। দূর—দূর—ঐ দেখিতেছি, তথাপি দূর—অনেক দূর। দয়াময়! প্রাণবল্লভ! আর কত দিন দুঃখিনী চরণাশ্রিতা দাসীকে এমন করিয়া কষ্ট দিবে? কত কাল, প্রাণেশ্বর! সেবিকাকে এমন করিয়া বঞ্চনা করিবে? তোমাকে সম্মুখে রাখিয়া আমি কেবল দূরত্ব আর সময়েরই সম্বন্ধ দেখিতেছি। এ দূরত্ব, দয়াময়! কমাইয়া দেও। প্রাণের বন্ধু প্রাণে মিশিয়া কালের চিন্তা দূর করিয়া দেও।"

যোগানন্দ মনে মনে বুঝিলেন, "যোগেশ্বরীর জ্ঞাননিষ্ঠা ও ব্রহ্মজ্ঞান সার্থক। তাঁহারা আজীবন ধ্যানাদি সহকারে বিষয়-বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া, প্রাণায়ামাদি উপায়প্রভাবে নির্গুণ ব্রহ্মসাধনার পথে বিশেষ অগ্রসর হইতে পারেন নাই এবং ব্রহ্মোপলব্ধিজনিত আলোক দ্বারা হৃদয়ের অন্ধকার নির্ম্মূলিত করিয়া উঠিতে সক্ষম হন নাই। অথচ এই নারী, এই নবীনা অলোক-সামান্যা নারী, সগুণ-সাধনার পথ দিয়া, ভোগপ্রবৃত্তিসূচক ও প্রবর্দ্ধক সম্বন্ধ অবলম্বন করিয়া, নিরতিশয় একাগ্রতা ও দৃঢ়তা হেতু স্বচ্ছন্দে ব্রহ্মোপলব্ধিরূপ অসুলভ সৌভাগ্যের অধিকারিণী

হইয়াছেন। সার্থক ইঁহার সাধনা! ধন্য ইঁহার জীবন! বলিলেন,—"এখনও কি দেবি! তোমার আমাকে পাইতে বাকী আছে? এখনও কি তোমার আমাকে ধরা হয় নাই? এখনও কি তোমার আমাকে প্রাণে মিশান হয় নাই?"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"না—না প্রাণেশ্বর, এখনও অনেক বাকী, এখনও অনেক দেরী, এখনও তো আমি যে দিকে চাহিয়া দেখি, সে দিকে কেবল তোমাকে দেখিতে পাই না; এখনও তো আমার শরীরের সর্ব্বভাগ তোমাতেই ছাইয়া যায় নাই; এখনও তো ভাষায়, তোমার নাম ছাড়া, আর সকল শব্দ আমি ভুলিয়া যাই নাই; এখনও তো এক একবার তোমাকে এই মাটীর চক্ষু দিয়া দেখিতে হয়, তবেই তো এখনও অনেক দূর।"

যোগানন্দ বলিলেন,—"আমি কিন্তু দেখিতেছি, তোমার আর দূর নাই; তুমি স্বামীর সহিত অভিন্ন ও তন্ময় হইয়াছ।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"তুমি বড় শঠ, বড় ধূর্ত্ত, বড় প্রবঞ্চক, তাই এ কথা বলিতেছ। তোমার কথা যদি সত্য হইবে, তবে এক একবার আমার প্রাণ শূন্য হয় কেন? এক একবার তোমাকে হারাই কেন? কিন্তু তা হউক, আমি তোমাকে ধরিয়া নিশ্চয় এই প্রাণের ভিতর বাঁধিয়া ফেলিব। আমি তোমাকে এই হৃদয়-মন্দির হইতে আর এক পা-ও নড়িতে দিব না। তুমি যতই দূরে থাক, আমি যুগ যুগ—জন্মে জন্মে ছুটিয়া ছুটিয়া তোমাকে ধরিবই ধরিব। কত দিন তুমি আমাকে ফাঁকি দিয়া কাটাইবে? আমার এ সাধনার অন্ত নাই; তোমার চাতুরীর কত দূর সীমা!"

যোগানন্দ বলিলেন,—"তোমাকে ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব; তোমার নিকট হইতে দূরে থাকা অসাধ্য। তোমার দৃঢ়তা, তোমার পবিত্রময়তা, তোমার ভক্তি, তোমার প্রেম সকলই অদ্ভুত। তাহার হাত ছাড়ায়, কাহার সাধ্য?"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিয়া দুষ্ট তুমি চিরদিন অনেকেরই সর্ব্বনাশ করিয়া আসিতেছ। আমি তোমার কথায় ভুলি না! তুমি যাদুকর! এই তোমার এক ভাব, আবার এখনই অন্যরূপ। এই তুমি কাছে, এই তুমি দূরে। এই তোমার হাসি, এই তোমার কান্না। তোমাকে বিশ্বাস নাই। তোমার ভালমন্দ বুঝিয়া উঠা অসম্ভব। আমি তোমার কথায় কখনও ভুলিব না। অনেকে তোমার আশ্বাসবাক্যে ভুলিয়া শেষে কাঁদিয়া মরিয়াছে। আমি সেরূপ কাঁদিয়া মরিব না। তোমাকে হৃদয়ে বাঁধিয়া অনন্তে গা ঢালিব এবং অনন্তের সহিত মিশিয়া অনন্ত আমোদে মজিয়া রহিব, ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা। আমি তোমার কথা শুনিব কেন? তা হউক—আমি এখন আসি—তোমার জন্য চাঁপাফুলের মালা গাঁথিতে হইবে।"

যোগানন্দ বলিলেন,—"ছেলের সঙ্গে দেখা করবে না? ছেলে যে তোমায় মা মা বলিয়া সারা হয়।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"ছেলে—হাঁ, ঠিক কথা। তুমি আমার ঘাড়ে আবার ছেলে চাপাইয়াছ বটে—আবার পুত্রবধূ; সংসারধর্ম্ম সবই চাপাইয়া আমাকে পাকা গৃহস্থ করিয়া তুলিবে মনে করিয়াছ। তা চাপাও, তোমার যত মনে আছে! আমি কোন ভারেই নারাজ হইব না। কিন্তু মনে করিও না তুমি যে, আমি এই সকল ভার লইয়া, এই সকল আমোদে মত্ত হইয়া, তোমাকে ছাড়িব বা ক্ষণেকের নিমিত্তও তোমার সঙ্গ-শূন্য হইব। আমার কাছে তোমার আর ফাঁকি চলিবে না। হাঁ—ছেলের কথা বলিতেছিলে—ছেলের সঙ্গে দেখা করিতে গেলে দেরী হইবে—আমার চাঁপাফুল শুকাইয়া যাইবে। ছেলে এখন বড় ব্যস্ত—বাছা এখন বড়ই সুখে একটি মেয়ের মুখপানে চাহিয়া আছে।"

যোগানন্দ জিজ্ঞাসিলেন,—"কে সে মেয়ে, কোথায় সে মেয়ে?"

যোগেশ্বরী হাসিয়া বলিলেন,—"এত প্রতারণাও তুমি জান! কেন, জান না তুমি, সে মেয়ে কে? নীলরতনের কন্যা অন্নপূর্ণা, তোমার ভাবী পুত্রবধূ।"

যোগানন্দ বলিলেন,—"তোমার বাক্য কখনই মিথ্যা হইবে না। তুমি যখন অন্নপূর্ণাকে পুত্রবধূ বলিয়া উল্লেখ করিলে, তখন নিশ্চয়ই তাহাই হইবে, কিন্তু সম্ভাবনা কিছুই দেখা যাইতেছে না।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"তোমার কথা কখনই মিথ্যা হইবে না। তুমি যখন উমাশঙ্কর রাজরাজেশ্বর হইবে বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাক, তখন নিশ্চয়ই তাহা হইবে। কিন্তু আপাততঃ সম্ভাবনা কিছুই দেখা যাইতেছে না।"

যোগানন্দ কহিলেন,—"তোমার কি এই অভিপ্রায় যে, এমন শাস্ত্রজ্ঞ ধর্ম্মনিষ্ঠ বালক সন্ন্যাসের পথে থাকিয়াও আবার ইহা ছাড়িয়া, স্ত্রী-পরিবারসমন্বিত হইয়া বিষয়সুখে মত্ত হউক?

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"আমাকে ফাঁকি দেও কেন ঠাকুর? যাহাকে যাহা তুমি করাইবে, সে তাহাই হইবে। আমার ইচ্ছা, তুমি সংসারের সর্ব্বসুখৈশ্বর্য্য-

সংবেষ্টিত সন্ন্যাসীর দৃষ্টান্ত দেখাইবে। এই পরম ভাগ্যবান্ বালক তাহার উপলক্ষ। নহিলে বাল্যকাল হইতে তোমার ন্যায় পরমগুরুর আশ্রয়লাভ কাহারও অদৃষ্টে ঘটে কি? তা শিষ্য গুরুর নাম রাখিতে পারিবে, তোমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে। তা আমি এখন আসি—আহা, কি মধুর! কি রমণীয়—তোমার ঐ অঙ্গস্পর্শ! আমার দেহ পুলকে পূর্ণ হইল, নয়ন জল-ভারাকীর্ণ হইল। এইরূপ সঙ্গ যেন অবিশ্রান্ত থাকে প্রভো! আবার চুম্বন, আবার আলিঙ্গন! কি সুখ! কি আনন্দ!"

যোগেশ্বরী মুকুলিত-নয়নে, শিথিল-শরীরে, অবসিত-ভাবে তথায় বসিয়া পড়িলেন, সর্ব্বশরীর কণ্টকিত ও বিকম্পিত হইয়া উঠিল। স্নিগ্ধ ঈষদ্ধাস্য ওষ্ঠপ্রান্তে লাগিয়া রহিল। ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস হেতু হৃদয় বেপিত হইতে থাকিল। মস্তক বক্রভাবে স্কন্ধের উপর ঢলিয়া পড়িল। যোগানন্দ নীরবে সেই প্রেমময়ীর অলৌকিক প্রেমের অদ্ভুত লীলা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। মনে ভাবিলেন, 'যতক্ষণ মানবের এই ভাবে ভগবানের সহিত সম্পর্কানুরূপ সঙ্গ না ঘটে, ততক্ষণ সকলই বৃথা। হায়, কবে আমাদের এরূপ সৌভাগ্যোদয় হইবে? এরূপ ভগবদ্ভক্ত দর্শন করাও ভগবদ্দর্শনের তুল্য ফলপ্রদ। আমার কি শুভাদৃষ্ট! এই মূর্ত্তিময়ী জীবন্মুক্তা দেবীর দর্শনলাভ আমার ঘটিতেছে।' যোগানন্দ ভক্তিসহকারে তত্রত্য ধূলিতে মস্তক স্থাপন করিয়া যোগেশ্বরীকে প্রণাম করিলেন। তাঁহার লোচন অশ্রুভারাক্রান্ত হইল।

তিনি প্রণামান্তে যখন মস্তকোত্তোলন করিলেন, তখন দেখিলেন, কুটীরদ্বারে হরকুমার বাবু দণ্ডায়মান। হরকুমার বলিলেন,—"কি সৌভাগ্য, আমি একসঙ্গে মাকে ও বাবাকে উভয়কেই দেখিতে পাইলাম।" তিনি ভক্তি সহকারে সেই পুণ্য-প্রদীপ্ত অলৌকিক দম্পতিকে প্রণাম করিলেন।

যোগেশ্বরী ব্যস্ততা সহ গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন, হরকুমার। বলিলেন,—"হাঁ বাবা! তোমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে, কিন্তু অনেক বিলম্ব, অনেক বাধা।"

হরকুমার বলিলেন,—"হউক বাধা, হউক বিলম্ব মা, তাহাতে ক্ষতি বোধ করি না; কিন্তু আপনার দয়ায় যত্ন সফল হইলেই হয়।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"যাহার কর্ম্ম, তিনিই সব করাইবেন।" যোগানন্দের দিকে অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"এই যে মহাপুরুষটি দেখিতেছেন, ইনি বড় শক্ত ঠাকুর। করেন সব, করান সব, জানেন সব, বুঝেন সব, তথাচ যেন কিছুই নহেন, কেহই নহেন। উঁহার ছেলে উমাশঙ্কর। মহাপুরুষের ছেলে মহাপুরুষই হইবে। আপনার পরিশ্রম নিষ্ফল হইবে না। উনি ছেলেকে রাজা করিবেন ইচ্ছা করিয়াছেন। কাহার সাধ্য, তাহার অন্যথা করে?"

কেহ কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই যোগেশ্বরী বেগে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। যোগানন্দ ও হরকুমার অবাক্ হইয়া তাঁহার পরিগৃহীত পন্থার দিকে চাহিয়া রহিলেন। অচিরে যোগেশ্বরী তাঁহাদের দৃষ্টি-সীমা অতিক্রম করিলেন। হরকুমার বলিলেন,—"উঁহার অনুসরণ করিব কি?"

যোগানন্দ বলিলেন,—"নিষ্প্রয়োজন!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাঙ্‌নিষ্ঠা

অন্নপূর্ণার অসুখ হইয়াছিল; এখন ভাল হইয়াছে। শরীরের একটু দুর্ব্বলতা, একটু পাণ্ডুতা মাত্র আছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মূর্ত্তির কি শোভাই হইয়া উঠিতেছে। এখনও অন্নপূর্ণা বালিকা—এখনও অপ্রাপ্ত-যৌবনা। এখনই এত শোভা—এতই পূর্ণতা। আর অল্পকালমধ্যেই এই কিশোরী যৌবনের মোহময় রাজ্যে প্রবেশ করিবেন। না জানি, কি স্বাভাবিক অপরূপ সৌন্দর্য্য ইঁহাকে আশ্রয় করিবে।

মধ্যাহ্নকালে অন্নপূর্ণা একাকী বসিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের একখানি বঙ্গানুবাদ পাঠ করিতেছেন। প্রথম স্কন্ধের শেষভাগে রাজা পরীক্ষিতের মৃগয়াগমন, শমীকের গলে মৃতসর্প প্রদান, তদনন্তর ঋষিতনয় শৃঙ্গীর নিদারুণ অভিশাপ-ব্যাপার পাঠ করিলেন এবং সেই শাপের প্রভাবে পরীক্ষিতের পরিণামফলও মনে মনে আলোচনা করিলেন। অনেক কথা ভাবিতে লাগিলেন। বালক শৃঙ্গীর তেজস্বিতা, পিতার অপমান দর্শনে জ্বলন্ত ক্রোধ, স্বকীয় ক্ষমতায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস ইত্যাদি অনেক কথা তিনি মনে মনে আন্দোলন করিলেন। তাহার পর মনে মনে বলিতে লাগিলেন, —"ধন্য এই মুনি-বালক! ধন্য তাঁহার তেজ ও বাঙ্‌নিষ্ঠা। শমীক ঋষি পুত্রের শাপ-প্রদান-ব্যাপার জ্ঞাত হইয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন এবং পুত্রের এই ব্যবহারে নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবিকই রাজা পরীক্ষিৎ বড়ই অন্যায় কাজ করিয়াছিলেন। তিনি বিজ্ঞ, প্রবীণ, ধার্ম্মিকবর; বৃদ্ধ ঋষির প্রতি তাঁহার এ ব্যবহার ভাল হয় নাই; এরূপ অন্যায় ব্যবহারের শাস্তি না হইলে, ন্যায়ময় ভগবানের সুবিচারের কলঙ্ক

হইবে যে। শৃঙ্গীর অভিসম্পাতে রাজার দুষ্কর্ম্মের সমুচিত শাস্তি হইয়াছে। শৃঙ্গীকে নিমিত্ত-কারণ করিয়া ভগবান্ রাজাকে বিহিত শাস্তি প্রদান করিয়াছেন। শৃঙ্গী এরূপ রাগ না করিলে ভাল হইত বটে, কিন্তু তাঁহার ক্রোধ অন্যায় বা অসঙ্গত বলা যায় না। সার্থক তেজ এই ঋষিবালকের। কোথায় প্রবল-প্রতাপ মহারাজ-চক্রবর্ত্তী পরীক্ষিৎ, আর কোথায় আশ্রম-পালিত দরিদ্র মুনি-নন্দন শৃঙ্গী। অথচ বিশ্বাস, রাজার প্রভূত বল-বিক্রমে যাহা না হইবে, বালকের মুখের কথায় তাহা হইবেই হইবে। বালকের অবিচলিত বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার বাক্য কখনই বিফল হইবে না। বালক জানিতেন, রাজার হয়-হস্তী, সৈন্য-সেনাপতি, অস্ত্রশস্ত্র কিছুই তাঁহাকে বালকের ক্রোধাগ্নির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। বাক্য সকলেই সারাদিন ব্যয় করে, তাহার কয়টা ফলে? রাগ করিয়া লোক লোককে নিরন্তর গালি দেয়, তাহার কয়টা গালি সফল হয়? কিন্তু শৃঙ্গীর বিশ্বাসও যেমন অটল, তাঁহার বাক্যও তেমনই সফল। কি করিলে এরূপ বাঙ্‌নিষ্ঠা জন্মে? বাক্য-কথনের ক্ষমতা লাভ করিয়া যদি তাহা এরূপ ফলবান্ করিতে না পারা যায়, তবে বৃথা বাক্য-কথনের শক্তি। বাক্য সত্য ভিন্ন যেন কদাপি মিথ্যা না হয়, ইহাই আমার প্রার্থনা। কিন্তু শৃঙ্গীর ন্যায় ক্রোধভরে কাহারও অনিষ্টসাধনোদ্দেশে যেন তাহার কখন অপব্যবহার করিতে না হয়।"

তিনি যখন এইরূপ আলোচনা করিতেছেন, সেই সময়ে নীলরতন বাবু তথায় প্রবেশ করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বই পড়িতেছ বুঝি? সারাদিন পড়া ভাল নয়। এখনও শরীর ঠিক সারে নাই, আবার মাথা ধরিয়া অসুখ হইতে পারে।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"পড়িতেছিলাম বটে, কিন্তু এখন আর পড়িতেছি না বাবা। একটা কথা ভাবিতেছি। তুমি আমাকে বলিয়া দেও, কি করিলে কোন কথাই মিথ্যা না হয়, কি করিলে যাহা বলা যায়, সকলই সফল হয়।"

নীলরতন হাসিয়া বলিলেন,—"বড় শক্ত কথা। এ কালে তা আর বড় দেখা যায় না। এ কালের মানুষের সকল কথাই নিষ্ফল, যদি এক আধটা কখন সত্য হয়, সে জানিবে দৈবাৎ।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"কেন বাবা, এ কালটার কি দোষ? আগেও চন্দ্র-সূর্য্য ছিলেন, এখনও আছেন, আগেও দেবতা-বামুন ছিলেন, এখনও আছেন। এখন তবে মানুষের কথার শক্তিলোপ হইল কেন?"

নীলরতন বলিলেন,—"মানুষ এখন বড় পাপী, বড় অধার্ম্মিক হইয়াছে। যে ব্যক্তি জীবনে কখন পাপ করে না, পরের উপকার ভিন্ন অপকার করে না, ভ্রমেও কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করে না, স্বার্থের ভাবনা ভাবে না, ভুলিয়া বা পরিহাসেও মিথ্যা কথা কহে না, নিয়ত বাক্যসংযম অভ্যাস করে, সত্য ছাড়া কথা নাই বলিয়া জানে, কথা মুখ হইতে বাহির হইলেই সত্য হইবে বলিয়া বিশ্বাস করে, সর্ব্ববিষয়েই যে লোক নিষ্ঠাবান্, তাহারই বাঙ্‌নিষ্ঠা হওয়া সম্ভব। এ কালে সে রকম লোকও নাই, কথার সফলতাও নাই।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"তুমি যাহা বলিলে বাবা, তাহা তো এখনও করা যাইতে পারে। তাহার একটাও তো অসাধ্য কার্য্য নহে। তবে বাবা, এখন সেরূপ বাঙ্‌নিষ্ঠ লোক দেখা যায় না কেন?"

নীলরতন বলিলেন,—"দেখা যে নিতান্ত যায় না, এমন নহে। দৈবাৎ দুই এক জন সংসারত্যাগী সাধু মহাত্মা এখনও দেখা যায়, তাঁহাদের বাঙ্‌নিষ্ঠা অদ্ভুত। তোমার যে দিন কঠিন পীড়া হইয়াছিল, সে দিন কে তোমাকে বাঁচাইয়াছিলেন জান? উমাশঙ্কর ঠাকুর সে দিন তোমার রোগশান্তি করিয়া আমাদের সকলের জীবন দান করিয়াছিলেন। তোমার অজ্ঞানের ও বিকারের ভাব দেখিয়া আমরা সকলেই ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছিলাম। এমন সময় উমাশঙ্কর আসিয়া আমাদের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন এবং তোমাকে নিজেও দর্শন করিলেন। তাহার পর আমাদের বলিলেন, 'আপনারা স্থির হউন, ভয়—চিন্তা ত্যাগ করুন।' তিনি এক আসনে উপবেশন করিলেন এবং কিয়ৎকাল ধ্যানে মগ্ন থাকিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তদনন্তর এক অঞ্জলি গঙ্গাজল মন্ত্রপূত করিয়া তোমার সকল শরীরে সেচন করিয়া দিলেন। তখনই তিনি চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, 'কালি প্রাতে অন্নপূর্ণা সুস্থ হইবেন। ঔষধাদির প্রয়োজন নাই।' তাহাই ঠিক হইল। পরদিন প্রাতে তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া শয্যায় উঠিয়া বসিলে। আমরা আনন্দে স্বর্গ হাতে পাইলাম। এরূপ বাঙ্‌নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত এখন বড় বিরল।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "ঐ—ঐ সন্ন্যাসী—" অন্নপূর্ণা বুঝিলেন, উমাশঙ্করের নাম উচ্চারণ করিতে তাঁহার রসনা অশক্ত। তিনি চেষ্টা করিয়া সে নাম বলিয়া উঠিতে পারিলেন না। মনে মনে বড় লজ্জা হইল। কেন সহসা এ পরিবর্ত্তন ঘটিল? আবার বলিলেন,

—"ঐ সন্ন্যাসী বাস্তবিকই মহাপুরুষ।" অন্নপূর্ণা আরও কি বলিতেন, কিন্তু বলা হইল না। বদন নত করিলেন।

এ কি লজ্জা? কোন অপরাধ নহে, কোন দুষ্কর্ম নহে, তথাপি এ কি লজ্জা! একটা নাম উচ্চারণ করিতে এক জন শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তির প্রসঙ্গ ব্যক্ত করিতে এ কি সঙ্কোচ! সঙ্কোচ অমূলক ও অকারণ হইলেও ইহার কার্য্য বড়ই নিশ্চিন্ত ও মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন-পরিচায়ক। এক জনকে এক জন ভালবাসে। তাহাতে লজ্জার কোন কারণ নাই সত্য। যদুকে হরি বড় ভালবাসে; যদু কাদম্বিনীকে বড় ভালবাসে; কাদম্বিনী রামলালকে বড় ভালবাসে; এরূপ ঘটনা নিত্য ঘটিয়া থাকে এবং তাহা ব্যক্ত করিতে কেহই কুণ্ঠিত, সঙ্কুচিত ও লজ্জিত হয় না। কিন্তু যদি সেই ভালবাসার মধ্যে এমন কোন আকর্ষণ থাকে, যাহা লোকে জানে না বা লোককে না জানানই দরকার, সেখানেই লজ্জা ও সঙ্কোচ দেখা দেয়। যেখানে আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা একটু অধিক দূর যায় বা যাইতে চাহে, সেখানে লজ্জা ও সঙ্কোচ দেখা দেয়। যেখানে প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতা না থাকিলেও তাদৃশ অবস্থা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়, সেইখানেই লজ্জা ও সঙ্কোচ দেখা দেয়। যেখানে অনুরাগ অনুভূতপূর্ব্ব ও অকল্পিতপূর্ব্ব মিষ্টতা উপলব্ধি করে, সেইখানেই লজ্জা ও সঙ্কোচ দেখা দেয়। অন্নপূর্ণা! লজ্জা ও সঙ্কোচ তোমাকে অধিকার করিয়াছে। সুতরাং তোমার হৃদয়-ভাব যেমন করিয়াই তুমি প্রচ্ছন্ন কর না কেন, আর তাহা কাহারও বুঝিতে বাকী থাকিতেছে না। যাহাকে তুমি সহায় জ্ঞান করিতেছ, তাহাই এখন তোমার বিরুদ্ধাচারী। যে লজ্জা ও সঙ্কোচকে তুমি হৃদয়ভাবের সংগোপক মনে করিতেছ, বস্তুতঃ তাহারাই সেই হৃদয়ভাবের প্রকাশক।

আমরা দেখিয়াছি, উমাশঙ্করও স্বয়ং এই লজ্জা ও সঙ্কোচের অধীন হইয়া পড়িয়াছেন। সন্ন্যাসিন্! তোমার হৃদয়ে এ অননুভূত-পূর্ব্ব অনুরাগ কেন জন্মিল? ইহা কি তোমার পরিগৃহীত জীবনের অনুকূল? অন্নপূর্ণা! তোমার হৃদয়ে এ অননুভূতপূর্ব্ব অনুরাগ কেন জন্মিল? তুমি বিভবশালী গৃহস্থ-তনয়া। সন্ন্যাসীর সহিত তোমার মিলন কখনও সম্ভবপর কি? তোমাদের উভয়েরই অনুরাগের ক্রমোন্নতি দেখিতেছি বটে, কিন্তু জানি না, ইহার পরিণাম কিরূপ হইবে। আমরা কার্য্যের লিপিকারক মাত্র। বর্ত্তমান দেখিয়া ভবিষ্যতের অনুমান করিতে আমাদের অধিকার নাই। সুতরাং আমরা কি বলিব? কিন্তু বর্ত্তমান ব্যাপারসমূহ তোমাদের ভবিষ্যৎ আশার বড়ই বিরোধী।

কন্যার এইরূপ সঙ্কোচ দেখিয়া নীলরতন কিছু অনুমান করিতে পারিলেন কি? তিনি চতুর, বুদ্ধিমান্। এ অনুমান তিনি আরও পূর্ব্বেই করিয়াছেন। কিন্তু কন্যার হৃদয়-জাত এই প্রবৃত্তির বেগ নিরুদ্ধ করিতে তাঁহার ইচ্ছা নাই। এই অনুরাগ প্রবর্দ্ধিত হইতে না দেওয়াই তাঁহার পক্ষে বিধেয় হইলেও তিনি তাহা করিতেছেন না। অঙ্কুরেই এই মনোবৃত্তিকে দলিত করিয়া দেওয়াই তাঁহার কর্ত্তব্য হইলেও তিনি তাহা করেন নাই।

হৃদয়ভাব সম্পূর্ণরূপে পরিব্যক্ত করিতে না পারিয়া অন্নপূর্ণা নিরস্ত হইলেন এবং বদন বিনত করিলেন। নীলরতন বলিলেন, "বাস্তবিকই মা, ঐ সন্ন্যাসী উমাশঙ্কর প্রকৃত মহাপুরুষ। বাঙ্নিষ্ঠা-লাভের সদুপায় তিনি সম্যক্ জ্ঞাত আছেন, অতএব তাঁহার নিকট এ সম্বন্ধের কথা উত্থাপন করিলে তুমি অনেক সদুপদেশ লাভ করিতে পারিবে।"

অন্নপূর্ণা নীরব। ঘটনাক্রমে এই সময়ে উমাশঙ্কর একটি কাগজের পুরিয়া হাতে করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং নীলরতন বাবুর হস্তে তাহা প্রদান করিয়া বলিলেন, "আপনি অকৃত্রিম মুক্তা-ভস্ম সংগ্রহ করিতে বলিয়াছিলেন। ইহা যে ব্যক্তির নিকট পাইয়াছি, তাহাতে অকৃত্রিম বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।"

নীলরতন তাহা গ্রহণ করিলেন। উমাশঙ্কর অন্নপূর্ণার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "শরীর ক্রমে সবল বোধ হইতেছে?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "হাঁ।"

নীলরতন বলিলেন, "আমরা এখনই তোমার কথা বলিতেছিলাম। অন্নপূর্ণা জানিতে চাহেন, কি করিলে বাক্‌সিদ্ধি লাভ করা যায়। আমার যাহা ধারণা, তাহা আমি বলিয়াছি। কিন্তু এ সকল বিষয়ে তোমার অভিপ্রায়ই বিশেষ সমাদরণীয়। এই জন্য আমি তোমার নিকট হইতেই এ বিষয়ক উপদেশ লইতে বলিয়াছি।"

উমাশঙ্কর বলিলেন, "বড় শক্ত কথা আপনারা উত্থাপন করিয়াছেন এবং কঠিন বিষয়েই আমাকে অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে আজ্ঞা করিতেছেন।"

উমাশঙ্কর একবার অন্নপূর্ণার মুখের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, সেই সুন্দর বদন প্রীতিপূর্ণভাবে তাঁহারই মুখের দিকে চাহিয়া সাগ্রহে তাঁহার বাক্য

শ্রবণ করিতেছে। তিনি চাহিবামাত্র সে বদন একটু লজ্জা-সহকৃত সঙ্কুচিতভাবে নত হইয়া পড়িল।

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আমার বিশ্বাস, সঙ্কল্পই ইহার প্রধান সাধন। সঙ্কল্প হইলেই মনের দৃঢ়তা জন্মে; মনের দৃঢ়তা হইলে অসাধ্যসাধন হওয়াও অসম্ভব নহে। কখন অলীকবাক্য বলিব না, ইহাই যাহার আন্তরিক সঙ্কল্প, তাহার মুখ দিয়া কখনই অলীকবাক্য নির্গত হয় না। যাহার বাক্যের বন্ধন নাই, বিচার নাই এবং কোন গুরুত্ব নাই, তাহার বাক্য অসার ও নিষ্ফল। বাক্য ব্রহ্মস্বরূপ। বেদ বাঙ্ময়, শাস্ত্র বাঙ্ময়, মন্ত্র বাঙ্ময়, স্তব-স্তুতি বাঙ্ময়। সংসার বাক্যসূত্রে গ্রথিত। সুতরাং এই বাক্য নিতান্ত পবিত্র সামগ্রী। ইহাকে সামান্য কার্য্য জ্ঞান করিয়া অসতর্কভাবে ইহার ব্যবহার করিলে মানবের কোনই আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে পারে না; অতএব বাক্‌শক্তি-সম্পন্ন হইলেও বাগ্‌যন্ত্রের অপব্যবহারকারী মন চিরদিন পশুরই সমতুল্য থাকিয়া যায়। জীবনের মধ্যে বাক্‌সংযম বড়ই শুভলক্ষণ ও প্রধান সাধনা। মৌনী ও নিরুদ্ধ-বাক তপস্বী সত্বর জ্ঞানের অধিকারী হইয়া থাকেন। শিথিলভাষীরা চিন্তাহীন ও গাম্ভীর্য্যহীন হইয়া থাকেন। তাদৃশ অবস্থায় কখনই হৃদয়ের বল বা একাগ্রতা লাভ করা যায় না। অতএব বাক্য বড়ই সাবধানতার সহিত ব্যবহৃত হওয়া বিধেয়। যিনি বাগ্‌যন্ত্রের ব্যবহারে সম্পূর্ণ সাবধান, তাঁহার বাঙ্‌নিষ্ঠা লাভ করা সম্ভব। আমি সংক্ষেপে এতদ্বিষয়ক প্রধান সাধনের বিষয় বলিলাম মাত্র। ইহার সহকারী আরও অনেক উপায় আছে। কিন্তু সহসা এ সিদ্ধিলাভের জন্য অন্নপূর্ণার এত আগ্রহ কেন জন্মিল?"

নীলরতন বলিলেন,—"বল মা, হঠাৎ তোমার মনে এ বিষয়-জ্ঞানের বাসনা কেন জন্মিল?"

লজ্জায় অন্নপূর্ণার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি অধোমুখে উত্তর দিলেন,—"ভাগবত পাঠ করিতে করিতে একটা ভাবের উদয় হইয়াছে। কিছু নয়।"

সে স্থানে বসিয়া থাকা অন্নপূর্ণার পক্ষে বড়ই কঠিন হইয়া পড়িল। উঠিয়া যাইতে—উমাশঙ্কর কথা বলেন, তাহা শুনিবার লোভ ত্যাগ করিয়া উঠিয়া যাইতেও ইচ্ছা নাই। কিন্তু বড় লজ্জা—আর বসিয়া থাকা যায় না। অন্নপূর্ণা উঠিলেন।

নীলরতন বলিলেন,—"কোথা যাও মা?"

"পিসীমার কাছে।"

দুই পদ অগ্রসর হইলেন। লজ্জায় ও সঙ্কোচে পায় পায় জড়াইয়া যাইতে লাগিল। একবার ফিরিয়া উমাশঙ্করের মুখের পানে চাহিয়া দেখিবার নিমিত্ত প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তথাপি দেখিতে ভরসা হইল না। বইখানি লইয়া যাইবেন ইচ্ছা ছিল। দুই চারি পা যাওয়ার পর তাহা মনে পড়িল। কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া বই লইতে সাধ্য হইল না। এ অবস্থা সুখময় কি দুঃখময়? অন্নপূর্ণা বাহিরে আসিয়া বেগে প্রস্থান করিল।

একবার সেই দেবী-প্রতিমার প্রতি চাহিয়া দেখিতে উমাশঙ্করের ইচ্ছা ছিল। যতক্ষণ তিনি দৃষ্টি-সীমার মধ্যে ছিলেন, ততক্ষণ তাঁহার সে সাহস হইল না। যখন সাহসে ভর করিয়া দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন সে দেবী দৃষ্টিসীমা ছাড়াইয়া গিয়াছেন। একটি অস্ফুট দীর্ঘনিশ্বাস তাঁহার হৃদয় ভেদ করিয়া নিঃসৃত হইল। মুখখানি একটু নিষ্প্রভ হইল।

এই সময়ে হরকুমার বাবু বাহির হইতে বলিলেন, "দাদা কোথায় গো?"

নীলরতন বলিলেন,—"এস ভায়া।"

হরকুমার বাবু তথায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"দেশ হইতে দুইটি পূর্ব্বপরিচিত আত্মীয় আসিয়াছেন। তাঁহারা প্রথমতঃ কাশীবাস করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। তাঁহাদের জন্য বড়ই ব্যস্ত ছিলাম। এ জন্য এ দিকে আসা হয় নাই। মা কোথায়? আর কোন অসুখ নাই তো?"

নীলরতন বলিলেন,—"অন্নপূর্ণা এখানেই ছিলেন, এই চলিয়া যাইতেছেন। ভালই আছেন।"

হরকুমার বলিলেন,—"বাবাজি! যোগেশ্বরী দেবীর সহিত আজি আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছিল কি?"

উমাশঙ্কর উত্তর দিলেন,—"না।"

হরকুমার আবার বলিলেন,—"আপনাকে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন আছে। আজিই দরকার। ছেলেবেলার কোন কথা আপনার মনে পড়ে কি?"

"কি রকম কথা?"

"কোন লোকের কথা? কাহারও চেহারা? কাহারও মুখের ভাব?"

উমাশঙ্কর চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"একটি সুন্দরী নারীর কাতর মুখ আমার মনে পড়ে। তিনি আমার কে বা তাঁহার কি হইল অথবা কেনই তাঁহাকে আর দেখিতে পাই না, তাহা আমার মনে নাই। ভাবিলেও সে কথা আমার মনে পড়িবে না। ইহা ছাড়া আর কোন কথা আমার মনে হয় না।"

হরকুমার আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"আচ্ছা, সেই

যে মুখ মনে পড়ে, তাহার অনুরূপ মুখ আর কোথায় আপনি কখন দেখিয়াছেন?"

"না।"

"সে মুখখানি কেমন, তাহা আপনি বুঝাইয়া দিতে পারেন?"

উমাশঙ্কর কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না। তবে ইদানীং যদি কখন দৈবাৎ আমি আমার প্রতিরূপ দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমার চক্ষু দেখিয়া সেই মুখখানি, সেই চক্ষু দুটি মনে পড়ে।"

হরকুমার অনেকক্ষণ চিন্তা করিতে থাকিলেন। তাহার পর বলিলেন,—"আমি আগামী কল্য হইতে কিছু দিনের জন্য এ দেশে থাকিব না। আপনাদের নিকট আপাততঃ বিদায় লইতেছি।"

উমাশঙ্কর জিজ্ঞাসিলেন,—"কত দিন আপনার বিলম্ব হইতে পারে বোধ করেন?"

হরকুমার বাবু বলিলেন,—"ঠিক বলা যায় না। এক মাস ছাড়াইবে বোধ হয় না।"

নীলরতন জিজ্ঞাসিলেন,—"যে দুই জন আত্মীয় আসিয়াছেন, তাঁহাদের থাকিবার স্থানাদি সব ঠিক হইয়াছে?"

হরকুমার বলিলেন,—"আপাততঃ এক রকম বন্দোবস্ত হইয়াছে। যদি কোন অসুবিধা হয়, তাহা হইলে তুমি ব্যবস্থা করিয়া দিবে। সন্ধ্যার পরে তাঁহারা তোমার সহিত আলাপ করিতে আসিবেন। তাঁহারা বিশিষ্ট ব্যক্তি। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাদের দেশের প্রধান অধ্যাপক—অতি সুপণ্ডিত। সঙ্গে তাঁহার ছেলে। তাঁহারা আমার প্রভু-পুত্রের দৌরাত্ম্যে উৎপীড়িত হইয়া দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। পুত্র নবীন-কৃষ্ণের সহধর্ম্মিণীকে আমার পূর্ব্ব-প্রভু শ্যামলাল হরণ করিবার চেষ্টা করেন। পুত্রবধূটি কোথায় পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন বা অপর কোন দুষ্টের হাতে পড়েন, তাহার ঠিক নাই। তাহার পর শ্যামলাল নিরীহ পিতা-পুত্রের উপর অযথা অত্যাচার করিতে থাকেন। ইঁহারা সমাজ-ভ্রষ্ট, কলঙ্কিত, গৃহ-শূন্য হইয়া অবশেষে কাশী আসিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের বিপদের সবিশেষ বৃত্তান্ত তাঁহাদের মুখেই ক্রমশঃ শুনিতে পাইবে।"

নীলরতন বলিলেন,—"তবে ত বড় ভয়ানক অবস্থাতেই ইঁহারা পড়িয়াছেন।"

হরকুমার বলিলেন,—"যত দূর হইতে হয়। আপাততঃ আমার উদ্দেশ্য বিষয়ের কোন কোন সংবাদ সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট জানিতে পারিয়াছি। সংবাদ আমাদের অনুকুল নহে। বাধা অনেক। কিন্তু আমি হতাশ হই নাই।"

উমাশঙ্কর বলিলেন, "আমি এক্ষণে বিদায় হই।"

নীলরতন বলিলেন,—"এস বাবা।"

তাহার পর হরকুমারের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"চল ভায়া, আমরাও একবার মা গঙ্গার কাছে যাই।"

তাঁহারা নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অষ্টম খণ্ড—হলাহল

প্রথম পরিচ্ছেদ

পরিবর্ত্তন।

শ্যামলাল বাবুর সেই সুবিস্তৃত বৈঠকখানার শোভা ও সমৃদ্ধি যেন অনেক কমিয়া গিয়াছে। যে সরঞ্জাম দেখা গিয়াছিল, এখন তাহার অনেক নাই; সেই পূর্ব্বস্থানে পূর্ব্বকালের ব্র্যাকেট রহিয়াছে, কিন্তু তাহার উপর যে মেকের ক্লকটি বসান ছিল, সেটি আর এখন নাই; তাহার স্থানে একটি বাজারে টাইম-পিস্ বসিয়াছে। ঘরের কোণগুলিতে ব্রঞ্জ পেডাষ্টেলের উপর মারবেল পাথরের ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গীর অনেকগুলি অতি সুন্দর নারী-মূর্ত্তি বসান ছিল। আধারগুলি এখনও আছে, কিন্তু সে ছবিগুলি আর সেখানে নাই। ঘরের মধ্যস্থলে একখানি লেজারসের ওভাল মারবেল টেবিল ছিল। সে স্থানে এখন একখানি কাপড়-ঢাকা কাঠের টেবিল বসিয়াছে। ইত্যাদিরূপ অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। শ্যামলাল বাবু যে শয্যায় বসিয়া আছেন, তাহারও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে। একখানি রূপার পায়া ও দাণ্ডিযুক্ত প্রকাণ্ড খাটে মুর কোম্পানীর আইরণ ম্যাট্রেস্ লাগান ছিল। সেই গদীর উপর কিংখাপের চাদর মোড়া ও চারিদিকে মকমলের বালিস দেওয়া একটি বিছানা ছিল। সেই স্থানে এখনও বিছানা আছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বভাব কিছুই নাই। সেগুণ-কাঠের একখানি খাটের উপর

খেরোর গদী ও বালিস দেওয়া একটি বিছানা সেই স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

শ্যামলাল বাবু বেলা তিনটার সময় একাকী সেই শয্যায় বসিয়া আছেন। তাঁহার আকৃতিরও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে ; তাঁহার দেহের কুত্রাপি সৌন্দর্য্যের সমাবেশ ছিল না ; তথাপি নিশ্চিন্ততা ও স্বকীয় প্রাধান্য-বোধ-সম্ভূত যে একটু সতেজ ভাব ছিল, এক্ষণে তাহার এক বিন্দুও নাই। দারুণ চিন্তার ভার তাঁহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। তাঁহার লোচন-যুগল প্রভাশূন্য হইয়াছে, মুখমণ্ডল উদ্বেগময় হইয়াছে, ললাটে চিন্তার রেখাপাত হইয়াছে, শরীরের স্থূলতা প্রভৃত পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে, দৃষ্টি কেমন উদাস ও সন্দিগ্ধ হইয়াছে। এখন হঠাৎ তাঁহাকে দেখিলে নূতন লোক বলিয়াই মনে হয়। শ্যামলালের পার্শ্বে এখন সে রূপার সরপোস ও জিঞ্জিরযুক্ত, রজতকলিকা ও সোনার মুখনলবিশিষ্ট প্রকাণ্ড রূপার গুড়গুড়ি নাই। এখন একটি বাজারে সামান্য গড়গড়া তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। আর পূর্ব্বকালে নিরন্তর তাঁহার কলিকা হইতে যে সুরভিময় ধূমরাশি উদ্গত হইত, এখন তাহার কিছুই নাই। তিনি কখন্ তামাক টানিবেন মনে করিয়া ভৃত্যগণ যে আয়োজন সতত করিয়া রাখিত, এখন প্রয়োজনেও তাহা আর পাওয়া যায় না। শ্যামলাল কলিকায় হাত দিয়া দেখিলেন, তাহা শীতল। ডাকিলেন,—"রামা! রামা!" কেহ উত্তর দিল না, কেহও আসিল না। শ্যামলালের কণ্ঠস্বরেরও ভয়ানক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সে অত্যুচ্চ, সতেজ, রাসভনাদবিস্তারী কণ্ঠ হইতে এখন ক্ষীণ, ভীত ও কাতর ধ্বনি নিঃসৃত হইতেছে। রামা আসিল না, কেহ উত্তর দিল না। যাহার আজ্ঞা ব্যক্ত হইবামাত্র অসাধ্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইলেও লোকের অভাব হইত না, আজি তাঁহার তামাক সাজিয়া দিবার জন্যও একটা লোক অগ্রসর হইল না।

কেহ আসিল না দেখিয়া, শ্যামলাল সেই অগ্নিশূন্য হুঁকাই দুই চারিবার টানিলেন। তাহার পর একটু চিন্তা করিয়া আবার ডাকিলেন,—"রামা—রামা—রামা!" এবারও কোন উত্তর নাই। শ্যামলাল আবার কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। তাহার পর শয্যা ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং ধীরে ধীরে দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। শ্যামলালের কি ভয়নাক পরিবর্ত্তন! শ্যামলালের আর সে উচ্চ দেহ নাই। মাজা-ভাঙ্গা বৃদ্ধের ন্যায় তাঁহার দেহের ঊর্দ্ধভাগ সম্মুখে নত হইয়া পড়িয়াছে। দ্বার-সন্নিধানে গমন করিয়া, শ্যামলাল আবার ডাকিলেন,—"রামা—রামা!"

এবার রামা উত্তর দিল। বলিল,—"কি? যাচ্ছি!"

শ্যামলালের মনে বড় ক্রোধের উদয় হইল। কিন্তু তিনি সে ক্রোধ সংবরণ করিয়া বলিলেন,—"একটু তামাক চাই!"

রামা উত্তর দিল না। শ্যামলাল ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্বশয্যায় উপবেশন করিলেন। মনে অনেক চিন্তার উদয় হইল। তিনি স্বকীয় এই দশা-বিপর্য্যয়ঘটিত অনেক আলোচনা করিলেন। মনে মনে স্থির করিলেন, অদ্য তিনি তাঁহার পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং তাঁহার নিকট সকল কথা জানাইয়া প্রতীকারের উপায় করিবেন।

এক মাস হইল, শ্যামলাল স্বকীয় সমস্ত সম্পত্তি পত্নীর নামে লিখিয়া দিয়াছেন। এই অল্পসময়ের মধ্যেই তাঁহাকে নানারূপ ক্লেশের অধীন হইতে হইয়াছে। জীবনে যে স্ত্রীর তিনি কখন মুখ দর্শন করেন নাই, সেই স্ত্রীর নিকট তিনি দুই দিন গিয়া আপনার দুঃখের কথা জানাইয়াছেন; কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই। প্রথম প্রথম তিনি ক্রোধভরে হরিচরণের সর্ব্বনাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন; কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। হরিচরণ তাঁহার ভাব দেখিয়া আর তাঁহার নিকটে আইসেন না। দ্বারবান্, ভৃত্য, সহিস, কোচ্‌ম্যান কেহই আর তাঁহার কথা শুনে না। অগত্যা তাহাকে এখন অনেক অনুসন্ধান করিয়া হরিচরণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়। সাক্ষাতে হরিচরণ বলিয়াছেন,—"আপনি যদি আমার সহিত রাগারাগি করেন, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই। আমি আপনার ভালর জন্যই দানপত্র লেখাইয়া দিয়াছি। আপনি তাহা ভাল মনে না করিলে আমি নাচার। এক্ষণে গিন্নী আমার নিকট কাগজপত্র বুঝিয়া লইয়া আমাকে বিদায় দিলে আমি চলিয়া যাই।"

শ্যামলাল বুঝিয়াছেন, তাহাকে কোন কথা বলায় ফল নাই। তখন তিনি নিতান্ত কাতরভাবে তাহার নিকট আর কিছু হউক, না হউক, দিনান্তে এক বোতল মদের দাম ভিক্ষা করিয়াছেন। উত্তরে হরিচরণ বলিয়াছে যে, গিন্নীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার কোন কাজই করিবার ক্ষমতা নাই, একটি পয়সাও ব্যয় করিতে অধিকার নাই! কাজেই গিন্নীর কাছে দরবার না করিলে বা তাঁহার হুকুম বাহির করিতে না পারিলে শ্যামলালের আর কোন ভরসাই নাই।

শ্যামলাল অনন্তরজাত সকল ঘটনাই মনে মনে আন্দোলন করিলেন। স্থির করিলেন, আর একবার গিন্নীর সহিত দেখা করিয়া, তাহার পর এদিক্ ওদিক্ যাহা হয় করিয়া ফেলিবেন।

সুখের কোন পারাবতই আর শ্যামলালের সমীপাগত হয় না। যাহারা নিরতিশয় সৎপরামর্শ মনে করিয়া শ্যামলালকে দানপত্র-প্রদান-বিষয়ে প্রণোদিত করিয়াছিল, তাহারা আর কেহই দেখা দেয় না। যাহারা নূতন নূতন নারীর সন্ধান দিয়া ও সর্ব্বনাশ ঘটাইয়া শ্যামলালের অনুগ্রহ উপভোগ করিত, তাহারাও আর আইসে না। শ্যামলালের এই দশা-বিপর্য্যয়ে দেশের লোক কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছে। কুলবালাগণ কতকটা ভরসা পাইয়াছে।

স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শ্যামলাল বুঝিয়াছেন, বিধুমুখী সুন্দরী বটেন। সে যে সকল নারী লইয়া মত্ত থাকে, তাহাদের তুলনায় বিধুমুখী বিদ্যাধরী। স্ত্রীর সহিত আলাপ-পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করিতে তাহার বড়ই বাসনা হইয়াছিল, কিন্তু কোনই সুযোগ হয় নাই। দাসীর দ্বারা দূর হইতে দুই একটি কথা বলিয়াই বিদায় করিয়াছেন।

রামা অনেক বিলম্বে ছোট কলিকা করিয়া একটু তামাক সাজিয়া আনিল। শ্যামলাল দুই চারিবার তাহা টানিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং ধীরে ধীরে স্বকীয় অন্তঃপুরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

অন্তঃপুরদ্বারে যে ভোজপুরী পাহারাওয়ালা ছিল, সে শ্যামলালকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল বটে, কিন্তু কোন সম্মান প্রকাশ করিল না। হতভাগ্য শ্যামলাল তাহাতে লক্ষ্য না করিয়া দ্বার অতিক্রম করিবার উপক্রম করিলে সে বাধা দিয়া কহিল, "বাবু কোথা যাইতে চাহেন ?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"অন্দরে।"

পাহারাওয়ালা বলিল,—"হুকুম নাই।"

শ্যামলাল বলিল,—"আমার অন্দরে আমি যাইব, কাহার সাধ্য বারণ করে ? কে তোমাকে এরূপ হুকুম দিয়াছে ?"

পাহারা। দেওয়ানজী সাহেব।

শ্যামলাল। অন্য লোক সম্বন্ধে হুকুম দিয়া থাকিবে। আমার সম্বন্ধে কখনই এরূপ হুকুম দেয় নাই।

পাহারা। আপনারই সম্বন্ধে।

শ্যাম। আমার সম্বন্ধে ?

পাহারা। আজ্ঞে হাঁ।

দুর্ব্বল, হীনপ্রকৃতি, চরিত্রবলহীন শ্যামলাল সাহস করিয়া আর কোন কথা বলিতে পারিল না। অহো, কি দুর্ভাগ্য !

ঘটনাক্রমে সেই সময়ে সারদা দাসী সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সে গিন্নীর কোন বার্ত্তা লইয়া হরিচরণের নিকট গমন করিয়াছিল। সে বোঝা হরিচরণের কাছে নামাইয়া, তাহার প্রদত্ত বোঝা লইয়া এক্ষণে আবার গিন্নীর কাছে ফিরিতেছে। তাহার রকম-সকম চিরদিনই বেয়াড়া, আজিকালি তাহার মাত্রা বড়ই বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার প্রভুতাও সর্ব্বত্র অযথা বর্দ্ধিত হইয়াছে। সে সর্ব্বেশ্বরী গিন্নীর দক্ষিণহস্তস্বরূপা; তাঁহার সকল কার্য্যই সারদার মন্ত্রণা-সাপেক্ষ। এই বৃহৎ সংসারের এক প্রকার মালিকস্বরূপ হরিচরণ বাবুও সারদার সহিত প্রণয়-সূচক ব্যবহার করেন এবং নিরতিশয় আত্মীয়বৎ সম্ভাষণাদি দ্বারা তাহাকে পরিতৃপ্ত করেন। তাঁহাদের আত্মীয়তা বড়ই প্রগাঢ় হইয়াছে বলিয়া অনেকেই বিশ্বাস করে। সুতরাং সারদার মান ও অহঙ্কার বড়ই বাড়িয়া উঠিয়াছে। মানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সারদার চালচলনও বাড়িয়া উঠিয়াছে। সে হাল্কা প্রাণের লোক হইলেও বাহিরে সে এখন খুব ভারী হইয়াছে। সামান্য চাকরবাকরদের সঙ্গে সে এখন কথাই কহে না। সাহস করিয়া অন্যান্য দাস-দাসী তাহার সহিত কথা কহিতে অগ্রসরও হয় না। নিতান্ত দায়গ্রস্ত হইলে, দায়মুক্তির জন্য সকলে সারদার শরণাগত হয় বটে ; কিন্তু লোকে বড়ই সাবধানভাবে তাহার সহিত কথা কহে ; নিতান্ত ভীত ও সঙ্কুচিতভাবে তাহার করুণা উদ্রেক করে।

সারদাকে দর্শনমাত্র সেই ভোজপুরী দ্বারবান্ সসম্ভ্রমে সেলাম করিল এবং শ্যামলাল বাবুকে সারদার পথ ছাড়িয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইতে ইঙ্গিত করিল। গর্ব্বিতা বিলাসিনী সারদা হেলিতে হেলিতে, দুলিতে দুলিতে, শ্যামলালের নিকটস্থ হইয়া বলিল,—"কে গা, বাবু যে ! তা এখানে কেন ?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"সারদা, একবার গিন্নীর সহিত দেখা করিবার দরকার হইয়াছে। তা এ হতভাগা দ্বারবান্ বেটা আমাকে যাইতে দিতে চায় না। দেখ দেখি এর আক্কেল।"

সারদা একটু বক্র হাসি হাসিয়া বলিল,—"তা বাবু, গিন্নীর হুকুম না পাইলে ও যেতে দিতে পারে কি ?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আমার বাড়ী-ঘর, আমার বিষয়, আমার স্ত্রী ; আমি যেখানে খুসী যাইব, ে জন্য কাহারও হুকুম লইবার দরকার কি ?"

সারদা এবার মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল,—"জন্মে কখন যার মুখখানাও দেখিতে না বাবু, এখন তার কাছে ঘন ঘন যাওয়া-আসার দরকার পড়েছে। কিন্তু সে তোমার এ শুক্‌না আদর ভালবাসে না, তোমার যখন তখন যাওয়া-আসাও পছন্দ করে না। কাজেই হুকুম না পেলে দ্বারবান্‌ যেতে দেবে কেন ?"

শ্যামলাল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"হায়! কাল দানপত্র লিখে দিয়েই আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মেরেছি। গিন্নীর তো মনে করা উচিত যে, এ সকলই আমার। আমার কৃপায় তিনি আজি এই ঐশ্বর্য্যের মালিক হইয়াছেন।"

সারদা বলিল, "গিন্নী তা মনে করেন না। তিনি মনে করেন, তাঁর অদৃষ্টে এই ঐশ্বর্য্যলাভ ছিল, তাই আপনার এমন মতি হইয়াছিল। এজন্য আপনার কাছে কৃতজ্ঞ হওয়ার কোন দরকারও তিনি দেখিতে পান না। হরিচরণ বাবুর যত্নে এ সকল কাজ ঘটিয়াছে। সে জন্য তিনি হরিচরণ বাবুর নিকট সমূহ কৃতজ্ঞ। হরিচরণ বাবু দিন-রাত্রি সকল সময়েই অন্দরে যাওয়া-আসা করেন; সে বিষয়ে কোন বারণ নাই; কারও হুকুমেরও কোনও প্রয়োজন নাই।"

শ্যামলাল আবার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"হরিচরণের যে অধিকার আছে, আমার নিজ বাড়ীতে সে অধিকার নাই ?"

সঙ্গে সঙ্গে সারদা বলিল,—"তা তো নাই-ই বাবু। হরিচরণ বাবু গিন্নী ঠাক্‌রুণের প্রাণের বন্ধু।"

শ্যামলাল সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিলেন,—প্রাণের বন্ধু—হরিচরণ—যখন তখন যাওয়া-আসা করে, এ সকল কি কথা সারদা ?"

সারদা কহিল,—"কথা যাহাই হউক, তাতে আপনার আর ক্ষতি-বৃদ্ধি কি ? আপনি তো কখনই গিন্নীকে ভালবাসিতেন না, কখন একটা মুখের কথাও কহিতেন না। সে লোকের যে-ই বন্ধু হউক, আর যার সঙ্গেই তার মনের মিল হউক, তাতে আপনার কি ?"

শ্যামলাল এ সকল সংবাদই শুনিয়াছেন, জানিয়াছেন, বুঝিয়াছেন। তথাপি কথাটা তাঁহার মুখের উপর এরূপ প্রকাশ্যভাবে বলায় তিনি একটু ব্যথিত হইলেন। শ্যামলাল অনেকক্ষণ অধোবদনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সারদা বলিল,—"গিন্নীর সঙ্গে দেখা করা যদি নিতান্তই দরকার হয়ে থাকে, তা হ'লে এখন আপনি ফিরে যান। আমি তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা ঠিক ক'রে সময়মত আপনার কাছে খবর পাঠাইয়া দিব।"

শ্যামলাল জিজ্ঞাসিলেন,—"এখন দেখা হবে না তবে ? কেন, এখন দেখা হওয়ায় কি দোষ ছিল ?"

সারদা বলিল,—"দোষ কিছু নয়—তবে এখন ঘণ্টাখানিকের মধ্যে হরিচরণ বাবুর আসিবার কথা আছে। সুতরাং এখন কোনমতেই আপনার যাওয়া হইতে পারে না।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"কেন হইতে পারে না ? আইসে হরিচরণ, আমার সম্মুখেই আসিবে। তাহার কথা আমার সম্মুখেই সে বলিবে। হরিচরণ কখন্‌ আসিবে, তাহার ঠিক নাই; সে চাকর, আমি মুনিব। তাহার জন্য আমি স্বামী দরজা হইতে ফিরে যাইব ?"

সারদা বলিল,—"হরিচরণ বাবুর আগমন আপনার সম্মুখে হইতে পারে না। তাঁহার কথাবার্ত্তা অনেক রকম; লোকের সাম্‌নেও তাহা হয় না। চাকর তিনি ছিলেন বটে, কিন্তু গিন্নী তাঁহাকে এখন প্রাণের প্রভু বলিয়া জ্ঞান করেন। সুতরাং আপনার এখন চলিয়া যাওয়া ভিন্ন উপায় নাই। তা আপনি যান এখন, আমি আপনাকে একবার দেখা করার সুযোগ করিয়া সংবাদ দিব।"

সারদা চলিয়া গেল। অধোবদনে কাপুরুষ নরাধম শ্যামলাল এই বাক্য শ্রবণ করিল। সে কখনই মনুষ্য ছিল না; সুতরাং মনুষ্যোচিত কোন ভাবই তাহার হৃদয়ে স্থান পাইল না। কিয়ৎকাল দাড়াইয়া থাকিয়া সে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কাপুরুষ।

নিঃসহায় ও নিরুপায় শ্যামলাল ধীরে ধীরে ও অধোবদনে বাহিরের বৈঠকখানায় ফিরিয়া আসিবার সময় একবার আস্তাবলের নিকটস্থ হইলেন এবং জারিফ কোচ্‌ম্যানকে দেখিতে পাইয়া, তাহাকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। কোচম্যান সাহেব তাঁহার কাচা দাড়িগুলি তখন আয়না ধরিয়া দেখিতেছিলেন এবং একখানি কাঠের চিরুণী লইয়া আঁচড়াইতেছিলেন। শ্যামলাল বাবু ডাকিতেছেন দেখিয়াও কোচ্‌ম্যান হাতের কাজ ফেলিয়া উঠিয়া আসিল না। শ্যামলাল অনেকক্ষণ তাহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া পুনরায় তাহাকে ডাকিলেন।

এবার কোচ্‌ম্যান হাতের আয়না ও চিরুণী ফেলিয়া শ্যামলাল বাবুর নিকটে আসিল এবং জিজ্ঞাসিল,—"বাবু, কি খবর ?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"একখানা গাড়ী জোতাও, পাল্কী গাড়ী হইলেই চলিবে। থানার দারোগা উমেশ বাবুকে একবার আমার নাম করিয়া আনিতে হইবে।

কোচ্‌ম্যান ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল,—"তা আমি পারি না তো বাবু। দেওয়ান বাবুর হুকুম ছাড়া গাড়ী জুতিবার উপায় নাই—গাড়ী কোথাও পাঠাইবারও উপায় নাই।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"বটে। আমি যদি নিজে চড়িয়া কোথাও যাই ?"

কোচ্‌ম্যান বলিল,—"দেওয়ান বাবুর কাছে দরবার না করিয়া আপনাকেও গাড়ী দিতে আমাদের এক্তিয়ার নাই।"

শ্যামলাল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "জরিফ ! তুমি অনেক দিনের চাকর। আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। সাবেক লোকের মধ্যে কেবল তুমিই আছ। তুমি এ বিপদে আমার একটু সাহায্য না করিলে আমি প্রাণে মারা যাই।"

জরিফ কোচ্‌ম্যানও ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিল, "আমি এ সংসারের অনেক দিনের চাকর। কর্ত্তার আমলেও আমি এ সংসারে চাকরী করিয়াছি। তখন আপনি হন নাই। আপনাকে ছেলেবেলায় আমি অনেক কোলে-পিঠে করিয়াছি, ধরিয়া ধরিয়া ঘোড়ায় চড়িতে, গাড়ী হাঁকাইতে শিখাইয়াছি। বাবু, ইদানীং আপনার এ সকল দুর্দ্দশা দেখিয়া আমারও বড় কষ্ট হয় বটে; কিন্তু কি করা যাইবে, সকলই নসিবের ফল।"

এক মাসের মধ্যে এই বৃহৎ পুরীতে শ্যামলাল আর-এক দিনও কাহার সহানুভূতি পান নাই। আজি এই বৃদ্ধ কোচ্‌ম্যানের মুখে কতকটা সমবেদনার আভাস পাইয়া তাঁহার চিত্ত যেন অনেকটা আশ্বস্ত হইল। বলিলেন,—"আমার নসিব চিরদিনই বড় ভাল ছিল। হঠাৎ এমন হইল কেন ?"

জরিফ বলিল,—"আপনার নসিব খুবই ভাল ছিল। লোকে এঁটোকুড়ের পাত স্বর্গে যাওয়া বলে, তাহাই আপনার হইয়াছিল। সে অনেক কথা—আপনি তাহার কিছুই জানেন না, জানিবার এখন কোন দরকারও দেখিতেছি না। এক লোক সব কথা জানিতেন—আপনার সাবেক দেওয়ান হরকুমার বাবু। আপনি তাঁহাকে তাড়াইয়াছেন। আর জানি আমি—আমি এখনও আছি। কিন্তু সে কথা যাউক, আপনার মত নসিব দুনিয়ায় আর কখনও কারও ঘটে নাই। কিন্তু আপনি বড় পাপী। খোদা হক্ বিচারের মালিক। এত পাপ যে করে, তাহার কি কখন ভাল হয় ?"

এ কথা শ্যামলাল আর কখন শুনেন নাই। এক দিন হরকুমার বাবু তাঁহাকে ধীরে ধীরে, অতীব কোমলভাবে তাঁহার পাপের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া শ্যামলাল নিরতিশয় বিরক্তির সহিত তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন ; সেই অবধি অকৃত্রিম হিতৈষীর আর সন্ধান নাই। আজি সেইরূপ কথা ; জরিফ কোচ-ম্যান সুস্পষ্টরূপে তাঁহার মুখের উপর ব্যক্ত করিল। সে দিন দেওয়ান হরকুমার বাবুর উপর বড় রাগ হইয়াছিল ; কিন্তু আজি জরিফের কথা শুনিয়া বড় চিন্তার উদয় হইল। বলিলেন,—"আমি কি বড়ই পাপী ? আমি কি অনেক পাপ করিয়াছি জরিফ ? হাঁ, করিয়াছি বটে। কিন্তু তুমি কি মনে কর, সেই পাপের জন্যই আমার এত সাজা হইতেছে ?"

জরিফ বলিল,—"তার আর ভুল নাই। সাজা আপনার ঢের হইয়াছে, আর এর চেয়ে বেশী সাজা হইতে পারে না ! আপনাকে বলাই ভাল। দুনিয়ার সকল লোকই জানে, আপনি অবশ্য কতক জানেন। এ সকল কথা এখন বুঝাইয়া বলায় দোষ নাই। আপনি পরম ধার্ম্মিক হরকুমার বাবুকে তাড়াইয়া ছোটলোক সয়তান হরিচরণের উপর কাজের ভার দিলেন। সে ছোটলোক আপনার সকল কাজের ভার লইল। আপনি বিবাহ করিয়াছিলেন, অথচ সে স্ত্রীর এক দিন মুখ দেখিতেন না, দুটা মুখের কথাও কখন কহিতেন না। আপনার পেয়ারের হরিচরণ আপনার স্ত্রীর সহিত প্রসক্তি ঘটাইল। দিনরাত্রি তাহারা আমোদ-আহ্লাদ চালাইতে লাগিল। আপনি অনেক সতীলক্ষ্মীর সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, সেই পাপে আপনার ঘরের লক্ষ্মী ভ্রষ্টা হইল। আপনি বাহিরে হয় ত একটা কদাকার কৈবর্ত্ত-মাগীর সঙ্গে বসিয়া মদ খাইতেছেন, এ দিকে আপনার ঘরের মধ্যে পরীর মত খপসুরত বিবিকে কুকুরে ভোগ করিতে লাগিল।—"

শ্যামলাল হাঁ করিয়া জরিফের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সমস্ত কথা শুনিয়া, সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন,—"বুঝিয়াছি জরিফ, আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে।"

জরিফ বলিল,—"সর্ব্বনাশ আপনার যতদূর হইতে

হয়, তাহাই হইয়াছে। হরিচরণ আর আপনার পরিবার একমন একপ্রাণ। তাহারা কৌশল করিয়া আপনার নিকট বিষয়-পত্র এমনই করিয়া লিখাইয়া লইয়াছে যে, বাড়ীতে পেটের দুটা ভাত আর পরিবার একখানা কাপড়েরও আপনার আর দাওয়া নাই।"

বিধুমুখীর সহিত হরিচরণের অবৈধ প্রণয় সম্বন্ধে শ্যামলাল অনেক দিন হইতে অনেক প্রকার সংবাদ পাইয়া আসিতেছিল। ইদানীং তৎসম্বন্ধে তাহার আর কোনই সন্দেহ ছিল না। কিন্তু নরাধম শ্যামলাল সে বিষয়ে কখনই মনোযোগী হয় নাই, দেখিয়াও তাহা দেখে নাই এবং তাহার প্রতিবিধান করিবার কোন আবশ্যকতা সে অনুভব করে নাই। অদ্য এ সকল কথা শুনিয়া তাহার মনে বিশেষ কোন ক্লেশোদয় হইল না; কিন্তু স্বকীয় অবস্থা চিন্তা করিয়া তাহার মনে বড়ই কষ্ট হইল। বলিল,—"যে ভুল হইয়াছে, তাহার তো আর হাত নাই। এখন কি উপায়ে আমার বিষয়-আশয় আবার আমার হাতে আইসে, তাহার কোন পরামর্শ দিতে পার?"

জরিফ বলিল,—"বিষয়-আশয় হাতে আসিবার কোনই উপায় দেখিতেছি না। আপনার স্ত্রীর মৃত্যু না হইলে এ বিষয় আপনার হাতে আসিতে পারে না। তাঁহার মৃত্যু হইলে আপনি হকদার হইয়া সব ফেরৎ পাইতে পারেন।"

শ্যামলাল বলিল,—"তা সে তো সুস্থ, সবল, বেশ আছে। মরিবার কোন লক্ষণই তো তাহার দেখ যাইতেছে না।"

জরিফ বলিল,—"আমরা হইলে কখনই যমের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতাম না। নিজেই যম হইয়া তাহার সকল কাজ চুকাইয়া দিতাম।"

শ্যামলাল ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলিল,—"কোন সুযোগ নাই। অন্দরে লোক যাইতে পায় না। কিরূপে কাজ শেষ করা যায়? বিশেষ আমার আর লোক নাই। আমার হুকুম কেহ শুনে না। হাতে পয়সা নাই, আমি কি করিতে পারি?"

জরিফ একটু বিরক্তির সহিত বলিল,—"করিলে আপনি সবই করিতে পারেন; কিন্তু আপনি নিতান্ত বদ্‌বক্ত; কাজেই আপনাকে দিয়া কিছুই হইবে না। আপনি এত বড় শরীর লইয়া গোস্তের বোঝা টানিয়া বেড়াইতে পারেন, আর নিজের স্ত্রী ঘরে বসিয়া ব্যভিচার করিবে, বুকে বসিয়া দাড়ি উপ্‌ড়াইবে, আপনার বিষয় লইয়া কুত্তার সহিত ইয়ারকি দিবে, আপনাকে পথের ভিখারী করিয়া রাখিবে, আপনি সে সকল বসিয়া দেখিতে, ভুগিতে, সহিতে পারিবেন, তবু তার প্রতীকার করিতে পারিবেন না? ধিক্ আপনাকে! বাবু, একটা স্ত্রীলোক আর একটা ভেড়ুয়া এই কাণ্ড করিতেছে, আর আপনি উপায় কি ভাবিয়া অন্ধকার দেখিতেছেন। কিছু যদি না পারেন, তাহা হইলে গলায় দড়ী দিয়া মরুন না কেন, সে তো সোজা কাজ।"

জরিফ চলিয়া গেল। শ্যামলালের কোন উত্তর শুনিবার নিমিত্ত সে আর অপেক্ষা করিল না। বড় তীব্র তিরস্কার। এমন স্পষ্ট কথা, এমন সহজ উপদেশ শ্যামলাল জীবনে আর কখন শুনেন নাই। তাঁহাকে কেহ কখন কোন হিতকথা বলিতে সাহস করে নাই; সাহস করিয়া কেহ কিছু বলিবার উপক্রম করিলেও শ্যামলালের বিরক্তি দেখিয়া সে সঙ্কুচিত ও নিরস্ত হইয়াছে এবং হয় ত তাহার সেই চেষ্টা হেতু তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছে। আজি ক্ষুদ্র কোচ্‌ম্যান, সামান্য দাস, তাঁহাকে উচিত কথা শুনাইয়া দিল। দুঃখে ও দুরবস্থায়, বিপদে ও যাতনায় শ্যামলালের অনেক প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সেই শ্যামলাল ও এই শ্যামলালে কতই প্রভেদ। তিনি সমস্ত কথা শ্রবণ করিলেন ও তৎসমস্ত উক্তির যাথার্থ্য অনুভব করিলেন।

ধীরে ধীরে ভাবিতে ভাবিতে শ্যামলাল বৈঠকখানার দিকে অগ্রসর হইলেন। জরিফ যাহা বলিল, মনে মনে তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। বিধুমুখী আর হরিচরণ দুই জনকে মারিয়া ফেলিবার উপায় করিব কি? তাহারা ব্যভিচারনিরত, তাহাতে ক্ষতি কি? সে জন্য শ্যামলাল তাহাদের নিপাত করিবার আবশ্যকতা অনুভব করিলেন না। বিধুমুখী না মরিলে পুনরায় তাঁহার সম্পত্তি হস্তগত হইবে না; এটা ঠিক কথা এবং এ জন্য তাহাকে মারিয়া ফেলা উচিত বটে। তাহারই চেষ্টা দেখিব কি? স্বয়ং তাহা পারিব কি? কাহাকেও বলিব কি? থাক্ না কেন আর দুই দিন, যদি তাহাদের দয়া হয়—যদিই দয়া করিয়া বিধুমুখী আমার সম্বন্ধে কোন সুবিচার বা কোন সদ্ব্যবস্থা করে। আর একবার যেমন করিয়া হউক দেখা করিতে হইবে।

জরিফ যে আর একটা কথা বলিল, তাহার অর্থ কি? এঁটোকুড়ের পাত স্বর্গে যাওয়া কি? বলিল, সে অনেক কথা—আমি তাহার কিছুই জানি না। হরকুমার বাবু জানিতেন। আর এক দিন হরকুমার বাবুও এইরূপ একটা কি কথা বলিয়াছিলেন। তিনি যেন বলিয়াছিলেন, 'এরূপ না ঘটিলে এই সম্পত্তি হয় ত আমার হাতে নাও থাকিতে পারিত।

অবশ্যই এ সকল কথার কোন অর্থ আছে। কি সে অর্থ ?

হতভাগা শ্যামলাল সেই স্থানে বসিয়া আপনার জীবনের সকল কথাই ভাবিতে লাগিল। এত অল্প-সময়ের মধ্যে এত পরিবর্ত্তন ও এরূপ দুর্দ্দশা কখন কাহারও ঘটে কি না সন্দেহ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পশু।

রাত্রি ৮টা। বিধুমুখী সেই প্রকোষ্ঠে একখানি সোফার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া বিদ্যাসুন্দর পাঠ করিতেছেন। ঘরের কড়ি হইতে বিলম্বিত দুইটি শোভনীয় আলোকাধার হইতে অতি সুনির্ম্মল আলোকরাশি নিঃসৃত হইতেছে। ঘরের চারিদিকে রমণীয় তৈলচিত্র-সমূহ বিলম্বিত। অনেক চেয়ার, অনেক ড্রয়ার, অনেক টেবিল, অনেক হোয়াট-নট ইত্যাদি ঘরের চারিদিকে যথাযথ স্থানে নিপতিত। অতি উৎকৃষ্ট কার্পেট দ্বারা ঘরের মেজে সমাচ্ছন্ন।

চিত্রগুলি বিলাতী এবং শিল্পোন্নতি ও শিল্পকৌশল-প্রদর্শনের ওজরে নিরতিশয় অশ্লীলতা ও কুরুচিপূর্ণ। কুরুচি শব্দের আজিকালি যেরূপ অপব্যবহার হইয়াছে, তাহাতে অনেক সুরুচিসঙ্গত সদ্ব্যাপারও কুরুচির মধ্যে পড়ে। আমরা কুরুচি শব্দের এই দুর্গতি দেখিয়া ইহার প্রকৃত অর্থ-বিনির্ণয়ে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছি। এখন কাজ অপেক্ষা কথায় দোষ বেশী ; ভিতর অপেক্ষা বাহিরেই বিচার্য্য বেশী। রাম নামক এক ব্যক্তি শ্যামের ভগ্নীপতির খুড়তুতো ভাই ; রাম এই সম্পর্ক ধরিয়া শ্যামকে দেখিতে পাইলেই, শ্যামের ভগ্নী যিনি যেখানে থাকুন না কেন, তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া অনেক গ্রাম্য রসিকতা করে—যাহা মনে ভাবিলেও রুচির দোষ হয়। এমন কথাও স্পষ্ট করিয়া বলে, এমন সকল রহস্য করে, যাহা শুনিলে স্পষ্টই উপলব্ধ হয় যে, শ্যামের ভগ্নীবর্গের সহিত রামের নিশ্চয়ই অবৈধ আত্মীয়তা ঘটিয়াছে। কিন্তু রামও জানেন, শ্যামও জানেন, পাড়ার দশ জন লোকও জানেন যে, রামের সহিত শ্যামের ভগ্নীগণের প্রণয়ের অঙ্কুরও নাই ; তাঁহাদের এই প্রণয়লীলা মুখের সীমা কখন ছাড়ায় না এবং এইরূপ মৌখিক রসিকতায় কখন কোন গুরুতর অনিষ্টও ঘটে না। হয় ত অনেক সময়ে এমনও ঘটে যে, শ্যামের যে এক ভগ্নী ছিলেন, তিনিও অনেক দিন যমালয়ে গমন করিয়াছেন. তাঁহার আর ভগ্নী নাই ও ছিল না। তথাপি রাম তাঁহার ভগ্নীদের আক্রমণ করিতে ছাড়িবে না এবং সেই সকল কাল্পনিক কুলবালাকে স্বকীয় শয্যায় আনিয়া, তাঁহাদের সহিত রঙ্গরসের বিরাম দিবে না। বর্ত্তমান কালের আইন অনুসারে রামের এই ব্যবহার নিতান্ত কুরুচি-মাখা ; রাম অসভ্যের একশেষ, ভদ্র-সমাজের নিতান্ত অযোগ্য। রাম এরূপ না হইয়া যদি শ্যামের ভগ্নীগণকে নিজের সহোদরার সমান বলিয়া ব্যক্ত করিত, অথচ সুযোগ পাইলে তাহাদের মন চুরি করিয়া নৈশ-লীলায় প্রমত্ত হইত বা তাঁহাদের সহিত সংগোপনে প্রেমের রহস্যালাপ করিত, অথবা তাঁহাদের মধ্যে যিনি যিনি বিধবা, তাঁহাদের ক্লেশে উৎকণ্ঠিত হইয়া অশ্রুপাত করিতে থাকিত কিংবা তাঁহাদের সন্তান-মুখ-সন্দর্শনের উপায় করিয়া দিয়া শেষে ভ্রূণ-হত্যা বা আত্মহত্যার পথ দেখাইয়া দিত, তাহা হইলেও রামকে নিন্দা করিবার কোনই কারণ ছিল না, রামের তাদৃশ অনুষ্ঠানসমূহ কখনই সুরুচি-বিগর্হিত বলিয়া পরিগণিত হইত না এবং ভদ্রসমাজও কদাপি রামকে দুরাত্মা বলিয়া মনে করিতে পারিত না। সুতরাং এই রুচি বড়ই গোলমেলে জিনিস এবং ইহার সু ও কু নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে নিতান্ত সুকঠিন। আমরা কিন্তু সকলে রামকে পূজনীয় ও ভক্তিভাজন ব্যক্তি বলিয়াই মনে করি এবং একেলে রামকে নরকের কীট ও অস্পৃশ্য বলিয়াই বোধ করি।

বিধুমুখীর ঘরের ছবিগুলি কুরুচিপূর্ণ বলিয়া আমরা উল্লেখ করিয়াছি। শিব, দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতির ছবি আমরা বুঝি ভাল এবং তাহার কোন স্থানেই কুরুচি দেখি না। কিন্তু হাল আইনে ঐ সকল ছবি নিতান্ত কুরুচি-মাখা ; কেন না, শিবের গায়ে জামা নাই। কালী রমণী-মূর্ত্তি, অথচ উলঙ্গ। অহো ! কি ভয়ানক ! কি ঘৃণিত ! কি বিভীষিকাময় ! কিন্তু ভিনসের যে নগ্নমূর্ত্তি, আদম এবং হবার যে উলঙ্গ প্রতিকৃতি, নেডস্‌গণের যে বারিসিক্ত বস্ত্রবিহীন আলেখ্য, নিদ্রিতা বিউটির যে অবসাদময় বিস্রস্ত ভাব, প্রমোদকাননের সুন্দরীগণের যে বিলাসময়ী ভঙ্গী, স্নানার্থিনী দেবীর যে অপরূপ বেশ, মজ্জমানা বিলাসিনীর সাগরবক্ষে পুরুষ-স্কন্ধাশ্রয়ে যে মনোহর অবস্থান, সে সকলই সুরুচি-সঙ্গত ; কারণ, তৎসমস্ত চিত্রকরের অত্যদ্ভুত নিপুণতার ও চিত্র-শিল্পের চরমোৎকর্ষের পরিচায়ক। হায় বিদ্যা ! তোমার দোহাই দিয়া কত সময়ে কত বীভৎস কাণ্ডই জগতে ঘটিয়া থাকে। তাহাই হউক।

বিধুমুখী উপুড় হইয়া পুস্তক পাঠ করিতেছেন।

আমাদের এক জন পূর্ব্বপরিচিত সুরুচিসম্পন্ন সাম্যবাদী সুহৃদ্ আছেন। তিনি বিধুমুখীর এই অবস্থা আলোচনা করিয়া বলেন, পুস্তক পাঠ করিতেছেন, ভালই করিতেছেন; কিন্তু পুস্তকখানি বিদ্যাসুন্দর না হইয়া ব্রাহ্মসঙ্গীত হইলেই ভাল হইত। আমরা বলি, যে নারী পাপের পঙ্কিল হ্রদে গা ভাসাইয়াছে, যে রমণী নারীজাতির সার ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া নারকীয় আমোদে প্রমত্ত হইয়াছে, যে স্বেচ্ছায় সমাজের ও কুলের মস্তকে পদাঘাত করিয়া অধর্ম্মের পথ আশ্রয় করিয়াছে, তাহার অধীত পুস্তকের আর ভাল-মন্দ কি? যাহার সকলি মন্দ, তাহার নিকট কিছুই ভাল প্রত্যাশা করা অসঙ্গত। আমরা দেখিতে পাইতেছি, আমাদের এই সাম্যবাদী বন্ধু এই স্থানে রোষকষায়িত-লোচনে আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে বলিতেছেন, কেন, বিধুমুখীর অপরাধ কি? তাঁহার এই বয়স, এই রূপরাশি, এ সকল বিধাতৃদত্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার তিনি কেন করিবেন না? এক প্রেতের সহিত তাঁহার সামাজিক বিবাহ হইয়াছে। সে বিকট বানর এই সুন্দরী-শিরোমণির মুখও দেখে না, দেখিলেও সে এই রূপসী যুবতীর কখনই উপযুক্ত নায়ক বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য নহে। তোমাদের নিন্দিত সমাজের মস্তকে বাম-চরণাঘাত করিয়া তিনি যদি স্বেচ্ছামত বিহার করিতে থাকেন, তিনি যদি তোমাদের ঘৃণিত নিয়মে বদ্ধ না থাকিয়া, স্বাধীনভাবে প্রাকৃতিক সুখে ভাসিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সে জন্য কখনই দোষী করিতে পার না। বরং বিধুমুখী এক জন নারী-রিফরমার-রূপে আদৃত, পূজিত ও গৌরবান্বিত হইবার উপযুক্ত। আমরা কি বলিব? এ উৎকট বিপদে আমাদের চুপ করিয়া থাকা ছাড়া আর কি সৎপরামর্শ আছে?

বিধুমুখী যে ভঙ্গীতে শয়ন করিয়া গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন, তাহা বর্ণনীয় নহে, কিন্তু আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত সাম্যবাদী বন্ধু শ্মশ্রুরাশি দুলাইতে দুলাইতে হস্তদ্বয় উত্তোলন করিয়া বলিতেছেন, "ছাড়িও না; ছাড়িও না ভাই হে! এ অতুলনীয় সৌন্দর্য্য সন্দর্শনের সুযোগ ত্যাগ করিও না। ঘৃণিত লালসা পরিবর্জ্জন করিয়া, কুৎসিত চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া, মনকে পবিত্রতায় পরিপূর্ণ করিয়া কল্পনা-নয়ন উন্মীলন কর এবং কেবল সৌন্দর্য্য-সন্দর্শন করিতে করিতে বিধাতৃ-প্রদত্ত নয়নযুগলের সার্থকতা ও সদ্ব্যবহার কর। ঐ দেখ, বিগলিতবসনা বিধুমুখী বামচরণের উপর দক্ষিণচরণ দুলাইতে দুলাইতে ঈষৎ হাস্যজনিত প্রস্ফুরিত অধরোষ্ঠ ও আরক্তিম গণ্ড সমন্বিতভাবে কেমন অপার্থিব শোভা বিস্তার করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কর্ণের হীরক-দুল কেমন ভুবনমোহনভাবে দুলিতেছে এবং তাঁহার চরণের মল পরস্পর আহত হইয়া কেমন মধুর ধ্বনি সমুৎপাদন করিতেছে। আর দেখ নবীনার—।"

আমরা কুরুচিসম্পন্ন দুরাত্মা; আমাদের সুরুচিসম্পন্ন বন্ধু মহাত্মা আরও যে সকল শোভাসন্দর্শনের প্রস্তাব করিতেছিলেন, তাহা দর্শন করা আমাদের অসাধ্য; সুতরাং আমাদের ভাগ্যের নিন্দা করিতে করিতে বন্ধুবরকে একাকী সৌন্দর্য্যপর্য্যালোচনা করিবার ভার দিয়া আমরা নিরস্ত হইতেছি।

অতি সুস্নিগ্ধ দাক্ষিণানিল আসিয়া বিধুমুখীর কলেবরকে শীতল করিতেছে। পার্শ্বস্থিত রজতপাত্র হইতে সময়ে সময়ে এক একটি তাম্বুল লইয়া তিনি চর্ব্বণ করিতেছেন। আতর ও এসেন্সের গন্ধে ঘর আমোদিত। বিধুমুখী একাকিনী, নিকটে কোনও দাসীও নাই।

ধীরে ধীরে নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে এক কৃষ্ণকায়, কুৎসিতদর্শন ও স্থূলকলেবর পুরুষ তথায় প্রবেশ করিল এবং নীরবে দূরে দাঁড়াইয়া সেই অধ্যয়ন-নিরতা সুন্দরীর শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে, এই পুরুষ শ্যামলাল। শ্যামলাল অতৃপ্ত-নয়নে স্বকীয় পত্নীর রূপরাশি দর্শনে বিস্মিত হইতে থাকিল। আরও দুই চারিবার শ্যামলাল পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিয়াছে এবং প্রত্যেকবারই সে অনুমান করিয়াছে, তাহার স্ত্রী বাস্তবিকই সুন্দরী। আজি সে বুঝিতেছে, তাহার পত্নীর ন্যায় সুন্দরী সে আর কোথায়ও প্রত্যক্ষ করে নাই। তাহার স্ত্রী নারীজাতির রাণী হইবার যোগ্যা; তাহার স্ত্রী ভুবনমোহিনী। এই রূপসীর সহিত সে কখনও আলাপ করে নাই, এই ভুবনমোহিনীর প্রতি সে কখন ফিরিয়াও চাহে নাই এবং এই পূর্ণাঙ্গী নবীনাকে আপনার সামগ্রী বলিয়া সে কখন মনেও করে নাই। এই দুর্ল্লভ রত্ন উপেক্ষা করিয়া সে ইতরজাতীয়া, মলিনবেশা, এ নারীর দাসীরও অযোগ্যা নারীগণের সহিত কালপাত করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের চরণে প্রভূত অর্থোপহার প্রদান করিয়াছে, তাহাদিগকে আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত অনেক সময়ে অনেক দুষ্কৃতি সম্পাদন করিয়াছে এবং তাহাদের জন্য অনেক অধর্ম্ম ও অখ্যাতির ভার স্কন্ধে করিয়া বহন করিয়াছে।

দারিদ্র্য ও দুঃখে কঠোর হৃদয়ও কোমল হইয়া যায়, উচ্চ হইতে সহসা নিম্ন-প্রদেশে নীত হইলে মানব সহজেই পরিবর্ত্তনের প্রকৃতি উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়। সহসা ভাগ্য-পরিবর্ত্তন ঘটিলে, আপনার

পূর্ব্বাপরাধ সমস্তই এতাদৃশ দশা-বিপর্য্যয়ের মূলীভূত জ্ঞান করিয়া, মনুষ্য তদ্বিষয়ক সমালোচনায় সুখ দর্শন লাভ করে। শ্যামলালেরও সম্প্রতি এই অবস্থা ঘটিয়াছে। বদ্ধবাহু ও বদ্ধপদ দুর্দ্দান্ত দস্যুও যেমন কিয়ৎকালাবসানে আপনার সকল চেষ্টাই অনর্থক জানিয়া স্বকীয় অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে আপনার পূর্ব্বকৃত অসৎ কার্য্যসমূহ স্মরণ করে, তদ্রূপ শ্যামলালও আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাবিহীন এবং পরকীয় আয়ত্তাধীন দেখিয়া আপনার যাবতীয় উদ্যমের নিস্ফলতা উপলব্ধি করিয়াছে এবং ক্রমশঃ বুঝিতেছে যে, সে তাহার কর্ম্মফলেই এই দুর্দ্দশায় নিপতিত হইয়াছে। ইহার উপর জরিকের তীব্র বাক্যাবলীও তাহার প্রাণে বিঁধিয়াছে। তাহার হৃদয় কোমল, প্রকৃতিস্থ ও দীনহীন হইয়া আসিতেছে। এই অবস্থায় এইরূপ সময়ে নানাবিধ বিলাস-সামগ্রীপরিবেষ্টিতা সুন্দরী-শিরোমণি পত্নীকে দেখিয়া সে সকল কথাই ভুলিয়া গেল। সে কাপুরুষ, পশুতুল্য নির্ব্বোধ; সুতরাং তেজস্বিতা ও সৎসাহস-বিবর্জ্জিত। পত্নীর ব্যভিচার ও ধর্ম্মহীনতার কথা তাহার আর মনে হইল না; রূপের প্রখর উজ্জ্বলতায় তাহার সামান্য জ্ঞান-শক্তি ঝলসিয়া গেল; শোভার ভাণ্ডার সম্মুখে উন্মুক্ত দেখিয়া তাহার প্রাণ মন বিমোহিত হইয়া উঠিল। ক্রোধ নাই, প্রতিহিংসা নাই, অনিষ্ট-সাধন-বাসনা নাই। রূপোন্মত্ত শ্যামলাল স্বকীয় অপরাধের নিমিত্ত পত্নীর চরণে সবিনয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে এখন কৃত-সঙ্কল্প। হায় রূপ! তোমার কি বিমোহিনী শক্তি!

শ্যামলাল নীরবে অগ্রসর হইয়া পত্নীর নিকটস্থ হইল এবং তাঁহার অলক্ত-রাগরঞ্জিত মোহন-মল-পরিবেষ্টিত চরণযুগলে হস্তার্পণ করিল। সুন্দরী সভয়ে ব্যস্ততা সহ চরণদ্বয় অপসারিত করিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং ভীত অথচ উত্তেজিতভাবে বলিলেন, "এ কি! তুমি এখানে কেন? কে তোমাকে আসিতে দিল?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আমি তোমার স্বামী, আমি দ্বারবান্‌কে বলিয়া কহিয়া, সারদাকে জানাইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। এজন্য তুমি এমন করিতেছ কেন?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"এখানে এরূপে আসিতে তোমার কোনই অধিকার নাই। যে তোমাকে আসিতে দিয়াছে, তাহার নিশ্চয়ই দণ্ড হইবে। তোমার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছিল সত্য; কিন্তু আমি তোমাকে একবারও স্বামী বলিয়া মনে করি না। তুমি এখনই এখান হইতে দূর হও।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"বিধুমুখি! আমি তোমার নিকট অনেক অপরাধ করিয়াছি সত্য। যাহা হইবার হইয়াছে; আর আমি কদাপি কোনরূপ অন্যায় ব্যবহার করিব না। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"তোমার অপরাধের জন্য আমি কাতর নহি, তোমাকে ক্ষমা করিবারও আমার কোন প্রয়োজন নাই। তোমার সহিত পূর্ব্বেও আমার কোন সম্পর্ক ছিল না, এখনও নাই। তুমি কেন আমাকে ত্যক্ত করিতেছ? তুমি দূর হও।"

হতভাগ্য শ্যামলাল বলিলেন, "তোমার এত রূপ, এত শোভা, ইহা আমি কখন জানিতাম না। বিধুমুখি, আমি তোমার পায়ে ধরিতেছি, আমাকে চরণে স্থান দেও; আমি ক্রীতদাসের ন্যায় তোমার নিকটে থাকিব, প্রাণপণে তোমার মনের মত হইয়া চলিব, তোমার অনুমতি ছাড়া কোন কর্ম্মই করিব না, তুমি আমাকে কৃপা কর। আমার বিষয়-আশয় সমস্তই তোমাকে দিয়াছি, প্রাণ-মন-দেহও তোমাকে দিতেছি। আমি আর কিছুই চাহি না, তুমি আমাকে কৃপা কর। তোমার রূপে আমার হৃদয় ভরিয়া গিয়াছে, তোমার শোভায় আমার প্রাণ উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিধুমুখি! তুমি ছাড়া আর আমার কোন গতি নাই। এ চরণের দাসকে তুমি এমন করিয়া দূর করিও না।"

বিধুমুখী বলিলেন, "তোমার সহিত কথা কহিতেও আমি ঘৃণা করি। তুমি আমার সম্মুখ হইতে এখনই দূর হও। তোমাকে মনুষ্য বলিয়া আমি কখনই জ্ঞান করি না। তোমার ন্যায় ভল্লুকের সহিত প্রেমের কল্পনা করিতেও আমার শরীর শিহরিয়া উঠে। রামী বাগ্‌দিনী, দুর্গী জেলেনী, নিতী ধোপানী প্রভৃতি অপ্সরাগণ তোমার যোগ্য প্রেয়সী। তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হও। তোমার কুৎসিত আকার দেখিয়া আমার হাসি পাইতেছে; তোমার দেহের দুর্গন্ধে আমার বমি আসিতেছে; তোমার কথা শুনিয়া আমার গায়ে জ্বর আসিতেছে। তোমার সহিত প্রেমালাপ অসম্ভব। এক্ষণে তুমি কি চাও বল, দুইটা টাকা পাইলে তুমি বিদায় হইবে কি?"

শ্যামলাল বলিলেন, "না না বিধু! আমি টাকা চাহি না, সুখ-সম্পদ্ কিছুই চাহি না, কেবল চাহি তোমার কৃপা। তুমি আমাকে দয়া না করিলে আমি আত্মহত্যা করিব।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"তাহাতে বিশেষ ক্ষতি দেখিতেছি না। তোমার জীবনে আমার কোনই প্রয়োজন নাই; সুতরাং তুমি আত্মহত্যাই কর আর রোগেই মর, তাহাতে আমার ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছুই নাই। এক্ষণে কি করিলে দূর হইবে, তাহাই আমি জানিতে চাহি।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"তোমার ঐ চন্দ্রবদন একবার চুম্বন করিতে দাও, তাহা হইলে আমি আপাততঃ তোমার সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিব। আমি আর তোমাকে ত্যক্ত করিব না। আবার তোমার আদেশমত সময়ে আসিয়া তোমার রূপ-দর্শনে চরিতার্থ হইব।"

বিধুমুখী প্রথমতঃ হাঃ হাঃ শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। তাহার পর ক্রোধ সহকারে বলিলেন,—"আশ্চর্য্য স্পর্দ্ধা! তুমি নরকের প্রেত, তুমি মেথরাণীর নাগর। তুমি আমার মুখচুম্বন করিবে? দূর হও আমার সম্মুখ হইতে! যদি সহজে না যাও, আমি লোক দিয়া তোমাকে এখনই তাড়াইয়া দিব।"

যাহারা রূপোন্মত্ত হয়, তাহাদের মানাপমান, হিতাহিত কোন বোধই থাকে না। পাপীয়সী পত্নীকৃত এই অপমান শ্যামলালের কর্ণে স্থান পাইল না। সে চিরদিন প্রেম বা হৃদয়ের কোন কারবার কখনই করে নাই। ইন্দ্রিয়ভোগ সে করিয়া আসিয়াছে এবং প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত সে কাণ্ডজ্ঞান-পরিশূন্য হইয়াছে। এরূপ ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তির উত্তেজনা-পরতন্ত্র পশু কোন চিন্তাকেই মনে স্থান দিতে পারে না। শ্যামলাল কোন অপমানের কথা শুনিয়াও শুনিল না। সে বেগে গিয়া আপনার স্ত্রীকে বেষ্টন করিয়া ধরিল এবং বিধুমুখী কোনরূপ প্রতিবন্ধকাচরণ করিবার পূর্ব্বে সে তাহার বদনমণ্ডল পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিল।

অনেক কষ্টে বিধুমুখী আপনাকে শ্যামলালের বাহুমধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন এবং বেগে দূরে আসিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, "সারদা!.. রামমতি! নিস্তারিণি!"

তখনই অনেক দাসী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিধুমুখী ক্রোধ-কম্পিত-কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"এই হতভাগা শূকরটাকে এখনই আমার সম্মুখ হইতে দূর করিয়া দাও। যদি তোমরা না পার, তাহা হইলে দরওয়ান ডাকিয়া মারিতে মারিতে ইহাকে তাড়াইয়া দিতে বল। যাও নরাধম! এখনও মানে মানে প্রস্থান কর। তোমার অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। আমি তোমাকে লাথি মারিয়া দূর করিতাম, কিন্তু অনেক ধৈর্য্য ধরিয়া ক্ষমা করিলাম।"

তৎক্ষণাৎ দাসীরা শ্যামলালের উভয় হস্ত ধরিয়া টানিয়া আনিল। শ্যামলাল কহিলেন,—"বিধুমুখি! ভাবিয়া দেখ, আমি তোমার স্বামী।"

নিদারুণ ক্রোধের সহিত বিধুমুখী বলিলেন,—"তুই হতভাগ্য কুক্কুর! তুই আমার দাসের দাস হইবার যোগ্য নহিস্। আমার স্বামী তুই? আমার স্বামী আমি স্বয়ং স্থির করিয়া লইয়াছি। তাহার কাছে মনে বা ব্যবহারে আমি কদাপি অবিশ্বাসিনী নহি।"

শ্যামলাল একটা কথা কহিবার উদ্যোগ করিতেছিল; কিন্তু দাসী "চুপ চুপ আর কথায় কাজ নাই" বলিয়া তাহাকে সরাইয়া লইয়া গেল।

আমাদের পূর্ব্বপরিচিত সেই সাম্যবাদী বন্ধু মহাশয় বিধুমুখীর এই ব্যবহারের আলোচনা করিয়া বলিতেছেন, three cheers for this heroic lady! এই বীর-নারী রমণীজাতির অলঙ্কার। ইহার সুনীতি, সত্যবাদিতা মরাল-করেজ অর্থাৎ সৎসাহস, তেজস্বিতা, প্রেমময়তা সকলই অতুলনীয়। কবে এ অধঃপতিত দেশের ঘরে ঘরে এইরূপ রমণীরত্নের আবির্ভাব হইবে? আমরা উত্তরে বলিয়াছি, তাহার আর বড় দেরী নাই; তাঁহারা যেরূপ আড়েহাতে লাগিয়া সুনীতি প্রচার করিতেছেন, তাহাতে এ পুণ্যভূমি অচিরে এইরূপ মরাল-করেজশালিনী রমণীতে ছাইয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। তিনি আরও বলেন, "তোমাদের সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি কোন কাল্পনিক চরিত্রই এই বাস্তব নারীচরিত্রের নিকটস্থ হইতেও পারে না। এই নারীর কার্য্যকলাপ ভবিষ্যতে ভারতীয় সভ্য ললনার আদর্শ হইবে।" আমরা ভাবিতেছি, ভগবানের যাহা মনে আছে, তাহা তো হইবেই; তবে ভূমিকম্পটা আর একটু বেশী রকমের হইলেই ভাল হইত না কি? তিনি আরও বলেন, "The stupid beast is rightly served; সে বিশ্বাসঘাতক নরাধমের বামন হইয়া চাঁদ ধরার আশা করা উচিত হয় নাই। তবে বিধুমুখী লাথি না মারিয়া, কেবল লাথি মারিতাম বলিতেছেন, সে কাজটাও তাঁর মত বীর-নারীর পক্ষে ভাল হয় নাই। লাথি মারাই উচিত ছিল। He should have been kicked then and there."

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গাত্রদাহ

শ্যামলালকে দাসীরা তাড়াইয়া দিয়া আসিল। বিধুমুখী নিতান্ত উত্তেজিতভাবে একখানি কৌচের উপর বসিয়া পড়িলেন। হায় নারায়ণ! কেন তুমি সর্ব্বত্র পাপকে কুৎসিত করিয়া সাজাও না? কেন তোমার সৃষ্টিতে পাপের মূর্ত্তি অনেক সময়ে শোভাময়ী দেখিতে পাই? বিধুমুখী কৌচে বসিলেন, কিন্তু কি শোভা! ক্রোধ হেতু তাঁহার গণ্ড-যুগলের আরক্তিম ভাব, লোচনদ্বয়ের উদ্দীপ্ত ও উত্তেজিত শ্রী, শিথিল-বন্ধন কবরীভ্রষ্ট বেণীর অনায়াস-পাত-জনিত শোভা, বসন-ভূষণের বিশৃঙ্খলতা-জনিত অপরূপ বিন্যাস, বিপুল বক্ষঃস্থলের ঘন শ্বাস-জনিত উন্নতি-অবনতি, অঙ্গ সকলের আবেগজনিত ঈষচ্চাঞ্চল্য, সকলই অপূর্ব্ব—সকলই পরম শোভা-ময়। যে নারী কুষ্ঠিনীর ন্যায় অস্পৃশ্য, যাহার হৃদয় বিষধরের ন্যায় কালকূটে ভরা, যাহার আচরণ স্মরণ ও চিন্তনেও পাপ হয়, সে কেন এমন শোভাময়ী হইল? সে কেন এমন অলৌকিক শ্রীর আধার হইল?

বিধুমুখী উপবেশন করিলে, এক জন দাসী পার্শ্বে দাঁড়াইয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিল; স্বয়ং সারদা গোলাপজল আনিয়া তাহার মাথায় ও মুখে সিঞ্চন করিতে লাগিল এবং আর এক জন দাসীকে স্মেলিংসল্টের শিশি আনিয়া তাঁহার নিকটে স্থাপন করিতে বলিল। সে তাহার পর একখানি আতর-মাখা তোয়ালে লইয়া সন্তর্পণে সুন্দরীর পৃষ্ঠদেশ, বাহু-লতা, বদনকমল, বক্ষঃস্থল প্রভৃতি মুছাইয়া দিতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে বিধুমুখী কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন,—"জল দেও, মুখহাত ধুইব।"

তখনই দাসী চিলমচি ও রূপার ঘটীতে করিয়া জল ও সাবান আনিল। সুন্দরী সেখানে বসিয়াই মুখ-হাত ধৌত করিলেন। তাহার পর দর্পণের দিকে ফিরিয়া দেখিয়া বলিলেন,—"আমার চুলগুলা ঠিক করিয়া দেও।"

এক জন তাহা ঠিক করিতে লাগিল। বিধুমুখী আর এক জনকে আদেশ করিলেন,—"বরফ লেমনেড আন।"

সে তাহা আনিয়া উপস্থিত করিল। বিধুমুখী ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া লেমনেড পান করিতে লাগিলেন।

এইরূপ সময়ে হরিচরণ তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র উল্লাসে বিধুমুখীর মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি দাসীগণকে প্রস্থান করিতে ইঙ্গিত করিলেন; তাহারা চলিয়া গেল।

হরিচরণ কিন্তু বিষণ্ণ; মুখখানা যেন মেঘে ঢাকা, কেমন ভার ভার। হরিচরণ নীরবে উপবেশন করিলেন—বিধুমুখীর নিকট হইতে একটু দূরে—স্বতন্ত্র আসন। বিধুমুখীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি হরিচরণের এই ভাব দেখিয়া উদ্বেগ সহকারে তাঁহার নিকটস্থ হইলেন এবং এক হস্ত তাঁহার কেশে স্থাপন করিয়া ও অপর হস্তে তাঁহার চিবুক ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"কাঁচা সোনা আজ কালো কেন? পুকুরের জল আজি তোলপাড় কেন? আমার প্রাণের বঁধুয়া আজি কাতর কেন?"

হরিচরণ ধীরে ধীরে বিধুমুখীর হাত দুইখানি সরাইয়া দিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং বলিলেন,—"আমি আপনার নিকট আজি বিদায় লইতে আসিয়াছি। আমাকে আপনি আজি হইতে জন্মের মত বিদায় দিন।"

এ কি কথা! এ কি বজ্রাঘাত! বিধুমুখীর প্রাণ বড়ই ব্যাকুল। সবিস্ময়ে সোদ্বেগে জিজ্ঞাসিলেন, "সে কি কথা হরিচরণ! তোমাকে বিদায়? প্রাণ থাকিতে? আমার মাথা খাও, বল, বল, বল—কি হইয়াছে!"

হরিচরণ বলিলেন,—"বিশেষ কিছুই হয় নাই। আমি কুঁজো, চিৎ হইয়া শুইবার সাধ করিয়াছিলাম; আমি খোঁড়া, পাহাড়ে উঠিতে চাহিয়াছিলাম; আমি বামন, চাঁদ ধরিতে হাত বাড়াইয়াছিলাম। আমার কোন সাধই মিটিল না। যাহা হইবার নহে, তাহা হইবে কেন?"

বিধুমুখী বড়ই ব্যাকুলিতা হইয়া পড়িলেন। হরিচরণের এরূপ অসন্তোষ, এত বিষণ্ণভাব, ইহাও কি ছাই প্রাণ ধরিয়া সহিতে পারা যায়! সুন্দরীর উৎকণ্ঠা সীমাশূন্য হইয়া পড়িল। তিনি কাতরভাবে হরিচরণের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"বল হরিচরণ! তোমার মনে কি দুঃখ হইয়াছে? যদি আমার জীবন দিলে, সর্ব্বস্ব ব্যয় করিলে, তোমার মুখে আবার হাসি দেখিতে পাই, তাহা হইলে এখনই আমি তাহা করিব। বল, বল কি হইয়াছে?"

হরিচরণ বলিলেন,—"হবে আর কি? যাহা হইবার, তাহাই হইয়াছে। বাবুর ঘন ঘন যাওয়া আসা হইয়াছে—সন্ধ্যার পরেও আমাকে লুকাইয়া তাঁহাকে আনিতে দেওয়া হইয়াছে, অবশ্যই মনে মনে

এক হইয়া গিয়াছে, যাহা যাহা হইবার কথা, তাহাই হইয়াছে—”

বিধুমুখী খল্ খল্ হাসিয়া বলিলেন,—“এই কথা, তবু রক্ষা। আমার মাথা হইতে যেন একটা প্রকাণ্ড বোঝা নামিয়া গেল। এতক্ষণ তোমার ভাব দেখিয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল। সে বানরটা এখনই আসিয়াছিল বটে, তাতে কি হয়েছে?”

হরিচরণ বলিলেন,—“না, তাতে আর তোমার কি হইবে? এই হতভাগারই সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইয়াছে। সন্ধ্যার পর সাজ-গোজ, বেশভূষা করিয়া বাবুকে যখন লুকাইয়া আনা হইয়াছে, তখন এ ক্ষুদ্র হতভাগার সকল সাধেই ছাই পড়িয়াছে, সন্দেহ নাই।”

বিধুমুখী বলিলেন—“ছি হরিচরণ! এমন সন্দেহ মনে করাও তোমার অন্যায়। আমি তোমার কাছে মনে মনেও অবিশ্বাসিনী হইতে পারি, এরূপ সন্দেহকে মনে স্থান দিলেও আমার প্রতি বড় অত্যাচার করা হয়।”

হরিচরণ বলিলেন,—“আমার অন্যায় এখন অনেকই হইবে। অনেকই দেখিতে পাইবে। আমার হুকুম ছাড়া বাবু কোন দিনও এখানে আসিতে পাইবেন না, এ কথা তোমার সহিত পাকা রকম স্থির ছিল। সে নিয়ম ভঙ্গ করিয়া তুমি অনায়াসে নিজের ইচ্ছামতে তাঁহাকে লুকাইয়া ঘরে আনিলে, ইহাতে তোমার অন্যায় কিছু হইল না; কেবল আমার মনে ভাবাই অন্যায়। তা ভাই, বেশ কথা। আমি আজি বিদায় হইতেছি। দুঃখী লোকের এত স্পর্দ্ধায় দরকার কি?”

বিধুমুখী বলিলেন,—“সে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু কিরূপে কেমন করিয়া আসিয়াছিল, তাহা আমি জানি না। তাহাকে আমি আসিতে বলি নাই।”

হরিচরণ বলিলেন,—“তুমি মুনিব, আমি চাকর। এরূপ লোকের মধ্যে প্রণয় হওয়া কি শোভা পায় ভাই? তোমার ইচ্ছামত কাজ তুমি করিবে, তাহাতে আমার কথা কহিবার কোনই অধিকার নাই। আমি স্বচক্ষে বাবুকে এখান হইতে চলিয়া যাইতে দেখিয়াছি। দরওয়ানকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি যে, সারদা তাঁহাকে আসিতে বলিয়াছিল। সারদা তোমার কথা না পাইলে কখনই বলিতে সাহস করে নাই। অথচ তুমি তাহা স্বীকার করিতেছ না। এ স্থলে তোমাকে আর আমি কি বলিব? আজি হইতে ভাই, এ গরীব বিদায় লইতেছে। প্রার্থনা করি, তোমার সুখ হউক। তোমার কাছছাড়া হইলে এ অভাগা প্রাণে মারা যাইবে সত্য; কিন্তু তোমার সুখের পথে কণ্টক হইয়া সে আর এক দিনও এখানে থাকিবে না।”

বড়ই অভিমানের কথা! বড়ই মনস্তাপের কথা! বিধুমুখী বলিলেন,—“কি বৃথা সন্দেহে হরিচরণ, তুমি নিজেও কষ্ট পাইতেছ, আমাকেও কষ্ট দিতেছ। সে কোন উপায়ে আসিয়াছিল বটে, কিরূপে আসিয়াছিল, তাহা আমি জানি না। তার পর সে তো মনুষ্যরূপে ভল্লুক। স্বয়ং স্বর্গ হইতে কন্দর্পদেব আসিলেও, হরিচরণ, তোমার স্থান অধিকার করিতে পারে না। আমার প্রাণ-মন হরিচরণময় হইয়া গিয়াছে। তুমি এক্ষণে আমার জীবন-মরণের মন্ত্র! আমাকে অবিশ্বাস করিতে হয় কর, কিন্তু ধর্ম্ম জানেন, আমার কোনই অপরাধ নাই।”

বিধুমুখী সকল কথা সাহস করিয়া বলিতে পারিলেন না। শ্যামলালের আগমন-সংবাদেই যখন হরিচরণের এই অন্তর্দ্দাহ, তখন তাহার চুম্বনালিঙ্গনাদি ব্যাপার প্রচার হইলে, না জানি, কি অনর্থপাতই হইবে! সুতরাং তাঁহাকে সে সকল বিষয় প্রচ্ছন্ন করিতে হইল।

হরিচরণ বলিলেন,—“হইতে পারে, তোমার কোন অপরাধ নাই; কিন্তু তিনি তোমার বিবাহিত স্বামী, লোকতঃ, ধর্ম্মতঃ তুমি তাঁহারই। তিনি জোর করিয়া তোমাকে নিজের করিয়া রাখিলে রাখিতে পারেন; আইন অনুসারেও তোমাকে বাধ্য করিতে পারেন। সকলই তাঁহার অনুকূল। আমার এ জোরের প্রণয় বই ত না; তোমার দয়া ও ভালবাসা বই ত না। তুমি রাখিলে রাখিতে পার, পদাঘাতে দূর করিয়া দিলে দূর করিতে পার। সুতরাং তাঁহার যাওয়া-আসা যখন আরম্ভ হইয়াছে, তখন আমার মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে। তাই বলিতেছি, বসিয়া সে সকল দুরবস্থা ভোগ করার অপেক্ষা, চক্ষের উপর নিজের সর্ব্বনাশ বসিয়া দেখার অপেক্ষা দূরে গিয়া মরাই ভাল। বিধুমুখি, প্রাণেশ্বরী, তোমাকে দেখিতে না পাইলেই আমার মৃত্যু হইবে। তা হউক, তথাপি আমি আর এখানে থাকিব না। আজি এ অধম দাসকে তুমি জন্মের মত বিদায় দেও।”

হরিচরণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বিধুমুখী তখন যমযন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—“বেশ, যাও তুমি। কিন্তু ধর্ম্ম সাক্ষী। তোমাকে নিশ্চয়ই এই অন্যায় অত্যাচারের প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে। হরিচরণ! আমি শয়নে-স্বপনে কেবল তোমাকেই দেখি, তোমাকেই জানি! সেই তুমি

আমাকে অবিশ্বাস করিয়া ত্যাগ করিতেছ। আচ্ছা, যাও তুমি, এ পুরীর বাহিরে যাইতে না যাইতে তুমি শুনিতে পাইবে, বিধুমুখী আর নাই।"

বিধুমুখী কাঁদিয়া ফেলিলেন। হরিচরণ বলিলেন,—"কেন ভাই! তোমার কিসের অভাব? তুমি কেন আত্মহত্যা করিবে? যে অভাগা তোমার প্রেমের আশ্রয়ে স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া আসিতেছে, সে এখন সর্ব্বস্বান্ত হইল; সুতরাং তাহারই আর না থাকা আবশ্যক।"

বিধুমুখী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"যাহা হইবার হইয়াছে, হরিচরণ, আমি তোমার পায়ে হাত দিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, ইহজীবনে আর কখন তাহার মুখ দেখিব না। তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি সদয় হও।"

এই বলিয়া সুন্দরী হরিচরণের পদদ্বয় ধারণ করিলেন। হরিচরণ তখনই তাঁহাকে উঠাইয়া তাঁহার বদন চুম্বন করিলেন ও তাঁহার নেত্র মার্জ্জনা করিয়া দিলেন। আনন্দে বিধুমুখীর হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। হরিচরণ আলিঙ্গনবদ্ধা সুন্দরীকে লইয়া সেই কৌচে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং বলিলেন,—"এখান হইতে কিছুদিন স্থানান্তরিত হওয়াই আমার ইচ্ছা। এখানে থাকিলে তোমার স্বামী হয় ত কোন না কোন সুযোগে আবার তোমার সম্মুখে আসিবে। আমি তাহা আর সহ্য করিতে পারিব না। আমি শীঘ্রই তোমাকে লইয়া পশ্চিম যাইব।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"স্বচ্ছন্দে। কিছু দিন তোমার সঙ্গে নানা দেশ ভ্রমণ করিতে আমারও বড় সাধ হইয়াছে।"

হরিচরণের আদেশক্রমে এক জন দাসী গোলাপ-জল-ভরা সোনার গুড়গুড়িতে রূপার কলিকায় লক্ষ্ণৌয়ের সুরভিগন্ধপূর্ণ তামাক সাজিয়া আনিল। তামাক খাইতে খাইতে তাঁহারা দেশভ্রমণের পরামর্শ আঁটিতে লাগিলেন। পরামর্শ স্থির হইলে হরিচরণ বলিলেন, "বিলু!" (আমাদের বলিতে ভুল হইয়াছে যে, হরিচরণ বিধুমুখীকে আদর করিয়া বিলু বলিয়া ডাকিয়া থাকেন! বলিলেন,—"বিলু! একটু রোজলিকর খাবে কি? স্যাম্পেন খেলে তোমার অম্বল হয়, রোজলিকর তো তুমি ভালবাস।"

বিলোল কটাক্ষ সহকারে সোহাগিনী বিলু বলিলেন, "বড় মাথা ঘুরে—তা একটু বরফ মিশাইয়া দেও ত দেও।"

তখনই রোজলিকর আসিল এবং বরফ-সংমিশ্রণে সুশীতল হইয়া বিলুসুন্দরীর রসনা সিক্ত করিতে থাকিল। হরিচরণ বাবু—বাবু না বলিলে আর চলে না। এই সুন্দরী যাহার চরণাশ্রিত, অতুল সম্পত্তি যাহার ইচ্ছাধীন, বিলাসের সর্ব্বোপকরণে যে পরিবেষ্টিত, তাহাকে বাবু না বলিয়া আর কি বলিব? হরিচরণ বাবু কিন্তু সোডা মিশাইয়া ইনকম্পেয়ারেবল-বুল হুইস্কি সেবন করিতে লাগিলেন।

দুই তিনবার সুরাপানের পর বিলু সুন্দরীর চক্ষু অবসিত, মস্তিষ্ক অলসিত, মুখমণ্ডল উচ্ছ্বসিত, হৃদয় বিলসিত হইয়া আসিল। তিনি আদর-বিমিশ্রিত গদগদ-স্বরে সুরাজড়িত অস্পষ্টভাষায় বলিলেন,—"চন্‌—আমার প্রাণের চন্‌, তোকে বুকের মধ্যে পুরিয়া রাখিলেও আমার সাধ মেটে না।"

বলিয়া দেওয়া আবশ্যক, বিধুমুখী আদর করিয়া হরিচরণকে 'চন্‌' বলিয়াই ডাকিয়া থাকেন।

সেই অর্দ্ধবিবসনা, সুরাকৃত অবসিত-কলেবরা যুবতী উভয় হস্তে হরিচরণকে বক্ষে পেষণ করিয়া ধরিল।

এই অবাধ-প্রণয়ের পবিত্র লীলা দর্শনের ভার অতঃপর আমাদের সেই সুনীতি-সম্পন্ন সাম্যবাদী বন্ধু গ্রহণ করিলেন; সুতরাং আমরা এই স্থলেই ক্ষান্ত হইলাম।

নবম খণ্ড—জ্যোতিঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ

সঞ্জীবনী।

সনাতনপুর একখানি সামান্য গ্রাম। জলাঙ্গী নদীর ধারে উচ্চ ভূমির উপর গ্রামখানি অবস্থিত। গ্রামের পার্শ্বেই পারঘাট। এক দিন প্রাতঃকালে পারঘাটায় বড় জনতা। তত্রত্য বালুকাচড়ায় এক স্থানে বহুলোক ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া মধ্যস্থিত পদার্থ-বিশেষ দর্শন করিতে করিতে নানারূপ জল্পনা করিতেছে।

সেই নদী-সৈকতে সেই বালুকা-শয্যায় সিক্তবসনা, আলুলায়িতকেশা, ভুবনমোহিনী সুন্দরী। সুন্দরী মৃতা। বহু পুরুষের তীব্রদৃষ্টি তাঁহার প্রতি নিপতিত। তাঁহার বস্ত্রাদির সমাবেশও অসংবদ্ধ। যে সংজ্ঞা ও অভিমান মানুষকে লজ্জা ও সঙ্কোচ প্রদান করে, তাহা তাঁহার নাই। মৃত্যু তাঁহার সকল ভয় ও ভাবনা বিদূরিত করিয়া দিয়াছে। লোকের কটূক্তি, দর্শকগণের সন্দেহবাক্য, অনেকের নিন্দাবাদ কিছুই তাঁহাকে আর বিচলিত করিতেছে না।

সমবেত লোকের মধ্যে এক জন জিজ্ঞাসিলেন,—"মানুষটা কে হে?"

আর এক জন বলিল,—"চেনা যায় না। এ গাঁয়ের তো নয়ই—কোথা থেকে ভেসে এসেছে, বলা যায় না।"

আর এক জন বলিল,—"ভদ্রঘরের মেয়ে নিশ্চয়। দেখ্‌ছ না রূপ?"

অপর এক জন বলিল,—"ঐ রূপেই সর্ব্বনাশ হয়েছে। বোধ হয়, খুন ক'রে জলে ফেলে দিয়েছে।"

অপর এক জন বলিল,—"নষ্ট-দুষ্ট মেয়েমানুষের এই গতি।"

আর এক সুবিচক্ষণ লোক গম্ভীরভাবে বলিল,—"ধরা প'ড়ে জলে ডুবে মরেছে।"

এই সময়ে ওপার হইতে খেয়ার নৌকা এপারের ঘাটে আসিয়া লাগিল। আবার সেই মৃতা সুন্দরীর চারিপাশে ভিড়ের ভিতর আর চারি পাঁচ জন লোক বাড়িয়া গেল। তাহার মধ্যে এক ব্যক্তির মাথায় চাদর বাঁধা, গায়ে জামা, হাতে গামছা-জড়ান একটা ব্যাগ; অপর হাতে ছড়ি, বগলে ছাতা, পায়ে জুতা। লোকটি লম্বা চওড়া, পক্ক-কেশ অথচ বলিষ্ঠগঠন, প্রিয়-দর্শন এবং ভদ্রাকার। ইনি আমাদের সুপরিচিত হরকুমার বাবু। কাশী হইতে নানা অভিপ্রায়ে চলিয়া আসিয়া ইনি নানা স্থান ঘুরিতে ঘুরিতে আজি এই স্থানে উপস্থিত। তাঁহার এখানে আগমনের উদ্দেশ্য কি, তাহা পরে জানিতে চেষ্টা করা যাইবে। আপাততঃ তিনিও ভিড়ের দিকে অগ্রসর হইয়া এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্যাপারটা কি হে?"

লোক উত্তর দিল,—"আজ্ঞে, দেখ না কেন মশাই?"

হরকুমার বাবু আর একটু অগ্রসর হইলেন। তখনই সেই অসামান্যা সুন্দরীর শোভাময়ী কান্তি তাঁহার নয়নে পড়িল। তিনি বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ ও অনেক শাস্ত্রার্থবিৎ। সুন্দরীর বিগত-জীব কলেবর দর্শনমাত্র চিরস্মরণীয় মহামনস্বী ডাক্তার মার্সাল হল (Dr. Marshall Hall) ও ডাক্তার সিলবেষ্টরের (Dr. Sylvester) উদ্ভাবিত প্রণালীর এবং রয়াল নেশানাল লাইফ (Royal Nationai Life Boat Institution) বোট ইনষ্টিটিউসনের ঘোষিত সমস্ত ব্যবস্থার বৃত্তান্ত তাঁহার মনে পড়িল। তিনি মৃতার নিকটে গমন করিয়া বিশেষরূপে তাঁহার অঙ্গাদির পরীক্ষা করিলেন। তাহার পর সমবেত লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"বিশেষরূপ চেষ্টা করিলে হয় ত স্ত্রীলোকটি এখনও বাঁচিতে পারে। তোমরা কেহ আমার সাহায্য করিতে পার কি?"

এই অপরিচিত আগন্তুকের বাক্য শুনিয়া লোক-গুলা পরস্পর মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল এবং হরকুমার বাবুর দৃষ্টি হইতে আপনাদের মুখ ফিরাইতে লাগিল। কেহ কেহ প্রস্থান করিল। কেহ কেহ একটু সরিয়া দাঁড়াইল। এক দৃঢ়কায় সুস্থ যুবা অগ্রসর হইয়া বলিল,—"যদি আমার দ্বারা কোন সাহায্য হওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে আজ্ঞা করুন।"

হরকুমার বলিলেন,—"তোমার দ্বারা বেশ কাজ হইবে। তুমি বড় ভাল ছেলে। আপাততঃ কয়েক আঁটি খড় আন দেখি। দাম লাগে যদি, আমি দিতেছি,—লও। একটু শীঘ্র।

দাম গ্রহণ না করিয়াই যুবা প্রস্থান করিল। নিকটেই মাঝিদের ঘর। তাহারা খড় পাতিয়া শয়ন করে এবং তাহাদের ঘরে খড় থাকে, এ কথা যুবার জানা ছিল। সে কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, কাহারও বিধিনিষেধের অপেক্ষা না করিয়া, সেখানকার সমস্ত খড় উঠাইয়া লইয়া আসিল।

যুবা যখন খড় আনিতে গিয়াছিল, তখন হরকুমার বাবু সেই মৃতা সুন্দরীকে উপুড় করিয়া শোয়াইয়াছিলেন এবং বালিসের পরিবর্ত্তে মৃতার একখানি বাহু কপালের নীচে স্থাপন করিয়াছিলেন। এইরূপে দেহস্থাপন করার অনতিকাল পরে মৃতার মুখগহ্বর হইতে জল বাহির হইতে লাগিল। হরকুমার সযত্নে তাহা মুছাইয়া দিতে দিতে সেই সাহায্যপ্রবৃত্ত যুবাকে বলিলেন,—"তুমি খড়গুলা ঐখানে রাখিয়া শীঘ্র আমার নিকট আইস।"

যুবা তৎক্ষণাৎ নিকটস্থ হইলে হরকুমার বলিলেন,—"যুবতীর পরিধানের কাপড় কটিদেশে আলুগা করিয়া বাঁধ, আর হাঁটুর কাছেও বাঁধিয়া দেও, যেন খসিয়া না যায়।"

উভয়ে অতীব সাবধানতা সহকারে মৃতা যুবতীর বস্ত্র বাঁধিয়া দিলেন। তাহার পর দর্শকগণের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"এই নারী তোমাদেরও কেহ নহেন, আমারও কেহ নহেন। তোমরাও ইঁহাকে জান না, আমিও জানি না। কিন্তু ভাই সব, ধর্ম্ম মাথার উপরে আছেন। আমরা ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া ইঁহাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিতেছি। যদি এই নারীকে দেখিয়া, ইহার প্রায় উলঙ্গ শরীর দেখিয়া কাহারও মনে, মা বা কন্যা ছাড়া আর কোন ভাবের উদয় হয়, তাহার বড়ই অধর্ম্ম হইবে। তেমন লোক এখান হইতে সরিয়া যাওয়াই ভাল।"

এক বৃদ্ধ বলিলেন,—"উনি যে হউন, উনি আমাদের মা। এই অবস্থায় তা ছাড়া আর কিছু যার মনে উদয় হয়, সে বেটার নরকেও স্থান হইবে না। মহাশয় চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু মরা কি কখন বাঁচে? আপনার নিকট যে ছেলেটি সাহায্য করিতেছে, উহার নাম হরিশ কামার। বড় ভাল লোক।"

হরকুমার বাবু কথা কহিতেছেন ও শুনিতেছেন বটে, কিন্তু কার্য্যে বিরাম নাই। তিনি মৃতাকে পাশ ফিরাইয়া শয়ন করাইলেন এবং হরিশকে যুবতীর মাথা ধরিয়া থাকিতে বলিলেন। হরিশ সেইরূপ করিলে হরকুমার সেই বৃদ্ধের কথার উত্তরে বলিলেন,—"সত্যই হরিশ বড় ভাল লোক। ঈশ্বর উহার মঙ্গল করিবেন। বাঁচা মরা ঈশ্বরের হাত। আমরা চেষ্টা করিতেছি মাত্র। ভাল কাজ বই মন্দ কাজ নয় তো।"

বৃদ্ধ বলিল,—"আরও লোকের দরকার হইবে কি? আমি প্রাচীন, তথাপি কিছু সাহায্য করিতে পারি বোধ হয়। যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি যাই।"

হরকুমার বলিলেন,—"আইস। অনেক লোকেরই তো এ কাজ। তোমার দ্বারা বিশেষ উপকার হইবে।"

বৃদ্ধ নিকটস্থ হইল, হরকুমার মৃতার জিহ্বা, অতি সন্তর্পণতার সহিত আকর্ষণ করিলেন। সুন্দরীর রসনা কিয়ৎপরিমাণে মুখমধ্য হইতে বাহির হইয়া পড়িল। তাহার পর পকেট হইতে নস্যের কৌটা বাহির করিলেন এবং তন্মধ্যে হইতে খানিকটা নস্য বাহির করিয়া ধীরে ধীরে যুবতীর নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। তাহাতে কোন কার্য্য হইল না দেখিয়া, একটা খড়ের অগ্রভাগ লইয়া তাঁহার নাসাপথে প্রেরণ করিলেন। তাহাতেও মৃতার হাঁচির উদ্রেক হইল না দেখিয়া বৃদ্ধকে বলিলেন,—"তুমি ভাই মৃতার বুকে ও পাঁজরে হাত বুলাইতে থাক, আর এক হাত দিয়া শবের গায়ে ও মুখে হাত বুলাও।"

তাহারা উপদেশানুরূপ কার্য্য করিতে লাগিল। তাহার পর নিজের ব্যাগ হইতে একটা গ্লাস বাহির করিয়া এক ব্যক্তিকে বলিলেন,—"ভাই, নদী হইতে শীঘ্র একগ্লাস জল আন তো?"

সে উত্তর দিল,—"তোমরা মরা ছুঁইয়াছ। তোমাদের আমি ছোঁব কেন?"

আর এক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া জল আনিয়া দিল। হরকুমার জোরে যুবতীর মুখে ও বুকে জলের ঝাপটা দিতে লাগিলেন। জল ফুরাইয়া গেল। শেষোক্ত ব্যক্তি আবার জল আনিয়া দিল। তখন দিয়াশলাই দ্বারা এক আঁটি খড় ধরাইয়া হরকুমার বাবু সেই আগুনে গ্লাস বসাইয়া দিলেন। অনতিকালমধ্যে জল গরম হইয়া উঠিল। জোরে যুবতীর মুখে ও বুকে সেই গরম জলের ঝাপটা দেওয়া হইল। আবার শীতল জল, আবার গরম জল, এইরূপ বারংবার জলপ্রয়োগ করা হইতে লাগিল। তাহার পর হরকুমার একবার ধীরভাবে যুবতীর নাসাগ্রে ও বক্ষঃস্থলের বামভাগে হস্তার্পণ করিলেন এবং উৎকণ্ঠিতভাবে মৃতার মুখের ভাব পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। সেই বৃদ্ধ বলিল,—"কিছুই তো বুঝা যায় না মশাই।"

হরকুমার বলিলেন,—"এখনই? এখনও অনেক পরিশ্রম করিতে হইবে। তোমরা হতাশ হইও না।"

তাহার পর আপনার মাথার চাদর খুলিয়া একটা ক্ষুদ্র বালিসের মত করিয়া জড়াইলেন, তদনন্তর মৃতাকে উপুড় করিয়া শোয়াইয়া তাঁহার ঠিক

বক্ষঃস্থলের নিম্নে সেইটি প্রবেশ করাইয়া দিলেন। চারি গণিতে যতটুকু সময় লাগে, প্রায় ততটুকু সময় পরেই আবার মৃতাকে পাশ ফিরাইয়া শয়ন করাইলেন, আবার সেইরূপ সময় পরে বুকের নীচে সেইরূপ বালিস দিয়া তাঁহাকে উপুড় করিয়া শোয়াইলেন। আবার সেইরূপ সময় পরে আর এক দিকে পাশ ফিরাইয়া দিলেন। বারংবার এইরূপ চলিতে লাগিল। হরিশ মাথা ধরিয়া থাকিল, বৃদ্ধ পায়ের দিক্ ধরিয়া ফিরাইয়া দিতে লাগিল এবং হরকুমার স্বয়ং মৃতার মধ্যভাগ ধরিয়া ফিরাইতে ফিরাইতে যখন যে দিকে ফিরাইতে হইবে, তাহার উপদেশ দিতে থাকিলেন। যতবার মৃতাকে উপুড় করিয়া শোয়ান হইতে লাগিল, ততবারই হরকুমার বাবু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পৃষ্ঠদেশে, বাহুমূলের অব্যবহিত নিম্নে চাপ দিতে লাগিলেন।

প্রায় ৫।৭ মিনিট কাল এইরূপ প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইলেও বিশেষ কোন ফল হইল না দেখিয়া হরকুমার বাবু মৃতাকে হরিশ ও বৃদ্ধের সাহায্যে একটা ঢালু স্থানে আনিয়া চিৎ করিয়া শোয়াইলেন এবং কয়েক আঁটি খড় আপনার চাদরের দ্বারা ঢাকিয়া মৃতার স্কন্ধদেশের নিম্নে স্থাপন করিলেন। যে স্থানে পা পড়িল, শরীরের ঊর্দ্ধভাগ তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চতর স্থান স্থাপিত হইল।

তদনন্তর হরকুমার বাবু মৃতার জিহ্বা টানিয়া ধরিলেন এবং ক্রমশঃ বলপ্রয়োগ সহকারে মুখ-গহ্বর হইতে অনেকখানি বাহির করিয়া আনিলেন। তাহার পর স্বকীয় পরিধেয় বস্ত্রের এক প্রান্ত হইতে কিয়দংশ ছিন্ন করিয়া তদ্দারা মৃতার থুতুনির সহিত মুখনিঃসৃত জিহ্বা বাঁধিয়া ফেলিলেন। জিহ্বা আর মুখের মধ্যে প্রবেশ করিতে পাইল না।

সন্নিহিত লোকেরা হরকুমার বাবুর এই সকল উন্মাদ-চেষ্টা দেখিয়া তাঁহাকে পাগল বিবেচনা করিতে লাগিল; এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলিল, —"এ লোকটা নেহাত পাগল।"

আর এক ব্যক্তি বলিল,—"না হে, বোধ হয়, কিছু গুণ আছে।"

আর এক জন বলিল,—"না, বোধ হয়, লোকটা ডাক্তার হইতে পারে।"

অপর এক ব্যক্তি বলিল,—"খানিক পরে হয় ত মড়াটা কাট্‌বে।"

আর এক জন বলিল,—"তার পর হয় ত খাবে।"

এক ব্যক্তি বলিল,—"চল, এখান থেকে সরা যাক্।"

আর এক ব্যক্তি বলিল,—"সেই ভাল।"

সরিবার পরামর্শ অনেকেই করিল বটে; কিন্তু কেহই সরিল না। ক্রমেই জনতার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এ দিকে হরকুমার বাবু মৃতার মস্তক-সন্নিধানে দাঁড়াইয়া তাঁহার উভয় হস্ত কনুয়ের নিকটে সবলে চাপিয়া ধরিলেন। তদনন্তর সেই বাহুদ্বয়কে প্রসারিত করিয়া উভয় পার্শ্বে কর্ণদ্বয়ের মূল দিয়া ঊর্দ্ধদিকে উঠাইয়া লইলেন। দুই সেকেণ্ডমাত্র কাল হস্তদ্বয়কে তদবস্থায় রাখিয়া পুনরায় তাহা নীচের দিকে ঘুরাইয়া আনিলেন এবং বক্ষঃস্থলের উভয় পার্শ্বে বাহুদ্বয়কে চাপিয়া ধরিলেন; পুনরায় হস্তদ্বয় পূর্ব্ববৎ ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া এবং দুই সেকেণ্ড পরে নিম্নে আবর্ত্তিত করিয়া তদ্দারা বক্ষঃস্থলের উভয় পার্শ্ব পেষণ করিলেন। এইরূপ অনুষ্ঠান পুনঃ পুনঃ চলিতে লাগিল। বহুক্ষণ এইরূপ প্রক্রিয়া চলার পর হরকুমার বাবু সানন্দে দেখিলেন, সুন্দরীর বক্ষঃস্থল যেন স্পন্দিত হইতেছে, নাসারন্ধ্রদ্বয় যেন ঈষৎ স্ফীত হইয়াছে। তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিল না; তিনি চীৎকারস্বরে বলিলেন,—"শ্রীহরির কৃপায় এই স্ত্রীলোক বাঁচিবে; তোমরা সকলেই একবার হরি হরি বল।"

চারিদিক্ হইতে হরিনামের উচ্চরোল উঠিল। হরকুমার বাবু পকেট হইতে দিয়াশলাই বাহির করিয়া দিয়া বলিলেন—"খড় জ্বালাইয়া আগুন কর। তোমাদের যত্ন ও পরিশ্রম সফল হইবে। ভগবান্ অবশ্যই এই সৎকর্ম্মের জন্য তোমাদিগের প্রতি দয়া করিবেন।"

তাহারা আগুন জ্বালিল। এ দিকে হরকুমার বাবু পীড়িতার নাসা-সন্নিধানে হস্তস্থাপন করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের সূচনা বুঝিতে পারিলেন। তখন সকলকে বলিলেন,—"ঐ আগুন দিয়া পীড়িতার হাত-পা সেঁকিতে থাক, তাত লাগিবে বলিয়া ভয় করিও না।"

হরিশ ও বৃদ্ধ সেঁকিতে লাগিল। হরকুমার বলিলেন,—"তোমরা পা সেঁকিতে লাগিলে, হাত সেঁকিবার জন্যও দুই জন লোকের দরকার!"

সৎকর্ম্মের বড়ই মোহকর আকর্ষণ। দুই ব্যক্তি কোমরে গামছা বাঁধিয়া হরকুমার বাবুর নিকটস্থ হইল; তিনি তাহাদিগকে পীড়িতার বাহুদ্বয়ে তাপ দিতে উপদেশ দিলেন। এক প্রবীণ ব্যক্তি জিজ্ঞাসিল, —"আর লোক চাই কি মশাই?"

হরকুমার বাবু বলিলেন,—"চাই কি? অনেক লোকেরই ত এ কাজ; এস না তোমরা।"

আরও দুই ব্যক্তি অগ্রসর হইল; তাহারা

সুন্দরীর তলপেটে ও পাঁজরে তাপ দিতে থাকিল। হরকুমার বাবুর প্রদর্শিত প্রণালীক্রমে হাত, গামছা বা বস্ত্রাদি গরম করিয়া পীড়িতার দেহের নিম্নদিক্ হইতে উর্দ্ধদিকে সকলে ঘর্ষণ করিয়া আনিতে লাগিল। কিয়ৎকাল এইরূপ চলার পর যুবতীর গণ্ডদ্বয় ঈষৎ রক্তাভ হইয়া উঠিল এবং তাঁহার মৃতবৎ আকার বিদূরিত হইয়া যেন স্বাভাবিক বর্ণ ও ভাব আবির্ভূত হইতে থাকিল। হরকুমার বাবু যুবতীর রসনার বন্ধন খুলিয়া দিলেন এবং বলিলেন---"ভাই সব! তোমাদের যত্ন সফল হইবার সূচনা হইয়াছে। ঈশ্বরের জীব যেই কেন হউক না, তোমরা রক্ষা করিয়া বড়ই পুণ্য করিলে। সেক ও তাপ বন্ধ করিও না ভাই।" সুন্দরীর জিহ্বা ধীরে ধীরে বদনের মধ্যগত হইল। চারি দিকেই আগুন জ্বলিতেছিল, হরকুমার গ্লাসে জল গরম করিয়া ফেলিলেন এবং সেই উষ্ণ জল কিয়ৎপরিমাণে হস্তে গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে ফোঁটায় ফোঁটায় যুবতীর মুখের মধ্যে দিতে থাকিলেন। জল অল্পে অল্পে যুবতীর উদরস্থ হইতে থাকিল। তখন হরকুমার বাবু আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া বাহুদ্বয় উত্তোলন করিয়া বলিলেন,---"ভাই সব! হরিনামই সত্য---হরিরই জয়; তোমরা সকলে একবার হরি হরি বল।"

আবার চারিদিক্ হইতে উচ্চরোলে হরিধ্বনি হইতে লাগিল। এই সময়ে এক জনের প্রদত্ত তাপ যুবতীর বাম চরণে অধিক পরিমাণে লাগায় তিনি পা সরাইয়া লইলেন।

আবার চারিদিক হইতে হরিধ্বনি সংঘোষিত হইল। সেই চির-প্রীতিপদ মধুময় হরিধ্বনি সাঙ্গ হইতে না হইতেই যুবতী নয়ন মেলিয়া চাহিলেন এবং আপনাকে এই অবস্থায় অপরিচিত ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে সংস্থাপিত দেখিয়া লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া আবার চক্ষু মুদিত করিলেন এবং বস্ত্র দ্বারা দেহ সমাচ্ছন্ন করিবার অভিপ্রায়ে হাত বাড়াইয়া কাপড় টানিতে লাগিলেন।

হরকুমার বাবু বলিলেন,---"ভয় কি মা, আমি তোমার বুড়া ছেলে। ছেলের কাছে মায়ের লজ্জা কি? কাপড় দিই মা। কিছু ভয় নাই।"

হরকুমার ব্যাগ খুলিয়া একখানি কাপড় বাহির করিলেন এবং তাহা দুই ভাঁজ করিয়া সুন্দরীর সকল শরীর ঢাকিয়া দিলেন।

যুবতী ক্ষীণস্বরে বলিলেন,---"আমি ডুবিয়া গিয়াছিলাম; আপনি আমায় বাঁচাইলেন কেন?"

হরকুমার বলিলেন,---"আমরা বাঁচাই নাই মা---ঈশ্বর বাঁচাইয়াছেন। মরা বাঁচান কি আমাদের সাধ্য? যাহার কাজ, তিনিই করিয়াছেন।"

তাহার পর উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন---"তোমরা বড়ই সৎকর্ম্ম করিয়াছ। কিন্তু ভাই, কাজের এখনও শেষ হয় নাই। যেমন করিয়া হউক, একখানি পাল্কী আনিতে হইবে; আর এই সুন্দরীকে রাখিতে পারা যায়, গ্রামের মধ্যে এরূপ একটা স্থান স্থির করিয়া দিতে হইবে। এখনও ১০।১২ দিনের কমে এই রমণী সুস্থ হইতে পারিবেন না। পয়সা যাহা খরচ হয়, তাহা আমি দিব। অগ্রিম লাগে ত এখনই লও।"

হরকুমার পকেট হইতে ৫টি টাকা বাহির করিলেন। হরিশ কামার বলিল,---"যদি বাবু মত করেন, তাহা হইলে আমার বাড়ীতে জায়গা হইতে পারে। আমার বাড়ীতে আমি, আমার মা, এক বিধবা ভগ্নী আর আমার স্ত্রী আছেন। শুশ্রূষার লোকের অভাব হইবে না। আমার বাড়ীতে একখানি বেশী ঘরও আছে। আমি জাতিতে কামার, বড় গরীব; কিন্তু এ জন্য টাকা-কড়ি কিছু লইব না ঠাকুর।"

অনেকেই বলিল,---"হরিশ কামার লোকও ভাল, তাহার বাড়ীও ভাল। এই পরামর্শই বেশ।"

হরকুমার বলিলেন---"হরিশ, তুমি বড়ই ধার্ম্মিক। তাই হইবে---তোমার বাড়ীতেই যাওয়া স্থির। কিন্তু ভাই, লইয়া যাওয়ার উপায়?"

হরিশ বলিল,---"আজ্ঞে, পাল্কী বড় সহজে মিলিবে না। পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু অনেক কষ্টে ও অনেক বিলম্বে। আপনি যদি মত করেন, তাহা হইলে আমরা মাকে ধরাধরি করিয়া লইয়া যাইতে পারি। এই মাঝিদের ঝাঁপ আছে, তাহার উপর মা ঠাকুরুণকে শোয়াইয়া সহজেই লইয়া যাইতে পারা যায়।"

হরকুমার বাবু বলিলেন,---"তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু তাহার উপর একটা কিছু না পাতিলে মায়ের গায়ে লাগিবে।"

হরিশ বলিল,---"তাহারও ব্যবস্থা করিতেছি।"

তিন ব্যক্তি প্রস্থান করিল। ক্ষীণস্বরে সুন্দরী আবার বলিলেন,---"আপনি কে?"

হরকুমার বলিলেন,---"আমাকে চিনিতে পারিবার আপনার কোনই সম্ভাবনা দেখিতেছি না। তথাপি আমার পরিচয় আপনাকে ক্রমে জানাইব। আপনি কে, তাহা জানিবার জন্য আমার কোন কৌতূহল নাই। আপনার উপকারের জন্য যদি

আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আমি পরে তাহা জানিবার চেষ্টা করিব। আপাততঃ এই জানিয়া রাখুন, আমি আপনার পেটের ছেলে। আমার দ্বারা আপনার ইষ্ট ভিন্ন কোনই অনিষ্ট হইবে না মা।"

আবার ক্ষীণস্বরে সুন্দরী বলিলেন,—"আমার জন্য খরচপত্র করিবেন না। আমি বড় দুঃখিনী।"

হরকুমার বলিলেন,—"কিন্তু মা, তোমার আকারে দেখিতেছি, তুমি ভদ্রকন্যা; তোমার কথা-বার্ত্তায় বুঝিতেছি, তুমি সতীলক্ষ্মী। তোমার জন্য যত্ন, খরচ কখনই নিষ্ফল হইবে না মা। তুমি এখন দুঃখিনী হইতে পার, কিন্তু দুঃখ তো চিরদিন থাকে না মা। অবশ্যই দুঃখ দূর হইবে। সে দুঃখের কথা বুঝিয়া যদি তাহা দূর করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত হয়, তাহা হইলে সে জন্যও আমরা যত্ন করিব। অবশ্যই ভগবান্ মুখ তুলিয়া চাহিবেন। ভয় করিও না মা। সকলই ভাল হইবে।"

সুন্দরী বলিলেন,—"আপনি মহাশয় লোক। ঈশ্বর আপনার ভাল করুন। আমার এখনও বাঁচিতে সাধ আছে।"

ঝাঁপ ও কম্বল আসিয়া উপস্থিত হইল। ঝাঁপের উপর কম্বল বিছাইয়া বালিসের স্থলে হরকুমারের ব্যাগ স্থাপন করা হইল। তাহার পর সুন্দরীকে সেই শয্যায় শুয়াইয়া চারিদিকে চারি প্রান্ত ধরিয়া ধীরে ধীরে লইয়া চলিল। যুবতীর সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদিত। তিনি নয়ন মুদ্রিত করিয়া ও স্বঅবগুণ্ঠনে বদন আচ্ছন্ন করিয়া সেই শয্যায় পড়িয়া রহিলেন।

কৌতূহলপরবশ অনেক লোক সঙ্গে চলিতে লাগিল। তাহারা এরূপ অদ্ভুত কাণ্ড কখনও দর্শন করে নাই। এতাদৃশ বিস্ময়জনক-ব্যাপার সম্ভবপর বলিয়াও তাহাদের জ্ঞান ছিল না; সুতরাং তাহারা হরকুমার বাবুকে দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া মনে করিতে লাগিল। তিনি কে, কোথা হইতে এ গ্রামে সহসা আসিলেন, কেনই বা তাঁহার আগমন ঘটিল, এ সকল বৃত্তান্ত জানিবার জন্য তাহাদের নিরতিশয় আগ্রহ জন্মিল।

আর ঐ সুন্দরী? ঐ কুসুম-সুকুমারী লজ্জাশীলা যুবতী—কে উনি? কোন কুলটা কামিনী কি? অসম্ভব। দুঃখিনী? কিসের দুঃখ? কে জানে! কত দুঃখই সম্ভব। ঐ পুরুষ কি ঐ নারীকে পূর্ব্বে জানিতেন?—না।

এই সকল রহস্যের কিছুই তাহারা উদ্ভেদ করিতে পারিল না; কিন্তু বিশেষ ভক্তি ও সম্ভ্রমপূর্ণভাবে তাহারা ঐ মৃতকল্প নারী ও ঐ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষকে লক্ষ্য করিতে করিতে তাঁহাদের অনুসরণ করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরিচয়।

সন্ন্যাসী উমাশঙ্করের পিতৃমাতৃঘটিত বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে হরকুমার বাবু নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া এই স্থানে আসিয়াছেন। এ স্থানে থাকিবার তাঁহার প্রয়োজন ছিল না। এই সনাতনপুরের কিছু দূরে রামনগরে গমন করাই হরকুমারের অভিপ্রায়। পথিমধ্যে অপরিজ্ঞাত যুবতীর এই দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে অগত্যা এখানে থাকিতে হইয়াছে।

বাস্তবিকই হরিশ কামার বড় ভাল লোক। সে সানন্দে পীড়িতা কামিনী ও হরকুমার বাবুর যথাবিহিত সাহায্য করিয়াছে এবং আপনার বাটীতে তাঁহাদের অবস্থানের বড়ই সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। হরিশের মা, ভগ্নী, স্ত্রী সকলেই পীড়িতাকে গুরুকন্যার ন্যায় সমাদর করিতেছে ও তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা প্রভৃতি সকল কর্ম্ম পরমানন্দে সম্পাদন করিতেছে। যেখানে পীড়িতা সুন্দরী থাকেন, হরিশ সে দিকেও যায় না। বাটীর বাহিরে একখানি ক্ষুদ্র ঘর আছে; হরকুমার তথায় অবস্থান করেন। পীড়িতা সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে তাঁহাকে কোন নিরাপদ্ স্থানে পাঠাইয়া না দিয়া হরকুমার স্থানান্তরে যাইতে অক্ষম।

হরকুমার বাবুর সে দিনকার কার্য্য ও তাহার পরবর্ত্তী অন্যান্য ব্যবহারাদি আলোচনা করিয়া হরিশ কামার এবং গ্রামের লোকেরা হরকুমার বাবুকে একটা দেবতুল্য মহাত্মা বলিয়াই মনে করিয়াছে।

পীড়িতা ক্রমশঃ সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার লাবণ্যজ্যোতিঃ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই

[মন্তব্য]—বঙ্গভাষায় আরও কোন উপন্যাসে জলনিমগ্না এক নারীর পুনর্জ্জীবন প্রাপ্তির প্রসঙ্গ আছে। এতদ্বিষয়ক জ্ঞান নিতান্ত প্রয়োজনা এবং ইহার প্রণালী তাহাতেবই পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং এই ব্যাপারের আমূল ব্যবস্থা বিস্তারিতরূপে বিবৃত হওয়াই বিধেয়। বিচক্ষণ হরকুমার বাবু উপস্থিত ঘটনার প্রথম হইতে যে যে প্রণালীর অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহাই সমীচীন ও শাস্ত্রসম্মত। এই জন্যই মূল ঘটনা পরিপুষ্টির নিমিত্ত বর্ত্তমান ব্যাপারে বর্ণনা বিশেষ আবশ্যক না হইলেও আমরা ইহার পরিবর্জ্জন করিলাম না।]

শোভাময়ী সুন্দরীর পরিচয় জানিবার নিমিত্ত বৃদ্ধ হরকুমার বাবু অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু স্বকীয় বৃত্তান্ত-বিজ্ঞাপনে নবীনার নিতান্ত অনিচ্ছা দেখিয়া অগত্যা ক্ষান্ত হইয়াছেন। এই সুন্দরীর জন্য হরকুমার বাবুর অনেক অর্থব্যয় হইতেছে; কিন্তু তিনি সে জন্য একটুও কাতর বা অসুখী নহেন।

এক দিন বৈকালে হরকুমার বাবু হরিশ কর্ম্মকারের বাটীতে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন,—"মা, কোথায় গো?"

তৎক্ষণাৎ একখানি ঘরের মধ্য হইতে লজ্জাবনতবদনা সেই পুনর্জ্জীবিতা সুন্দরী আগমন করিয়া ভক্তি সহকারে হরকুমার বাবুকে প্রণাম করিলেন এবং একখানি কাঠের পিঁড়ি পাতিয়া তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিলেন। হরকুমার বাবু আসনগ্রহণ করিলে সুন্দরী সঙ্কুচিতভাবে অনতিদূরে ভূ-পৃষ্ঠে উপবেশন করিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে স্বকীয় বস্ত্রের এক প্রান্তদেশ অন্যমনস্কভাবে অঙ্গুলীতে জড়াইতে জড়াইতে ও খুলিতে খুলিতে বলিতে লাগিলেন,—"বাবা, কয়দিন হইতে আপনাকে একটা কথা বলিব মনে করিয়াছি, কিন্তু আপনার স্নেহ ও দয়া দেখিয়া বলি বলি করিয়াও বলিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আজ কিন্তু যেমন করিয়া হউক, কথাটি বলিয়া ফেলিব মনে করিয়াছি।"

হরকুমার বাবু সস্নেহে বলিলেন,—"আমাকে কোন কথা বলিতে এত সঙ্কোচ কেন মা? বল কি কথা?"

সুন্দরী কিয়ৎকাল অধোমুখে চিন্তা করিলেন; তাহার পর সাহসে ভর করিয়া বলিলেন,—"আমার বোঝা আপনি আর এমন করিয়া কত দিন বহিবেন?"

হরকুমার বাবু বলিলেন,—"মা'র বোঝা ছেলে তো চিরদিনই বহিয়া থাকে। কোন ছেলেই তো সে জন্য কাতর হয় না এবং বোঝা বলিয়া মনেও করে না। তুমি মা, যত দিন আবশ্যক হইবে, আমাকে অবশ্যই আনন্দের সহিত তত দিন তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে।"

সুন্দরী আবার বলিলেন,—"আপনার যত্ন ও অনুগ্রহের সীমা নাই। কিন্তু আমারও নানা স্থানে অনেক আত্মীয় লোক আছেন; তাঁহাদের সংবাদাদি না পাইয়া আমি বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি। তাই বলিতেছিলাম, আপনি অনুমতি দিলে আমি কোন আত্মীয় লোকের নিকট চলিয়া যাই।"

হরকুমার বাবু এই সুন্দরীর পরিচয় জানিবার নিমিত্ত নিতান্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। ভাবিলেন, নবীনা যখন স্বেচ্ছায় পরিচয় প্রদান করিবেন না, তখন কৌশল দ্বারা তাহা জানিতে চেষ্টা করা অপরামর্শ নহে। বলিলেন,—"বেশ কথা, আমার তাহাতে কোনই আপত্তি নাই, তুমি কোথায় কোন্ আত্মীয়ের নিকট যাইবে, বল। আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া রাখিয়া আসিব।"

সুন্দরী জানিতেন যে, তাঁহার প্রস্তাবের এইরূপ উত্তরই হইবে। কোন আত্মীয়ের নাম উল্লেখ করিলেই তাঁহার পরিচয় প্রকাশ হইয়া পড়িবে, এ কথা তিনি বুঝিলেন; অথচ এরূপ ভাবে থাকিতেও তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। তিনি অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন,—"আমাকে একাকিনী চলিয়া যাইতে দিন।"

হরকুমার বাবু ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিলেন,—"তাও কি হয় মা? আমি এমন অজ্ঞানের মত কাজ করিতে পারি কি? কিন্তু কেন মা, তুমি আমার নিকট নিজের পরিচয় গোপন করিতেছ? আমাকে তোমার পরিচয় জানাইলে ইষ্ট ভিন্ন কখনই অনিষ্ট হইবে না। আমি বেশ বুঝিতেছি, তুমি বিশেষ ভদ্রঘরের মেয়ে। তোমার স্বভাব-চরিত্র খুব ভাল; নিশ্চয়ই কোন দৈবদুর্ব্বিপাকে পড়ায় তোমার এই দশা ঘটিয়াছে। বল মা, তুমি কে? আমি যত্ন করিয়া অবশ্যই তোমার যাহাতে ভাল হয়, তাহার উপায় করিব।"

সুন্দরী বলিলেন,—"আমার কথা কেহই বিশ্বাস করে না। আপনিও আমার বৃত্তান্ত শুনিলে হয় ত বিশ্বাস করিবেন না। আমি জীবনে কোন মন্দ কাজ করি নাই; কিন্তু আমার অদৃষ্টের দোষে বা বুদ্ধির দোষে সকলই মন্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে সুখের আশায় এখনও আমি জীবন রাখিতে চাহি, তাহা যে আমার অদৃষ্টে আবার ঘটিবে, এরূপ বিশ্বাস আমার আর নাই; এরূপ অবস্থায় আমার মরাই মঙ্গল। কিন্তু আমার যাহাই হউক, আমার জন্য আর এক দুঃখী পরিবার বড়ই বিপদাপন্ন হইয়াছে। আমার নিজের ভাবনা আমি এখন ছাড়িয়া দিয়াছি; একবার তাহাদের সংবাদ লইবার জন্য আমি অস্থির। আর আমার কোন কামনা নাই। তাহাদের ভাল হউক, মন্দ হউক, একটা সংবাদ লইয়া আমি হয় ত প্রাণত্যাগ করিব। অতএব আপনি আমাকে বিদায় দিন।"

হরকুমার বাবু বলিলেন,—"ছিঃ মা! আত্মহত্যার কথা মনে আনিতে নাই। তুমি কাহার

সংবাদের জন্য ব্যাকুল, বল? আমি এখনই তাহা জানিবার উপায় করিব। আমার লোকজন আছে; এ গ্রামের তাবতেই আমার বাধ্য; এ প্রদেশের অনেকেই আমার পরিচিত, আত্মীয় ও বন্ধু আছেন; কুটুম্ব-সাক্ষাৎও এ অঞ্চলে আমার অনেক; টাকা-কড়িরও আমার হাতে অপ্রতুল নাই। এ অবস্থায় তুমি আমাকে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিলে, আমার দ্বারা প্রতীকার হওয়াই সম্ভব।"

সুন্দরী নীরবে অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন। হরকুমার বাবু আবার বলিলেন,—"দেখ মা! আমি তোমার ছেলে। মা কখনও ছেলেকে অবিশ্বাস করে না এবং ছেলেও কখনও মাকে অবিশ্বাস করিতে পারে না। অন্যে তোমার কথা বিশ্বাস করুক না করুক, আমি যে তোমার কথা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিব, তাহার কোনই সন্দেহ নাই। তোমার আকৃতি, তোমার ব্যবহার, তোমার কথা-বার্ত্তা এ কয়দিন আমি আলোচনা করিতেছি এবং বুঝিতেছি যে, তোমার ন্যায় সতী-লক্ষ্মী, সুশীলা নারী এ সংসারে বড়ই দুর্ল্লভ। তবে মা, কেন তুমি আমাকে অকারণ সন্দেহ করিয়া কষ্টভোগ করিতেছ?"

তথাপি সুন্দরী নীরব। হরকুমার বলিলেন,—"কিন্তু মা, তোমার এ চেষ্টা নিষ্ফল হইবে। আজ হউক, কাল হউক বা দশ দিন পরেই হউক, আমি তোমার পরিচয় জানিতে পারিবই পারিব। তোমার ন্যায় অল্পবয়সের মেয়েকে একাকিনী নিঃসহায় অবস্থায় ফেলিয়া আমি যাইতে পারিব না। সুতরাং হয় তোমাকে সঙ্গে করিয়া কাশীতে লইয়া যাইব এবং আমার পরিবারবর্গের নিকট রাখিয়া দিব, না হয় এ দেশে তোমার কোন আত্মীয়ের সন্ধান পাইলে, তাঁহাদের নিকট তোমার থাকিবার ব্যবস্থা করিব। যেরূপেই হউক, তোমার পরিচয় অধিক দিন আমার নিকট প্রচ্ছন্ন থাকিবে বোধ হয় না। এ অবস্থায় তুমি তাহা জানাইলে সুবিধা ভিন্ন অসুবিধা কিছুই হইত না। তবে যদি তাহাতে তোমার নিতান্তই অনিচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমি বার বার সে জন্য জেদ করিতে চাহি না।"

হরকুমার বাবু নীরব হইলেন। সুন্দরী বলিলেন,—"আপনি আমাকে মা বলিয়া ডাকিয়াছেন; পিতার ন্যায় যত্নে আমার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন; আমার জন্য অনেক ক্লেশ স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন; আপনি মহাশয় লোক। আপনার নিকট সকল কথা বলিব। বিশ্বাস করুন বা না করুন, অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, আমি কিছুই আপনার নিকট লুকাইব না। আপনি সোনাপুরের সার্ব্বভৌম ভট্টাচর্য্য মহাশয়ের নাম শুনিয়াছেন কি?"

হরকুমার চমকিত হইলেন এবং সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিলেন,—"মা! তবে তুমি সর্ব্বভৌম মহাশয়ের পুত্রবধূ নবীনকৃষ্ণের সহধর্ম্মিণী?"

যুবতী অঞ্চলে বদনাবৃত করিয়া রোদন-বিজড়িত-স্বরে বলিলেন,—"আপনি কেমন করিয়া জানিলেন? এ অভাগিনীর এক দিন সেই গৌরবের পরিচয়ই ছিল বটে; এখন শ্বশুর আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু আপনি কেমন করিয়া বুঝিলেন?"

হরকুমার বলিলেন,—"শ্যামলালের দৌরাত্ম্য ও নির্য্যাতনের কথা সকলই আমি জানি মা। তোমার শ্বশুর ও স্বামী এক্ষণে কাশীধামে অবস্থিতি করিতে-ছেন, তাঁহারা ভাল আছেন। তুমি আমার নিতান্ত আপনার লোক। কোন ভয় করিও না, নিঃসঙ্কোচে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সকল কথা বল মা! নিশ্চয়ই আমি সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিব।"

তখন সুহাসিনী একে একে আমূল সমস্ত ঘটনা হরকুমার বাবুর গোচর করিলেন। শ্যামলালের প্রেরিত দূতের আগমন, শ্বশুর ও স্বামীর রক্ষা করিতে অক্ষমতা, গদা-চণ্ডালের অলঙ্কারলোভে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বিলাসপুরের কুটুম্ববাড়ীতে আনয়ন, কুটুম্বগণের বিরাগ, দাসীর সহিত পরিচয় হওয়ায় চণ্ডীতলা গ্রামে কৈবর্ত্তবাটীতে আশ্রয়লাভ, পুনরায় গদার সাহায্যে শ্বশুরের নিকটস্থ হইবার চেষ্টা, পথিমধ্যে অপরিচিত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক আক্রমণ, দাসীর স্বামী রামহরির গুরুতর আঘাতপ্রাপ্তি ও পতন, অপরিচিত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক তাঁহাকে ও দাসীকে নৌকায় আনয়ন, নৌকার নিমজ্জন, অসম্ভাবিত উপায়ে তাঁহার জীবন-রক্ষা ইত্যাদি সকল কথাই তিনি বলিলেন। এই সকল বৃত্তান্ত শেষ হইলে তিনি বলিতে লাগিলেন,—"আমার যাহা হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে; কিন্তু আমার জন্য রামহরি ও দাসী হয় ত মারা পড়িয়াছে। তাহারা বড়ই সৎ ও ধার্ম্মিক। তাহাদের জন্য ভাবনাতেই আমি যার-পর-নাই অস্থির।"

হরকুমার বলিলেন,—"তোমাকে দেখিয়া ও তোমার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া আমার আজ যে আনন্দোদয় হইল, সমস্ত জীবনে এরূপ আনন্দ আর কখনও হইয়াছে কি না সন্দেহ। তোমার শ্বশুর ও আমি অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু। আমার নাম শুনিয়া তুমি হয় ত আমাকে মনে করিতে পারিতেছ না; কিন্তু আমার পরিচয় শুনিলে তুমি নিশ্চয়ই আমাকে

চিনিতে পারিবে। আমি পূর্ব্বে শ্যামলাল বাবুর দেওয়ান ছিলাম।”

সুহাসিনী মাথার কাপড় আর একটু টানিয়া দিয়া বলিলেন—“বাস্তবিকই আপনি আমার শ্বশুর। আমি জানি, আপনি আমার শ্বশুরের পরম আত্মীয়। আমি আগে না জানিয়া, আপনার সহিত কথা কহিয়া বড়ই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি।”

হরকুমার বলিলেন,—“বড়ই ভাল কর্ম্ম করিয়াছ। তোমাকে দেখিতে পাইলাম, তোমার মুখে সকল কথা শুনিতে পাইলাম বলিয়াই ত সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা করিবার ভরসা করিতেছি। তোমার কোন চিন্তা নাই মা। আমি শীঘ্রই কৈবর্ত্তদিগের সংবাদ আনাইয়া দিতেছি এবং যাহাতে তোমার শ্বশুর মহাশয় তোমাকে নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করেন, তাহার সুব্যবস্থা করিতেছি। তোমার ন্যায় পুত্র-বধূ অনেক ভাগ্যফলেই মিলে। জগতে ভাল হইলেই অনেক কষ্ট সহিতে হয়। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী সকলকেই কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। অশেষ কষ্টের মধ্যেও ধর্ম্ম বজায় রাখিতে পারাই মহত্ত্ব। তুমি বালিকা হইলেও অতীব যত্নে ধর্ম্ম-ধনকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মহত্ত্বের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছ। তোমার কষ্টের শেষ হইয়াছে মা! কাহারও কষ্ট কখনই চিরদিন থাকে না।”

সুহাসিনী অধোমুখে রোদন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বাহির হইতে এক ব্যক্তি চীৎকার করিয়া ডাকিল,—“হুজুর বাড়ী আছেন কি?”

হরকুমার উত্তর দিলেন,—“কে ও? জরিফ? দাঁড়াও, যাই।”

তাহার পর সুহাসিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—আমাকে যে ব্যক্তি ডাকিতেছে, সে শ্যামলাল বাবুর ক্যোচ্‌ম্যান ছিল। এ সম্বন্ধে অনেক কথাই তোমাকে জানাইবার আছে, অন্য সময়ে তাহা বলিব।”

হরকুমার প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সংবাদ।

হরকুমার বাহিরে আসিলে প্রাচীন জরিফ কোচ্‌ম্যান তাঁহাকে সবিনয় সেলাম করিয়া বলিল,—“ধর্ম্মাবতার, চেষ্টার কোন ত্রুটি করি নাই, কিন্তু ফল ত কিছুই হইল না।”

হরকুমার বলিলেন,—“তুমি বড়ই পরিশ্রম করিয়াছ দেখিতেছি। সমস্ত দিন বুঝি খাওয়া হয় নাই? চেহারা বড় খারাপ দেখাইতেছে। আগে তুমি বিশ্রাম কর, কিছু খাওয়া-দাওয়া কর, তাহার পর সকল কথা শুনিব।”

হরিশ কর্ম্মকারের বাহির-বাটীতে একখানি দোচালা ঘর ছিল; হরিশের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হওয়ার পর এবং এ প্রদেশে এখন কিছু কাল থাকিতে হইবে জানিয়া হরকুমার বাবু সেই সামান্য ঘরখানি আপনার বৈঠকখানা করিয়া লইলেন। তিনি সেই ঘরে শয্যার উপর উপবেশন করিলে, কোচ্‌ম্যান একখানি কম্বল লইয়া তাহার অনতিদূরে ঘরের বাহিরে উপবেশন করিল। তাহার পর বলিল,—“লোকটা গুলীখোর। অতি অসভ্য, নিতান্ত নির্ব্বোধ। তাহার দ্বারা কোন কাজ আদায় করা আমার ত সাধ্য নহে, হুজুর যদি পারেন।”

হরকুমার বলিলেন,—“তবে তুমি তাহার সন্ধান পাইয়াছ, তাহার সহিত দেখাও করিয়াছ। ভাল, এও একটা সুসংবাদ বটে; কিন্তু বিশেষ সন্ধানে জানিতে পারিয়াছি যে, সে লোকটা গঙ্গামণির বোনপো বটে। গঙ্গামণি পাঁচ বৎসর আগে মরিয়াছে। এই বোনপো তাহার কাছেই থাকিত; মাসী মরার পর বোনপো রামনগর ছাড়িয়া রাধানগরে আসিয়া বাস করিতেছে। গঙ্গামণির একটি ঘর, কিছু পিতল-কাঁসার বাসন, দুই চারিখানা সোনা-রূপার অলঙ্কার এবং যৎসামান্য নগদ টাকা ছিল। এই বোনপো সে সমস্ত দখল করিয়াছিল এবং বাড়ী-ঘর ও জিনিসপত্র বেচিয়া রামনগর হইতে চলিয়া আসিয়াছিল। এক্ষণে তাহার আর কিছুই নাই, নেশা করিয়া ও অপব্যয় করিয়া সকলই নষ্ট করিয়াছে।”

হরকুমার জিজ্ঞাসিলেন,—“এখানে তাহার একটা থাকিবার স্থানও নাই কি?”

জরিফ বলিল,—“কিছুই নাই, সমস্ত দিন সে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায় ও গুলীর আড্ডায় কাটায়। রাত্রে এক ভদ্রলোকের বাটীর বাহিরের বারান্দায় পড়িয়া থাকে। গঙ্গামণির নিকট যে কাগজ-পত্র ছিল বলিতেছেন, এ হতভাগা নিশ্চয়ই তাহা পায় নাই এবং পাইলেও রাখে নাই।”

হরকুমার জিজ্ঞাসিলেন—“তুমি কাগজপত্রের কথা তাহার নিকট তুলিয়াছিলে কি?”

জরিফ বলিল,—“আজ্ঞে না। আমি তাহার সহিত কোনও কথা কহি নাই। পাছে ভয় পাইয়া সে পলাইয়া যায়, এই আশঙ্কায় আমি তাহার সহিত কথা কহিবার চেষ্টা করি নাই। হুজুর তাহাকে দেখিয়া যেরূপ মনে বুঝেন, তাহাই করিবেন ভাবিয়া আমি

তাহাকে ঘাঁটাই নাই। কিন্তু আমার বোধ হয়, যদিই কাগজপত্র পাইয়া থাকে, তাহা হইলে সে সকলই নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।"

হরকুমার জিজ্ঞাসিলেন,—"তাহার ভয়ের কারণ কি, তাহা অনুমান করিতে পারিয়াছ?"

জরিফ বলিল,—"তাহাও একরকম বুঝিয়াছি। গঙ্গামণির আর এক ভগ্নীর আর এক ছেলে আছে। তাহার নাম রামচন্দ্র। সে বর্দ্ধমানে থাকে, ভাল কাজ-কর্ম্ম করে—তাহার অবস্থা মন্দ নয়। মাসীর সামান্য সম্পত্তির জন্য তাহার কখনও লোভ হয় নাই অথবা তাহার মাসী হয় ত তাহাকে সে সকল কিছু দেয় নাই। ফলতঃ সে তাহার অংশ লইবার জন্য কখনও চেষ্টা করে নাই। গঙ্গামণি যত দিন জীবিতা ছিল, তত দিন রামচন্দ্র মধ্যে মধ্যে মাসীর খবর লইয়াছে এবং কখন কখন গঙ্গামণিকে সামান্য অর্থ-সাহায্যও করিয়াছে। চণ্ডী অচেনা লোক দেখিলেই মনে করে যে, হয় ত সে তাহার সেই মাসতুত ভায়ের লোক এবং হয় ত এত দিন পরে গঙ্গামণির সম্পত্তির অংশ লইবার লোভ হওয়ায় তাহার ভাই তাহাকে তাহার নিকট পাঠাইয়াছেন।"

হরকুমার একটু হাস্য করিলেন,—"বলিলেন,—"জরিফ, তোমার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। তুমি অনেক প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছ। এমন গুরুতর বিষয়ের অতি সহজেই মীমাংসা হইয়া যাইবে, এরূপ আশা আমি কখনই করি নাই। এক গঙ্গা-মণি ও রামনগর এই দুইটি মাত্র নাম লইয়া আমি এ প্রদেশে আসিয়াছি। কোন্ রামনগরে আমার প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে, তাহাও আমি জানিতাম না। এক্ষণে বুঝা যাইতেছে, এই রামনগরই ঠিক। গঙ্গা-মণিরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এ সকলই বিশেষ শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। আমাদিগের হতাশ হইবার কোনও কারণ নাই।"

জরিফ বলিল,—"আমি কিন্তু হুজুর কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এমন কি খোদা করিবেন? আমার মনে কোনই ভরসা নাই। তবে হুজুরের মত বুদ্ধি আর কাহারও নাই। হুজুর যখন ভাল বুঝিতেছেন, তখন কাজেই সকল বিষয় ভাল বলিয়াই মনে করিতে হইবে।"

হরকুমার বলিলেন,—"ভাল যে হইবে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। সেই বালক আকারে-প্রকারে দেবতার মত, তাহার অদৃষ্টে অনেক সুখ ও ঐশ্বর্য্য-ভোগ আছে। নিশ্চয়ই তাহার বংশাবলীর বৃত্তান্ত আমি প্রকাশ করিতে পারিব। এ বিষয়ে মহাপুরুষ আমাকে আশীর্ব্বাদও করিয়াছেন। আশায় বুক বাঁধিয়া কাজ কর, অবশ্যই আমরা সফলতা লাভ করিব। তোমার পুরাণ মুনিবের কোন খবর পাইয়াছ কি?"

জরিফ বলিল,—"আমার জবাব হওয়ার পর হইতে আর কোন খবর পাই নাই—পাইতেও ইচ্ছা নাই। তবে এইমাত্র শুনিতেছি যে, গিন্নী আর হরিচরণ বাবু পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছেন। শ্যামলাল বাবু একা বাড়ীতে বড় দুরবস্থায় পড়িয়াছেন। তাঁহার খরচের নিমিত্ত ১৫৲ টাকা করিয়া ধার্য্য হইয়াছে, তাহাও তাঁহার হাতে দেওয়া হয় না—রামা খানসামার কাছে থাকে। গাড়ী, ঘোড়া, হাতী সমস্তই বিক্রী হইয়াছে। দামী দামী জিনিসপত্র গিন্নী সকলই সঙ্গে করিয়া লইয়াছেন—কতক বিক্রয় করিয়াছেন। সামান্য কাঠ-কাঠরা, বাসন-কোসন বাড়ীতে পড়িয়া আছে। চাকর-বাকর সকলেরই জবাব হইয়াছে, কেবল কাছারীতে কয়েক জন মুহুরী ও এক জন নায়েব আছেন। বাড়ী আগ্‌লাইবার জন্য চারিজন দরওয়ান আছে। সোনার সংসার ছাই হইয়া গিয়াছে। শ্যামলাল বাবুর দুর্দ্দশার সীমা নাই।"

হরকুমার বাবু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"যাহা হওয়া উচিত, তাহাই হইয়াছে। সে জন্য দুঃখ করিবার কোনই দরকার নাই। আমি আপাততঃ তোমার আহারের উদ্যোগ করিয়া দিই।"

জরিফের আহারাদি সমাপ্ত হইলে হরকুমার বাবু তাহাকে নিকটে ডাকিয়া পীড়িতা সুন্দরীর পরিচয় এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য অনেক বৃত্তান্ত জানাইয়া বলিলেন,—"এক্ষণে যেমন করিয়া হউক, অবিলম্বে গদা চাঁড়ালের সন্ধান করিতে হইবে। তোমার উপর আমি এই ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেছি।"

জরিফ আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিল,—"এ কাজ আমি সহজেই শেষ করিতে পারিব। গদা যেখানে থাকে, তাহা আমি জানি, শীঘ্রই তাহাকে ধরিয়া হুজুরের কাছে আনিতে পারিব।"

জরিফ প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া হরকুমার জিজ্ঞাসিলেন,—"কোথা যাও?"

জরিফ বলিল—"গদার সন্ধানে।"

হরকুমার। এখনই?

জরিফ। দেরী করায় লাভ কি? হাতে তো কাজ কম নাই। কালি প্রাতে ফিরিব। গদাকে ধরিয়া আনিতে পারিব আশা আছে।

হরকুমার। আজি বড় ক্লান্ত আছ। আজ থাকুক না কেন?

জরিফ। হুজুরের হুকুম তামিল করিতে শরীরের মায়া হয় না। আমি এখন আসি।

সসম্মান সেলাম করিয়া জরিফ প্রস্থান করিল। হরকুমার মনে মনে তাহার বিস্তর প্রশংসা করিলেন।

জরিফ যাহা বলিয়াছিল, তাহা ঠিক। সহজেই সে গদার সন্ধান পাইল বটে; কিন্তু গদা বড় বিপদাপন্ন। দারোগা, জমাদার, পাহারাওয়ালা অনেকে গদাকে ঘেরাও করিয়াছে। সুহাসিনী-প্রদত্ত অলঙ্কাররাশি গদার সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে। অলঙ্কারগুলি গদা নানা স্থানে বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। যে যে লোকের নিকট সে চোরাই মাল বিক্রয় করে, তাহারা একশত টাকার বেশী দাম দিতে চাহে না। এত সামান্য মূল্যে এ সামগ্রী বিক্রয় করা উচিত নয়, ইহা গদা বেশ বুঝিত। বিশেষতঃ এ সকল চুরির মাল নহে। গদা ভয়শূন্য হইয়া ক্রমে কোন কোন গৃহস্থবাটীতে তাহা বিক্রয়ের চেষ্টা করে। কথা প্রচার হইয়া উঠে। গদার হাতে এই সকল মাল দেখিয়া কেহই চুরির জিনিস ছাড়া আর কিছুই মনে করে নাই। থানার লোক সংবাদ পাইয়া গদাকে ধরিয়াছে। গদা বুঝাইতেছে, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্রবধূ তাহাকে এ সকল অলঙ্কার দান করিয়াছেন। রাজকর্ম্মচারী ও সাধারণ লোক সকলেই স্থির করিয়াছেন, অলঙ্কারগুলি সার্ব্বভৌম মহাশয়ের পুত্রবধূর হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু তিনি যে এত অলঙ্কার ইহাকে দিয়াছেন, এ কথা বিশ্বাস্য নহে। বিশেষতঃ তিনি আছেন কি নাই, তাহাও সন্দেহ। এরূপ অবস্থায় গদাকে চালান দেওয়াই সদুপায়। কেহ দান করিয়াছেন, এ কথা প্রমাণ করিতে পারিলে গদাকে এখনই ছাড়া যায়; না হয় পরে হাকিমের নিকটেও সেই কথা বুঝাইলে গদা খালাস হইয়া আসিতে পারে। বড়ই বিপদের কথা; কেন না, গদা জানে, বামুনদের বউ-ঠাকরুণ জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছেন। হরিচরণ বাবু সন্ধান করিয়া গদাকে সুহাসিনীর খবর আনিতে বলিয়াছিলেন। সেই কথায় গদা তাঁহার সন্ধান করিতে থাকে। সেই সময় রামহরি চাষাও গদার সন্ধানে ব্যাপৃত হয়। গদার সহিত রামহরির সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা ধার্য্য হইলে, গদা সমস্ত পরামর্শ হরিচরণকে জানাইল। সুহাসিনীকে ধরিয়া আনিবার জন্য পথিমধ্যে হরিচরণের নিয়োজিত লোক থাকিল। তাহারা যে যে কাণ্ড ঘটাইল, তাহা পাঠকগণ জানেন। হরিচরণের দূতেরা সুহাসিনীকে ও দাসীকে নদীতীর পর্য্যন্ত আনিয়া নৌকায় উঠাইল। গভীর রাত্রে নৌকা-ডুবি হইল। গদা স্বচক্ষে সুহাসিনীকে জলে ডুবিতে দেখিয়াছে—উঠিতে দেখে নাই। সুতরাং তিনি মারা গিয়াছেন বলিয়াই গদা জানে। তবে গদা এখন কেমন করিয়া প্রমাণ করিবে যে, অলঙ্কার সমস্ত তিনি দান করিয়াছেন? তিনি থাকিলেও যে দানের কথা স্বীকার করিতেন, ইহারই বা নিশ্চয়তা কি? এ সম্বন্ধে কোনই সাক্ষী নাই। সুতরাং গদা বুঝিতেছে, এ যাত্রা তাহার আর অব্যাহতি নাই।"

এইরূপ সময়ে জরিফ কোচ্‌ম্যান সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। সে সমস্ত কথা বুঝিয়া, থানার লোকদিগকে, গদাকে অলঙ্কার সমেত তাহার সঙ্গে আসিতে বলিল। জরিফ সকলেরই পরিচিত। সে যখন ঠিক সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দিতে পারে বলিতেছে, তখন তাহার সহিত যাওয়ায় হানি নাই বিবেচনায় এক জন জমাদার ও দুই জন পাহারাওয়ালা অলঙ্কার সমস্ত ও গদাকে সঙ্গে লইয়া সনাতনপুরে হরিশ কর্ম্মকারের বাটীতে উপস্থিত হইল। সেখানে হরকুমার বাবুকে দেখিয়া থানার লোক ও গদা সকলেই সসম্ভ্রমে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

হরকুমারের মুখে সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিয়া অলঙ্কারগুলি দর্শন করিয়া সুহাসিনী তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিলেন যে, তৎসমস্ত তিনি গদা চণ্ডালকে দান করিয়াছেন। সে উপকারের তুলনায় এ অলঙ্কারদান নিতান্ত সামান্য কার্য্য। থানার লোক নিরুপায়। অগত্যা তাহারা গদাকে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল।

হরকুমার এই অলঙ্কারগুলি ক্রয় করিতে চাহিলেন। গদা কোথায়ও একশত টাকার বেশী দাম পায় না; হরকুমার দুই শত টাকা দিতে চাহিলেন। গদা সানন্দে অলঙ্কারের বদলে দুই শত টাকা গ্রহণ করিল।

গদা প্রস্থান করিল; কিন্তু যখন তাহাকে প্রয়োজন হইবে, তখনই সে আসিবে, এরূপ ব্যবস্থা থাকিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মহদাশ্রয়

আকাশে মেঘ হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে এক একবার জোরে বৃষ্টি আসিতেছে; কিয়ৎকাল পরেই আবার ছাড়িয়া যাইতেছে। পল্লীগ্রামের পথ-ঘাট কর্দ্দমাকীর্ণ। ডোবা ও পুষ্করিণীতে জল বাধিয়াছে। বর্ষাকালের পূর্ণলক্ষণ পরিদৃষ্ট হইতেছে।

রামনগর অতি সামান্য গ্রাম। সপ্তাহে দুই দিন

করিয়া এই গ্রামে একটি হাট বইসে। সন্নিহিত অনেকগুলি ক্ষুদ্রগ্রামের লোক সেই হাটের দিন স্ব স্ব প্রয়োজনীয় পদার্থ সংগ্রহ করিয়া লয়। হাটে নানারূপ সামগ্রী আমদানী হয়। হাট বসিবার জন্য গ্রামের প্রান্তভাগে অনেক বৃক্ষ-সমাকীর্ণ একটি মাঠ নির্দ্ধারিত আছে; তথায় তিনখানি অতি সামান্য আকারের চালাঘরও আছে।

অদ্য হাটবার। কিন্তু হাট জমিতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। বেলা ১০ টার পর হইতে হাটে লোক আসিতে আরম্ভ হয় এবং বেলা ১২ টার সময় হাট পূর্ণভাবে জমিয়া উঠে। এখন বেলা ৮॥ টা। এখনও কেহ আইসে নাই; কেবল উল্লিখিত চালা-ঘর কয়খানির একখানিতে একটি কদাকার পুরুষ বসিয়া একটা খুঁটি হেলান দিয়া ঝিমাইতেছে। লোকটার পরিধানে যে বস্ত্র আছে, তাহা না থাকারই সমান। গায়ে একখানা ছেঁড়া ও নিতান্ত মলিন কাপড় আছে। ঝিমাইতে ঝিমাইতে এক একবার লোকটা পড়িয়া যাইবার মত হইতেছে, আবার তখনই সাবধান হইয়া আপনার পূর্ব্বস্থান স্থির করিয়া লইতেছে। মাছি ও মশা এ ব্যক্তির কম শত্রুতা করিতেছে না। অনেক মাছি তাহার ছিন্নবস্ত্রের উপর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহার মাথার উপর ঘুরিতেছে। অনেক মশা তাহার কানের নিকট উড়িতেছে এবং তাহার কৃষ্ণ কলেবরে আপনাদের দেহ মিশাইয়া বসিয়া আছে। লোকটা ক্রমেই নিতান্ত বিব্রত হইয়া পড়িল। বুঝিল, এ সুখের নিদ্রায় অনেক ব্যাঘাত; অবশেষে মশক ও মক্ষিকাকুল নির্ব্বংশ করিতে তাহার সঙ্কল্প হইল এবং সে তাহাদের বিরুদ্ধে বিষম যুদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু সে চক্ষু মেলিয়া চাহিতে পারিল না। একবার চক্ষু মেলিবার চেষ্টা করিল বটে; কিন্তু সেই মেঘ-ঢাকা ঘোলা ঘোলা আলো তাহার চক্ষুতে কিঞ্চিন্মাত্র প্রবেশ করিতে না করিতেই সে নয়ন মুদিয়া ফেলিল। চক্ষু মুদিয়া সে বলিল,—"শালার মাছি! শ্রাদ্ধ করি, দাঁড়াও না।"

তাহার পর লোকটা নিজের মুখের সম্মুখে আপনার পোড়া কাঠের রলার ন্যায় হাত দুইটা তফাৎ করিয়া ধরিল এবং ক্রমশঃ নিকটস্থ করিতে লাগিল; খুব নিকটস্থ হইলে সে বেগে দুই হাত যুক্ত করিল। তাহার পর অতি সাবধানে একখানি হাত তুলিয়া লইল এবং আর একখানি হাত সম্মুখে ধরিয়া বলিতে লাগিল,—"কেমন শালার মাছি, কেমন জব্দ!"

হাতে কিন্তু মাছির নামও নাই। থাকুক বা না-ই থাকুক, সে কিন্তু এইরূপে অনেকক্ষণ মাছির শ্রাদ্ধ করিতে ও তাহাদের জব্দ করিতে লাগিল। ইহাতে আপাততঃ তাহার একটু উপকার হইল। তাহার মৃতবৎ নিশ্চল দেহে যত মাছি বসিতেছিল, এক্ষণে তত মাছি আর তাহার গায়ে বসিতে পারিল না।

এইরূপে মক্ষিকা-বধ-কাণ্ড সমাধা করিয়া সে আবার বলিল, "জান না শালারা, আমি কে?"

আবার সর্ব্বসন্তাপনাশিনী নিদ্রা তাহাকে অধিকার করিল। ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লাগায় সে আবার জড়সড় হইয়া ঝিমাইতে লাগিল।

এইরূপ সময়ে দুইটি লোক তাহার নিকটস্থ হইল এবং এক জন সসম্ভ্রমে ডাকিল—"বাবু! বাবু মহাশয়।"

মলিনবেশী, কৃষকায়, লম্বোদর, কোটরনেত্র পুরুষ ঝিমাইতেছিল। এ সম্বোধনবাক্য তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল; কিন্তু আহ্বানকারী যে তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া কথা কহিতেছে, ইহা তাহার প্রথমে মনে হইল না। সুতরাং সে নীরবে এই নিদ্রার ব্যাঘাতকারী আগন্তুককে মনে মনে গালি দিতে থাকিল।

আগন্তুকদ্বয় আমাদের পরিচিত হরকুমার বাবু ও জরিফ কোচ্‌ম্যান। আহ্বানকারী স্বয়ং হরকুমার। জরিফ পশ্চাতে ঈষদ্ধাস্যমুখে দণ্ডায়মান। হরকুমার আবার ডাকিলেন,—"বাবু মহাশয়! ঘুমাইতেছেন না কি? বড় একটা দরকারের কথা জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়া আসিয়াছিলাম, তা বাবুর নিদ্রাভঙ্গ করা তো সম্ভব নয়।"

এবার সেই তন্দ্রামগ্ন পুরুষ বুঝিল যে, এই অপরিচিত কণ্ঠস্বর তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই বাক্য উচ্চারণ করিতেছে। সে তখন বুঝিল যে, বাবু সে চিরকালই ছিল, চিরকালই আছে এবং চিরকালই থাকিবে। সুতরাং তাহাকে বাবু বলিয়া আগন্তুক ভালই করিয়াছে। কিন্তু এত বড় বাবু লোকটার হঠাৎ কথা কহিয়া ছোট হওয়া অনুচিত বোধে সে নীরব রহিল।

হরকুমার বলিলেন,—"কাঁচা পাকা সব রকম মালই একটু একটু সঙ্গে আছে। চাটের রকম রকম জিনিসও কিছু কিছু আছে। এখন একটু জায়গা আর সাজ-সরঞ্জাম পাইলে মৌতাতটা সারিয়া লইতাম ইচ্ছা ছিল। বিদেশী লোক, কাহাকেও জানাশুনা নাই; একজনকে জিজ্ঞাসিয়া জানিলাম, এ গ্রামে ভদ্রলোক কেহই নাই; মানুষের মতন মানুষ এক চণ্ডী বাবু আছেন, তাঁহার জন্যই এখনও গ্রামের শ্রী আছে। তাই সন্ধান করিয়া মহাশয়ের কাছে এসেছি।"

হরকুমারের এই কথাগুলি ভেকদেহে তাড়িত প্রয়োগের ন্যায় চণ্ডী গুলীখোরের মনের ও দেহের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটাইল। কাঁচা-পাকা মালের কথা শুনিয়া তাহার জড়ভাবাপন্ন দেহ চিচালিত হইয়া উঠিল। চাটের বৃত্তান্ত শুনিয়া তাহার কোটরাবিষ্ট আলোকভীত নয়ন সহসা ফাঁক হইয়া গেল এবং সে সাগ্রহে এই দেবতুল্য আগন্তুক মহাত্মাকে দেখিতে লাগিল। চণ্ডে গুলীখোর নামে সকলের পরিচিত হইলেও সে আপনাকে চণ্ডী বাবু বলাই ভাল ও বিশ্বাস করে। সুতরাং ঝাড়া দিয়া একটু সোজা ভাবে বসিয়া স্থির করিল, আগন্তুক যথার্থ গুণগ্রাহী ভদ্র লোক বটেন। তাহার পর ভাঙ্গা গলায়, চাপা আওয়াজে বলিল,—"মহাশয় বিশিষ্ট ভদ্রলোক! নিবাস ?"

হরকুমার বলিলেন,—"নিবাস অনেক দূর। একটু কাজে এ দেশে এসেছি। সে সব কথা ক্রমে বাবুকে জানাইব। বাবু যে রকম মহাশয় লোক, তাহাতে বোধ হয়, কাঁচা-পাকা দুই রকমই বাবুর অভ্যাস আছে। এ সকল কাজে মাত না থাকিলে বড়লোকই মিথ্যা। আমার আবার একটু বেশীও অভ্যাস ঘটিয়াছে। এক আধছিলুম পাকা তামাকও মাঝে মাঝে খেয়ে থাকি।"

চণ্ডী সমুৎসাহে বলিলেন,—"আমিও—আমিও।" সে নিশ্চয় স্থির করিল, এ লোকটা দেবতা না হইয়া যায় না। বুঝিল, আজি সুপ্রভাতই বটে। আবার বলিল,—"বসুন—বসুন।"

চণ্ডী বসিতে বলিল বটে, কিন্তু সেখানে বসিবার কোনই স্থান নাই; তথাপি হরকুমার নিঃসঙ্কোচে তত্রত্য ধূলার উপর উপবেশন করিয়া বলিলেন,—"বসিলাম বটে, কিন্তু এটা হাটের ঘর; এখনই অনেক লোক জমিয়া যাইবে। একটু তফাতে যাইলে হয় না বাবু?"

চণ্ডী তখনই গাত্রোত্থান করিয়া বলিল,—"তাই ভাল, আসুন আমার সঙ্গে।"

মন্থর-পদবিক্ষেপে বক্রদেহ বহন করিয়া চণ্ডী অগ্রসর হইল। হরকুমার ও জরিফ তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে চণ্ডী বহু দূরে জঙ্গলের মধ্যে এক বটবৃক্ষমূলে আগমন করিয়া বলিল,—"এই বেশ জায়গা। এখানে কোন গোল নাই।"

হরকুমার বলিলেন,—"খুব ভাল। বাবুর পছন্দকে বলিহারি। এমন জায়গা নহিলে কি আয়েস হয়?"

হরকুমার তথায় উপবেশন করিলেন এবং জরিফের নিকট হইতে ব্যাগ লইয়া একে একে অনেক সামগ্রী বাহির করিলেন। আফিং, গুলী, গাঁজা, তামাক, টিকে, গুলীর বাতি, সকল রকমের কলিকা, হুঁকো ইত্যাদি অনেক সামগ্রী তাঁহার ব্যাগ হইতে বাহির হইল। আর বাহির হইল বার্ণির কৌটার এক কৌটা রসগোল্লা, এক কৌটা পানতুয়া, এক কৌটা উৎকৃষ্ট সন্দেশ।

লর্ড ফকল্যাণ্ড (Viscount Falkland) যখন বম্বে প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তখন তাঁহার পত্নী গুণবতী লেডী ফকল্যাণ্ডও এ দেশে ছিলেন। সেই মহিলা ভারতাবস্থান-সংক্রান্ত কতকগুলি কথা লিপিবদ্ধ করিয়া, "চৌ চৌ" নামে দুই খণ্ড পুস্তক প্রণয়ন করেন। দাক্ষিণাত্যে এক সম্প্রদায় ফেরি-ওয়ালা আছে, তাহারা আপনাদের পণ্য-সামগ্রী ঝুড়ি, বাক্স প্রভৃতির মধ্যে লইয়া, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পর্য্যটন করিয়া বেড়ায়। তাহাদের সঙ্গে একটা ঝুড়ি থাকে, তাহাকে তাহারা "চৌ চৌ" বলে। সেই ঝুড়িতে সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনোপযোগী অনেক প্রকার সামগ্রী সংগৃহীত থাকে। গ্রন্থ-কর্ত্রী সেই পণ্যজীবিগণের অনুকরণে আপনার গ্রন্থের নাম "চৌ চৌ" রাখিয়াছেন।

আমাদের হরকুমার বাবুর ব্যাগটিও একটি "চৌ চৌ"। তাহার বিপুলোদর হইতে যে সকল সামগ্রী বাহির হইয়াছে, তাহাতেও সেই ব্যাগ-সুন্দরী শূন্যো-দরী হন নাই। তিনি এখনও প্রসব করিতেছেন এবং আরও প্রসব করিবেন, এরূপ সম্ভাবনা দেখাই-তেছেন। তিনি আবার প্রসব করিলেন একটা পিতলের ঘটা, তার পর একটা এনামেল গ্লাস ইত্যাদি।

সমস্ত জিনিস সম্মুখে বিস্তৃত হইলে চণ্ডে গুলীখোর মুগ্ধ হইয়া গেল এবং হরকুমারের আয়োজন দেখিয়া অবধারণ করিল, লোকটা যথার্থ আমীর বটে। বলিল,—"তা মহাশয়! কি মনে ক'রে এ দেশে আগমন?"

হরকুমার বলিলেন,—"আমার আগমন ঠিক এ গ্রামে নহে। আমি রামনগর যাইব। এই গ্রামের মধ্য দিয়া পথ বলিয়া এখানে আসিয়াছি। পথে মহাশয়ের ন্যায় বড়লোকের সহিত আলাপ-পরিচয় ঘটিল, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। তা বাবু, যা ইচ্ছা হয়, আরম্ভ করুন।"

চণ্ডী সামগ্রী-সমূহের নিকটে বসিয়া মহোল্লাসে নেশার উপকরণগুলিতে হস্তার্পণ করিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার পর বলিল,—"সবই ভাল জিনিস! মহাশয়ের মাল চেনা আছে বেশ। হাঁ—রামনগর

যাইবেন বলিতেছেন বুঝি? তা সে তো এখান থেকে অনেক পথ। পাকা চারি ক্রোশ।"

হরকুমার বলিলেন,—"শুনিয়াছি, আরও ৪।৫ ক্রোশ পথ যাইতে হইবে। তা কি করি বাবু, দরকারে সবই করিতে হয়। আমাকে সেখানে যাইতেই হইবে। বাবু! জিনিস সবই ভাল বোধ হয়। আপনি হলেন জহুরী। পরখ ক'রে দেখুন সব।"

চণ্ডী প্রথমেই এক দলা আফিং গলাধঃকরণ করিয়া বলিল—"বেশ জিনিসই বটে, ক্রমে সবই দেখা যাউক। রামনগরে এমন কি দরকার, শুনিতে পাই না? সেখানে আমার মাসীর বাড়ী। সেখানকার অনেকের সঙ্গেই আমার আলাপ আছে। আমাকে মহাশয় গোলাম বলিয়া জানিবেন। তা এ ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালীর দ্বারা যদি কোন সাহায্য হইতে পারে, তাহা হইলে হুকুম করিবেন। কাহার কাছে দরকার?"

হরকুমার বলিলেন,—"শ্রীমতী গঙ্গামণি দেবী নামে এক বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যার নিকট আমার একটু সামান্য কাজ আছে। সেই জন্যই রামনগর যাওয়া। বাবু এ প্রদেশে বড়লোক। আপনার কৃপা থাকিলে সবই সম্ভব।"

এই সময় আবার বৃষ্টি আসিল এবং তাহার সহিত একটু হাওয়া উঠিল। গুলীখোর চণ্ডী গায়ের ছেঁড়া কাপড়খানি ক্ষীণ দেহের সহিত ভাল করিয়া আঁটিতে লাগিল। হরকুমার বলিলেন,—"বড় ঠাণ্ডা হাওয়া বাবু, একটা জামা গায়ে দেন।"

আবার "চো চো" ব্যাগের ভিতর হইতে একটি জিনের জামা বাহির হইল। জামা চণ্ডীর হাতে দিয়া হরকুমার বলিলেন,—"গায়ে দেন, দোষ কি? আমার থাকিলে আপনি লইবেন, আপনার থাকিলে আমি লইব। নহিলে বন্ধুত্ব কিসের?"

চণ্ডী কথাটিও না কহিয়া স্বচ্ছন্দে জামা গায়ে দিয়া বাঁচিল। তাহার পর বলিল,—"গঙ্গামণি দেবী? সে তো আমার মাসীর নাম। তাঁর কাছে কি দরকার? তিনি তো মারা গিয়াছেন।"

হরকুমার বলিলেন,—"তিনি আপনার মাসী ছিলেন? কি আশ্চর্য্য ঘটনা! আপনাকে পাওয়ায় আমার অনেক উপকার হইল দেখ্‌ছি। তিনি মারা গিয়াছেন! ভাল, মহাশয় তো আছেন। আপনার দ্বারা আমার সাহায্য হওয়া অসম্ভব নহে।"

চণ্ডী এক ছিলিম গাঁজা টিপিতে টিপিতে বলিল, —"বলুন দেখি, কি দরকার?"

হরকুমার বলিলেন,—"শুনিয়াছি, তাঁহার কাছে কতকগুলি কাগজপত্র ছিল। সেগুলি দ্বারা একটি ভদ্রলোকের বিশেষ উপকার হওয়া সম্ভব, তাই সেগুলি একবার দেখিবার অভিপ্রায়ে যাইতেছিলাম।"

চণ্ডী কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিল,—"অসম্ভব। যদি থাকে, নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সে বাটী আমি বেচিয়া ফেলিয়াছি। যাহারা কিনিয়াছে, তাহারা নিশ্চয়ই কাগজপত্রের কোনই যত্ন করে নাই। সে কি আর পাওয়া যায়?"

হরকুমার বলিলেন,—"তথাপি একবার সেখানে যাইব। যদি কোন সন্ধান হয়, তাহা হইলে বড় উপকার হইবে। মহাশয়কে যখন পাইয়াছি, তখন আর ভাবনা কি! আপনাকেও সঙ্গে যাইতে হইবে, এখানে গরুর গাড়ী পাওয়া যায় না? একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া যাওয়া যাউক চলুন।"

এইরূপ মহদাশ্রয় ত্যাগ করিতে চণ্ডীর কোনই অমত ছিল না। সে বলিল,—"স্বচ্ছন্দে! আপনার কাজে আপনার সঙ্গে যাইব, তার আর কথা কি?"

হরকুমার সন্ধান করিয়া একখানি গরুর গাড়ী ঠিক করিতে জরিফকে পাঠাইয়া দিলেন। চণ্ডীকে বলিলেন,—"মহাশয় কিছু জলযোগ খান। সকলই তো উপস্থিত।"

চণ্ডী বলিল,—"গোটাকতক ছিটা টানিয়া লইতে ইচ্ছা করিয়াছি, মহাশয় খাবেন কি?"

হরকুমার বলিলেন,—"এও কি কথা? খাব না! আমি একটু পরে, অন্যান্য দুই একটা কাজ সারিয়া ক্রমে খাইতেছি। আপনি চালান না ততক্ষণ।"

চণ্ডী যথেষ্ট গুলী খাইয়া লইল। সঙ্গে সঙ্গে সে যথেষ্ট সন্দেশ-রসগোল্লা উদরস্থ করিল।

অনতিকালমধ্যে গাড়ী লইয়া জরিফ ফিরিয়া আসিল। হরকুমার অতি সমাদরে চণ্ডীকে গাড়ীতে উঠাইলেন। চণ্ডী এই মহৎ ব্যক্তির সহিত ঘনিষ্ঠতা বাড়াইবার অভিলাষে ও তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ না করিবার অভিপ্রায়ে সানন্দে গাড়ীতে স্থান লইলেন। জরিফ গাড়ীর পশ্চাতে চলিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরিত্যক্ত ভবন।

অপরাহ্নকালে হরকুমার বাবু, চণ্ডী গুলীখোর এবং জরিফ কোচ্‌ম্যান রামনগরে আসিয়া পৌছিলেন। পরলোকগতা গঙ্গামণির যে পল্লীতে বাস ছিল, তাহারই নিকট ভবসুন্দরী নাম্নী এক বিধবা কায়স্থ-কামিনীর বাস। এই কায়স্থ নারী গ্রামসম্পর্কে গঙ্গামণিকে দিদি বলিত। সেই সূত্রে চণ্ডী গুলীখোর তাহাকে কায়েত-মাসী বলিয়া ডাকে। অদ্য চণ্ডীচরণ সঙ্গিগণকে সঙ্গে লইয়া মাসীর ভবনে উপস্থিত হইল।

হরকুমার বাবুর "চৌ চৌ" ব্যাগ চণ্ডীর মূর্ত্তি ফিরাইয়া দিয়াছে; ব্যাগের কৃপায় চণ্ডীর গায়ে জামা উঠিয়াছে, ইহা পাঠকগণ পূর্ব্বেই দেখিয়াছেন। পথিমধ্যে ব্রহ্মাণ্ডোদরী কার্পেট-কাবা ব্যাগ-সুন্দরী চণ্ডীর নিমিত্ত ধুতি-চাদর এবং জুতা প্রসব করিয়াছেন। যদি পরিচ্ছদ ভদ্রত্বের পরিচায়ক হয়, তাহা হইলে চণ্ডীকে অধুনা নিতান্ত অভদ্র বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না; কিন্তু চণ্ডীর দুরদৃষ্ট-ক্রমে তাহার এই পরিচ্ছদ-পরিবর্ত্তনও অদ্য তাহার সম্মানবৃদ্ধির সহায় হইল না। ভবসুন্দরীর দ্বারে আসিয়া চণ্ডীচরণ "মাসী, মাসী" শব্দে বারংবার চীৎকার করিলে ভব বাহিরে আসিল এবং চণ্ডীকে দেখিয়া বিরক্তির লক্ষণই প্রকাশ করিল। সে নেশাখোর; অপব্যয় করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে; জীবিকাপাতের উপায়াভাবে তস্করবৃত্তিও অবলম্বন করিয়াছে; প্রথমতঃ আত্মীয় ও পরিচিত ব্যক্তিবর্গের সাহায্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে অশেষ দুর্ব্ব্যবহারে উৎপীড়িত করিয়াছে; তদনন্তর আশ্রয়হীন, অন্নহীন ও বস্ত্রহীন হইয়া পথের ভিক্ষুকরূপে পরিণত হইয়াছে। এরূপ ভগ্নী-পুত্রের মিষ্ট সম্ভাষণ ভবসুন্দরীর প্রীতি উৎপাদন করিল না। তথাপি অদ্য তাহার ভদ্রবেশ দর্শনে, বিশেষতঃ তাহার সঙ্গে এক জন বিশিষ্ট ভদ্রলোক রহিয়াছেন দেখিয়া ভব মুখে কোন কর্কশ শব্দ প্রয়োগ করিল না। চণ্ডী গুলীখোর পরিচিত, অপরিচিত তাবৎলোকের নিকট হইতে এতদপেক্ষা বহুগুণে অধিক রূঢ় ব্যবহার সহ্য করিয়া আসিতেছে; সুতরাং তাহার মাসীর অভ্যর্থনাবিহীনতা তাহাকে একটুও হতাশ বা নিরুৎসাহ করিল না। সে মাসীর নিকটস্থ হইয়া বলিল,—"মাসী-মা! আজ আমরা তোমার বাটীতে থাকিব, এখানেই পাক-সাক করিয়া খাইব। আমার সঙ্গে এই যে বাবু দেখিতেছ, ইনি অতি মহাশয় লোক।"

ভব বলিল,—"তা তো দেখিতেছি। আমার এখানে স্থান কোথায়? কেন ভদ্রলোককে সঙ্গে করিয়া এখানে আসিয়াছ? এখানে উঁহার বড়ই কষ্ট হইবে। অন্য স্থানে চেষ্টা দেখ গে।"

এই বলিয়া ভবসুন্দরী পুনরায় বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিল। তখন হরকুমার বাবু অপেক্ষাকৃত নিকটে আসিয়া বলিলেন,—"ভদ্র-লোকের মেয়ের আকার-প্রকারই কেমন চমৎকার।" সঙ্গে সঙ্গে পকেট হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া ভবসুন্দরীর সমীপদেশে ফেলিয়া দিলেন এবং বলিলেন,—ভদ্রলোকের আশ্রয় ছাড়িয়া আমি তো আর কোথাও যাইব না। আপনি টাকা দুইটা তুলিয়া লউন; তিন জনের মত যাহা হয় খাওয়ার জোগাড় করিয়া রাখিবেন। আমরা আপাততঃ একটু ঘুরিয়া আসিতেছি। যদি খরচ বেশী হয়, সে জন্য কোন চিন্তা করিবেন না; আমি ফিরিয়া আসিয়া তাহাও দিব।"

সঙ্গে সঙ্গে ভবর সুর ফিরিয়া গেল। সে ঈষদ্ধাস্য সহকারে হরকুমার বাবুর মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল,—"আপনার মত লোক আমার বাড়ীতে পায়ের ধূলা দিয়াছেন, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। বাড়ীতে জায়গা একটু কম; তা হউক, বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপ আছে। সেখানে মহাশয় স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন। কষ্ট যাহাতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা আমি করিব। আপনি ফিরিয়া আসিয়া নিজে পাক করিবেন কি?"

হরকুমার বলিলেন,—"কাজেই। আমি ব্রাহ্মণ; যদি এক জন ব্রাহ্মণ জোগাড় করিতে পারেন, তাহা হইলেই ভাল হয়, নচেৎ আমাকে স্বয়ংই কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। আমার সঙ্গে এক জন মুসলমান আছে; সে চিঁড়াদধি বা দুধ খাইয়া থাকিবে। আর নিকটে যদি মুসলমান-বাড়ী থাকে, আপনি বন্দোবস্ত করিয়া দিলে সেখানে গিয়া এ ব্যক্তি ভাতও খাইয়া আসিতে পারে। খরচের জন্য চিন্তা করিবেন না, আরও এক টাকা আপনি রাখিয়া দেন।"

আবার একটা টাকা হরকুমার বাবুর পকেট হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভবসুন্দরীর করতলগত হইল। ভব একমুখ হাসিয়া বলিল,—"ও মা, তাও কি হয়? আপনার মত লোক রাঁধিয়া খাইবেন, এও কি কথা? আমি এখনই ভট্‌চার্য্যিদের মেজো ছেলে

লক্ষ্মীকান্তকে ডাকিয়া আনিতেছি। কিছু পয়সার জন্য আপনার এ কষ্ট কখনই করিতে হইবে না। মুগের ডাইল, মাগুর মাছ, সরু চাউল সকলই আমি সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছি। চণ্ডীমণ্ডপে চৌকি পাতা আছে, তাহার উপর বিছানাও ঠিক করিয়া রাখিতেছি। সঙ্গের মুসলমান লোকটির জন্যও কোন ভাবনা নাই। এখনই রহমত মণ্ডলের বাড়ীতে খবর পাঠাইয়া যাহাতে উহার খাওয়া দাওয়ার কষ্ট না হয়, তাহার উপায় করিতেছি।"

হরকুমার বলিলেন,—"আমি চেহারা দেখেই মানুষ চিন্‌তে পেরেছি। আপনার আশ্রয়ে আমাদিগের কাহারও যে কোন কষ্ট হইবে না, আপনাকে দেখিয়াই আমি তাহা বুঝিতেছি। তবে আমরা এখন আসি?"

ভব বলিল,—"আচ্ছা। শীঘ্রই ফিরিবেন। আমি গোয়ালা-বউকে ডাকিয়া একটু দুধের যোগাড় আগে করি।"

ভবসুন্দরী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। হরকুমার ও জরিফ চণ্ডীর সঙ্গে গঙ্গামণির পরিত্যক্ত ভবনোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। চণ্ডী গুলীখোর যাহার নিকট গঙ্গামণির বাটী বিক্রয় করিয়াছে, সে ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত তাহার জীর্ণসংস্কার বা কোন উন্নতিসাধন করে নাই। ক্রেতা কর্ম্ম-সূত্রে সপরিবারে বিদেশে অবস্থান করে। এই ক্ষুদ্র ভবন তাহার পৈতৃক ভদ্রাসনের নিকটস্থ বলিয়াই সে ইহা ক্রয় করিয়া রাখিয়াছে মাত্র। সুতরাং তথায় গমন ও প্রবেশ করায় কোনই অসুবিধা হইল না। অতি সামান্য বাটী। একটি একতলা ঘর; তাহার পার্শ্বে একখানি খড়ের একচালা। ঘরটি পতনোন্মুখ। চালাখানির ছাউনি পচিয়া, খসিয়া, গলিয়া গিয়াছে, বাঁশ, বাঁখারি এখনও খাড়া আছে। বাটীর ভূরিভাগ বনে পূরিয়া গিয়াছে। ক্রেতা বৎসরান্তে একবার করিয়া বাটী আইসেন। সেই সময় কতক গাছ-পালা কাটিয়া পরিষ্কার করা হয়। তথাপি তৃণ, গুল্ম, বৃক্ষ-লতাদির শ্রীবৃদ্ধি যথেষ্ট।

চণ্ডী এ পর্য্যন্ত অগ্রেই ছিল। এক্ষণে বাটীর সন্নিধানে আসিয়া সে হরকুমার বাবুকে অগ্রগামী হইতে অনুরোধ করিল। ভীত গুলীখোর এ বনাকীর্ণ পরিত্যক্ত ভবনমধ্যে অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না।

হরকুমার বাবু অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া জরিফ কোচ্‌ম্যান ব্যস্ততাসহ সম্মুখে আসিয়া বলিল—"হুজুর গোলামের অপরাধ মাপ করিবেন। আমি আগে যাই।"

অগ্রে জরিফ, তৎপশ্চাতে হরকুমার, সর্ব্বশেষে চণ্ডী সেই ভবনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনেক গাছপালা সরাইয়া পথ করিতে করিতে অগ্রে জরিফ চলিল। ঘরের নিকটস্থ হইয়া তাঁহারা দেখিলেন দ্বারের কপাট ক্ষয়িত হইয়াছে এবং চৌকাঠের কাঠগুলি নিতান্ত জীর্ণ হইয়াছে। সেই দ্বারে একটি শিকল দ্বারা আটকান রহিয়াছে এবং সেই শিকল তালাবদ্ধ। হরকুমার বাবু জরিফকে বলিলেন,—"তালা খুলিবার কোন উপায় নাই কি?"

জরিফের নিকট একটা চাবী ছিল; সে তাহা লাগাইয়া দেখিল, তাহাতে সেই মরিচাধরা বেকল তালা খুলিল না। হরকুমার বাবুর একটা রিঙে দুইটা চাবী ছিল, তাহাও তিনি জরিফের হাতে দিলেন, তাহাতেও ফল কিছু হইল না। তখন জরিফ বলিল, —"ভাঙ্গিয়া ফেলি না কেন হুজুর?"

হর। পারিবে কি?

জরিফ। স্বচ্ছন্দে।

হর। তবে তাই কর।

তখন জরিফ গোটাকতক নাড়াচাড়া দিয়া শেষে একখানি ইটের ঘা মারিয়া তালা ভাঙ্গিয়া

আইনের চক্ষে হরকুমার বাবুর এই সকল কার্য্য নিতান্ত গর্হিতরূপে প্রতীত হইতে পারে। অনধিকার-প্রবেশ, তালা ভাঙ্গা প্রভৃতি অনেক অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া, সুনীতিসম্পন্ন পুলিসকর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে সহজেই শ্রী-ঘরে প্রেরণ করিবার সুব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন। সুচতুর, সুশিক্ষিত ও বহুদর্শী হরকুমার বাবু এ সকল কথা জানেন না বা বুঝেন না, এমন নহে; তথাপি তিনি এই দুষ্কর্ম্মে পশ্চাৎপদ হইলেন না। ধর্ম্ম-সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাস সাধারণ ব্যবস্থার অপেক্ষা কোন কোন স্থলে বিশেষ বিভিন্ন। উদ্দেশ্য মন্দ না হইলে, কাহারও অনিষ্টসাধনের বাসনা না থাকিলে, অনর্থক স্বার্থের বশীভূত হইয়া অপরের সর্ব্বনাশ করিবার সঙ্কল্প না থাকিলে এবং পরের হিতসাধন ব্যতীত অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা মনে উদিত না হইলে, মনুষ্যের কার্য্য ধর্ম্ম-বিগর্হিত বা দোষাবহ হয় না বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন। সময়ে সময়ে সমাজ এরূপ ব্যবহারের বিরোধী হইতে পারে এবং রাজকীয় বিধিব্যবস্থা বহুস্থলে এতাদৃশ কার্য্যের প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে পারে; কিন্তু সমাজ বা রাজশাসন যাহার অনুমোদন করিবে, তাহাই ধর্ম্ম-কর্ম্ম এবং যাহার প্রতিকূলাচরণ করিবে, তাহাই অধর্ম্ম-কর্ম্ম, এরূপ বিশ্বাস হরকুমার বাবুর মনে কখনই স্থান

পায় না। কিন্তু তাই বলিয়া সামাজিক ও রাজকীয় ব্যবস্থার মস্তকে পদাঘাত করিতে তাঁহার কখনই প্রবৃত্তি নাই। তবে যে স্থলে এরূপ কার্য্য সমাজ-শাসনের প্রতিকূল হইলেও বিশেষ নিন্দিত বা দোষাবহ হইবে না, তথায় তিনি অবলীলাক্রমে উভয়বিধ শাসনকেই উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত।

তালা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। শিকল খোলা হইল। দরজা ঠেলিতে আরম্ভ করিয়া জরিফ দেখিল, তাহা খোলা যায় না। ভিতর হইতে কোন গুরুতর পদার্থবিশেষে তাহা আটকাইয়া আছে। অনেক বল-প্রয়োগ করিতে করিতে একটু ফাঁক হইল। সেই রন্ধ্র-পথে জরিফ দেখিতে পাইল, উপর হইতে নিপতিত কতকগুলি ইষ্টকাদিতে দরজা প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে। হরকুমার বাবু হস্তস্থিত যষ্টি জরিফকে দিলে সে দরজার ফাঁকের ভিতর দিয়া যষ্টি দ্বারা অনেক ইট সরাইয়া ফেলিল; তাহার পর বলপ্রয়োগ করিলে দরজা অনেকখানি খুলিয়া গেল। তখন ঘরের অবস্থা পরিদৃষ্ট হইল। সে ঘরে প্রবেশ করা নিতান্ত কঠিন ব্যাপার; ছাদের কোন কোন স্থান খসিয়া পড়িয়াছে এবং এখনও খসিতে পারে। ঘরের মধ্যেও দুই একটা ছোট ছোট গাছ জন্মিয়াছে। দেওয়াল ছেতলায় আকীর্ণ হইয়াছে। তথাপি জোর করিয়া জরিফ ও হরকুমার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। চণ্ডী বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অনুকূল কোন পদার্থই হরকুমার বাবু দেখিতে পাইলেন না। তিনি ভাবিয়াছিলেন, হয় তো একটা ভাঙ্গা বাক্স, না হয় তো একটা পচা সিন্দুক, না হয় তো ডালাহীন পেটরা অথবা দুই একটা হাঁড়ী-কলসী এইরূপ পরিত্যক্ত বাটীতে পড়িয়া থাকিলেও থাকিতে পারে এবং তাহার মধ্যে অনাবশ্যক বোধে উপেক্ষিত দুই চারিখানা কাগজ পড়িয়া থাকিলেও থাকিতে পারে। অন্যের অনাবশ্যক হইলেও সেই কাগজ হয় তো তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির বিশেষ সহায় হইতে পারে। তাঁহার আশা ফলবতী হইল না। গৃহে তাদৃশ কোন সামগ্রী নাই; তথাপি সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া দেখা হইল। তখন অগত্যা তাঁহারা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পুনরায় দ্বার বন্ধ করিয়া শিকল আঁটিয়া দেওয়া হইল।

হরকুমার বাবু বলিলেন,—"আজ যদি পার ভালই, নচেৎ কল্য প্রত্যূষে এখানকার বাজার হইতে একটি তালা কিনিয়া এই দরজায় লাগাইয়া যাইবে। তাহার চাবিটি যাহাতে গৃহস্বামীর হস্তগত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিব।"

চণ্ডী একাকী বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল। সে জিজ্ঞাসিল,—"কিছু পাইলেন কি দাদা মহাশয়?"

হর। না।

চণ্ডী। আমি তখনই বলিয়াছি, কাগজপত্র কখনই কিছু দেখি নাই।

হরকুমার ও জরিফ অতি কষ্টে সেই জীর্ণ এক-চালায় প্রবেশ করিলেন। সেখানেও সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া ফল কিছুই হইল না। তখন হতাশ-হৃদয় হরকুমার ফিরিয়া আসিবার নিমিত্ত চিত্তকে প্রস্তুত করিলেন। গৃহের পশ্চাদ্ভাগে একটা আবর্জ্জনার স্তূপের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তাহার মধ্য হইতে ছেঁড়া নেকড়া, দুই একখানি ভাঙ্গা সরা, একগাছা মুড়া ঝাঁটা, হাড়ী-কলসীর ভাঙ্গা খোলা এবং ধূলামাটী তাঁহার চক্ষে পড়িল। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া, হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা সেই আবর্জ্জনা সরাইয়া দেখিতে লাগিলেন। বহুদিনের স্তূপীকৃত আবর্জ্জনা জল ও রৌদ্রের প্রভাবে কঠিন হইয়া জমিয়া গিয়াছে। সেই ভগ্ন চালা হইতে একখণ্ড ভাঙ্গা বাঁশ আনিয়া জরিফ সেই আবর্জ্জনারাশি ঘাঁটিতে আরম্ভ করিল।

হরকুমার বলিলেন,—"ওটা কি? কাগজ না?"

জরিফ বলিল,—"আজ্ঞে হাঁ।"

হরকুমার বড় উৎসুক্য সহকারে বলিলেন,—"দেও দেও, দেখি।"

অতি জীর্ণ এক খণ্ড মলিন কাগজ তুলিয়া জরিফ হরকুমারের হস্তে দিল। হরকুমার চশমা লাগাইয়া বিশেষ যত্ন সহকারে তাহা পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। লেখা অতি অস্পষ্ট, তাহারও আবার কালি উঠিয়া গিয়াছে এবং কাগজও গলিয়া পড়িতেছে। সুতরাং অনেক চেষ্টা করিয়াও পড়িয়া উঠিতে পারিলেন না। তবে একটা কথা তিনি যেন ঠিক করিতে পারিলেন বলিয়া মনে করিলেন। কথাটা—"মৃত্যু হইয়াছে।" কে কোথা হইতে কাহাকে লিখিতেছে, কিছু বুঝা গেল না। তথাপি অতীব যত্নে কাগজখানিকে হরকুমার রুমালে জড়াইয়া লইলেন। বলিলেন,—"জরিফ! দেখ, দেখ, হতাশ হইও না!"

উভয়ে বিশেষ যত্নে আবার সেই আবর্জ্জনারাশি অন্বেষণ করিতে করিতে আবার একখানা কাগজ পাইলেন। কাগজখানি অপেক্ষাকৃত নূতন এবং তাহার সকল ভাগ হরকুমার পড়িতে পারিলেন। তাহাতে লিখিত ছিল,—

"শ্রীচরণেষু—

প্রণামা শতসহস্র নিবেদনঞ্চ বিশেষ। আপনার

শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে এ দাসের প্রাণগতিক সমস্ত মঙ্গল। সম্প্রতি আপনার খরচের নিমিত্ত ডাকযোগে পাঁচ টাকা পাঠাই। প্রাপ্তিসমাচার লিখিতে আজ্ঞা হয়। শ্রীমতী খুড়ীমাতা ঠাকুরাণী কাশীধাম হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এ বিষয়ের কোন সন্ধানই তিনি পান নাই। পরে যেরূপ হয়, জানিতে পারিবেন। আপনার সে সকল সামগ্রী আমি যত্নে রাখিয়াছি। পত্রোত্তরে শ্রীচরণের কুশল-সমাচারদানে সেবকের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন ইতি। সেবক

শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মা।"

হরকুমার সযত্নে এ পত্রও রুমালের মধ্যে গ্রহণ করিলেন। জরিফ আরও অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করিল, কিন্তু আর কিছুই পাওয়া গেল না। তাঁহারা ধীরে ধীরে ভবসুন্দরীর ভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ভবসুন্দরী।

পথে আসিয়াই চণ্ডী বলিল,—"এতক্ষণে ধড়ে প্রাণ এলো! ভূতে খেয়ে ফেলে নাই যে, এই ভাগ্য!"

হরকুমার বলিলেন,—"বাড়ীটা ভয়ানক রকমই হইয়া রহিয়াছে বটে; কিন্তু ভূতে খেয়ে ফেলিবার কোন লক্ষণই দেখিলাম না তো।

চণ্ডী বলিল,—"সে আপনার ভাগ্য। আমার কিন্তু বড়ই ভয় হইয়াছিল। কাগজপত্র কিছুই পাওয়া গেল না—যা দুখানা পাওয়া গিয়াছে, তাহা আপনার কোন দরকারে লাগিবে কি দাদা?"

হরকুমার বলিলেন,—"বোধ হয়, কিছু কাজেই লাগিবে না।"

মুখে এ কথা বলিলেও হরকুমার বাবু সেই কাগজ দুইখানি মহামূল্য সামগ্রী বলিয়া জ্ঞান করিয়াছেন এবং এই স্থির করিয়াছেন যে, বিশেষরূপ যত্ন ও চেষ্টা করিলে সেই বাঙ্গালা কাগজে লেখা গলিত পত্রখানিও পাঠ করা যাইবে। অন্ততঃ তাহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যাইবে এবং রামচন্দ্র শর্ম্মা স্বাক্ষরিত পত্রখানিও হয় ত তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির অনেক সহায়তা করিবে। তন্মধ্যস্থ খুড়ীমাতার কাশী হইতে প্রত্যাগমন, সে বিষয়ের সন্ধান না পাওয়া এবং সামগ্রী যত্নে রাখা ইত্যাকার কয়েকটি কথা তাঁহার বড়ই প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইল। তিনি বিবেচনা করিতে লাগিলেন, হয় ত এই সকল সূত্রাবলম্বনে তাঁহার গন্তব্য পথ নির্ণয় করার অনেক সুবিধা হইবে।

ভবসুন্দরী অতিথিগণের সৎকারার্থ বড়ই ব্যস্ত। সত্য সত্যই ব্রাহ্মণ ডাকাইয়া সে তাহার দ্বারা মুগের ডাল চাপাইয়াছে; মাগুর মৎস্য আনিতে লোক গিয়াছে। দুধ সংগ্রহ হইয়াছে। বাহিরের চণ্ডী-মণ্ডপে তক্তপোষের উপর পরিষ্কার বিছানা করিয়া রাখিয়াছে এবং মুসলমান জরিফের জন্য বারান্দায় একখানি কম্বল রাখিয়া দিয়াছে। জরিফের খাওয়ার সুব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। অনাদৃত চণ্ডীর কথাও বিস্মৃত হয় নাই; তাহার জন্যও ঐ চণ্ডীমণ্ডপে একটি সামান্য রকম শয্যা সংরক্ষিত হইয়াছে।

চণ্ডীর সহিত হরকুমারের ঘনিষ্ঠতা খুব বাড়িয়া উঠিয়াছে। সে বুঝিয়াছে, হরকুমার বাবু নেশা করেন না, করিতে জানেনও না। সামান্য এক তামাক ছাড়া কোন ভদ্র রকম নেশায় তাঁহার দখল নাই; ইহাতে হরকুমারকে নিতান্ত অপদার্থ মনে করিয়া তাঁহার সহিত বাক্যালাপ ত্যাগ করাই চণ্ডীর উচিত ছিল, কিন্তু সে তাহা করে নাই; কেন না, সে বুঝিয়াছে, হরকুমার নেশা না করিলেও নেশার পক্ষপাতী, নেশার মাহাত্ম্য সকলই জানেন, নেশার সামগ্রী সবই ভাল রকম চিনেন, কিসে কি হয়, তাহা জানেন এবং যে ব্যক্তি নেশা করে, তাহাকে ভালবাসেন। এমন একটা লোকই কি কম নাকি? তাঁহার অদৃষ্ট মন্দ, তাই তিনি স্বয়ং নেশা করিতে পারেন না; না পারিলেও নেশা ও নেশাখোরের সহিত তাঁহার যেরূপ সহানুভূতি, তাহাতে তাঁহাকে মহাপুরুষ না বলিয়া থাকা যায় না। সুতরাং হরকুমার নেশা না করিয়াও চণ্ডীর ন্যায় মহাত্মার নিকট শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন, ইহা তাঁহার অপরিসীম সৌভাগ্য। চণ্ডীর বেশভূষা বদলাইয়াছে, নিভাবনায় নেশা চলিতেছে, খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট নাই। চণ্ডী বেশ আছে। নেশাখোরের আশ্রয়দাতার জয় হউক।

চণ্ডী মাসীমার নিকটস্থ হইল এবং কোন্ বিষয়ের কি হইতেছে, তাহার সন্ধান করিয়া আসিল। এবার মাসী তাহার সহিত ভাল করিয়া কথা কহিল এবং একটু আদরের সুরে স্নেহও প্রকাশ করিল। হরকুমার লোকটা কে, জানিবার জন্য ভব কৌতূহল প্রকাশ করিল। চণ্ডী বলিল,—"হাঁ বাবা মাসী-মা! তুমি আমাকে কেবলই ছোটলোক মনে কর বুঝি? দেখ বাবা, আমার পাল্লায় কেমন কেমন লোক!

এ লোকটা ভারী জমীদার। কিন্তু লোকটা পাগল—নিতান্ত পাগল!"

ভব সবিস্ময়ে বলিল,—"ও মা, সে কি গো? হঠাৎ চেঁচিয়ে ক্ষেপে উঠে নাকি?"

চণ্ডী বলিল,—"তা নয়, তা নয়। আমার কাছে কি কাগজ ছিল; তাতেই না কি ওঁর দরকার। তাই খুঁজতে এ দেশে এসেছেন। তা মাসী-মা, কাগজে তো মসলা বাঁধে। তাতে আর কি এমন দরকার হ'তে পারে বাবা যে, তার জন্য খরচপত্র ক'রে দেশবিদেশে ছুটাছুটি করিতে হয়?"

ভব বলিল,—"তোমার মাসীর কাছে কাগজ ছিল, তারই সন্ধান করিতে এসেছেন। হবে। কাগজ কি এখনও সেখানে প'ড়ে আছে? তোমার মাসীর কাছে কত কাগজই থাকিত, কত কাগজই ছিল বটে। তা কি আর আছে?"

ভব খুব চিন্তাকুল হইল। চণ্ডী চলিয়া আসিল। হরকুমার নূতন জল-পোরা হুঁকায় অতীব মনঃসংযোগ সহকারে তামাক খাইতেছেন। চণ্ডী তাঁহার নিকটস্থ হইয়া বলিল,—"বাবা, দুনিয়ায় পাগল আছে বত্রিশ রকম। তার মধ্যে একরকম কাগজ-খোঁজা পাগল। তুমি দাদা তাই। কাগজের যদি দরকার থাকে, তবে বেণের দোকানে যাও, জুতার দোকানে যাও, ছাপাখানায় যাও, আড্ডায় যাও। এ কি বাবা, ভাঙ্গা বাড়ীতে কাগজ! ছি দাদা, তুমি নেহাত পাগল!"

হরকুমার বলিলেন,—"চণ্ডী বাবু, বইস, তামাক খাও। আমার যে কাগজে দরকার, তা কি দোকানে মিলে ভাই? তা হ'লে এত কষ্ট করিব কেন? তা যাহা হউক, এই সূত্রে তোমার সহিত আলাপ হলো, এই কি ভাই কম লাভ?"

চণ্ডী বলিল,—"তা দাদা, আমি তোমার চরণের দাস। আমি তো আর তোমাকে ছাড়িব না। আর কাগজের কথা, তার জন্য ভাবনা কি? আমি বুঝেছি দাদা, তোমার একটু বাইয়ের ছিট্ আছে। তুমি কাগজ কাগজ ক'রে ক্ষেপেছ; সে জন্য ভাবনা কি তোমার? আজি থেকে যেখানে যত কাগজ দেখিব, তা এনে তোমার কাছে হাজির করিব। কাগজে তোমাকে ডুবিয়ে দেব, ভয় কি তোমার দাদা! ছাপার কাগজ, খবরের কাগজ, বই, হাতে লেখা কাগজ, দলিলের কাগজ, যাহা চক্ষুর সামনে পড়িবে, আমি কিছুই ছাড়িব না। তুমি এত কাগজ ভালবাস, তা আমাকে আগে বল্‌তে হয়। তা হ'লে এত দূরই বা আস্‌তে হবে কেন? আমি তোমাকে রাধানগরের জমীদারের দপ্তরখানা থেকে, পাঠশালার ছেলেদের কাছ থেকে, মোক্তার মহাশয়ের বাসা থেকে চেয়ে, ভিক্ষে ক'বে, নিদেন চুরি ক'রে, গাদা গাদা কাগজ এনে ফেলে দিতেম। তা যাহা হইবার হইয়াছে। এখন তুমি নিশ্চিন্ত থাক দাদা। তোমাকে কাগজ আনিয়া দেওয়ার ভার আমার থাকিল।"

হরকুমার বলিলেন,—"কাগজেই এখন আমার নেশা দাঁড়াইয়াছে বটে। তা তুমি এখন মৌতাত চড়াইবে না?"

চণ্ডী বলিল,—"তা আর বল্‌তে?"

সে নেশার উদ্যোগে ব্যাপৃত হইল। এ দিকে আহারের স্থান প্রস্তুত করিবার সংবাদ আসিলে, চণ্ডী বলিল,—"আমার জন্য জায়গা-টায়গা চাহি না। এ আমার ঘর, আমি যেখানে সেখানে খাব এখন। আপাততঃ বাবুর জন্য জায়গা হউক, আমার একটু দেরী আছে।"

তাহাই হইল। চণ্ডী নেশায় ব্যাপৃত থাকিল। হরকুমার বাবু তাহার অনুমতি লইয়া আহার করিতে গেলেন। ভবর কার্য্যতৎপরতায় আহারের উদ্যোগ মন্দ হয় নাই। ব্রাহ্মণ-বালক সমস্ত সামগ্রী দিয়া বাহিরে গেল। হরকুমার আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ভব গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দূর হইতে বলিল, —"আমাদের এ নিতান্ত পাড়া-গাঁ, আপনার মত লোকের খাবার যোগাড় এখান থেকে হওয়াই ভার।"

হরকুমার বলিলেন,—"যে জোগাড় আপনি করিয়াছেন, এরূপ আহার আমার নিত্য ঘটিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। আপনাকে বড়ই কষ্ট দেওয়া হইল। আপনি দয়া করিয়া এ কষ্টভোগ স্বীকার না করিলে আমাদের দুর্গতির সীমা থাকিত না।"

ভব বলিল,—"ঘর হইতে বাহির হইলেই কষ্ট। তা যা হউক, রান্না নিতান্ত মন্দ হয় নাই তো? ছেলেমানুষ, জানে না। আমি আবার তফাৎ থেকে ব'লে দিয়ে, দেখিয়ে দিয়ে, কোন রকমে সিদ্ধ করাইয়া লইয়াছি।"

হরকুমার বলিলেন, "তাতেই এত ভাল হইয়াছে। আমি ভাবিতেছিলাম, এত পরিপাটী পাক ব্রাহ্মণের ছেলে করিল কিরূপে? এখন বুঝিলাম, ব্রাহ্মণ কেবল উপলক্ষ্য মাত্র; কাজ সব বলিতে গেলে আপনিই করিয়াছেন। এত ভাল রান্না আমি আর কখন খাইয়াছি বলিয়া মনে পড়িতেছে না।"

ভব পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিল, বাবুটি বড়ই সুজন। এক্ষণে স্থির করিল, বাবুটি খুব শিষ্ট। ভব বুদ্ধিমতী ও চতুরা। তাহার বয়স চল্লিশের কম নহে। দেখিতে শুনিতে তাহার চেহারা মন্দ নহে। অল্প-বয়সে একটি কন্যা-সন্তান লইয়া সে বিধবা হইয়াছে। জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার সঙ্গতি কিছু ছিল না। তথাপি ভব কাহারও দ্বারে ভিক্ষার্থিনী না হইয়া বা কাহারও গলগ্রহ না হইয়া জীবিকাপাত করিয়া আসিতেছে। কন্যাটির ভাল ঘরে বিবাহ দিয়াছে; ঘর-দুয়ার বজায় রাখিয়াছে; দৌহিত্র-দৌহিত্রীকে অন্নপ্রাশনে গহনা দিয়াছে। লোক-লৌকিকতা-তত্ত্বাদি করিয়া সাংসারিক শিষ্টতা পালন করিয়াছে এবং দশ টাকার সংস্থানও করিয়াছে। নিঃসহায় স্ত্রীলোক এত করিয়াছে বটে, কিন্তু পাপের পথে সে কখন পা দেয় নাই এবং দেহ বিক্রয় করিয়া একটি পয়সাও সংগ্রহ করে নাই। গরু পুষিয়া গোয়ালার নিকট ভব দুধ বেচিয়াছে, পাট কাটিয়া দড়ী বিক্রয় করিয়াছে, লোকের গহনা প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছে, কাহারও জিনিস রাখিয়া টাকা লওয়ার দরকার হইলে ভব স্থানান্তর হইতে আনিয়া দিয়াছে, কাহারও টাকা ধার দিবার হইলে, ভব তাহার লোক ঠিক করিয়া দিয়াছে এবং প্রাণপণে সকলের উপকার করিয়াছে। কাহারও হিসাব গোল হয় নাই; লোকের সহিত কার-কারবারে কেহই কখন তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হয় নাই; সকল কাজেই সে কিছু কিছু লাভ পাইয়াছে। মহাজন, খাতক, স্বর্ণকার, ব্যবসাদার সকলেই তাহাকে সন্তুষ্ট হইয়া কিছু কিছু দিয়াছে। গ্রামের সকল লোকই ভবকে ভালবাসে। যাহার যে দরকার, সে-ই তাহা বলে। কাহার কাপড় চাহি, কাহারও চাউল চাহি, কাহারও 'ঘি'র দরকার, কাহারও অলঙ্কার, কাহারও সাংসারিক অন্য কোন সামগ্রী সকলেই ভবকে বলিয়া নিশ্চিন্ত। কাহারও ছেলের অন্নপ্রাশন, ভব তাহার ব্যবস্থা করিবে। কাহার পীড়া, ভব তাহার পরামর্শ দিবে, ডাক্তারের ব্যবস্থা করিবে এবং আবশ্যক হইলে সেখানে দিবারাত্রি থাকিবে। কাহাকেও তীরস্থ করিতে হইবে, ভবর বন্দোবস্ত ভিন্ন তাহা হওয়া অসম্ভব। সকলের সকল কাজেই ভব আছে। বালক ও বৃদ্ধ, নর ও নারী, হিন্দু ও মুসলমান সকলেই ভবকে ভালবাসে। ভব কাহারও দিদি, কাহারও খুড়ী, কাহারও মা, কাহারও মাসী, কাহারও নাতিনী, কাহারও ঠাকরুণ-দিদি। ভব ব্যবসাদার হইলেও পরোপকারিণী। সে যে কেবল লাভের উদ্দেশেই কাজ করে, এমন নহে। লাভের সম্ভাবনা না থাকিলেও পরের হিতার্থে সে অনেক কাজ করে। তাহার কপালক্রমে সকল কাজেই তাহার কিছু না কিছু লাভ হয়। হরকুমার বাবু আশ্রয়ার্থী হইয়া আসিলে সে যে তাঁহাকে আশ্রয় দিত না বা তাঁহার স্বচ্ছন্দতার নিমিত্ত যত্ন করিত না, এমন নহে। চণ্ডীর উপর ভব বড় বিরক্ত। চণ্ডীর জন্য সে অনেক সময় অনেক যত্ন করিয়াছে; কিন্তু চণ্ডী বড়ই দুর্ব্ব্যবহার করিয়া তাহাকে জ্বালাতন করিয়াছে। দুই দিন খাওয়া-দাওয়া করিয়া চণ্ডী ঘটী, থালা, কাপড় লইয়া পলাইয়াছে। একটা কাজ করিতে বলিলে চণ্ডী কখন করে নাই, কিন্তু দৌরাত্ম্য অনেক করিয়াছে। এই সকল কারণে চণ্ডীকে কোনরূপ প্রশ্রয় দিতে ভবর ইচ্ছা ছিল না এবং তাহাকে আশ্রয় দেওয়া দূরে থাকুক, তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেও তাহার প্রবৃত্তি ছিল না। এই জন্যই ভব চণ্ডী ও তাহার সমভিব্যাহারী লোকদিগকে আশ্রয় দিতে সম্মত হয় নাই।

এক্ষণে ভব সেই স্থানে বসিয়া বলিল,—"শুনিলাম, কি কাগজের জন্য বাবুর আসা হইয়াছিল। তাহার কোন উপায় হইল কি?"

হরকুমার বলিলেন,—"কিছু না।"

ভব বলিল,—"গঙ্গামণি দিদি বড় ভাল লোক ছিলেন। তাঁহার আমার প্রতি বড়ই দয়া ছিল। আমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি কোন কাজ করিতেন না। তাঁর কাছে কাগজ অনেক ছিল জানি। কিন্তু কোথায় গেল, কি হইল, তাহা বলিতে পারি না।"

হরকুমার চণ্ডীর মুখে ভবর অনেক বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধি বিষয়ে ভবর দ্বারা সহায়তা হওয়া অসম্ভব নহে। তিনি বলিলেন,—"কাগজ অনেক ছিল, আপনি জানেন কি?"

ভব বলিল,—"অনেক কাগজ ছিল; গঙ্গা দিদি সেগুলিকে বড় যত্ন করিতেন, এ কথা আমি বেশ জানি। সে কাগজগুলি থাকিলে এক জন ভদ্রলোকের সকল মান-সম্ভ্রম বজায় হইবে এবং হয় ত সেগুলি আবশ্যকমত সময়ে দিতে পারিলে দশ টাকা পাওয়াও যাইবে, এমন কথাও তাঁহার মুখে আমি অনেকবার শুনিয়াছি।"

হরকুমার জিজ্ঞাসিলেন,—"তার পর? কাগজ সব গেল কোথায়?"

"জানি না, কাগজের কি হইল। গঙ্গা দিদির কাছে সময়ে সময়ে ডাকে চিঠি আসিত। কাশী হইতে এক জন চিঠি লিখিতেন। দিদির মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে কাশীর চিঠি আসা বন্ধ হয়। ইহাতে দিদি মনে করেন, যে জন্য কাগজপত্র এত যত্নে রাখা হইয়াছে, তাহা বোধ হয় বৃথা হইয়া গেল। যাহাদের দরকারে লাগিবার সম্ভাবনা ছিল, তাহাদের যখন আর সন্ধান নাই, তখন বোধ হয়, এ সকল কাগজে আর কাহারও আবশ্যক হইবে না। তাহার পর কাগজের কি হইল, আমি তাহার কোনই কথা বলিতে পারি না।"

হরকুমার এই সকল কথা যেন গিলিতে লাগিলেন। তাঁহার পক্ষে এ সকল সংবাদ বড়ই প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইল। তিনি আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"কাশী হইতে গঙ্গামণি ঠাকুরাণীকে যিনি পত্র লিখিতেন, তাঁহার নাম কিংবা পরিচয় কিছু আপনি শুনিয়াছিলেন কি?"

ভব বলিলেন,—"পরিচয়ের কথা বলিতে পারি না। নামটা একবার তাঁহারই মুখে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু এখন মনে করিতে পারিতেছি না। এক জন বামুনের মেয়ে।"

হরকুমার বলিলেন,—"সোনামণি নয় কি?"

ভব বলিলেন,—"ঠিক, সোনামণিই বটে। তা সোনামণি অনেক দিন হইতে খোঁজখবর বন্ধ করিয়াছেন কেন?"

হরকুমার বলিলেন,—"গঙ্গামণি মারা যাওয়ার অনেক পূর্ব্বেই সোনামণির মৃত্যু হইয়াছে; সুতরাং খোঁজখবর বন্ধ হইয়া গিয়াছে।"

ভব বলিল, "ঠিক কথা। তা সোনামণিই যদি মারা গিয়া থাকেন, তবে আর সে কাগজে দরকার কি?"

হরকুমার বলিলেন, "কাগজে সোনামণির কোনই দরকার ছিল না। একটি পিতৃমাতৃহীন বালকের পরিচয় সেই কাগজে আছে বলিয়া আশা করা যায়। যেরূপ আশা করা যায়, কাগজে যদি তাহা পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই মহাত্মার অনেক উপকার হইবে। এই জন্যই কাগজের সন্ধান।"

"বুঝিয়াছি। তা সে বালক এখন আছে কোথায়?"

হরকুমার বলিলেন,—"বালক কাশীতে সন্ন্যাসীদের কাছে সন্ন্যাসী হইয়া আছে।"

ভব বলিল,—"বুঝিয়াছি। তা আজি রাত্রি আপনি থাকুন। আমি এ বিষয়ে ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখি, যদি কোন কথা মনে পড়ে। আমি এ সম্বন্ধে অনেক চেষ্টা করিব। বোধ হয়, যত্ন করিলে কাগজের কোন না কোন সন্ধান পাওয়া যাইবে।"

বড় আশার কথা। এই বুদ্ধিমতী পরোপকারিণী, স্বাধীন-প্রকৃতি-সম্পন্না নারীর সহায়তা লাভ করা বড় কম কথা নহে। হরকুমার বলিলেন,—"আপনি মনে করিলে যে এ সম্বন্ধে অনেক সন্ধান হইতে পারিবে, তাহার ভুল নাই। এ কার্য্যে ধর্ম্ম অর্থ দুইই ঘটিবে, তাহা বুঝিয়াছেন।"

আহার সমাধা হইল। হরকুমার গাত্রোত্থান করিলেন। ভব বলিল,—"আমি এ বিষয়ে চেষ্টার ত্রুটি করিব না। যাহা হয় কল্য বলিব। আজি আপনি বিশ্রাম করুন।"

হরকুমার হস্ত-মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া বাহিরে আসিলেন। মুসলমান বাটী হইতে লোক আসিয়া জরিফকে ডাকিয়া লইয়া গেল এবং সে পরিতোষ-সহকারে ভোজন করিয়া ফিরিয়া আসিল। চণ্ডী অনেকক্ষণ পরে আহার করিতে গেল এবং অনেক বিলম্বে ভোজন শেষ করিয়া বাহিরে আসিল।

চণ্ডীর অনুপস্থিতিকালে হরকুমার জরিফকে বলিয়া রাখিলেন যে, এই গুলীখোর যখন সঙ্গে আছে, তখন রাত্রিটা একটু সাবধান থাকিতে হইবে।" জরিফ হাসিয়া বলিল,—"সে জন্য কোন চিন্তা নাই হুজুর।"

রাত্রি নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সূত্র।

বেলা প্রায় এক প্রহর কালে হরকুমার বাবু ভবসুন্দরীর চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে একখানি জলচৌকীর উপর বসিয়া মুখ ধুইতেছেন। জরিফ ভাঙ্গা বাড়ীতে তালা লাগাইতে গিয়াছে। চণ্ডী গায়ে চাদর ঢাকা দিয়া নিদ্রার সেবা করিতেছেন।

একটি নিতান্ত কাতর ও দুর্ব্বল পুরুষ ধীরে ধীরে আসিয়া হরকুমারের সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং দূর হইতে সবিনয়ে প্রণাম করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মাথায় একখানি কাপড় জড়ান, হাতে একগাছি বাঁশের লাঠি, শরীর বড় কৃশ। হরকুমার জিজ্ঞাসিলেন,—"কে তুমি? কি চাও?"

ভীত ও কাতরভাবে আগন্তুক বলিল,—"আজ্ঞে,

আমি যে কে, তাহার পরিচয় দেওয়ায় ফল নাই। আপাততঃ আমি বড় কাতর, বড়ই দুর্দ্দশায় পড়িয়াছি। মহাশয় যদি দয়া করিয়া কিছু সাহায্য করেন।"

হরকুমার বলিলেন,—"দাঁড়াইতে তোমার কষ্ট হইতেছে দেখিতেছি, তুমি বইস ঐখানে। সাহায্য কিছু করিতেছি। তোমাকে পীড়িত দেখিতেছি। তোমার পীড়া কি?"

আগন্তুক বলিল,—"দুর্ব্বলতা আর অনাহারই আমার পীড়া। তা ছাড়া আর কোন পীড়া আমি দেখি না।"

হরকুমার বলিলেন,—"দুর্ব্বলতা কি আপনি হইয়াছে, না আর কোন পীড়া হইয়া এইরূপ দুর্ব্বলতা দাঁড়াইয়াছে?"

তখন সে ব্যক্তি বলিল, "আজ্ঞে, সে অনেক কথা। এই মাথাটায় একটা আঘাত লাগায় অজ্ঞান হইয়াছিলাম। তাহার পর হইতে এই দুর্ব্বলতা চলিতেছে।"

"মাথায় কি রকমে আঘাত লাগিয়াছিল? বড় গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল কি?"

আগন্তুক বলিল,—"কি রকমে লাগিয়াছিল, জানি না; কিন্তু বড় গুরুতর আঘাতই লাগিয়াছিল। অনেকক্ষণ অজ্ঞান থাকিতে হইয়াছিল।"

"কিসে লাগিয়াছিল? কেহ মারিয়াছিল, কি অন্য প্রকারে আঘাত লাগিয়াছিল?"

ভিক্ষুক বলিল,—"তা কি ক'রে বলব? আমি গরীব মানুষ—আমার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। এখন আমার মত দুঃখী আর কেহ নাই।"

"বটে! তোমার কথা শুনিয়া বড়ই কষ্ট হইতেছে। তোমার সর্ব্বনাশ হইযা গিয়াছে শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। হাঁ, তা হ'লে অন্য লোক তোমার এই সকল বিপদ্ ঘটাইয়াছে এবং পরেই তোমাকে প্রহার করিয়াছে।"

আগন্তুক নীরব। হরকুমার আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভাল, কি জন্য তোমার এই সকল দুর্দ্দৈব ঘটিল?"

ভিক্ষুক বলিল,—"পরের ভাল করিতে গিয়া। নিজের মুখে কি বলিব? কলিকালে ভাল করিলে মন্দ হয়। এক ব্রাহ্মণ-কন্যার উপকার করিতে গিয়া সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়াছি। প্রাণও যায় যায় হইয়াছিল, যাইলেই ভাল হইত। স্ত্রী বোধ হয় মারা গিয়াছে। আমি দেশে দেশে তাহার সন্ধান করিতেছি। আর কি বলিব বাবু?"

ভিক্ষুক কাঁদিয়া ফেলিল। হরকুমার বলিলেন,—"তুমি বড় ভাল কাজ করিয়াছ, তোমার শেষ ভাল হইবেই হইবে। তোমার নিবাস কোন্ গ্রামে?"

ভিক্ষুক বলিল,—"এখান থেকে অনেক দূর—চণ্ডীতলা।"

হরকুমার জিজ্ঞাসিলেন,—"তোমারই নাম কি রামহরি দাস?"

ভিক্ষুক সবিস্ময়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"বাবু, আমি গরীব, আমার সর্ব্বনাশ করবেন না।"

হরকুমার বলিলেন,—"তুমি অতি ভদ্রলোক। আমি তোমার সমস্ত কথা শুনিয়াছি। তুমি যে ব্রাহ্মণ-কন্যার উপকার করিতে গিয়া নিজের সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছ, তিনি আমার পরম আত্মীয়। তোমাকে দেখিতে পাওয়ায় আমার বড়ই আনন্দ জন্মিল। আমি তোমার অনুসন্ধানে তোমার গ্রামে লোক পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু তোমার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তোমার স্ত্রী ও সেই ব্রাহ্মণকন্যা নৌকাডুবিতে জলে ডুবিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-কন্যার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। অনেক কষ্টে তাঁহার জীবনরক্ষা হইয়াছে। তোমার স্ত্রীর এখনও সন্ধান হয় নাই। নানাস্থানে তাঁহার সন্ধানে লোক পাঠাইয়াছি। তিনি মারা যান নাই, এ সংবাদ আমি পাইয়াছি। ত্বরায় তাঁহার সংবাদ জানিতে পাইব সন্দেহ নাই। আপাততঃ তোমাকে দেখিয়া বড়ই তুষ্ট হইলাম। সে ব্রাহ্মণ-কন্যাও তোমাদের ভাবনায় নিতান্ত অস্থির আছেন। তুমি আমাদের পরম আত্মীয়।"

এই সময়ে জরিফ আসিয়া উপস্থিত হইল। হরকুমার বলিলেন,—"এই দরিদ্র ব্যক্তি বড় ভদ্র লোক এবং আমার উপকারী বন্ধু, ইহাকে যত্ন করিয়া বসিতে দেও এবং তামাক-টামাক খাইতে দেও।"

জরিফ পরম সমাদরে রামহরিকে সঙ্গে লইয়া গিয়া ঘরের মধ্যে কম্বল পাতিয়া বসিতে দিল এবং তামাক খাইতে দিল। হরকুমারও উঠিয়া চণ্ডী-মণ্ডপের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

রামহরি বলিল,—"বাবু, আপনি যে সকল খবর দিলেন, তাহা শুনিয়া আমার প্রাণ বাঁচিয়া উঠিল। সেই সতী-লক্ষ্মী ব্রাহ্মণ-কন্যা যে নির্ব্বিঘ্ন হইয়াছেন, ইহা আমার বড় আহ্লাদের কথা। আমার স্ত্রী যে বাঁচিয়া আছে, এ বিশ্বাস আমার নাই। তবে মহাশয়ের ন্যায় লোক তাহার সন্ধান করিতেছেন, এও একটা ভাগ্য।"

হরকুমার বলিলেন,—"তোমার স্ত্রীর জন্য তুমি ভাবিত হইও না। আমি যে সকল লোকের হাতে

তাঁহার সন্ধানের ভার দিয়াছি, তাঁহারা নিশ্চয়ই শুভ সংবাদ আনিতে পারিবেন। সে জন্য তুমি যত দূর চিন্তিত, আমাদের চিন্তা তাহার অপেক্ষা বিশেষ কম নহে।"

রামহরি বলিল,—"আমার পরম সৌভাগ্য যে, আমি এ দিকে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিলাম। মহাশয়ের সহিত দেখা না হইলে কোন সংবাদই জানিতে পারিতাম না। এক্ষণে দিদিঠাকুরাণী কোথায় আছেন ? কেমন আছেন ?"

হরকুমার বলিলেন,—"তিনি এখন ভালই আছেন। তোমাকেও আজই তাঁহার নিকট লইয়া যাইব। তোমার শরীর দুর্ব্বল, আপাততঃ কিছু জলটল খাও, পরে যথাকালে অন্নাহার করিবে।"

হরকুমার বাবুর ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী ব্যাগ আসিল এবং তাহার মধ্য হইতে একখানি ধুতি বাহির হইল। হরকুমার রামহরির হাতে ধুতি প্রদান করিয়া বলিলেন,—"ও ছেঁড়া কাপড় ফেলিয়া দিয়া এইখানি পর।"

এইরূপ সময়ে চণ্ডীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে দেখিল, মাথায় কাপড় জড়ান, জীর্ণ-শীর্ণ, কৃষ্ণকায় আর এক মহাপুরুষ উপস্থিত। সে দেখিয়াই স্থির করিল, এ লোকটাও একটা পাকা গুলীখোর না হইয়া যায় না। বলিল, "কে হে জুড়িদার! কোথা থেকে উড়ে এসে জুটলে ভায়া ?"

সভয়ে রামহরি বলিল, "আজ্ঞে, আমি পথের ভিক্ষুক।"

চণ্ডী বলিল,—"বেশ ভাই। এ বাদশাহী কাজ করিতে হইলে পথের ভিক্ষুক হইতে হয়। কুছ পরোয়া নাই বাবা। কিন্তু দাদা, মালের সংগ্রহ বড় বেশী নাই। এক দিনে ফুরাইয়া দিলে চলিবে না। তেমন মাল জন্মে টান নাই দাদা।"

রামহরি বলিল,—"আজ্ঞে, হাঁ, অনেক দিন আমার খাওয়া হয় নাই। আমি বড় দুঃখী।"

চণ্ডী বলিল,—"কিছু চিন্তা নাই জুড়িদার ভাই। দুঃখ আর থাকবে না দাদা। কল্পতরুর আশ্রয়ে এসে পড়েছ যাদু। আর ভয় নাই।"

তাহার পর হরকুমার বাবুর দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"তোমার অক্ষয় স্বর্গ হবে দাদা, এমন পুণ্য আর কেহ কখন করিয়া উঠিতে পারেন নাই; তা রামচন্দ্রই হউন, কি তাঁর বেটা মন্দোদরীই হউন, এমন সৎসঙ্গ—এমন সাধুসেবা আর কাহারও দ্বারা কখন ঘটে নাই। তুমি যে কীর্ত্তি রাখ্‌লে, তার আর কখন ক্ষয় হবে না। আশীর্ব্বাদ করি, চিরজীবী হয়ে তুমি এইরূপ গুলীখোর প্রতিপালন করিতে থাক। সার্থক তোমার জন্ম দাদা।"

হরকুমার বলিলেন,—"চণ্ডী বাবু, তুমি একবার উঠ। এ লোকটি আমার আত্মীয়। ইহার একটু বিশেষ যত্ন করিতে হইবে।"

চণ্ডী বলিলেন,—"অবশ্য। তা তামাকে চরস মিশাইয়া দিতেছি। পাঁচ কলিকায় গাঁজা সাজিয়া দিতেছি। খাবার জলে আফিং গুলিয়া দিতেছি। এস দাদা, এ তোমারই ঘরকন্না জানিবে।"

চণ্ডী উঠিয়া আসিয়া রামহরিকে আলিঙ্গন করিল। রামহরি বড়ই কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

হরকুমার বলিলেন,—"ছাড়িয়া দেও। ও রকমে উহার যত্ন করিতে হইবে না। আপাততঃ তোমার মাসীর নিকট হইতে যা হয় কিছু খাবার আনিয়া উহাকে খাইতে দেও দেখি।"

চণ্ডী বলিল,—"শুধু জলখাবার ?"—দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিতান্ত সন্দিগ্ধভাবে আবার জিজ্ঞাসিল,—"আর কিছু নয়—শুধু জলখাবার ?"

তাহার পর একবার হরকুমারের ও একবার রামহরির মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সে প্রস্থান করিল।

রামহরি বস্ত্রত্যাগ করিল। অনতিকালমধ্যে চণ্ডী তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গেল।

এ দিকে ভবসুন্দরী আসিয়া কহিল,—"দেখুন বাবু, ২০ বৎসর পূর্ব্বে আমার স্বামী কাশী গিয়াছিলেন। তিনি সেখান হইতে প্রায় প্রতিদিনই আমাকে পত্র লিখিতেন। কালি রাত্রে আপনার কথা-বার্ত্তা শুনিয়া আমার স্বামীর লিখিত একখানি পত্রের কথা আমার মনে পড়িয়া গেল। সেই পত্রে একটি সুন্দরী যুবতীর মৃত্যুসংবাদ লিখিত ছিল। সে স্ত্রীলোক কে, তাহার কোন পরিচয় আমার স্বামী তখনও জানিতেন না। পরেও জানিতে পারেন নাই। তাঁহার একটি ২।৩ বৎসরের ছেলে ছিল। আপনার লোক কেহই ছিল না, একটি পরিচিতা প্রাচীনা স্ত্রীলোক তাঁহার যত্ন করিতেন। সেই স্ত্রীলোক ও ছেলেকে রাখিয়া সুন্দরী স্বর্গলাভ করেন। আমার স্বামী সৎকারের সহায়তা করিয়াছিলেন এবং তৎকালে শুনিয়াছিলেন যে, স্ত্রীলোক সপত্নীর ভয়ে লুকাইয়া জীবনপাত করিতেছিলেন। তিনি এক জন প্রধান ধনবান্ ব্যক্তির স্ত্রী। তাঁহার এই পুত্রটি যদি ভগবানের কৃপায় বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে হয় ত কালে অনেক সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিবে। ঘটনাটি বড় আশ্চর্য্য, অসাধারণ ও দুঃখজনক। এই

জন্যই আমার স্বামী মহাশয় এই সংবাদগুলি তৎকালে আমাকে লিখিয়াছিলেন। কালি আপনার কথা শুনিয়াই এই সংবাদ ছায়ার মত আমার মনে পড়িল। রাত্রিতে অনেকক্ষণ পত্রের সন্ধান করিয়াছিলাম, কিন্তু পাই নাই। আমি স্বামীর কোন পত্রই হারাই নাই। এ জন্য ভরসা ছিল, নিশ্চয়ই তাহা পাওয়া যাইবে। আজি প্রাতে অনেক পত্র পড়িতে পড়িতে সে পত্রখানি পাইয়াছি।"

হরকুমার বলিলেন,—"বড়ই দরকারী পত্র, বড়ই শুভসংবাদ। আমার যেন বোধ হয়, আপনার স্বামী যে বালকের কথা লিখিয়াছেন, সেই বালকের বিষয়ই আমি সন্ধান করিতেছি। এ পত্র দ্বারা আমার সন্ধানের বিশেষ সাহায্য হইবে। সে পত্রখানি আমাকে দেখিতে দিবেন কি?"

ভব বলিল, "দেখিতে কেন, সে পত্র একবারেই আপনাকে দিব। তাহাতে আপনার অনুসন্ধানের বিশেষ উপকার হইবে বলিয়া আমারও মনে হইতেছে। আপনি যে দুইখানি কাগজ কালি পাইয়াছেন, তাহার মর্ম্ম কি?"

হরকুমার বাবু প্রথমে রামচন্দ্র শর্ম্মা স্বাক্ষরিত পত্র পাঠ করিয়া শুনাইলেন এবং অপর পত্রের মধ্যে মৃত্যু হইয়াছে, এই কথাটি মাত্র পড়িতে পারিয়াছেন, ইহাও বলিলেন।

ভবসুন্দরী বলিল,—"এই রামচন্দ্র শর্ম্মা গঙ্গামণি দিদির বোনপো, চণ্ডের মাসতুত ভাই। এ ব্যক্তি বর্দ্ধমানে কি কাজ করে। অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে, লোকটা বড় চালাক, বড় ধূর্ত্ত। চণ্ডে নেশাখোর ও দুর্বৃত্ত। তাহার হাতে কাগজগুলি পড়িলে নষ্ট হইয়া যাইবে মনে করিয়া গঙ্গা দিদি মৃত্যুর পূর্ব্বে রামচন্দ্রের হাতে তাহা দিয়া গিয়াছেন, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। কাশীতে তাহার খুড়ীর সে বিষয়ের সংবাদ না পাওয়া এবং সে সকল সামগ্রী যত্ন করিয়া রাখা, এ দুইটা কথার সহিত এ বিষয়ের সম্বন্ধ থাকা সম্ভব। রামচন্দ্রের নিকট যদি কাগজপত্র থাকে, তাহা হইলে হস্তগত করা কঠিন হইবে বোধ হয় না, কোন না কোন সময়ে এই সকল কাগজপত্র দ্বারা বিশেষ লাভ হইবে বুঝিয়াই সে তাহা হস্তগত করিয়াছিল। সুতরাং তাহাকে কিছু দিলেই সেগুলি পাওয়া যাইতে পারে।"

হরকুমার বলিলেন,—"আপনি যেরূপ অনুমান করিতেছেন, আমিও সেইরূপ মনে করিয়াছিলাম। তবে রামচন্দ্র কে, কোথায় থাকে ইত্যাদি কোন সংবাদই আমি জানিতাম না!"

ভব বলিল,—"আর যে পত্রখানি পড়া যাইতেছে না, তাহা আপনি আর একবার পড়িবার চেষ্টা করুন। তাহার মধ্যেও দরকারী কথা থাকা সম্ভব। পত্রখানি একবার রৌদ্রে দিউন, না হয় আগুনে তাতাইয়া দেখুন, হয় ত, তাহাতে কাল ফুটিয়া উঠিবে, তখন পড়া যাইবে। সমস্ত পড়া না গেলেও এখানে ওখানে দুই একটা কথা পড়িতে পারিলেও অনেক উপকার হওয়া সম্ভব।"

হরকুমার ভবসুন্দরীর এইরূপ বুদ্ধি-বিবেচনা, পরোপকারে এইরূপ উৎসাহ ইত্যাদি আলোচনা করিয়া বিমোহিত হইলেন। কহিলেন—"আপনার ন্যায় বুদ্ধিমতীর পরামর্শ লইয়া কাজ করিলে, এ বালকের পরিচয় প্রকাশ করিবার উপায় করিতে পারিব সন্দেহ নাই। আপাততঃ চিঠিখানি তাতাইয়া দেখি।"

ভবসুন্দরী এক আঁটি খড় আনিয়া দিল। উঠানের এক পাশে গিয়া জরিফ তাহার কিয়দংশ লইয়া দিয়াশলাই দ্বারা জ্বালাইয়া দিল। হরকুমার অতীব সাবধানতা সহ পত্রখানি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সেই আগুনে তাতাইতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ তাত দেওয়া হইল। কালীর দাগ একটু একটু বুঝা যাইতে লাগিল বটে, কিন্তু তখনও কিছু পড়া যায় না। তথাপি হরকুমার অনেক কষ্টে একটা কথা পড়িতে পারিলেন। সে কথা—"সন্ন্যাসীর দল!"

ভব বলিল,—"চালুশে ধরা চক্ষের কাজ নহে। দাঁড়ান, আমি একজন ছেলে ডাকিয়া আনি।"

ভব চলিয়া গেল এবং অবিলম্বে একটি সভ্য-ভব্য যুবাকে ডাকিয়া আনিয়া পত্রখানি পড়িতে বলিল। এই যুবা ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত অনেক বিদ্যা শিখিয়াছেন এবং গ্রামের শ্রেষ্ঠ বালক। যুবা পত্রখানি লইয়া অনেকক্ষণ নাড়া-চাড়া করিয়া বলিলেন, —"এক আধটা কথা পড়া যায়। সমস্ত পত্র পড়িয়া উঠা অসম্ভব। তবে আমার নিকট মেগ্নিফায়ার আছে, যদি বলেন, তাহা হইলে তাহার দ্বারাও চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি।"

ভব বলিল,—"লক্ষ্মী জাদু, তাই আনিয়া দেখ, বাবা। বড় দরকারী কাজ।"

যুবা প্রস্থান করিলেন এবং অবিলম্বে মেগ্নিফায়ার হস্তে পুনরাগমন করিয়া পত্রপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। বলিলেন,—"এবার অনেক পড়া যাইতেছে বটে, কিন্তু সমস্ত কথা বুঝিতে পারিতেছি না।"

হরকুমার বলিলেন,—"যাহা পড়িতে পারিতেছেন, তাহাই বলুন দেখি, আমি পেন্সিল দিয়া নোট-বহিতে লিখিয়া লই।"

যুবক বলিতে লাগিলেন এবং হরকুমার তাহা লিখিতে লাগিলেন। মোটের উপর সে পত্র এইরূপ দাঁড়াইল।

"যখন * * ঠাকুরাণী * * কাগজপত্র আপনাকে * * মৃত্যু হইয়াছে * * আপনি * * দেখিয়াছেন * * জন্মাদি * * আছে * * সোনামণি * * যে আপনি * * যেন * * সন্ন্যাসীর দল * * বড় হইলে * * আসিতে পারে * * পরিচয় * * তাঁহার * * এই পত্র * * ইতি তা *

শ্রী * দাস * বর্ত্তী।
গণেশমহল্লা কাশী।"

বিনীত যুবা প্রস্থান করিল। হরকুমার ভবসুন্দরীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"পত্রে বিশেষ কিছু বুঝা না গেলেও, ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে, যে বালকের বিষয় আমি অনুসন্ধান করিতেছি, সোনামণি তাহারই সংক্রান্ত কাগজপত্র গঙ্গামণির নিকট রাখিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি পত্রের লেখক, তাহার নাম জানিতে না পারিলেও ইহা বুঝা যাইতেছে যে, তাহার উপাধি চক্রবর্ত্তী এবং কাশীর গণেশমহল্লায় তাহার বাস। সুতরাং কাশীতে সন্ধান করিবার একটা নির্দ্দিষ্ট ঠিকানাও পাওয়া যাইতেছে এবং উপাধি ধরিয়া সন্ধান করিবার একটা লোক পাওয়া যাইতেছে। ইহাতে অনেক উপকার সম্ভাবিত।"

ভব বলিল—"এই বালকের মাতামহের বাড়ী কোথায়, তাহা কেহ জানেন না?"

হরকুমার বলিলেন,—"আমি জানি, শিশুর মাতা পিতৃ-মাতৃহীন অবস্থায় এক দূর-জ্ঞাতির বাটীতে ছিলেন। সেই অবস্থায় তাঁহার বিবাহ হয়। যে জ্ঞাতির বাটীতে ছিলেন, তাঁহারও কেহ এখন নাই। সেই কামিনীর গর্ভে এই শিশুর জন্ম হইয়াছে, ইহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিলে আমাদিগের অনেকটা কার্য্য সিদ্ধ হয়। এই বালক যে তাঁহারই সন্তান, ইহা জানিতে পারিলেও অনেকটা সন্ধানের উপায় হয়।"

ভব বলিল,—"এখন রামচন্দ্রের নিকট যাওয়াই বোধ হয় এ সম্বন্ধে প্রধান দরকার। সেই কাগজপত্র দেখিতে পাইলে সব ঠিক হইয়া যাইবে।"

হরকুমার বলিলেন,—"সম্ভব। আপাততঃ আজি আমরা যাত্রা করিব। আপনার বুদ্ধি, সততা প্রভৃতি দেখিয়া আমি বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি, আমাকে আপনি একজন প্রধান আত্মীয় বলিয়া জ্ঞান করিবেন। আমার সময় থাকিলে আমি আরও দুই এক দিন আপনার বাটীতে থাকিতাম। যাহা হউক, উপস্থিত বিষয়ে হয় ত অনেক সময় আপনার সাহায্য দরকার হইবে। আমার নাম ঠিকানা সকলই আপনাকে বলিয়া দিয়াছি। আপনারও সকল কথা আমার জানা থাকিল। আবশ্যক হইলে আপনাকে পত্র লিখিলে দয়া করিয়া উত্তর দিবেন এবং প্রয়োজন হইলে সাধ্যমত সাহায্য করিবেন।"

ভব সকলই স্বীকার করিল এবং প্রয়োজন হইলে কাশী বা অন্য স্থানে যাইতে হইলেও সে যাইবে, ইহাও অঙ্গীকার করিল।

আহারাদিসমাপ্তির পর চণ্ডী, রামহরি, জরিফ ও হরকুমার যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে হরকুমার ভবকে দশটি টাকা লইবার জন্য অনেক জেদ করিলেন, কিন্তু সে কোন ক্রমেই তাহা স্পর্শ করিল না। বলিল,—"আপনার কৃপা থাকিলে অনেক লাভ হইবে।" ইহাও সে বলিল যে, কোন দায় উপস্থিত হইলে সে ভিক্ষা চাহিয়া লইবে। আসিবার সময় ভব তাহার স্বামীর লিখিত পত্রখানি হরকুমার বাবুর হস্তে দিতে ভুলিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মিলন।

যথাকালে হরকুমার, চণ্ডী, রামহরি ও জরিফ সনাতনপুরে হরিশ কর্ম্মকারের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। হরকুমার বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সুহাসিনী এক কৃষ্ণকায়া সুন্দরীর কেশবন্ধন করিয়া দিতেছেন। হরকুমারের অপরিচিতা এই কামিনী তাঁহাকে দর্শনমাত্র অঞ্চল দ্বারা স্বকীয় বদন আবৃত করিল। সুহাসিনী দেহের বস্ত্রাদি সুবিন্যস্ত করিয়া উঠিয়া আসিলেন এবং হরকুমারকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "বাবা, আমি আজ হারানিধি পাইয়াছি। এই সেই দাসী। ইহারা স্বামিস্ত্রী আমার নিমিত্ত সর্ব্বস্বান্ত হইয়া শেষে জীবনপাত করিতেও বসিয়াছিল। ঈশ্বরের কৃপায় দাসীকে পাইয়াছি; কিন্তু ইহার স্বামী রামহরিকে এখনও পাই নাই। তবে দাসীর মুখে শুনিতেছি, রামহরি বাঁচিয়া উঠিয়াছে। বাবা, হরিশের কৃপায় দাসীকে পাওয়া গিয়াছে। দাসী অনেক কষ্ট পাইয়াছে, অনেক বিপদ কাটাইয়া অনেক কষ্টে নিজের বাড়ীতে গিয়াছিল। দাসী যাওয়ার আগে রামহরিও বাটীতে ফিরিয়াছিল; কিন্তু আমাদের চিন্তায় অস্থির হইয়া বাটী ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে। কোথায় আছে, কি করিতেছে, কিছুই জানিতে না পারায় দাসীর উদ্বেগের সীমা নাই।"

হরকুমার বলিলেন,—"তুমি যদি আমাকে সন্দেশ খাওয়াও, তাহা হইলে দাসীর উদ্বেগ দূর করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে পারি।"

সুহাসিনী বলিলেন,—"তুমি না পার কি বাবা? যে লোক মরা বাঁচাইতে পারে, তাহার অসাধ্য কি আছে? যে দিন তুমি রামহরির আর দাসীর ভাল খবর আনিয়া দিলে, সেই দিনই আমি বুঝিয়াছি, তাহারা ভাল আছে। কারণ, তুমি দেবতা। দেবতার কথা কি কখনও মিথ্যা হয়?"

হরকুমার বলিলেন,—"তবে মা, তুমি অদিতি। তোমার সন্তান কখন কি মন্দ হয়?"

সুহাসিনী বলিলেন,—"এখন রামহরির খবর কি বল।"

হরকুমার জিজ্ঞাসিলেন,—"কি খবর পাইলে তুমি খুসী হও, বল।"

সুহাসিনী বলিলেন,—"রামহরি কোথায় আছে? কেমন আছে? কোন কষ্ট পাইতেছে কি না? বাড়ী ফিরিতেছে না কেন? কিরূপে খাওয়া-দাওয়া চলিতেছে? এই সকল সংবাদ পাইলে আমি খুসী হইব।"

হরকুমার বলিলেন,—"এত খবর আমি বলিতে পারি না। আমি রামহরির সম্বন্ধে এক ছোট খবর দিতে পারি।"

সুহাসিনী বলিলেন,—"ভাল, তাই বল।"

হরকুমার বলিলেন,—"দাঁড়াও তবে।"

তিনি বাহিরে চলিয়া আসিলেন এবং রামহরিকে সঙ্গে লইয়া ভিতরে গিয়া বলিলেন,—

"আমার খবর এই দেখ।"

আহ্লাদের সীমা থাকিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে দাসী আসিয়া হরকুমারকে প্রণাম করিল। তাহার পর রামহরির নিকটস্থ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বসিয়া পড়িল। রামহরি অবাক্! এ কি স্বপ্ন! দাসীকে সে আর এ জন্মে দেখিতে পাইবে না বলিয়াই মনে করিতেছিল। প্রাতে যখন হরকুমার বাবুর সহিত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তখনও তিনি দাসীর সংবাদ কিছু বলিতে পারেন নাই। অথচ সহসা এই অসম্ভাবিত স্থানে সেই দাসীকে স্বচক্ষের সম্মুখে দেখিয়া সে নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইল এবং তখন কি করা উচিত, স্থির করিতে না পারিয়া, প্রথমে হরকুমার বাবুর, তদনন্তর সুহাসিনীর চরণে এক একটা প্রণাম করিল।

হরকুমার বলিলেন,—"সন্দেশ পাইবার কাজ করিয়াছি, এখন সন্দেশ দেও মা।"

সুহাসিনী। অবশ্য। এত সন্তোষের কাজ যে ছেলে করিতে পারে, তাহার মা'র বড় অহঙ্কার বাড়িয়া উঠে। দাঁড়াও, আগে সন্দেশ আনি।

হরকুমার বলিলেন,—"আমরা অনেকগুলি। দুইটা চারিটা সন্দেশ আনিলে চলিবে না মা।"

সুহাসিনী হাসিয়া বলিলেন,—"দেবতার মা কি কখনও গরীব হয়? অনেক সন্দেশই বাবা।"

সুহাসিনী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং প্রকাণ্ড এক হাঁড়ি সন্দেশ কক্ষে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

হরকুমার সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিলেন,—"এত সন্দেশ কোথায় পাইলে মা?"

সুহাসিনী বলিলেন,—"হরিশকে দিয়া আনাইয়া রাখিয়াছি।"

হরকুমার বাবু বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, চণ্ড বাহিরের সেই চালাঘরে বসিয়া তামাক খাইতেছে।

হরকুমার জিজ্ঞাসিলেন,—"ভায়া, কিছু জল খাইতে হইবে না?"

চণ্ডী বলিলেন,—"তা বেশ। তবে দুটা একটা ছিটা টানিয়া লইবার জায়গা দেখাইয়া দেও।"

হরকুমার বলিলেন,—"ঐ জায়গা, ঐ তোমার ঘর, ঐখানেই যা হয় কর। আমি জলখাবার আনি।"

হরকুমার পুনরায় বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, একটি মাদুরের উপর রামহরি বসিয়াছে; তাহার সম্মুখে মাটীতে বসিয়া দাসী হাত নাড়িতে নাড়িতে অনেক গল্প করিতেছে। দাসী তাঁহাকে দেখিয়া বড়ই লজ্জিত হইল। রামহরি হাসিতে হাসিতে তাহাকে বলিল,—"দূর মাগী, তোর কিছু বুদ্ধি নাই। দেখ্‌ছিস্‌ না, উনি দিদিঠাকরুণের বাবা। বাবার কাছে ছেলেদের লজ্জা আছে কি?"

দাসী আর কিছু উত্তর দিতে পারিল না। আবার উঠিয়া আসিয়া গলায় কাপড় দিয়া হরকুমারের চরণ-সমীপে ঢিপ করিয়া একটি প্রণাম করিয়া গেল। হরকুমার বলিলেন,—"কতবার প্রণাম করিতে হয় মা? আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমাদের সুখ-সৌভাগ্য কখন ক্ষয় হইবে না।"

তাহার পর কতকগুলা সন্দেশ লইয়া বাহিরে আসিলেন। আসিবার সময় তিনি বলিয়া আসিলেন, —"মা কোথায়? রামহরিকে জল খাইতে দেও মা!"

বাহিরে আসিয়া চণ্ডী আর জরিফের হস্তে কতক-গুলা সন্দেশ দিয়া উভয়কে জল খাইতে বলিলেন।

চণ্ডীর নেশা সমাপ্ত করিতে অনেক সময় গেল। তাহার পর সে জলযোগ সমাধা করিয়া নিশ্চিন্ত ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইল। তখন হরকুমার বলিলেন,—"চল ভায়া, দুই চারি দিনের মধ্যে দেশভ্রমণে যাওয়া যাউক।"

চণ্ডী বলিল,—"কত দূর ?"

হরকুমার বলিলেন,—"অধিক দূর নয়। এই বর্দ্ধমান।"

চণ্ডী বলিল,—"সীতাভোগের চাট হইবে ভাল। আর একটা বিস্তাও না জুটিতে পারে, এমন কোন কথা নাই। চল দাদা, তোমার সঙ্গে যাব, তার আর ভাবনা কি ?"

তাহার পর হরকুমার জরিফের সঙ্গে অনেকক্ষণ নানা বিষয়ের কথোপকথন করিলেন, অনেক বিষয়ের ভার জরিফের উপর দিলেন ; অনেক বিষয়ের অনেক ব্যবস্থা করিলেন। অনেক রাত্রিতে আহারাদি সম্পন্ন হইয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

ব্যবহারাজীবী।

বর্দ্ধমানের রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ফৌজদারী আদালতের মোক্তার। ব্যবসায়ে বিশেষ জুত নাই ; কোনক্রমে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হয় মাত্র। বাসা ভাল নহে। মোক্তার মহাশয়ের চাকর-বাকর নাই। একটি ঝি আছে ; সে কোন প্রকারে গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করে। রামচন্দ্র এই ভাবে সপরিবারে অবস্থান করেন। তাঁহার দুইটি ছেলে, একটি মেয়ে। ছেলে দুইটি স্কুলে পড়ে। মেয়েটি দশ ছাড়ায় প্রায়। বিবাহের কি হইবে ভাবিয়া মোক্তার মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রী বড়ই অসুখী।

মোক্তার মহাশয়ের পরিগৃহীত ব্যবসায়ে একটুও অমনোযোগ নাই। শরীর বিশেষরূপ অসুস্থ না হইলে তিনি কোন দিন কাছারী যাওয়া বন্ধ করেন না এবং যে মক্কেল যাহা দেয়, তাহাই গ্রহণ করিয়া যত্ন সহকারে তাহার কার্য্য সম্পন্ন করিতে ত্রুটি করেন না। প্রতিদিন অন্য আমলা বা উকীল-মোক্তার কাছারী যাওয়ার পূর্ব্বেই ছেঁড়া পায়জামা পরিয়া, মোজাবিহীন পায়ে পাঁচ সিকা দামের জুতা লাগাইয়া, বন্ধ-আঁটা মলিন চাপ্‌কান গায়ে দিয়া, শতচ্ছিন্ন পাকান চাদর কাঁধের উপর ফেলিয়া, কানে কলম গুঁজিয়া হাতে একটা দপ্তর লইয়া এবং মাথায় পরামাণিকের মত পাগ্‌ড়ী বাঁধিয়া রামচন্দ্র কাছারীতে হাজির হন। কাছারীতে উপস্থিত হইয়া রামচন্দ্র চুপ করিয়া একস্থানে বসিয়া থাকেন না। কাজ থাকুক বা না থাকুক, তিনি চারিদিকে অতীব ব্যস্ততা সহ ঘুরিয়া বেড়ান এবং ছুটাছুটি করিয়া ব্যস্ততা প্রকাশ করিবার সুযোগ না ঘটিলে তিনি প্রায়ই দপ্তরের মধ্য হইতে শত সহস্রবার অধীত একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া আবার বিশেষ মনঃসংযোগ সহকারে পড়িতে থাকেন। তিনি যখন ছুটাছুটি করেন, তখন তাঁহার সহিত কেহ কথা কহিতে আসিলে তিনি বলেন,—"একটু অপেক্ষা কর, বড় জরুরি কাজ, এখনই ঘুরিয়া আসিতেছি।" যখন তিনি মনোযোগ সহকারে কাগজ পাঠ করেন, তখন তাঁহার সহিত কেহ কথা কহিতে আসিলে, তিনি ঘাড় নাড়িয়া অথবা হঁা হঁা করিয়া উত্তর সমাধা করেন। স্বাধীনভাবে মোকদ্দমা চালাইবার ভার প্রায় তাঁহার ভাগ্যে ঘটে না ; কোন না কোন উকীল-মোক্তারের সহকারিরূপেই তাঁহাকে প্রায় কার্য্য করিতে হয়। দরখাস্ত লেখা, দলিল দাখিল করা, সাক্ষীর জবানবন্দী টুকিয়া লওয়া, দলিল বাহির করা, সাক্ষীর রোজ দাখিল করা, জেরার সময়ে বা বক্তৃতার সময়ে তৎকার্য্যে নিযুক্ত উকীল বা মোক্তারের কানের কাছে অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিয়া বিরক্ত করা ইত্যাদি গুরুতর কার্য্যেই তাঁহাকে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। কদাচিৎ তাঁহার উপরওয়ালা উকীল বা মোক্তার উপস্থিত না থাকিলে রামচন্দ্রকে সাক্ষীর জেরা বা কখন কখন বক্তৃতা চালাইতে হয়। বলা বাহুল্য, সে সময়ে হাকিম, আমলা, অপর পক্ষের উকীল-মোক্তার সকলেই নিতান্ত জ্বালাতন হইয়া উঠেন। আমাদের মোক্তার মহাশয়ের সংস্কার এই যে, সাক্ষীকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করাই বুদ্ধিমান্ মোক্তারের কাজ ; প্রাসঙ্গিক হউক বা না হউক, অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলে হয় ত একটা না একটা অনুকূল কথা বাহির হইতে পারে এবং মক্কেলও খুসী হয়। কিন্তু অনেক জ্বালাতন করিলে বা অনেকক্ষণ বলিতে হইলে অসাবধান সাক্ষী যে প্রতিকূল কথাও বলিয়া ফেলিতে পারে, এ কথা তাঁহার মনে একবারও উদিত হয় না। বক্তৃতা করিতে হইলেও তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সকল কথাই উপস্থিত করিয়া থাকেন। রামায়ণ, মহাভারত, মহিষাসুরবধ সকল কেচ্ছাই তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে আবির্ভূত হওয়া সম্ভব। তিন মিনিটের কাজে তিনি তিন ঘণ্টা না লাগাইয়া ক্ষান্ত হন না। ইহাতে তাঁহার মূর্খ মক্কেল খুসী হইলেও হইতে পারে, কিন্তু ফল বড়ই মন্দ হয়। কারণ, হাকিম প্রায়ই বিরক্ত ও অপ্রকৃতিস্থ হইয়া শেষে যাহা মনে আইসে, তাহাই করিয়া ফেলেন। তিনি সাক্ষীর জেরা করিতে বা বক্তৃতা করিতে উঠিলে সে দিন হাকিম দুর্গানাম স্মরণ করিতে করিতে হাত-পা ছাড়িয়া দেন। হাকিম তাঁহাকে বিনয় করিয়া,

ধমক দিয়া, বিদ্রূপ করিয়া কোন প্রকারেই থামাইতে পারেন না। এক দিন এক হাকিম তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—"রাম বাবু কিছুই ছাড়িতে চাহেন না। চাপকান, পায়জামা, পাগ্‌ড়ী, জুতা অব্যবহার্য্য হইলেও রাম বাবু ছাড়েন না; মোকদ্দমাও সেইরূপ ছিঁড়িয়া গিয়াছে দেখিলেও রাম বাবু তাহা ছাড়েন না।" কথাটি রাম বাবু বিশেষ সুখ্যাতির বিষয় বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং তাহার পর হইতে অধিকতর নাছোড়বান্দা হইয়া মোকদ্দমা চালাইতেছেন।

রামচন্দ্রের মাথায় একটি অতি ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ টিকি আছে। অনেক সময়েই তিনি তাহা চুলের সহিত মিশাইয়া রাখেন; হঠাৎ ধরা যায় না। তিনি প্রতিদিন পূজা-পাঠ করেন কি না, বলা যায় না; কিন্তু স্নানাহার সমাপ্ত করিয়া, কাছারীর কাপড় পরিয়া যখন তিনি বাহিরে আইসেন, তখন ললাটে এক দীর্ঘ ফোঁটা দেখিতে পাওয়া যায়। কাছারী পর্য্যন্ত সে ফোঁটা সঙ্গে থাকে। কাছারী যাওয়ার পর কোন্ সুযোগে সে ফোঁটা কোথায় পলাইয়া যায়, তাহার আর সন্ধান হয় না।

রামচন্দ্রের বাসায় বাহিরের ঘরে একখানি চৌকীর উপর কম্বল পাতা আছে। দুই একখানি টুল, একখানি আম-কাঠের বেঞ্চও সে ঘরে পড়িয়া আছে। তামাক-টিকার একটা বাক্স ও দুই চারিটা ডাবা হুঁকাও সেখানে আছে।

বেলা প্রায় ৭টা। রামচন্দ্র সেই বাহিরের ঘরে বসিয়া আছেন। সম্মুখে তাঁহার প্রতিদিনবাহিত দপ্তর ও দোয়াত-কলম রহিয়াছে। রামচন্দ্র লেখা-পড়া কিছুই করিতেছেন না। চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছেন, এমন সময়ে তিনি দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখস্থ পথ দিয়া দুইটি ভদ্রলোক তাঁহারই গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি ব্যস্ততা সহ দপ্তর হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া মনঃসংযোগ সহকারে পাঠ করিতে লাগিলেন। লোকেরা গৃহপ্রবেশ করিলে রামচন্দ্র কাগজ হইতে দৃষ্টি অপসারিত না করিয়াই বলিলেন,—"আসুন।"

আগন্তুকদ্বয় আমাদের সুপরিচিত হরকুমার ও চণ্ডী। রামচন্দ্র দূর হইতে তাঁহাদের দেখিয়াছিলেন এবং হরকুমার বাবুর চেহারা ও রকম-সকম দেখিয়া স্থির করিয়াছিলেন, একটা বড় মামলা না হইয়া যায় না। বিলক্ষণ দশ টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা।

হরকুমার বাবু তক্তপোষের এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন; কিন্তু চণ্ডী না বসিয়া বলিল, "কি দাদা, চিনিতে পার না?"

এই বলিয়া সে রামচন্দ্রের চরণে একটা প্রণাম করিল এবং উভয় পদের ধূলি লইয়া মাথায় দিল। অগত্যা রামচন্দ্রকে বিশেষ দরকারী কাগজপাঠ ত্যাগ করিয়া এই সুবিনীত মক্কেলের প্রতি নেত্রপাত করিতে হইল। চণ্ডীকে দেখিয়াই তিনি চিনিতে পারিলেন এবং মনে করিলেন,—এই রে, এত দিন পরে এই গুলীখোর হতভাগা জ্বালাতন করিতে আসিল। ইহাকে ভাগাইবার ফিকির করা আবশ্যক। তাহার পর মনে করিলেন, ইহার সঙ্গে একটা জাঁকাল লোক দেখিতেছি; সুতরাং একটা লাভালাভের কথা থাকা সম্ভব। শেষ দেখিয়া তাড়াইবার ব্যবস্থা করা যাইবে। প্রকাশ্যে বলিলেন,—"চণ্ডী ভায়া যে! কোথা থেকে আসছ?"

চণ্ডী বলিল,—"বাড়ী থেকে দাদা। ছেলেপিলে ভাল আছে? বউ-ঠাকরুণ ভাল আছেন?"

রামচন্দ্র সমর্থনসূচক মস্তকান্দোলন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"তোমার সব কুশল?"

চণ্ডী সবিনয়ে বলিল,—"আপনার আশীর্ব্বাদে প্রাণগতিক সমস্ত মঙ্গল। একবার তামাক খাইতে হইবে। চাকর-বাকর আছে কি?"

রামচন্দ্র মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। চণ্ডী বলিল,—"আমার সঙ্গে এই যে বাবু আসিয়াছেন, ইনি এক জন মহাত্মা লোক দাদা। ওঁরই দরকারে আসা হইয়াছে। চাকরেরা বাজারে হাটে গিয়াছে বোধ হয়। দরকার কি? সবই তো আছে। আমিই সাজিয়া খাই।"

চণ্ডী তামাক সাজিতে লাগিল। রামচন্দ্র মনে করিলেন, এত দিনে বোধ হয় আমার বিদ্যা-বুদ্ধির সৌরভ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাই মহাত্মা লোকেরাও দেশ-বিদেশ হইতে আমার আত্মীয়-কুটুম্ব সঙ্গে লইয়া আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। জানি আমি, আমার নাম একদিন না একদিন সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবে। জিজ্ঞাসিলেন,—"মহাশয়ের নিবাস?"

হরকুমার বলিলেন,—"নিবাস আমার এ জেলায় নহে।"

রামচন্দ্র বলিলেন,—"যে জেলাতেই হউক না কেন, মোকদ্দমা আমার হাতে দিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, এরূপ যত্ন আর কাহারও দ্বারা হইবার সম্ভাবনা নাই। আইনের ফাঁকি বাহির করা, জেরায় সাক্ষীর সর্ব্বনাশ করা, বক্তৃতায় হাকিমের মত ফিরাইয়া দেওয়া ইত্যাদি কার্য্যে আমার বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। বলিতে কি, আজিকালি

আদালতে লোক নাই বলিলেই হয়। এখানকার যে সকল উকীল-মোক্তার, তাহারা লেখাপড়াও শিখে না, আইনও বুঝে না, জেরা করিতে জানে না এবং বক্তৃতায় দুই দশ কথার বেশী বলিতে পারে না। আমার মত সাবেক প্রবীণ লোক আর বড় নাই। যে দুই এক জন আছেন,তাঁহারা গেলেই মামলামোকদ্দমা হাকিমদের নিজ ইচ্ছামতেই চলিতে থাকিবে আর কি। তা মহাশয় বুঝি বাদী? বাদীর পক্ষে আমি যে আরজি লিখি, তাহাতে আর কাহারও কলম ডালিবার সাধ্য থাকে না।"

হরকুমার বলিলেন,—"আজ্ঞে,আমি বাদী নহি।"

রামচন্দ্র বলিলেন,—"ওঃ! তবে আপনি প্রতিবাদী। কিন্তু চিন্তা নাই। সাক্ষী ভাঙ্গাইয়া, তর্ক বাহির করিয়া প্রতিবাদীর ডুবা মোকদ্দমাও আমি তুলিয়া থাকি। নিজের কথা নিজেআর কি বলিব? এ পক্ষে আমার সিদ্ধবিদ্য। বলিব কি মহাশয়, সে দিন আমার এক মোকদ্দমায় জজ আদালতের এক জন উকীল আসিয়াছিলেন; আমরা প্রতিবাদী। উকীল মহাশয় মোকদ্দমা চালাইতে লাগিলেন। তাঁহাকে সকল কথা বেশ করিয়া শিখাইয়া দিয়া, আমাকে অন্য এজলাসে যাইতে হইল। আমার ত এক জায়গায় অনেকক্ষণ থাকা ভার। সকল এজলাসেই মোকদ্দমা। যাহা হউক, ফিরিয়া আসিয়া দেখি, উকীল মহাশয় মোকদ্দমাটির গায়ে জল দিয়াছেন আর কি। হাকিম বলিতেছেন, "ইহাকে ৬ মাস মেয়াদ দেওয়া উচিত।" আমি বলিলাম, "ধর্ম্মাবতার! আমি অনুপস্থিত থাকায় উকীল মহাশয় হুজুরকে মোকদ্দমা ঠিক বুঝাইতে পারেন নাই। আমি ইহার সমস্ত বুঝাইয়া দিতেছি। ধর্ম্মাবতার দেখিতে পাইবেন, আসামী নিতান্তই নির্দ্দোষ। হাকিমমাত্রেই আমাকে বড় শ্রদ্ধা করেন। আমার কথা হাকিম শুনিতে লাগিলেন। আমি কৌশলে সেই মোকদ্দমা ফিরাইয়া আসামীকে বেকসুর খালাস করিয়া আনিলাম। কথাটা কি জানেন বাবু, সকলই পয়সার কর্ম্ম। যেমন পরিশ্রম, তেমন পয়সা না পাইলে খাটিতে ইচ্ছা হয় না, কাজেও উৎসাহ হয় না। তা মহাশয় প্রতিবাদী বলিয়া ভয়ের কারণ কিছুই নাই।"

হরকুমার বলিলেন,—"আজ্ঞে, আমি প্রতিবাদীও নহি।"

রামচন্দ্র পরিত্যক্ত কাগজখানি তুলিয়া লইলেন। জিজ্ঞাসিলেন,—"তবে আপনার কি মোকদ্দমা?"

হরকুমার বলিলেন,—"আমার কোন মোকদ্দমা নহে।"

রামচন্দ্র কাগজপাঠে মনঃসংযোগ করিলেন। হরকুমার বলিলেন—"আমার কাজ অন্য রকম। তাহাতেও কিছু লাভের সম্ভাবনা নাই, এমন নহে।"

রামচন্দ্রের হাত হইতে কাগজ পড়িয়া গেল। বলিলেন,—"আদালত-সংক্রান্ত কত রকম কাজই আছে। মোকদ্দমাই থাকিতে হইবে, এমন কি কথা। মহাশয়ের কাজ বোধ হয় রোডসেস-সংক্রান্ত। সে কার্য্য আমার দ্বারা স্বচ্ছন্দে শেষ হইবে। আপনি ভাল লোকের কাছেই এজন্য আসিয়াছেন। কারণ, রোডসেস আফিসের সমস্ত আমলাই আমার হাতধরা।"

হরকুমার বলিলেন,—"আজ্ঞে, রোডসেস আফিসে আমার কোন কাজ নাই।"

রামচন্দ্র বলিলেন,—"তবে মহাফেজখানায় বুঝি? —তা বেশ তো। জমির চৌহদ্দি চাহি বুঝি? তা তায়দাদের নকল লইলেই হইবে। কিছু জল খেতে দিতে হবে; আমলা বেটারা যেন রাঘব-বোয়াল! তা সে জন্য আটকাইবে না। আজই দরখাস্ত করিয়া দিব এখন। আপনার নম্বরটি জানা আছে তো?"

হরকুমার বলিলেন,—"আজ্ঞে না, কোন জমির তায়দাদ বা চৌহদ্দির দরকার নাই।"

আবার সহস্রবার অধীত কাগজ রামচন্দ্রের হাতে উঠিল। তিনি সেই দিকে নেত্রপাত করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"তবে কি?"

হরকুমার বলিলেন,—"আপনার নিকট কতকগুলি কাগজ আছে।"

রামচন্দ্র বলিলেন,—"কোন্ মোকদ্দমার কাগজ? আপনাকে চিনি না, আপনার নিকট সে কাগজ ছাড়িয়া দিব কেন? আর মোকদ্দমার দরুণ যদি আমার ফিসের টাকা কিছু বাকী থাকে, তাহা হইলেই বা কাগজ ছাড়িব কেন?"

হরকুমার বলিলেন,—"কোন মোকদ্দমার কাগজ নহে।"

"তবে কিসের?"

"আপনার মাসী পরলোকগতা গঙ্গামণি দেবী আপনার নিকট কতকগুলি কাগজ রাখিয়াছিলেন; তাহাতেই আমার দরকার।"

রামচন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন। বহুদিবসাবধি সেই কাগজের তাড়া তাঁহার নিকট পড়িয়া আছে। কোন না কোন সময়ে তাহাতে কিছু না কিছু লাভ হইবে মনে করিয়া তিনি সেগুলি মাসীর নিকট হইতে হস্তগত করিয়াছিলেন। মাসী যখন বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইতে অধিক বিলম্ব নাই, তখন তিনি ঐ প্রয়োজনীয় কাগজগুলির কি ব্যবস্থা

করিবেন ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়াছিলেন। চণ্ডী দরিদ্র, তাহাকেই তিনি তাঁহার সম্পত্তি দিবেন স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি জানিতেন, কাগজ রাখিতে বা তাহার সদ্ব্যবহার করিতে চণ্ডী কখনই পারিবে না। এই সময়ে রামচন্দ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলে তিনি তাঁহাকেই কাগজ রাখিবার অতি উপযুক্ত-পাত্র বলিয়া মনে করিলেন। ব্যক্তি নির্ণয় করিতে না পারিলেও রামচন্দ্র কাগজ পাঠ করিয়া বুঝিলেন, তাহা রহস্যপূর্ণ। কখন কাহারও ইহাতে দরকার উপস্থিত হইলে বিলক্ষণ দুই পয়সা লাভ করিতে পারিবেন,সেই কাগজের সম্বন্ধে রামচন্দ্র অনেক আশা করিয়াছিলেন; কিন্তু কোন আশাই সফল হয় নাই; এ পর্য্যন্ত কোন লোক কাগজের খোঁজ করিতেও আইসে নাই। ব্যাপারটা কাশী-সংক্রান্ত বুঝিয়া তিনি স্বতঃ পরতঃ এ সম্বন্ধে কাশীতে অনেক সন্ধান করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সে কাগজের লক্ষিত কোন ব্যক্তিরই সন্ধান হয় নাই। অবশেষে তিনি হতাশ হইয়াছেন এবং তাহাতে কিছুই হইবে না বুঝিয়া কাগজগুলির যত্ন ত্যাগ করিয়াছেন। তথাপি কাগজগুলি যে এখনও তাঁহার একটি ভাঙ্গা বাক্সতে পড়িয়া আছে, ইহা তাঁহার অবিদিত নাই। এত দিন পরে সেই কাগজের সন্ধানে লোক আসিয়াছে। অবশ্য, বেশ দশ টাকা পাওয়া যাইবে। তাঁহার শরীর দিয়া যেন বিদ্যুৎ-স্রোত চলিয়া গেল। তিনি বলিলেন,—"থাকিতে পারে। মাসী-মার অনেক কাগজপত্র আমার নিকট ছিল, অনেক নষ্ট হইয়া গিয়াছে।"

হরকুমার বলিলেন,—"আমার যে কাগজে দরকার, তাহা আপনার নিকট আছে। সেগুলি আমাকে দিলে আপনাকে ৫০৲ টাকা পুরস্কার দিব।"

রামচন্দ্র মনে ভাবিলেন,—প্রথমেই নিজমুখে যখন পঞ্চাশ টাকা স্বীকার করিল, তখন অবশ্য অনেক বেশী তাক আছে। বলিলেন,—"আছে কি না, তাহাই সন্দেহ। যদি থাকে, তাহা হইলে অনেক খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। এত দিন যত্ন করিয়া রাখিয়াছি কিছু লাভেরই জন্য। পাঁচ শত টাকা দেওয়ার যদি মত হয়, তাহা হইলে কাগজ পাওয়া যায় কি না, একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।"

হরকুমার বলিলেন,—"কাগজের যাহা কাজ, তাহা আমি অন্য প্রকারে সারিয়া লইয়াছি। সে সম্বন্ধে যে কিছু সংবাদ সকলই আমি সন্ধান করিয়াছি। সুতরাং কাগজ না পাইলেও আমার কাজের কোন ক্ষতি হইবে না। তথাপি যদি তাহাতে আরও কোন নূতন সংবাদ পাই, এই আশায় কাগজগুলা একবার দেখিতে চাহি মাত্র। হয় ত যে পঞ্চাশ টাকা দিব, তাহা কেবল নষ্ট করাই হইবে! জলে ফেলা মনে করিয়াই পঞ্চাশ টাকা দিতে চাহিতেছি।"

রামচন্দ্র বলিলেন,—"কাগজ যে দরকারী, তাহার ভুল নাই। পাঁচ শত টাকা না পাইলে আমি তাহার সন্ধান করিব না।"

হরকুমার বলিমেন,—"পঞ্চাশ টাকাব বেশী এক পয়সাও আমি দিব না। আপনি তাহা রাখিয়া দিউন। তবে চণ্ডী বাবু, তুমি এখানে থাকিবে কি? আমি যাই, রাত্রের ট্রেণে আমি কাশীযাত্রা করিব। বৈকালে একবার দেখা হইবে কি?"

চণ্ডী ববিল,—"সে কি দাদা? আমি তোমার সঙ্গে কাশী যাইব; আমাকে এরূপ ভাবে ফেলিয়া যাইও না। তবে এ বেলাটা আমার এখানে থাকাই ইচ্ছা। বহুদিন পরে দাদার বাসায় এসেছি। এক বার ছেলেপিলেদের দেখে, বউ ঠাক্‌রুণের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে যেতে ইচ্ছা করি। আপনি যান—আমি এখনই আপনার কাছে হাজির হব।"

রামচন্দ্র বলিলেন,—"তবে কাগজগুলিতে মহাশয়ের বিশেষ দরকার নাই? সেগুলা আর পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে আর সে ভূতের বোঝা বহিয়া লাভ কি? সেগুলাকে উনান ধরাইবার কাজে লাগাইব।"

হরকুমার বলিলেন,—"স্বচ্ছন্দে।"

তিনি প্রস্থান করিলেন। রামচন্দ্র মনে মনে স্থির করিলেন, যখন দরকার পড়িয়াছে, তখন অবশ্যই আমার নিকট আসিতে হইবে। মেয়ের বিবাহের টাকাটা সংগ্রহ করিবার উপায় এত দিনে ভগবান্ উপস্থিত করিয়া দিয়াছেন।

চণ্ডী বলিল,—"দাদা, ঠকিয়া গেলেন। পঞ্চাশটা টাকা হাতছাড়া হইয়া গেল। বাবুটির সঙ্গে সদভাব থাকিলে অনেক কাজ হইত দাদা। তা হ'উক, আমি কেন ঐ বাবুর সঙ্গে যাই না।"

রামচন্দ্র বলিলেন,—"তাও কি হয়? তুমি এ বেলা এখানে খাওয়া-দাওয়া কর, তার পর যাওয়ার কথা হইবে।"

রামচন্দ্র স্থির করিলেন, চণ্ডীর নিকট হইতে সকল বৃত্তান্ত জানিতে পারিলে বুঝা যাইবে, কাগজের দাম কিরূপ আদায় হওয়া সম্ভব। বিশেষ লোকটার সহিত চণ্ডীর যথেষ্ট আলাপ। লোকটা হাতছাড়া হইলেও চণ্ডীকে হাতছাড়া করা হইবে না। সমস্ত বুঝিয়া বৈকালে যাহা হয় করা যাইবে। এ বেলা

চণ্ডীকে আটকাইয়া রাখিতেই হইবে। এইরূপ স্বার্থ-সিদ্ধির বাসনায় রামচন্দ্র চণ্ডীকে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। নচেৎ অন্ন দিয়া আত্মীয়তা প্রকাশ করিবার লোক রাম মোক্তার নহেন।

চণ্ডী তামাক সাজিল এবং দাদাকে খাইতে দিল। দাদা তামাক খাইতে খাইতে হরকুমার বাবুর সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসিলেন। চণ্ডীও সত্য মিথ্যা মিশাইয়া তাহার অনেক উত্তর দিল। সমস্ত শুনিয়া রামচন্দ্র মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন; বুঝিলেন, লোকটাকে একেবারে হাত-ছাড়া করা ভাল হয় নাই। ইহাও তিনি বুঝিলেন, চণ্ডী মনে করিলে এখনও পাঁচ শত না হউক, আড়াই শত টাকা আদায় করিয়া দিতে পারে। অতএব এখন চণ্ডীকে বড়ই যত্ন করা এবং যাহাতে সে তাঁহার পক্ষে চেষ্টা করে, তাহার উপায় করা আবশ্যক।

এ দিকে ক্রমে রামচন্দ্রের স্নানের সময় উপস্থিত হইল। রামচন্দ্র বলিলেন,—"এস ভায়া, বাড়ীর মধ্যে যাই।"

চণ্ডী বলিল,—"যে আজ্ঞে।"

উভয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

কার্য্যোদ্ধার।

রামচন্দ্র নিতান্ত উদ্বিগ্ন। কাজটা ভাল হইল কি? এত কাল কেহ কখন কাগজের খোঁজ করেন নাই, এখন যদি বা দৈবাৎ এক জন খোঁজ করিতে আসিয়াছিল, তাহাকে এরূপে বিদায় করিয়া দেওয়া ভাল হয় নাই। বাবুটি এখনও ষ্টেশনে আছেন; রাত্রি পর্য্যন্ত থাকিবেন. ষ্টেশনে গিয়া দেখা করিব? কোন কার্য্যের ওজরে কাছারীর ফেরতা ষ্টেশনের দিকে যাইব কি? এত ভারী হওয়া ভাল হয় নাই। লোকটার সহিত ভাল করিয়া আলাপ-পরিচয় না করাও উচিত কাজ হয় নাই। একটু আদর-অপেক্ষা না করা ভদ্রতা-সম্মত হয় নাই। এক কাগজের জন্য এতটা অহঙ্কার প্রকাশ করায় সকলই মাটী হইল। আর সে আসিবে বোধ হয় না; কাগজে আর দরকার পড়িবে, এমন বোধ হয় না। কি বা সে কাগজে আছে? আমি একটা পাকা মোক্তার—আইনের ঘুণ। দশবার সে কাগজপত্র পড়িয়া দেখিয়াছি। তাহাতে ছাই-ভস্ম কিছুই নাই —পড়িয়া কিছুই বুঝা যায় না। মাসী-মা স্ত্রীলোক। তাঁহাকে কে বলিয়া থাকিবে, "কাগজগুলা বড় দরকারী।" তাই তিনি যত্ন করিয়া সে ভূতের বোঝা বহিয়াছিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া আমিও বুঝিয়াছিলাম, হইবেও বা দরকারী কাগজ; হয় ত কিছু লাভও হইবে। এত কাল কেহ তাহার সন্ধান করিল না; আমিও বৃথা বোঝা বহিয়া মরিলাম। যদি অদ্য এক জন সন্ধানে আসিল, আমি তাহাকে অনাদর করিয়া হাতের লক্ষ্মী পা দিয়া ঠেলিলাম।

লোভী ক্ষুদ্রচেতা রামচন্দ্র মনে মনে বড়ই অনুতপ্ত হইলেন এবং আপনার বিদ্যা-বুদ্ধিকে শত-সহস্র ধিক্কার দিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে জানিতেন, তাঁহার মত বুদ্ধিমান্ মনুষ্য আর জন্মে নাই। বুদ্ধির অপ্রতুলতা হেতু কখনই তাঁহার ক্ষোভ হয় নাই। আজি হইল। অদ্যকার ব্যাপারে তিনি আপনাকে মূর্খের অগ্রগণ্য বলিয়া স্থির করিলেন।

এক্ষণে ভরসা চণ্ডী। চণ্ডীর সহিত বাবুটির আলাপ-পরিচয় আছে। উভয়ে একসঙ্গে আসিয়াছে, একসঙ্গে কাশী যাইবে। চণ্ডী যদি কোন উপায় করিয়া এ বিষয়ের কিনারা করিতে পারে। যে চণ্ডীকে গুলীখোর বলিয়া তিনি চিরদিন হতাদর করিয়াছেন, যে চণ্ডীকে একবেলা খাইতে দিতে, কখন দুই আনা পয়সা দিয়া সাহায্য করিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না, সেই চণ্ডীকে আজি তাঁহার ভরসা-স্থল, পরম সহায় ও নিতান্ত আত্মীয় বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

রামচন্দ্র আবার চণ্ডীকে জিজ্ঞাসিলেন,—"হ্যাঁ ভায়া, বন্ধুটি তোমায় ফেলিয়া যাইবেন না তো?"

চণ্ডী বলিল,—"সম্ভব তো নয়। তবে তাঁহার কাজ হইল না, এ জন্য যদি না থাকেন।"

রামচন্দ্র বলিলেন,—"তা তাঁহাকে একবার ডাকিয়া আন না কেন? আমি পাঁচ শত বলিয়াছি বলিয়াই যে তাহাই লইব, এমন তো কথা নয়। দেখ, আহারাদির পর তুমি ষ্টেশনে যাও। আমিও কাছারীর পর ঐ দিকে যাইব। আমি যেন তোমাদের দেখিয়াও দেখিব না। তুমি আমাকে দেখিয়া দাদা, দাদা বলিয়া ডাকিবে। তার পর আমি জিজ্ঞাসিব,—'কি হে, তোমাদের এখনও যাওয়া হয় নাই?' তুমি পাঁচটা বাজে কথার পর ক্রমে কাগজের কথা তুলিয়া একটা মাঝামাঝি রকম রফা করিয়া দিতে পারিবে না?"

চণ্ডী বলিল,—"বেশ পরামর্শ, এই জন্যই দাদা তোমার এত পসার। এ মতলবে নিশ্চয়ই কাজ হইবে। সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙ্‌বে না।"

ভায়ার এই আশ্বাসবাক্যে দাদা বড়ই পরিতুষ্ট হইলেন। বাটীর মধ্যে উপস্থিত হইয়া রামচন্দ্র গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিলেন,—"বলি, দেখিয়াছ, কে আসিয়াছে ?"

গৃহিণী তখন মাথায় ঝুঁটি বাঁধিয়া রান্নাঘরে হাতাহস্তে মহাসমরে নিযুক্ত ছিলেন। সেই অবস্থায় এ দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলে, চণ্ডীর ভব্যযুক্ত বেশ তাঁহার চক্ষে পড়িল। তিনি কে একটা লোক মনে করিয়া মাথায় কাপড় উঠাইয়া দিলেন।

তখন চণ্ডী বলিল,—"বউ ঠাকরুণ, চিন্‌তে পারিলে না ? আমি চণ্ডী।"

বউ-ঠাক্‌রুণ বড়ই বিরক্ত হইলেন। এ পাপ কেন আসিল ? একবেলা কাহাকেও অন্ন দেওয়া তাঁহার নিয়মের বহির্ভূত। এখন এ হতভাগা যদি একবেলা খাইয়াই না যায়। বলিলেন,—"উনি আবার এখানে কেন ? আমরা তফাতে থাকি, কারও ভালতেও নাই, মন্দতেও নাই। এখানে আবার আসা কেন ?"

তখন হরকুমারের উপদিষ্ট চণ্ডী টেঁক হইতে দুইটি চকচকে টাকা বাহির করিল এবং রান্নাঘরের নিকটস্থ হইয়া বউ-ঠাক্‌রুণের চরণোদ্দেশে ঝণাৎ করিয়া টাকা দুইটা ফেলিয়া দিয়া প্রণাম করিল।

গৃহিণী অবাক্! তাঁহার সেই ঠাকুরপো, যাহার অন্ন নাই, সে টাকা দিয়া প্রণাম করিল! তাঁহার পায়ে জুতা, গায়ে ভাল জামা, কাপড় চাদর সবই ভাল। মনে করিলেন, চণ্ডী নিশ্চয়ই কোথায় পড়ো টাকা পাইয়াছে। তাড়াতাড়ি হাতা ছাড়িয়া তরকারী পুড়িতে দিয়া তিনি টাকা দুইটি তুলিয়া লইয়া অঞ্চলে বাঁধিলেন। চণ্ডী কিন্তু ইহাতেই ক্ষান্ত হইল না। জিজ্ঞাসিল,—"ছেলে-মেয়েরা কোথায় ? তাহাদের এই তিন টাকা সন্দেশ খাইতে দিও বউঠাক্‌রুণ।"

আবার তিন টাকা! আবার গৃহিণীর অঞ্চলাশ্রয়ে তাহাদেরও স্থান হইল। তখন গৃহিণী বলিলেন,—"তা ঠাকুরপোর যে আমাদের কথা মনে পড়েছে, এও একটা ভাগ্য। আপনার লোক দেখেও বাঁচলেম।"

কর্ত্তাও অবাক্ হইয়া চণ্ডীর কারখানা দেখিতেছিলেন। তিনি এক্ষণে বলিলেন,—"চণ্ডী চিরদিনই ভাল। আমার চিরদিনই ইচ্ছা, ভায়ার উপর সংসারের ভার দিয়া আমি নিশ্চিন্ত হই।"

গৃহিণী বলিলেন,—"কতদিন পরে ঠাকুরপোর দেখা পাওয়া গেল। আমাদের তো রান্নাবাড়ার আজি কিছুই জুত নাই। একটু ভাল মাছটাছ আন্‌তে দেও।"

চণ্ডী বলিল,—"না বউ-ঠাক্‌রুণ, আমার জন্য কিছুই দরকার নাই। আমি কাশী যাইতেছি, তোমাদের সঙ্গে দেখা করিয়া যাইবার জন্যই নামিয়াছি। দাদা ছাড়িলেন না বলিয়া এ বেলা থাকিতে হইল। যা হয়েছে, তাই দুটো দেও, আমি খেয়ে এখনই চলিয়া যাইব।"

গৃহিণী চক্ষু বিস্তৃত করিয়া বলিলেন,—"ও মা, তাও কি হয় ? এলে যদি এত দিন পরে, পাঁচ দিন থাক, ছেলেপিলে নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ কর, তার পর যা হয় করিও। আজি তো কোনমতেই যাওয়া হবে না।"

মেয়ে ও ছেলে দুইটি কোথায় ছিল; এই সময়ে ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—"মা, ভাত হয়েছে ?"

জননী সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন,—"তোমাদের কাকা এসেছেন, দেখেছ ? যাও, আগে কাকাকে প্রণাম করিয়া এস।"

কাকা কাহাকে বলে, তাহা তাহারা জানে না, কাকার নামও কখন শুনে নাই; সুতরাং সবিস্ময়ে চণ্ডীর দিকে চাহিয়া রহিল। চণ্ডী তাহাদিগকে আদর করিলেন, ছোটটিকে কোলে লইলেন। বড়টির হাত ধরিলেন, মেয়েটির কিরূপ শাশুড়ী হইবে, তাহা বুঝাইয়া দিলেন। তাহার পর দাদার নিকট চলিয়া আসিলেন।

দাদার তখন স্নান হইয়া গিয়াছে। তিনি আঙ্গুলে পৈতা জড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। চণ্ডী নিকটস্থ হইলে তিনি বলিলেন,—"ভায়া, ষ্টেশনের পরামর্শটা মনে থাকে যেন। যদি পারা যায়, তাহা হইলে বাবুটিকে আজি আটকাইয়া রাখিতে হইবে। লোকটার সঙ্গে একটু ভাল ব্যবহার করিলে যদি দশ টাকা পাওয়া যায়, তাহার চেষ্টা দেখিতে হইবে।"

অবশ্য, পৈতা হাতে সমানই জড়ান থাকিল, চণ্ডী বলিল,—"কোন চিন্তা নাই দাদা! তোমার ঘরে যাহাতে দুপয়সা আসে, তাহাতে কি আমার অনিচ্ছা ?"

চণ্ডী স্নানে বড় নারাজ। যে যে সামগ্রী সে সেবা করে, তাহার সহিত স্নানের আন্তরিক শত্রুতা। সুতরাং সে আর স্নান করিল না। আহারের স্থান হইলে গৃহিণী ডাকিলেন,—"ঠাকুরপো, এস, তোমার দাদাকেও ডেকে নিয়ে এস।"

দুই ভাই এক স্থানে বসিয়া আহার করিলেন। জীবনে এ সৌভাগ্য উভয়ের অদৃষ্টে আর কখন ঘটে

নাই। আহারের বন্দোবস্ত বড় মন্দ। গৃহিণী সে জন্য নানারূপ কারণ প্রদর্শন করিলেন, অনেক শিষ্টাচার প্রকাশ করিলেন এবং ঠাকুরপোর মোটেই খাওয়া হইল না বলিয়া নিতান্ত কুণ্ঠিত হইলেন। সে সকল ব্যাপারের বিস্তারিত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন।

আহারান্তে বিলক্ষণরূপ তামাক সেবা করিয়া রামচন্দ্র ধড়াচূড়া বাঁধিয়া কাছারীযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন,—"ভায়া! আমি কাছারীর ফেরতা তাহা হইলে ষ্টেশনের দিকেই যাইব। কথা সব মনে থাকে যেন—কোন গোল না হয়। তবে তুমি কখন্ ষ্টেশনে যাইবে?"

চণ্ডী বলিল,—"এই একটু গা গড়াইয়া আমিও ধীরে ধীরে ষ্টেশনের দিকে যাইব। কাগজ লইতে সে এখানে আসিয়াছে। কাগজ তাহাকে লওয়াইয়া তবে ছাড়িব। সে জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই দাদা।"

দাদা নিশ্চিন্ত-মনে দুর্গা দুর্গা বলিয়া কাছারীযাত্রা করিলেন। চণ্ডী কিন্তু গা গড়াইল না এবং বিশ্রাম করিবার কোন চেষ্টাও করিল না। দাদা প্রস্থান করার কিয়ৎকাল পরে সে বাটীর মধ্যে আসিয়া ডাকিল,—"বউ-ঠাকরুণ, খাওয়া হলো কি?"

বউ-ঠাকরুণ বলিলেন,—"হাঁ ঠাকুরপো, এই দুটা ভাত মুখে দিলাম। আর একটা পাণ দিব কি?"

চণ্ডী বলিল,—"ইচ্ছা তোমার, আমি অতিথি, তোমাদের যাহা দয়া হইবে, তাহাই আমার যথেষ্ট।"

গৃহিণী বলিলেন,—"এমন কথা বলো না ঠাকুরপো, তুমি আবার অতিথি কিসের? তোমার বাড়ীঘর, তোমার সংসার। তুমি কেন অতিথি হ'তে যা'বে?"

চণ্ডী বলিল,—"আমার প্রতি তোমার যে অপার স্নেহ, তা কি আমি জানি না বউ-ঠাকরুণ। বল্‌ছিলেম কি, এত দিন তো বিদেশে ঘুরলে, দাদাও তো এত দিন রোজগার করলেন, তা তোমার হাতে দশ টাকার সংস্থান হয়েছে তো? সময় আছে, অসময় আছে, মেয়েমানুষের হাতে দশ টাকা থাকায় সংসারের অনেক উপকার।"

বউ-ঠাকরুণ বলিলেন,—"সে দুঃখের কথা আর কি বলিব ঠাকুরপো! তোমার দাদা লোকটি কেমন, তা কি তুমি জান না? টাকা তো দূরে থাকুক, একটা পয়সা কখন হাতে তুলে দেন না। সিকি-পয়সাটিও তোমার দাদার কাছ থেকে পাবার প্রত্যাশা নাই। সারাদিন মুখে রক্ত তুলে খাট, আর তাঁর বকুনি খাও, এই পর্য্যন্ত।"

চণ্ডী বলিল,—"দাদার এটা বড় অবিবেচনার কাজ বলিতে হইবে। তুমি হ'লে ঘরের লক্ষ্মী—তাই কি যেমন তেমন, লাখের মধ্যেও এমন স্ত্রী একটা মিলে না। তোমার অদিনের বিধি না করা তাঁহার বড়ই অন্যায়। সত্য বটে, দাদার বুদ্ধিটা যেন কেমন এক রকম। তিনি যে কি বুঝেন, তা তিনিই বলিতে পারেন।"

গৃহিণী বলিলেন,—"বুদ্ধির কথা বল কেন? কি গুণে যে উনি মোক্তারী করেন, তা উনিই বলিতে পারেন। এক কড়ার বুদ্ধি ঘটে নাই, একটা কাজের হিসাব নাই। কেবল মুখসর্ব্বস্ব।"

চণ্ডী বলিল,—"ঠিক বলেছ বউ। আজই যে আমি তার পরিচয় পেলাম। তোমাদের কাছে রামনগরের মাসী-মা কি কতকগুলা কাগজ রাখিতে দিয়াছিলেন। সেই কাগজগুলাতে এত দিন পরে একটি বাবুর দরকার পড়িয়াছে; তাই তিনি সন্ধান ক'রে দাদার কাছে তাই লইতে আসিয়াছিলেন। দাদাকে কুড়ি টাকা পর্য্যন্ত সে লোকটি দিতে চাহিলেন; তবু দাদা তাহা দিতে চাহিলেন না। লোকটা চলিয়া গেল। দেখ দেখি বুদ্ধিখানা। পচা ছেঁড়া কাগজ, ঘরে প'ড়ে নষ্ট হইতেছে। তাই দিয়ে কুড়ি কুড়িটা টাকা পাওয়া, সোজা কথা কি? সে চলিয়া গেল, এখন দাদা ভাবিয়া আকুল। এখন আমাকে অনুরোধ, তুমি কোন রকমে লোকটাকে ফিরাইয়া আনিয়া যাহাতে টাকা দিয়া কাগজ লয়, তাহার উপায় করিয়া দাও।"

গৃহিণী গালে হাত দিয়া বলিলেন,—"ও মা, এমন হতভাগা মিন্‌ষে—এমন হতশ্রী বুদ্ধি! ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! সে কাগজগুলা একটা ভাঙ্গা টিনের বাক্সতে দপ্তর-বাঁধা কতকাল ধ'রে পড়িয়া আছে। আমি তাহা অনেক দিন দেখিয়াছি। দাঁড়াও ঠাকুরপো, একটা মত্‌লব করলে হয় না? আমি তোমাকে সে কাগজগুলা এখনই দিতে পারি। তুমি সে লোকটার কাছ থেকে আমাকে কুড়ি টাকা আনিয়া দিতে পার না?"

চণ্ডী বলিল,—"তা পারিব না কেন? সে লোকটা তো কুড়ি টাকা দিতে সম্মতই আছে। ভয় হয়, দাদা যদি রাগ করেন।"

"কিসের রাগ? তিনি তো জান্‌তে পারবেন না।"

"যদি জান্‌তে পারেন? কাছারী থেকে এসেই যদি তিনি কাগজের খোঁজ করেন, তা হ'লে কি হবে?"

"হবে আবার কি? জান্‌তে পারেন পারবেন। কেন, আমি কি সংসারের কেহ নহি? কোনও উপায়ে

আমার কি দু'পয়সা পেতে নাই? তোমাকে এ কাজ করিতেই হইবে। আমাকে এ কুড়ি টাকা যেমন করিয়াই পার, আনিয়া দিতে হইবে।"

চণ্ডী বলিল,—"তার আর তো আশ্চর্য্য নাই। লোকটা কুড়ি টাকা দিতে তো রাজি আছে। যেখানে থাকিবে, তাও আমি জানি। রাত্রির গাড়ীতে সে চলিয়া যাইবে, এ অবস্থায় টাকা আনিয়া দিব, তাহার আর বিচিত্র কি? আর টাকা আনিয়াই বা দিতে হইবে কেন? আমার নিকটই কুড়ি টাকা আছে। তাহাই আমি তোমাকে আপাততঃ দিয়া পরে সে লোকটার কাছ থেকে আদায় করিয়া লইতে পারিব।"

গৃহিণী বলিলেন,—"ঠাকুরপো, এত দিনে বুঝিলাম, তুমি আমাদের যথার্থ আত্মীয় লোক। তবে এস তুমি, আমি তোমাকে এখনই কাগজ বাহির করিয়া দিব।"

চণ্ডী বলিল,—"বউ-ঠাকুরুণ, তোমার জন্য আমি সকলই করিতে পারি। তুমি দু টাকা পাইবে, আমি উদ্যোগী হইব, এ কথা আর আশ্চর্য্য কি? তবে দাদা পাছে রাগ করেন, কিছু বলেন, সে জন্য আমার ভয় হইতেছে।"

বউ-ঠাকরুণ বলিলেন,—"তুমি বড় ভাল মানুষ। বলেন তিনি কিছু আমাকেই বল্‌বেন, রাগ করতে হয় আমার উপরেই রাগ কর্‌বেন। তুমি তো আর চুরি করিয়া কাগজ লইতেছ না? আমি তোমার হাতে তুলিয়া দিতেছি। ইহাতে তোমার দোষ কি? তিনি এক গুণ রাগ করেন, আমি দশ গুণ শুনিয়ে দেবো। সে জন্য তোমার ভাবনা নাই।"

চণ্ডী বলিল,—"তবে চল।"

বউ-ঠাকরুণ কক্ষান্তরে প্রবেশ করিয়া একটা টিনের বাক্স খুলিয়া, একটি ছোট নেকড়া-বাঁধা কাগজের দপ্তর বাহির করিলেন এবং নেকড়ার আবরণ খুলিয়া সেই কাগজের দপ্তর চণ্ডীর হাতে প্রদান করিয়া বলিলেন,—"পড়িয়া দেখ, সেই কাগজ কি না?"

চণ্ডী কষ্টে-স্বষ্টে পাঠ করিল—"কাশীধামের এক বিধবার পুত্র-সংক্রান্ত কাগজ। শ্রীমতী গঙ্গামণি দেব্যা মাসী-মাতা ঠাকুরাণীর প্রদত্ত।"

সে যেন হাতে স্বর্গ পাইল। তাহার হরকুমার দাদা যে কাগজের জন্য পাগল, এত দিনে এত চেষ্টার পর তাহা তাহার হস্তগত হইল। সে আপনাকে বড়ই ভাগ্যবান্ বলিয়া জ্ঞান করিল। আনন্দে তাহার দেহ কাঁপিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি পকেট হইতে দুইখানি নোট বাহির করিয়া তাহার বউ-ঠাকরুণের হাতে দিয়া বলিল,—"এই লও, আমি তবে এখন আসি। কি জানি, দাদা যদি এসে পড়েন।"

বউ-ঠাকুরাণী বলিলেন,—"তিনি এখন আসিবেন না। তা আচ্ছা, তুমি এস তবে।"

চণ্ডী অতি ব্যস্ততা সহ প্রস্থান করিল এবং গমনকালে খালি ভাবিতে লাগিল, 'ঠাকুরের কৃপায় কাগজগুলি ঠিক হইলেই হয়।'

বধূঠাকুরাণী একসঙ্গে ২০৲ টাকা পাইয়া মহোল্লাসে আপনার এক কৌটার মধ্যে তাহা রাখিয়া দিলেন এবং সাবধানতার অনুরোধে সে কৌটা একটা ছেঁড়া বালিসের মধ্যে পুরিয়া তাহার মুখ সেলাই করিয়া ফেলিলেন।

একটু তাড়াতাড়ি কাছারীর কাজ শেষ করিয়া রামচন্দ্র ব্যগ্রভাবে ষ্টেশনের দিকে ধাবিত হইলেন। কিন্তু ষ্টেশনে চণ্ডী বা বাবুটি কেহ নাই। চারিদিকে অনুসন্ধান করিলেন, কোথাও তাহারা নাই। তখন তিনি কপালে করাঘাত করিয়া আপনার অদৃষ্টকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। তথাপি তিনি অনুসন্ধান ত্যাগ করিলেন না। প্রতি দোকানে সন্ধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে এক জন দোকানদার বলিল,—"একটি বড়-গোছের বাবু আমার দোকানে বসিয়া জল খাইয়াছিলেন; অনেকক্ষণ বসিয়া ছিলেন। তার পর আর একটি লোক আসিয়া জুটিলে তাঁহারা দুই জনে মিলিয়া ষ্টেশনে গিয়াছেন। আর ফিরিয়া আইসেন নাই। বোধ হয়, চলিয়া গিয়াছেন।"

দশম খণ্ড—স্বর্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ

অসাবধানতা।

অদ্য জন্মাষ্টমী। যে পুণ্যস্বরূপ নারায়ণ এই পাপ-তাপপূর্ণ বসুন্ধরায় অবতীর্ণ হইয়া পূর্ণভাবে লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, যাঁহার অনুমান-সমূহ অদ্ভুত, নির্দ্দোষ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, যিনি মানবকুলকে প্রকৃষ্ট ধর্ম্মমার্গ দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত স্বয়ং মানবের ন্যায় ব্যবহারের অধীন হইয়া জগতে সৎপথের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, যাঁহার লীলা চিরনূতন, অনন্ত-রসময়, অজস্র প্রেমপূর্ণ, যিনি জগতে পাপী ভিন্ন আর কাহাকেও অবজ্ঞা করিতে জানিতেন না, স্ত্রী ও পুত্র সকলকেই যিনি তুল্যরূপে মুক্তিরূপ পরম পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, যিনি অনেকের হিতমাত্র লক্ষ্য করিয়া সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, যাঁহার স্বার্থজ্ঞান কেবল পরার্থেই পর্য্যবসিত হইয়াছে, ক্ষুদ্র নৈতিক মানদণ্ড বা মানবের সামান্য জ্ঞানরূপ তুলাযন্ত্র যাঁহার মহামহিমময় কীর্ত্তিশৈলের সমীপস্থ হইবার সম্ভাবনাও নাই, যিনি নিন্দা বা সুখ্যাতি, তিরস্কার বা পুরস্কার উভয়েই অবিচলিত থাকিয়া নিরন্তর স্বকীয় শুভেচ্ছা-পূর্ণ সৎকর্ম্মসমূহ সম্পন্ন করিয়াছেন, যাঁহাকে প্রণিধান করিতে পারিলে অথবা যাঁহার মাহাত্ম্য-ভূধরের একদেশমাত্র দর্শন করিতে পাইলেও মানব চিরধন্য ও কৃতকৃতার্থ হয়, সেই ব্রজকিশোর, শ্যাম-নটবর, রাধিকা-হৃদয়-রঞ্জন নারায়ণ দ্বাপরের অবসানে কলির প্রারম্ভে এই পুণ্য-তিথিতে কংস-কারাগারে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেই পবিত্র তিথি পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে মহোৎসবের দিন। বালক ও বৃদ্ধ, নর ও নারী, শাক্ত ও বৈষ্ণব সকলেই আজি উৎসবে মত্ত। নৃত্য ও গীত, বাদ্য ও উৎসব, হরিদ্রা-ম্রক্ষণ ও দধিলেপন, ভূ-লুণ্ঠন ও কর্দ্দম-মর্দ্দন, ভোজন ও উপবাস, ব্রত-কথা-শ্রবণ ও ভগবৎ-পূজা ইত্যাদি বহুব্যাপারে অদ্য ভারতভূমি উৎসবময়। ধন্য আমরা, যে দেশে নন্দ-নন্দন বংশীবাদন মধু-সূদনের নাম উচ্চারণ করিতে সক্ষম হইয়াছে, সেই দেশে আমরা মানবাকারে জন্মলাভ করিয়াছি, যে দেশের ধূলিকর্দ্দমে তাঁহার ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-চিহ্নিত পাদ-পদ্ম সংলিপ্ত হইয়াছিল, সেই দেশের পবিত্র রজঃ আমাদের দেহে সম্পৃক্ত হইতেছে। জয় জগন্নাথ জনার্দ্দন! জয় জয় সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তম!

অদ্য নীলরতন বাবুর বাটীতে পূজা, রাত্রি-জাগরণ, কাহারও ভোজন, কাহারও উপবাস, ভিক্ষা-দান, বস্ত্রদান ইত্যাদি ব্যাপার হইবে। সন্ধ্যার পর হইতে উমাশঙ্করও সকলের সহিত মিলিত হইয়া উৎসবাদির সহায়তা ও হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনাদি করিবেন কথা আছে। তিনি অনেক কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং পূর্ণভাবে এই পবিত্র ব্রতপালনের নিমিত্ত ও নীলরতন বাবুর অনুষ্ঠানসমূহের সহায়তা করিবার নিমিত্ত ঘনানন্দ স্বামীর অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অতি প্রত্যুষে নীলরতন বাবু, তাঁহার পত্নী ও ভগ্নী গঙ্গাস্নানে গিয়াছেন। অন্নপূর্ণা একাকিনী বাটীতে আছেন। তিনি একটি ঘরে বসিয়া শ্রীরাধা-কৃষ্ণ-মূর্ত্তির একখানি পটসন্নিধানে গললগ্নীকৃতবাসে, সজল নয়নে, কৃতাঞ্জলিপুটে বসিয়া আছেন।

এতদুপলক্ষে কয়েকজন পরমহংস ভোজন করাইতে নীলরতন বাবুর বাসনা ছিল এবং তিনি তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত উমাশঙ্করকে ভার দিয়া-ছিলেন। আট জন দণ্ডী অদ্য মধ্যাহ্নে নীলরতনের আলয়ে ভিক্ষা-গ্রহণে সম্মত হইয়াছেন। এই সংবাদ এখনই গৃহস্থকে জানান আবশ্যক মনে করিয়া, উমা-শঙ্কর প্রত্যুষেই নীলরতন বাবুর আলয়ে আগমন করিলেন। তাঁহার প্রবেশাধিকার অবাধ, সুতরাং দাস-দাসী ভক্তি সহকারে প্রণাম করিয়া সরিয়া দাঁড়া-ইল; কেহই কিছু বলিল না। "মা কোথায় গো?" "পিসী-মা কৈ?" বলিয়া উমাশঙ্কর ডাকিলেন। কোথায় কেহ নাই; কেহ উত্তর দিল না। অন্নপূর্ণা হয় ত কোন কথা শুনিতে পাইলেন না।

উমাশঙ্কর ধীরে ধীরে প্রকোষ্ঠ হইতে প্রকোষ্ঠান্তরে গমন করিতে করিতে ক্রমশঃ যেখানে অন্নপূর্ণা একাগ্রচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের যুগলরূপ সন্দর্শন করিতেছিলেন, তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বারদেশ হইতে সেই কিশোরী কামিনীর ভক্তি-সম্পৃক্ত অলৌকিক শোভাসংযুক্ত রূপরাশি-সন্দর্শনে তাঁহার মনে হইল, যেন শিব-মনোমোহিনী শঙ্করী তপস্যায় নিয়োজিতা রহিয়াছেন। তিনি নিঃশব্দপদ-সঞ্চারে অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ হইয়া আশ্চর্য্য জ্ঞানে সেই ভক্তিময়ী দেবীকে দর্শন করিতে লাগিলেন। যোগনিমগ্না অন্নপূর্ণার ভাব যতই তিনি আলোচনা করিতে থাকিলেন, ততই তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, অপরিসীম পুণ্যফলে অদ্য তাঁহার সাক্ষাৎ দেবীদর্শন সজ্ঘটিত হইল; প্রেম ও

ভক্তিতে তাঁহার কলেবর কণ্টকিত হইল এবং নয়নে আনন্দাশ্রুর আবির্ভাব হইল। তিনি নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সহসা অন্নপূর্ণার দৃষ্টি বিচলিত হইল এবং পটাভিমুখ হইতে অপসৃত হইয়া অন্যাভিমুখী হইতে না হইতেই উমাশঙ্করের দেবকান্তি তাঁহার লোচনপথবর্ত্তী হইল। তখন তিনি চমকিত ও বিস্রস্তভাবে ভূতলে মস্তক সংলগ্ন করিয়া সেই দেবতার চরণোদ্দেশে প্রণাম করিলেন এবং নিতান্ত অসাবধানভাবে বলিয়া ফেলিলেন,—"আমার দেবতা এমনই সদয় বটেন। ধন্য আমার সাধনা যে, সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধি! যে দেবতার চরণ-চিন্তা করিতে করিতে সহসা সাক্ষাৎলাভ ঘটিল, তাঁহার দয়ায় যেন কখনও বঞ্চিত না হই।"

কথা বলিয়া ফেলিলেন, হাতের ঢিল ছোড়া হইল। কিন্তু বড়ই বেশী কথা বলা হইয়াছে; এত কথা অন্য সময়ে বালিকা বলিয়া উঠিতে পারিতেন না ত। ভক্তি ও প্রেমে হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল, আকাঙ্ক্ষা ও আশায় অন্তঃকরণ উদ্বেলিত হইয়াছিল। সেই অবস্থায় প্রার্থিত দেবতার সহসা সন্দর্শনলাভ ঘটিল; প্রাণ যাঁহাকে চাহে, পটে বা দেবমূর্ত্তিতে সর্ব্বত্র যাঁহাকে দেখে, তাঁহাকে সম্মুখে পাইয়া মুখ হইতে অজ্ঞাতসারে অনেক কথা বাহির হইয়া পড়িল। হৃদয় তখন লৌকিক শাসনের অধীন ছিল না, বাক্য-সংযমের ক্ষমতা তখন ছিল না, অগ্রপশ্চাৎ ভাবনার তখন সময় ছিল না; তাই এত কথা তখন বলিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তার পর? তাহার পর দারুণ লজ্জা আসিয়া হৃদয় ও মন অধিকার করিল, বদনমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, শরীর ঈষৎ কম্পিত হইতে থাকিল, লজ্জায় ভূগর্ভে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা হইতে লাগিল, স্থূল ঘর্ম্মবিন্দুসকল ললাটে মুক্তাফলের ন্যায় আবির্ভূত হইল। সুন্দরী মৃতকল্প হইয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

আর উমাশঙ্কর? তিনি ভাবিতেছেন, 'এ কি কথা শুনিলাম? সত্যই কি এই রাজ-তনয়া সুন্দরী-শিরোমণি নবীনার চিন্তার বিষয় আমি? সত্যই কি আমি তাঁহার দেবতা? না—না, এ অধম তাঁহার দাস হইবারও অনুপযুক্ত।' আপনাকে আপনি শত ধিক্কার দিয়া তিনি স্বকীয় স্পর্দ্ধিত হৃদয়কে নিন্দা করিতে লাগিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, 'সন্ন্যাসি-পালিত, আশ্রয়বিহীন, ভিক্ষোপজীবী, পিতৃ-মাতৃহীন সন্ন্যাসীর এ চিন্তা নিতান্ত লজ্জাজনক ও অসঙ্গত। নিশ্চয়ই আমার শুনিবার ভুল হইয়াছে। সুন্দরী অভীষ্ট দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া যে কথা বলিয়াছেন, আমি তাহা আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে মনে করিতেছি কেন? ধিক্ আমাকে!'

উমাশঙ্কর, তুমি মহাপুরুষের শিষ্য ও সাধুগণের সংসর্গ-পালিত, সুতরাং তোমার জ্ঞান-গৌরব অপরিসীম হইলেও বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তুমি বড়ই ভ্রমে নিপতিত হইয়াছ। তোমার ন্যায় নিম্মলস্বভাব শাস্ত্রার্থবিৎ সংযতচিত্ত জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষের এইরূপ ভ্রান্তি দেখিয়া আমরা হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেছি না। তুমি স্বয়ং ঐ নবীনার প্রেম-নীরে আকণ্ঠ-নিমগ্ন হইয়াছ এবং ঐ সুন্দরীও তোমার প্রেম-শৈলের অত্যুচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন। এই পরিদৃশ্যমান সত্য তুমি দেখিয়াও দেখিতেছ না, বুঝিয়াও বুঝিতেছ না, ইহা বস্তুতই নিরতিশয় কৌতুকাবহ। তুমি যতই এই প্রেম-লতার বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিতে প্রয়াস করিতেছ, ততই তাহা তোমাকে অধিকতর বেড়িয়া ধরিতেছে। যতই তুমি ইহা অস্বীকার করিতেছ, ততই ইহা অধিকতর স্থায়িরূপে তোমার হৃদয়ে স্থান গ্রহণ করিতেছে। পঙ্কে নিপতিত ব্যক্তি উদ্ধারলাভের নিমিত্ত যতই বলপ্রয়োগ করে, ততই তাহার পদদ্বয় অধিকতর নিমগ্ন হয়। তোমার বর্ত্তমান দশাও সেইরূপ। আমরা বুঝিতেছি, তুমি যে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছ, তাহাতে তোমাকে ডুবিতেই হইবে।

অন্নপূর্ণা এই ঘরে আছেন দেখিয়া উমাশঙ্করের মনে হইয়াছিল যে, দণ্ডীদিগের ভোজনের কথা তাঁহাকেই বলিয়া যাইবেন; কিন্তু এখন তো আর কিছুই মনে হয় না। অথচ এরূপ নির্ব্বাক্ভাবে সুন্দরীর সমক্ষে দাঁড়াইয়া থাকাও যায় না। কি বলিবেন, জানেন না। ভাষায় কি শব্দ নাই? অতি কষ্টে সাহসে ভর করিয়া বলিলেন,—"আপনি স্বর্গ-কন্যা। আপনাকে নিরন্তর চিন্তা করিলে যদি স্বর্গ-লাভ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার তাহা হইবে।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"আমি এখন যাই। অনেক কাজের ভার অছে। আপনি বসুন।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"না—আমিও যাই। আবার আসিতে হইবে।"

ধীরে ধীরে অন্নপূর্ণা চলিয়া গেলেন। উমাশঙ্করের চক্ষে বিশ্ব সংসার অন্ধকার হইয়া গেল। তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। তখন দণ্ডি-ভোজনের কথা, তাঁহার মনে পড়িল। নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথা সুতরাং অন্নপূর্ণাকে তাহা বলিয়া যাওয়া আবশ্যক বলিয়া তাঁহার মনে হইল। তখন অন্নপূর্ণা তাঁহার

দৃষ্টি-সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন। উমাশঙ্কর ব্যস্ততা সহকারে বাহিরে আসিলেন; আবার অন্নপূর্ণার স্বর্ণ-কান্তি তাঁহার চক্ষে পড়িল। অন্নপূর্ণা প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিয়া অধিকদূর আইসেন নাই। প্রস্থান-কালে আর একবার উমাশঙ্করকে দেখিতে পাইবার লোভ তিনি সম্বরণ করিতে পারেন নাই। এই জন্য প্রকোষ্ঠের বাহিরে আসিয়া তিনি মন্থরগতিতে চলিতেছেন।

তাঁহাকে দর্শনমাত্র উমাশঙ্কর কিয়ৎকাল নির্নিমেষ-লোচনে সেই সৌন্দর্য্য-সুধা পান করিতে লাগিলেন। অন্নপূর্ণা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সুতরাং উমাশঙ্করকে লোচন বিনত করিতে হইল। বলিলেন,—"আপনাকে দেখিয়া—না—হাঁ, একটা বড় দরকারী কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম; আপনি দয়া করিয়া বাবুকে বলি-বেন।"

অন্নপূর্ণা অধোবদনে সম্মতিসূচক মস্তকান্দোলন করিলেন। উমাশঙ্কর দণ্ডিভোজনের বিষয় জানাইয়া প্রস্থান করিলেন। পাছে চক্ষুতে চক্ষুতে সম্মিলন হয়, এই ভয়ে কেহ কাহাকেও ফিরিয়া দেখিতে ভরসা করিলেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জগন্মাতা।

নিতান্ত উৎকণ্ঠিতভাবে উমাশঙ্কর ধীরে ধীরে আশ্রমে আসিলেন। গুরুদেব ঘনানন্দ তৎকালে ধ্যান-নিমগ্ন। দূর হইতে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উমাশঙ্কর ভিক্ষাযাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া ঝুলি ও মস্তকবন্ধনের নামা-বলী গ্রহণ করিলেন।

সহসা তাঁহার কর্ণে বীণার ন্যায় মধুর নিক্কণে শব্দ প্রবেশ করিল,—"বাবা! এ সংসারে সকলই সম্ভব, তোমার বাসনা-সিদ্ধি হইবে।"

সবিস্ময়ে উমাশঙ্কর ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে সৌদামিনী-বিনির্ম্মিতা দেবী-প্রতিমা! সেই প্রতিমা যোগেশ্বরী। অপার আনন্দে উমাশঙ্করের হৃদয়-মন পরিপূর্ণ হইল। তিনি ভক্তি সহকারে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "অনেক দিন পরে অধম সন্তানকে দেখা দিলে মা! এমন নিষ্ঠুর জননী আর কখন দেখি নাই।"

যোগেশ্বরী অগ্রসর হইয়া সস্নেহে উমাশঙ্করের মস্তকে হস্ত প্রদান করিলেন এবং তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে বলিলেন, "না বাবা, নিষ্ঠুর মা হইলে এমন দেব-সন্তান হয় কি?"

উমাশঙ্কর বলিলেন, "সংসারে আমার আর কেহই নাই। তোমাকে পাইয়া আমি মা বলিতে পাইয়াছি, মাতৃভক্তি শিখিয়াছি এবং মাতৃস্নেহ ভোগ করিতেছি। যখন যেখানে যেরূপে যে কষ্টই পাই না কেন, তখনই মা, তোমাকে মনে পড়ে। মনে হয়, তোমার ক্রোড়ে উপস্থিত হইলেই সকল ক্লেশের শান্তি হইবে। এমন মা তুমি, তবে তোমাকে সর্ব্বদা পাই না কেন মা?"

যোগেশ্বরী বলিলেন, "আজি তোমার মনে অনেক ভাবনা হইয়াছে, তাই আমি আসিয়াছি। যখন তোমার কোনরূপ দুঃখ বা চিন্তা উপস্থিত হয়, তখনই আমি আসি ত বাবা।"

উমাশঙ্কর কিয়ৎকাল সবিস্ময়ে এই দেবীর অলৌ-কিক শক্তির বিষয়ে আলোচনা করিলেন। মনে মনে বুঝিয়া দেখিলেন, বাস্তবিকই আজ তাঁহার গুরুতর চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে। বলিলেন, "না মা, আজ আর নূতন চিন্তা কিছু হয় নাই। জানি না, কোন্ পাপে কিছু দিন হইতে একটা অসঙ্গত চিন্তা আমাকে অসুস্থ করিতেছে। সেই চিন্তা আজিও আমাকে ত্যাগ করে নাই।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"সেই চিন্তা আরও একটি স্বর্গ-কন্যাকে প্রপীড়িত করিতেছে। চিন্তার অংশ গ্রহণ করিবার লোক থাকিলে তাহার কঠোরতা নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং তোমার চিন্তা অসহনীয় নহে।"

তত্রত্য মৃগচর্ম্মে উমাশঙ্কর বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন,—"মা! আপনার বাক্য কখনই মিথ্যা হইতে পারে না। আমি অনুমান করিয়াছিলাম, আর এক বালিকা আমার ন্যায় চিন্তায় ব্যথিতা হইতেছেন। এক্ষণে বুঝিলাম, আমার সে অনুমান সত্য। কিন্তু মা! আমি কঠোরহৃদয় সন্ন্যাসী; এ অসঙ্গত চিন্তার আক্রমণ হইতে হয় তো মুক্ত হইলেও হইতে পারিব। কিন্তু সেই কোমল-প্রাণা স্বর্গ-কন্যা এই অসঙ্গত চিন্তার প্রশ্রয় দিয়া হয় তো ভবিষ্যতে অপরিসীম যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকিবেন। এ কল্পনাও আমাকে নিতান্ত ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। মা—মা! আমার যাহা হয় হউক, তাঁহার হৃদয় হইতে এ চিন্তা অন্তর্হিত করিবার উপায় নাই কি?"

তখন উমাশঙ্করের পার্শ্বে আসিয়া যোগেশ্বরী দেবী সেই মৃগচর্ম্মে উপবেশন করিলেন এবং তাঁহার মস্তক আপনার বক্ষোমধ্যে গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—

"না বাবা! এ চিন্তা ত্যাগ করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। যে যাহা কায়মনোবাক্যে চিন্তা করে, তাহার তাহাই হয়। তোমাদের কোনই ভয় নাই। আমি এবার তোমাদের চিন্তার সফলতা না দেখিয়া আর দূরদেশে যাইব না।"

তখন উমাশঙ্কর ভক্তিসহকারে দেবীর পদরজঃ মস্তকে গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—"তবে মা, আমি এখন ভিক্ষায় যাই?"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"না, আজ তোর ভিক্ষায় যাইতে হইবে না;—তুই ত আজ ব্রত গ্রহণ করিয়াছিস। আহার করিবি না। তোর পিতা ব্রত মানেন না, তাঁহার কিছু আহারের প্রয়োজন বটে, তাহা আমি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি। আর আমি যে যে স্থান দিয়া তোর পিতা গমনাগমন করিবেন, প্রাণ ভরিয়া তত্রত্য ধূলি ভোজন করিব। তুই আমার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া শয়ন কর্। আমি সন্তান কোলে করার সুখ অনুভব করি।"

তখন উমাশঙ্কর সেই দেবীর অঙ্কে মস্তক-স্থাপন করিয়া শয়ন করিলেন। যোগেশ্বরী নয়ন মুদিয়া প্রেমসহকারে সন্তানের বক্ষে হস্তাবমর্ষণ করিতে লাগিলেন। অহো! কি আলোকিক শোভা! কি অপার্থিব অভিনয়! তখন সেই পীনোন্নতপয়োধরা দেবীর বক্ষোদেশের বসন সিক্ত হইয়া গেল এবং অবিরলধারায় ক্ষীররাশি বিগলিত হইয়া তাঁহার বসন ও তত্রত্য মৃত্তিকা আর্দ্র করিতে থাকিল।

এইরূপ সময়ে ঘনানন্দ স্বামী সেই কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, এই অমানুষী লীলা দেখিতে দেখিতে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ভক্তি, প্রেম, স্নেহ প্রভৃতির প্রাবল্যে ঘনানন্দের দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া ভক্তিগদ্গদকণ্ঠে স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন।

"আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈত-
দাপায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে॥
ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেত-
ত্ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥
বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরা পরোক্তিঃ॥
সর্ব্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী।
ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ॥
সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি।
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
সৃষ্টি-স্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
শরণাগত-দীনার্ত্তপরিত্রাণ-পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

(মার্কেণ্ডেয়-চণ্ডী)

তাঁহার স্তবপাঠ সমাপ্ত হইলে, যোগেশ্বরী দেবী নয়নোন্মীলন করিয়া বলিলেন,—"নারায়ণ সম্মুখে! আমি এতক্ষণ তোমার হইয়া সংসারপালন করিতেছিলাম। তা এ কি আমার কাজ? তোমার কার্য্য তুমি কর। আমি তোমার লীলা দেখিয়াই ধন্য হই।"

তার পর উমাশঙ্করকে বলিলেন,—"যাও বাবা! এই বিশ্ব সংসার যাহার আশ্রিত, তুমি, আমি সকলেই পরমাণুর ন্যায় যাহার চরণতলে অধিষ্ঠিত, যাঁহার স্ত্রী ও পুত্র, জনক ও জননী সকলেই সমান, সেই সনাতন পরম-পুরুষ সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। তুমি তাঁহার কাছে যাও বাবা!"

উমাশঙ্কর উঠিয়া বসিলেন। যোগেশ্বরী তত্রত্য ধূলায় দণ্ডবৎ লুণ্ঠিত হইয়া ঘনানন্দকে প্রণাম করিলেন। উমাশঙ্কর বলিলেন,—"বাবা আমি এতক্ষণ বিশ্বজননী পরমাশক্তির ক্রোড়ে স্থান পাইয়াছিলাম। ইহা কল্পনার কথা নহে, অনুমান নহে, প্রত্যুত জগৎ-প্রসবিত্রী দেবী আমাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছেন। আমি ধন্য হইয়াছি, আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা অপগত হইয়াছে, আকাঙ্ক্ষা ও বাসনা বিগত হইয়াছে। অলৌকিক শান্তিতে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়াছে।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"বৎস! তোমার কথা একটুও মিথ্যা নহে। অপরিসীম পুণ্যফলে আমরা পরমেশ্বরীর সাক্ষাৎ পাইয়াছি। ইনি কখন স্ত্রী, কখন বা পুরুষ, কখন জনক, কখন বা জননী, কখন সোদর, কখনও বা সহধর্ম্মিণী, কখন ব্রাহ্মণ, কখন বা চণ্ডাল, কখন হস্তী, কখনও বা মশক, কখন হিমালয়, কখন বা ক্ষুদ্র বলুকাকণা, কখন সরিৎপতি, কখনও বা ঘটবারিরূপে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিরাজিত আমরা সেই সনাতনী প্রকৃতিরূপা জড়াতীতা জড়ময়ী

চিন্ময়ী দেবীর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি। আইস বৎস! গুরু ও শিষ্য সমস্বরে শ্রোতমণ্ডে সেই দেবীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া জীবন পবিত্র করি।"

তখন গুরু ও শিষ্য উভয়েই মনোহর সমস্বরে বেদমন্ত্র গীত করিতে লাগিলেন।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্ব্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্॥
পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥
সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তং সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং বৃহৎ॥
য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্-
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥
তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ॥
ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চয়সি ত্বং জাতো ভবসি
বিশ্বতোমুখঃ॥
(শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ)

সেই পবিত্র সঙ্গীতধ্বনি দুলিতে দুলিতে ব্যোম-পথে সমুত্থিত হইল, পুণ্য-সলিলা ভাগীরথীর বক্ষে ভাসিতে লাগিল, বায়ুমণ্ডল ছাইয়া ফেলিল এবং পবিত্রতায় বসুন্ধরা পূর্ণ করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

লম্পটরাজ।

গভীর রাত্রিতে নীলরতন বাবুর বাটীতে সংকীর্ত্তনাদির পর উমাশঙ্কর শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতেছেন। সমস্ত দিন দান, ভোজন, সংকীর্ত্তন, পূজা, পাঠ ইত্যাদি ব্যাপারে ভবন পরিপূর্ণ ছিল। এক্ষণে আগন্তুকেরা সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। স্বয়ং নীলরতন, তাঁহার স্ত্রী, ভগ্নী ও কন্যা উমাশঙ্করের মধুময় বাক্য শ্রবণ করিতেছেন ও সময়ে সময়ে এক একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া আপনাদিগের জ্ঞাতব্য ব্যক্ত করিতেছেন।

অন্যান্য অনেক কথার পর নীলরতন জিজ্ঞাসিলেন, "সাধারণতঃ লোক শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে লাম্পট্য প্রভৃতি কতকগুলি দোষের আরোপ করে। আমি মনে মনে তৎসম্বন্ধে একরূপ মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছি। তথাপি তোমার ন্যায় পরমভক্ত সে বিষয়ের কি মীমাংসা করিয়াছে, তাহা জানিতে বাসনা হয়। যদি এখানে তাহা বলিতে আপত্তি বা অসুবিধা বোধ না কর, তাহা হইলে তুমি তাহা ব্যক্ত করিলে সন্তুষ্ট হইব।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আমি অতি দীন ও অভাজন। আমার দ্বারা সেই পরমপুরুষের চরিত্রের কোন অংশ ব্যাখ্যাত হওয়া সম্ভবপর নহে। তথাপি আপনাদের আজ্ঞাক্রমে আমি যাহা বুঝি, তাহা বলিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের কুত্রাপি এমন কোন ঘটনা নাই, যাহা মাতা বা ভগ্নীর নিকটে নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করা না যায়। সুতরাং আপনাদের সমক্ষে তাহার কোন কথাই বলিতে আপত্তি নাই। শ্রীকৃষ্ণের লম্পট অপরাধ বড়ই গুরুতর এবং বহুব্যাপী। বাস্তবিকই তিনি লম্পট। কিন্তু সে লাম্পট্য মনে হইলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, হৃদয় ভক্তি-ভরে অনবত হইয়া পড়ে; সেই লাম্পট্যের লীলা-স্থলের ধূলি-রাশিতে লুণ্ঠিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইতে হয় এবং সেই লম্পটরাজের কথা ছাড়িয়া দিউন, যে সকল দেবী তাঁহার প্রেমের পাত্র ছিলেন, তাঁহাদিগের চরণের রেণুমাত্র প্রাপ্ত হইলে কৃতার্থম্মন্য হইতে হয়। তাঁহার সেই পরদারাসক্তির সমস্ত বিবরণ বলিতে হইলে এ অসময়ে আপনাদের বিরক্তিকর হইতে পারে এবং সমস্ত দিনের ক্লান্তির পর আমার অপটু রসনা হয় ত তাহার প্রকৃষ্ট ব্যাখ্যা না করিতেও পারে; সুতরাং সংক্ষেপে অদ্য দুই একটি কথামাত্র বলি; সময়ান্তরে এ প্রসঙ্গ বাহুল্যরূপে আলোচনা করিব। শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক শাস্ত্রাদি দেখিলে উপলব্ধ হয় যে, তিনি একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বৃন্দাবনে লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই বয়সে তাঁহার বৃন্দাবন-লীলা সাঙ্গ হয় ও তিনি তত্রত্য নর-নারীগণের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ মথুরা, তদনন্তর দ্বারকা প্রভৃতি স্থানে গমন করেন।"

নীলরতন বলিলেন,—"এরূপ বাল্যাবস্থায় লাম্পট্য অসম্ভব। অতএব এ যুক্তির বলেই তাঁহার এ অপবাদ খণ্ডিত হইতে পারে।"

উমাশঙ্কর সবিনয়ে বলিলেন,—"আজ্ঞা না। এ যুক্তির আশ্রয় লইলে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক অনভিজ্ঞতারই পরিচয় দেওয়া হয়। ইদানীন্তন কালের অনেক লোক এরূপ অনভিজ্ঞতা সহকারে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের আলোচনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা সেই পরমপুরুষের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গত ও অসঙ্গত, সম্ভব ও অসম্ভব বিচার

করিয়া কিয়দংশ গ্রহণ করেন, কতক বা পরিত্যাগ করেন। আপনাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান, ক্ষুদ্র বিদ্যাবুদ্ধির অনুরূপ মানদণ্ড লইয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ রূপ অতল জলধির পরিমাণ করিতে প্রবৃত্ত হন। তাহার ফল বড়ই বিষময়। প্রত্যুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আজন্ম পূর্ণ। যিনি জন্মমাত্র সূতিকাগারে মাতার সহিত কথা কহিয়াছেন, যিনি জন্মদিনে পিতার অঙ্ক হইতে যমুনার জলে ঝাঁপ দিয়াছেন, যিনি ব্যাকুল পিতার শান্তির নিমিত্ত আবার হাসিতে হাসিতে তাঁহার ক্রোড়ে উত্থিত হইয়াছেন, যিনি শৈশবে পূতনা বধ করিয়াছেন, যমলার্জ্জুন ভঞ্জন করিয়াছেন, সেই দামোদর সকল বয়সেই—সকল অবস্থাতেই পরিপূর্ণ। যে ভাবেই তাঁহার মনুষ্যোচিত লীলা অনুষ্ঠিত হউক না কেন, তাঁহার পূর্ণতা কখনও তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই। এই জন্যই তাঁহার কোন না কোন কথাই অবিশ্বাস্য বা অসঙ্গত নহে। সুতরাং তাঁহার পক্ষে একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের মধ্যে লাম্পট্য অসম্ভব হইতে পারে না। বাস্তবিক গোপাঙ্গনাগণ জারভাবেই শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের হৃদয়গত দৃঢ়তার সবিশেষ পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ ও গোপাঙ্গনাগণ মনুষ্য-বিচারে নিন্দনীয় হইতে পারেন বটে; কিন্তু যখন তাঁহাদিগের সেই প্রেমের প্রগাঢ়তা, রহস্য, ভাব প্রভৃতি প্রণিধান করা যায়, তখনই বুঝিতে পারা যায় যে, সে প্রেম অলৌকিক, সে প্রেমের পাত্র-পাত্রী সকলেই অলৌকিক এবং তাহার ঘটনাও অলৌকিক।"

নীলরতন বলিলেন,—"কিসে তাহা বুঝা যায়?"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"তাহাই বলিতেছি। গভীর নিশীথে শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে শ্রীকৃষ্ণ একাকী আসীন। রজনী শুভ্রা, বসুন্ধরা জ্যোৎস্না-স্নাতা, সুস্নিগ্ধ অনিলহিল্লোলে প্রকাম্পিতা। এইরূপ অনুকূল সময়ে গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের সমীপাগতা হইয়া তাঁহার প্রণয়প্রার্থিনী হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ এ নিন্দনীয় সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে অনুযোগ-সহকৃত পরামর্শ প্রদান করিলেন। কিন্তু গোপাঙ্গনারা বলিলেন,"—আমাদিগের গৃহ, পতি, পুত্র, সংসারধর্ম্ম কিছুই মনে নাই। ধর্ম্ম, সমাজ, লজ্জা, ভয় আমরা পরিত্যাগ করিয়াছি। একমাত্র তুমিই আমাদিগের শরণ্য ও বরেণ্য। তুমি আমাদগকে পরিত্যাগ করিলে আমরা তোমার সমক্ষে আত্মহত্যা করিব। তুমি বিশ্বপতি, বিশ্বময় ও বিশ্বনাথ। অতএব আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পার না। আর তুমি পরিত্যাগ করিলেও আমরা তোমার ঐ ভক্তবৎসল চরণ ত্যাগ করিব না।' শ্রীকৃষ্ণ তথাপি তাঁহাদিগকে এ অধ্যবসায় পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। তথাপি তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া, নারায়ণ বলিলেন,—"তোমরা অদ্য গৃহে ফিরিয়া যাও, সংসারধর্ম্মে চিত্ত নিবেশ কর, যাহাতে পূর্ব্বাপর কুলধর্ম্ম রক্ষিত হয়, তাহার ব্যবস্থা কর, তাহার পর কল্য মনের ভাব বুঝিয়া আমাকে যেরূপ হয় বলিও।" এইরূপে পুনঃপুনঃ প্রত্যাখ্যান করিলেও যখন গোপিকারা একান্তভাবে তাঁহার চরণাশ্রয়গ্রহণ ভিন্ন জীবনরক্ষার উপায়ান্তর নাই বলিয়া বুঝাইয়াছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের সহিত রাসলীলায় প্রমত্ত হইতে সম্মত হইয়াছেন। কোন কোন গোপিকা কৃষ্ণপ্রেমে এতই বিহ্বল হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহাকে ধ্যান করিতে করিতে তখনই জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বা সেই জগতের পরব্রহ্মকে নিমীলিত-নয়নে চিন্তা করিতে করিতে রুদ্ধশ্বাস হইয়া বিগতজীব ও সদ্যোমুক্ত হইয়াছিলেন। এ সকলই ঐকান্তিকী ভক্তির দৃষ্টান্ত। এইরূপ ঘটনা ও পরীক্ষার পর শ্রীকৃষ্ণ গোপিকাদিগকে চরণ-সেবার অধিকার প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। মনুষ্যের চরিত্র আলোচনা করিলে এরূপ ঘটনা কখনই পরিদৃষ্ট হয় না। স্থান, কাল ও সুযোগ বিবেচনা করিলে কোন মনুষ্যই সেই দেব-যোগ্যা অপ্সরঃ-সদৃশী কামিনীদিগকে কদাপি প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন না; পরং তাদৃশী সুন্দরীকুলের সমাগম হেতু আপনাকে পরম ভাগ্যবান্ জ্ঞান করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদের সহিত নিন্দিত আচরণে প্রবৃত্ত হইতেন। শ্রীকৃষ্ণের লাম্পট্য তাঁহার দেবত্বের পরিচায়ক। তাহার পর সেই ভক্তগণের শিরোমণি-স্বরূপা কামিনীগণের কৃষ্ণময়তাও অলৌকিক। সেই কৃষ্ণগতপ্রাণা গোপিকারা আপনাদিগের নারীভাব এককালে বিস্মৃত হয়। প্রত্যেকেই আপনাকে কৃষ্ণ বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন এবং বস্তুতই তাঁহাদের কেহ বা গোবর্দ্ধন ধারণ করিতেছি মনে করিয়া ব্রজবাসিগণকে অভয় প্রদান করিতে লাগিলেন, কেহ বা তর্জ্জনগর্জ্জন সহকারে কালিয়দমনে প্রবৃত্ত হইলেন, কেহ বা তাড়নি-হস্তে গোচারণে উদ্যত হইলেন, কেহ বা বাহু আস্ফালন পূর্ব্বক ব্রজধামের শত্রুনাশে নিযুক্তা হইলেন। কি আশ্চর্য্য তন্ময়তা! কি ঐকান্তিকী ভক্তি! কি সুমধুর প্রেম! ইহার কোথায় বা কামগন্ধ, কোথায় বা গ্রাম্য আচরণ! কিন্তু তাহাও ছিল; সেরূপ

ব্যবহারও ঘটিয়াছিল সন্দেহ নাই। তাহাতেই বা দোষ কি? যখন প্রাণে প্রাণ মিশিয়াছে, হৃদয়ে হৃদয় প্রবেশ করিয়াছে, অঙ্গ যখন আর নিজের নয়, চক্ষু যখন আর কিছুই দেখে না, আপনার দেহকেই যখন সেই পুরুষ-রত্নের দেহ বলিয়া বোধ হইয়াছে, তখন—এইরূপ কল্পনাতীত সম্মিলনস্থলে ব্যভিচার না হইলেও ব্যভিচার হইয়াছে এবং ব্যভিচার হইলেও হয় নাই। দৈহিক সংস্পর্শই কি একটা বড় কথা? যে আপনার দেহ হারাইয়া প্রেমময়ের দেহকে আপন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, সে পূজনীয়া প্রেমিকার আবার দৈহিক সংস্পর্শে নূতনত্ব কি? তাহার পর এই প্রেমলীলার অত্যদ্ভুত পরাকাষ্ঠা পর্য্যালোচনা করুন। এই প্রেমে শ্রীনিবাস উন্মাদ-প্রায় হইয়াছিলেন। প্রেমময়ীর মধুর প্রেম তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, সেই বংশীবাদন-নিপুণ দেবতার বংশী সকল রাগ-রাগিণী পরিত্যাগ করিয়া কেবল মধুময়ী রাধা নাম ভিন্ন আর সকলই উচ্চারণ করিতে ভুলিয়া গেল; ক্ষণমাত্র সেই মানময়ীকে ম্লানমুখী দেখিলে জগদীশ্বর বিশ্বসংসার শূন্য বোধ করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধিকার শ্রীচরণ-পঙ্কজ পুরুষ-চূড়ামণি শ্রীহরি মস্তকে ধারণ করিয়া চরিতার্থ হইলেন। তিলমাত্র বৃকভানুনন্দিনীর অসাক্ষাৎ নারায়ণের অসহনীয় হইয়া উঠিল কদাচিৎ শ্রীরাধিকা স্বকীয় কুঞ্জ হইতে ক্রোধভরে জগন্নাথকে বিতাড়িত করিয়া দিলে, সেই বিশ্বরূপ বিবিধ ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া প্রাণ প্রেয়াকে দর্শন না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তাঁহাদিগের প্রেমে যমুনা উজান বহিয়াছে, পশু-পক্ষী ভোজনাদি ভুলিয়া নীরবে সেই প্রেমলীলা দর্শন করিয়াছে। বসন্ত চিরবিরাজিত হইয়া সেই প্রেমলীলার উত্তরসাধকতা করিয়াছে। ভ্রমর নিয়ত গুঞ্জন করিতে করিতে তাঁহাদিগকে বিনোদিত করিয়াছে। কোকিল সকল ঋতুতেই সেই পুণ্যক্ষেত্রে ঝঙ্কার করিয়াছে, শিখি-শিখিনী পুচ্ছ বিস্তার করিয়া সেই লীলা-স্থলের চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিয়াছে। বৃক্ষ-লতা অবনত-মস্তকে সেই স্থলের রজঃ শিরে ধারণ করিয়াছে। কোন কবি-কল্পনা, কোন প্রেমের অভিনয় এই ঐশ্বরিক লীলার নিকটস্থ হইতেও পারে না। তাহার পর সেই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ভগবানের নিকটে অক্রূর সমাগত হইয়া, কংসের নিমন্ত্রণবার্ত্তা নিবেদন করিলেন। অমনই ভূ-ভারহরণেচ্ছু লীলাময় ভগবানের মনে গুরুতর কর্ত্তব্যের কথা জাগরূক হইল। তখন কোথায় বা সেই প্রেমবন্ধন, কোথায় বা সেই আকর্ষণ, কোথায় বা সেই মধুর লীলা! সকলই উপেক্ষা করিয়া কংসারি মথুরাযাত্রা করিলেন। সুন্দরীগণের নয়ন-নীর, প্রেমিকার হাহাকার, সকলের নিষেধবাক্য কিছুই তাঁহাকে কর্ত্তব্যের পথ হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না। ক্ষুদ্র মনুষ্যের মানদণ্ডে এ প্রেমের পরিমাণ হইতে পারে কি? মনুষ্য সামান্য বেশ্যার সহিত ইন্দ্রিয়-বিকারজনিত আসক্তিতে অভিভূত হইলে সমাজের নিন্দা, প্রভূত বিত্তনাশ, বন্ধুবর্গের নিষেধবাক্য, পিতা-মাতার রোদন, ধর্ম্মপত্নীর আত্মহত্যা প্রভৃতি কোন কারণেই সে কুলটার সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে পারে না। আর এ স্থলে গোবিন্দ এ অলৌকিক প্রেমবন্ধন, গুরুতর কর্ত্তব্য-পালনের অনুরোধে হাসিতে হাসিতে ছিন্ন করিলেন। এরূপ অমানুষিক ব্যাপার কেবল সেই সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তমেরই সম্ভবে। এই ব্যাভিচারনিরত পুরুষ ও নারীগণের চরণে যেন আমাদের অবিচলিত মতি থাকে।”

নীলরতন বলিলেন,—“বৎস, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তুমিই শ্রীকৃষ্ণকে যথার্থ প্রণিধান করিয়াছ। আজ আমরা তোমার এই অমৃতোপম বাক্যশ্রবণে পরমানন্দভোগ করিলাম।”

উমাশঙ্কর সবিনয়ে বলিলেন,—“আমি আপনাদিগের নিকট সেই প্রেমময়ের প্রেমলীলার কোন কথাই ব্যক্ত করিতে পারি নাই। কথা অনন্ত। আমি ক্ষুদ্র কীটমাত্র। অদ্য রাত্রি প্রভাত হইল প্রায়; আমি এক্ষণে বিদায় হই। যদি ভাগ্যে থাকে, তাহা হইলে সময়ান্তরে কৃষ্ণ-কথা কহিয়া জীবন সার্থক করিব।”

আনন্দময়ী বলিলেন,—“রাত্রি অবসান হইল সত্য; সুতরাং তোমাকে আপাততঃ বিদায় দিতেই হইবে। কিন্তু তোমার এ মধুমাখা কথা আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া দিবা-রাত্রি বসিয়া শুনিলেও আকাঙ্ক্ষার শেষ হয় না।”

অন্নপূর্ণা অস্ফুটস্বরে কালীতারাকে বলিলেন,—“জিজ্ঞাসা কর মা, যোগেশ্বরীর সহিত সাক্ষাৎ অদৃষ্টে আর ঘটিবে না কি?”

কালীতারা বলিলেন,—“তুমি কি উমাশঙ্করের সহিত কথা কহ না? তুমিই জিজ্ঞাসা কর না কেন?”

তথাপি অন্নপূর্ণা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। অদ্যকার প্রাতের কথা স্মরণ করিয়া তিনি লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন। বড়ই ধরা পড়িলেন। কিন্তু আর সেখানে বসিয়া থাকা বিধেয় নহে বোধে তিনি প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন।

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আমি উঁহার কথা শুনিয়াছি। মাকে উঁহার প্রার্থনা জানাইয়াছি। তিনি করুণাময়ী, অবশ্যই উঁহার প্রার্থনা পূরণ করিবেন।"

তাহার পর উমাশঙ্কর সকলকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, কর্ত্তব্যসাধনের প্ররোচনায় তাঁহাকে প্রস্থান করিতে হইল বটে; কিন্তু তাঁহার জ্ঞানের সহিত অন্তঃকরণের একটুও বিরোধ উপস্থিত হইল না কি?

একাদশ খণ্ড—নরক

প্রথম পরিচ্ছেদ

রূপান্তর।

সৌধমালা-সমাকীর্ণা কাশীর পাঁড়ে ঘাটের নিকট গঙ্গার ধারে এক প্রকাণ্ড ভবনে বহুলোক-সমারোহ হইয়াছে। দ্বারে দৌবারিকগণ খাড়া আছে, দাসদাসীগণ ছুটাছুটি করিতেছে, সরকার বাজার হইতে ঝাঁকা-বোঝাই সামগ্রী লইয়া বাটীতে প্রবেশ করিতেছে, মহাজনেরা বেনারসী চেলী, শাড়ী ও গহনা প্রভৃতি লইয়া দ্বারে অপেক্ষা করিতেছে। চারিদিকে সমৃদ্ধির চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইতেছে। সকলেই বলিতেছে, বাঙ্গালা মুলুকের এক রাণী আসিয়াছেন।

রাণী হউন বা রাজ-কন্যাই হউন, দ্বারে সঙ্গীন-চড়ান বন্দুকওয়ালা খাড়া থাকুক বা ঢালতলওয়ারই ঘুরিতে থাকুক, পুরমধ্যে কাহারও প্রবেশের অধিকার থাকুক বা না-ই থাকুক, মা সরস্বতীর বরে কালিকলমের ব্যবসাদার দরিদ্র গ্রন্থকার যেখানে যেখানে মাছিটাও ঢুকিতে পায় না, সেখানেও স্বচ্ছন্দে ও নির্ভাবনায় প্রবেশ করিতে পারেন। পুণ্যবানের পবিত্র নিকেতন, পাপের পঙ্কিল পূতিগন্ধময় নরক, বিলাসীর রম্য কানন, দীনের হাহাকার-রব-পরিপূর্ণ পর্ণকুটীর সর্ব্বত্র উপন্যাস-লেখকের অব্যাহত গতি। কল্পনার সর্ব্ব-সাধন-ক্ষম-পক্ষপুট তাঁহাকে লোক-লোচনের অন্তরালে রাখিয়া দেয় এবং প্রতিকূল আক্রমণের হস্ত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করে। মা সরস্বতীর সেই বরপ্রভাবে আমরা এই নবাগতা রাণীর মন্দিরে একবার প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

ভবনের চারিদিকেই নবাগমনের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। নীচে একটা ঘরে দুই জন ঝি শিলাখণ্ডে মসলা পিষিতেছে, এক জন তরকারি কুটিতেছে, এক জন মাছ কুটিতেছে, দুই জন চাকর জল তুলিয়া আনিতেছে এবং দুই জন ব্রাহ্মণ পাক করিতেছে। সুতরাং নীচে কলরব যথেষ্ট। দ্বিতলে কোন বিশেষ গোলযোগ নাই, কিন্তু বড় বিশৃঙ্খল। বারান্দায় কতকগুলা সতরঞ্চ ও কম্বলের মোট, একটা ঘরে কতকগুলা বিলাতী ট্রাঙ্ক ও কয়েকটা দেবদারুকাঠের বাক্স, আর একটা ঘরে কতকগুলা বিছানা, অন্যত্র কতকগুলি পুঁটুলি ও বস্তা ইত্যাদিরূপ নানা স্থানে নানা সামগ্রী নিতান্ত বিশৃঙ্খলভাবে নিপতিত। ত্রিতলে এত বিশৃঙ্খলতা নাই। তথায় গঙ্গার দিকে একটি প্রকোষ্ঠে একটি পরিষ্কার বিছানা পাতা রহিয়াছে এবং যাহাকে লোকে রাণী বলিয়া ব্যস্ত হইতেছে, তিনি স্বয়ং তথায় বসিয়া নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে জানালার ফাঁক দিয়া গঙ্গার দিকে চাহিয়া আছেন।

রাণী আর কেহ নহেন—শ্যামলালের বিবাহিতা বনিতা, হরিচরণের প্রণয়িনী, পাপীয়সী বিধুমুখী। সম্পত্তি ধরিয়া বিচার করিলে বিধুমুখীকে আজিকালিকার অনেক রাজ-রাণীর অপেক্ষা বড় বলিতে হইবে সন্দেহ নাই।

প্রাণের বন্ধু হরিচরণের সমভিব্যাহারে সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম সঙ্গে লইয়া বিধুমুখী পশ্চিমে হাওয়া খাইতে আসিয়াছিলেন। ও দিকে লাহোর পর্য্যন্ত যাওয়া হইয়াছিল; সুতরাং অনেক হাওয়াই খাওয়া হইয়াছে। এক্ষণে পুণ্যবতী কামিনী পুণ্যতীর্থ কাশীধামে আসিয়া অধিষ্ঠান করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে কাশীর উদারতা অপরিসীম। পাপের আশ্রয় দিতে এবং পাপ-পঙ্ক গায়ে মাখিতে বারাণসীর কোনই সঙ্কোচ বা অপ্রবৃত্তি নাই। এই জন্যই এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পাপের পৈশাচ নর্ত্তন পরিদৃষ্ট হয় এবং অপবিত্রতার উৎকট উল্লম্ফন দেখিতে পাওয়া যায়। সতী-শিরোমণি ভবানীর প্রিয়নিকেতন, যোগীশ্বর মহেশ্বরের এই সনাতনী পুরীতে এ কি রাক্ষসী ও আসুরী লীলার অবিধেয় অভিনয়! হায় কাল! তোমারই মাহাত্ম্য প্রবল!

বিধুমুখী আসিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার সে সৌন্দর্য্য, সে শোভা, সে উজ্জ্বলতা এবং সে প্রফুল্লতা তিনি

হারাইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার স্বর্ণ-বর্ণ যেন কেমন সাদা মত হইয়াছে, তাহার উজ্জ্বল লোচন যেন কোটরগত ও প্রভাশূন্য হইয়াছে, তাঁহার সজীবতা ও প্রফুল্লতা অপগত হইয়াছে, তাঁহার সে বিলাস-প্রিয়তা ও বেশভূষার পারিপাট্য আর নাই। তাঁহার কক্ষ অবেণী-সংবদ্ধ কেশরাশি বিছানার উপর লুটাইতেছে, একখানি সামান্য বস্ত্র সামান্যভাবে তাঁহার দেহ আবরণ করিয়া রহিয়াছে এবং অঙ্গে ভূষণ নাই বলিলেই হয়। কেহ বলিয়া না দিলে, এখন আর বিধুমুখীকে চেনা যায় না। তাঁহার এরূপ পরিবর্ত্তন কেন হইল? পথের বিবিধ অনিয়ম, অসুবিধা ও কষ্ট হেতুই কি তাঁহার এই সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে? না। নিদারুণ মানসিক কষ্টই সুন্দরীর এই সকল পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে।

যাহার সুখের পথ নিষ্কণ্টক ও অব্যাহত, যাহার জীবনের গতি স্বাধীন ও অবাধ, যাহার বাসনা সফলিত হওয়ার সঙ্কোচকরণ আয়ত্তাধীন, যাহার তৃপ্তি ও সন্তোষ সংসাধন করিতে কর্ম্মবিচারের প্রয়োজন হয় না, যাহার অনুষ্ঠানসমূহ সদসৎ পাপপুণ্য বিচারের অধীন নহে, তাঁহার মানসিক পীড়ায় প্রপীড়িত হইবার কোনই কারণ দেখা যায় না। অতুল সম্পদের যিনি সর্ব্বেশ্বরী, প্রাণের বন্ধু হরিচরণ যাহার নিত্যসঙ্গী, তাঁহার কেন এ কষ্ট? কথা সকলই সত্য, তথাপি কষ্ট। জানি না, বিধাতা কি দুর্জ্জ্ঞেয় সূত্রে সুখ-দুঃখ বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। যাহাতে সুখ হইবার কথা, তাহাতেও দুঃখ হয়, যাহাতে দুঃখ হইবার কথা, তাহাতেও সুখ হয়। যাহাতে একের দুঃখ, তাহাতেই অপরের সুখ; যাহাতে একের সুখ, তাহাতেই অপরের দুঃখ। এই জন্যই জ্ঞানীরা সুখ-দুঃখের অতীত এবং এই জন্যই সুখ-দুঃখরাহিত্যভাবই স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

বিধুমুখী মায়াবিনী। যে হরিচরণ তাঁহার সকল সুখের কেন্দ্র, সেই হরিচরণ অধুনা তাঁহার বিজাতীয় ক্লেশের কারণ। তিনি প্রাণ ভরিয়া হরিচরণকে ভালবাসেন। হরিচরণের জন্য তিনি ধর্ম্মধনে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, সমাজের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছেন; হরিচরণের সুখ-সম্ভোগের নিমিত্ত অতুল সম্পত্তিরাশি তাঁহার চরণে ঢালিয়া দিয়াছেন, মনে বা কার্য্যে অবিশ্বাসিনী হওয়া দূরে থাকুক, পাছে সেরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হয় বলিয়া স্বামীকে পর্য্যন্ত পদাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; সেই হরিচরণ—তাঁহার জীবনের জীবন সেই হরিচরণ তাঁহাকে ভালবাসেন না, ইহাই সুন্দরীর হৃদ্গত হইয়াছে, তিনি ইহার অনেক প্রমাণ দেখিয়াছেন এবং বিভিন্ন প্রকারে ইহার পরীক্ষা করিয়াছেন। দুঃখের কথা বটে।

প্রথমতঃ সুহাসিনী-নাম্নী এক সুন্দরী স্ত্রীলোককে হস্তগত করিবার নিমিত্ত হরিচরণ অনেক যত্ন, চেষ্টা, ব্যয় ও নরহত্যা পর্য্যন্ত করিয়াছেন। ঐ সুহাসিনী প্রথমে শ্যামলালের মন আকর্ষণ করে; কিন্তু সে স্থানান্তরে লুকাইয়া থাকে। হরিচরণ তাহার নিমিত্ত উন্মাদপ্রায় হইয়া তাহার সন্ধান করেন এবং বিশেষ কৌশল সহকারে তাহাকে হস্তগত করিবার আয়োজন করিয়াও শেষে অকৃতকার্য্য হন। দ্বিতীয়তঃ, হরিচরণ পশ্চিমপ্রদেশে বেড়াইতে আসিবার সময় আপনার ভগ্নী-সম্পর্কিতা পরিচয় দিয়া একটা উপপত্নী সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন। শেষে বিধুমুখী সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারেন, তিনি তাহাকে স্বতন্ত্র একটা বাসায় রাখিয়াছেন। তৃতীয়তঃ, হরিচরণ সুযোগ পাইলে একটা চাকরাণীর সহিত আমোদ-প্রমোদ করিতেন। সে দাসী আর কেহ নহে, সারদা। বিধুমুখী একদিন স্বচক্ষে হরিচরণ ও সারদাকে পরস্পরের মুখচুম্বন করিতে দেখিয়াছেন। বলা বাহুল্য, সারদা তাড়িত হইয়াছে। সম্ভবতঃ হরিচরণ তাহাকে তখন স্থানান্তরে রাখিয়াছেন। চতুর্থতঃ হরিচরণ কাশীতে আসিয়া দিলজান-নাম্নী একটা যবনী বেশ্যার প্রেমে নিতান্ত উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছেন এবং দিবারাত্রি তথায় সুরাপান করিয়া কাটাইতেছেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

হরিচরণ এখন প্রভূত অর্থের অধীশ্বর। বিধুমুখীর কৃপায় তিনি অনেক অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। যাহা তিনি সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস যে, জীবনে তাঁহাকে আর অর্থাভাবে কষ্ট পাইতে হইবে না। সুতরাং তাঁহার ন্যায় রসিক ভ্রমর এক বিধুমুখী-কমলে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার কোনই প্রয়োজন দেখেন না। হরিচরণ এখন আর বিধুমুখীর কৃপার ভিখারী নহেন। বাটীতে অবস্থানকালেই হরিচরণের হৃদয়হীনতার অনেক সংবাদ বিধুমুখী জানিতে পারেন, কিন্তু তখন নানা কারণে হরিচরণ অনেক সাবধান ছিলেন। দেশপর্য্যটনে বাহির হইয়া হরিচরণ একবারে সকল আবরণ ফেলিয়া দিয়াছেন এবং বিধুমুখীকে সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষা করিয়াই নিঃসঙ্কোচে স্বকীয় রসরঙ্গ চালাইতে আরম্ভ করিয়াছেন।

বিধুমুখী প্রথমে রাগ, তাহার পর তিরস্কার, তাহার পর অভিমান, তাহার পর রোদন, তাহার পর বিনয়, শেষে হরিচরণের পদ-ধারণ পর্য্যন্ত করিয়া

দেখিয়াছেন। হরিচরণ কিন্তু এই সকল ব্যবহারের পরিবর্ত্তে কখন বিধুমুখীকে একটা আদরের কথাও বলে নাই; বিদ্রূপ ও অবজ্ঞা ছাড়া আর কিছুই জানায় নাই এবং কদাপি একটু লজ্জার ভাবও দেখায় নাই। বিধুমুখী বুঝিয়াছেন, হরিচরণ তাঁহার নহেন, তাঁহার হইয়াও থাকিবেন না। তাহার পর সুন্দরী ক্রমে শয্যাগ্রহণ করিয়াছেন।

হরিচরণ আর বড় আইসে না; আসিলেও বিধুমুখীর সঙ্গে বড় দেখা করে না, দেখা হইলেও কথা কহে না; কথা কহিলেও বিধুমুখী বড় জবাব দেন না; জবাব দিলেও বিধুমুখী তাহাকে এককালে যাওয়া আসা ত্যাগ করার কথা ছাড়া আর কিছু বলেন না। হরিচরণ এখন বিধুমুখীর চক্ষুঃশূল তাহার আকার-প্রকার, কথাবার্ত্তা সকলই এখন সুন্দরীর পক্ষে অপরিসীম জ্বালাকর। ভালবাসার কি ভয়ানক অত্যাচার!

বিধুমুখীর একটু একটু জ্বর হয়, নিদ্রা হয় না, আহারে নিতান্ত অপ্রবৃত্তি, খাওয়া নাই বলিলেই হয়। বড় দুর্ব্বল, শরীরে একটুও রক্ত নাই।

সংসারে আপনার লোক কেহই নাই; সুতরাং যত্ন করে কে? যাহাকে জগতে একমাত্র আপনার জ্ঞান করিয়া তিনি সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছিলেন, সে এখন তাঁহার পর। বরং পরও ভাল; কারণ, পরকে দেখিলে কষ্ট হয় না, কিন্তু তাহাকে দেখিলে রাগ হয়। সে এখন শত্রু।

দাসীরা পরামর্শ করিয়া কর্ম্মচারীদের বলিয়া-কহিয়া ডাক্তার-কবিরাজ আনাইয়াছিল। তাঁহাদের এক দল টনিক, আর এক দল বলকারক ঔষধ দিয়াছেন। কিন্তু দাসীরা অনেক চেষ্টা করিয়াও বিধুমুখীকে ঔষধ খাওয়াইতে পারে নাই। তাহারা পর, সুতরাং এ জন্য আর বেশী কিছু করিবার আবশ্যক অনুভব করে নাই।

অনেক দাস-দাসীর মধ্যে কালিদাসী নামে একটি চাকরাণী ছিল। সে একটু প্রবীণা, একটু ধর্ম্মভীতা ও একটু সাদাসিদা লোক ছিল। বিধুমুখীর এই অবস্থা দেখিয়া সে লোকটার যেন একটু আন্তরিক কষ্ট হইত বলিয়া বোধ হয়। সে অন্য দাস-দাসীর মত একটা মুখের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া চুপ করিত না; দুইবার মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হইত না; অকারণ অনর্থক দুঃখ প্রকাশ করিয়া নীরব হইত না; কষ্টে মুখের হাসি লুকাইয়া গম্ভীর-স্বরে একটা শিষ্টাচার প্রকাশ করিতে পারিত না। এইরূপ স্বভাব বলিয়াই হউক অথবা বাস্তবিকই বিধুমুখীকে ভালবাসে বলিয়াই হউক, সে কিন্তু সতত নানাপ্রকারে পীড়িতার শুশ্রূষা করিবার চেষ্টা করিত।

অনেকক্ষণ জানালার ফাঁক দিয়া গঙ্গা দেখিতে দেখিতে বিধুমুখী ক্লান্ত হইয়া তত্রত্য শয্যায় শুইয়া পড়িলেন। এই সময় কালিদাসী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, একটু দুধ খাবে কি? উঠ"

বিধুমুখী সেই অবস্থাতেই বলিলেন,—"না মা, কিছু খাইতে ইচ্ছা নাই; উঠিতে আর পারি না।"

কালিদাসী বলিল,—"তা বলিলে হবে কেন মা? চেষ্টা ক'রে একটু খেতে হয়। উঠ তুমি, আমি দুধের বাটি মুখে ধরি। প্রাণটা ত রাখ্‌তে হবে।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"কেন?"

কালিদাসী বলিল,—"ও মা! সে কি কথা! কেন আবার কি গা? তোমার এই বয়স, এত রূপ, এত ধন-দৌলত, সকলই আছে, তবে আর কেন কি গা?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"সবই সত্য; কিন্তু বল দেখি কালীদাসী, কি হইলে মেয়েমানুষের সকল সুখ পূর্ণ হয়?"

কালিদাসী বলিল, "তোমার যা যা আছে, তাই সব সুখের সার। এর উপর একটি ছেলে হইলেই ভাল হয়। তা কপালে থাকে তো অবশ্য হবে।"

বিধুমুখী বলিলেন, "আর কিছুই চাহি না?"

কালিদাসী বলিল, "মানুষের অদৃষ্টে যত সুখ হওয়া সম্ভব, সকলই তুমি পেয়েছ, আর চাহিবার কিছুই নাই।"

বিধুমুখী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "স্বামী না থাকিলে নারীর থাকে কি?"

কালিদাসী অনেক দিন বিধবা হইয়াছে। তথাপি গলার আওয়াজ একটু ভারি করিয়া বলিল, —"তা সত্য; কিন্তু তোমার সে দুঃখও নাই। তুমি জিজ্ঞাসা না ক'রে, কোন কথা না ব'লে চ'লে এসেছ, তবু তোমার স্বামী তোমার ভাবনায় বাড়ী ছেড়ে এখানেও এসেছেন।"

তখন সেই ব্যাধি-ক্লিষ্টা শক্তিহীনা নারী ব্যস্ততা-সহ উঠিয়া বসিলেন এবং সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, —"আসিয়াছেন? কোথায় তিনি?"

কালিদাসী বলিল, "আসিয়াছিলেন, কিন্তু দরওয়ানেরা আসিতে না দেওয়ায় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।"

বিধুমুখী দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনরায় শুইয়া

পড়িলেন। বলিলেন, "এত দূর আসিয়াছেন—আমার সহিত দেখা করিবার জন্য এত দূরে আসিয়াছেন! হয় ত বড় কষ্টে পড়িয়াছেন। আর তো দেখা হইবে না। একবার দেখা,—না, একবারও আর দেখায় কাজ নাই।"

কালিদাসী বলিল,—"যখন তিনি এখানে আসিয়াছেন, তখন অবশ্যই আবার আসিবেন। তোমার সহিত নিশ্চয়ই দেখা করিবেন।"

বিধুমুখী কোন উত্তর দিলেন না। তিনি সেই শয্যায় পড়িয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—'যে ভ্রম হইয়াছে, আর তাহা সংশোধন করিবার উপায় নাই। যে পতন হইয়াছে, আর তাহা হইতে উদ্ধারের আশা নাই। ভগবান্ আমাকে দয়া করিতে ত্রুটি করেন নাই। প্রভূত রাজ-ঐশ্বর্য্য আমার পদতলে ছিল; অপরিসীম রূপরাশি আমার দেহ ঢাকিয়াছিল; শরীর সতত নীরোগ ও সুস্থ ছিল; তথাপি ঘোর মনস্তাপে নিতান্ত ক্লেশে আজি আমি মরিতে বসিয়াছি। কেন এমন হইল? পাপে মত্ত হইয়াই আমি সকল সুখ নষ্ট করিলাম। বুদ্ধির দোষে আমি সকল হারাইলাম। ইন্দ্রিয়-ভোগলালসায় আমি সকলই বিসর্জ্জন দিলাম। যাহা সুখ ভাবিয়া মত্ত হইয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি, তাহা কেবলই অসুখ—সে সকল অসার! পাপ—পাপ! আমার শরীর-মন পাপে অপবিত্র হইয়াছে। হেলায় আমি সুখের পথ নষ্ট করিয়াছি। সুখের সকল উপায় আমি পায়ে ঠেলিয়াছি। স্বামীর প্রেমই রমণীর সার ধন। আমি সে ধনলাভে যত্ন করি নাই। সত্য বটে, স্বামী আমাকে কখন আদর করেন নাই; না-ই করিলেন। তাঁহার প্রতি আমার অবিচলিত মতি থাকিলেই আমার সকল সুখ হইত। তিনি অনেক নারীর সহিত কাল কাটাইতেন। তাহাতে আমার ক্ষতি কি ছিল? যদি ইন্দ্রিয়-লালসা ত্যাগ করিয়া তাঁহাকেই সর্ব্বস্ব বলিয়া জ্ঞান করিতে পারিতাম, তাহা হইলে অবশ্য কোন না কোন দিন তাঁহাকে আমি পাইতাম। না পাইলেও চিত্তের সুখ নষ্ট হইত না; ধর্ম্ম নষ্ট হইত না; পাপের তাড়নায় কষ্ট পাইতে হইত না; অবজ্ঞায় অন্তর্দ্দাহ ভোগ করিতে হইত না; এমন সর্ব্বনাশ কখনই ঘটিত না। সে দিন—সে দিনও যখন তিনি আমার রূপে মোহিত হইয়া আমার চরণ ধরিয়াছিলেন, তখনই মনে করিলে আমি তাঁহাকে প্রেম-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া ফেলিতে পারিতাম। এখন সব গিয়াছে। অন্ধকার! চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার! আর উপায় নাই। মৃত্যু উপস্থিত। মৃত্যুই এখন প্রার্থনীয়। তাঁহার সহিত আর দেখা করিব না; আর এ পাপ-মুখ তাঁহাকে দেখাইব না। তিনি আসিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। তাঁহার বিষয়-আশয় তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে হইবে।' আবার ভাবিলেন, 'নিষ্প্রয়োজন। আমার মৃত্যুর পর তাঁহারই হইবে; যেরূপেই হউক, বিষয় তাঁহারই হাতে যাইবে। দেখা—তাঁহার সহিত আর কখন দেখা করিব না। যে অন্যায় করিয়াছি, তাহার পর তিনি ক্ষমা করিলেও আমি সে ক্ষমায় সন্তোষ লাভ করিব না। ক্ষমা চাই না। আমি ক্ষমার অতীত পাপ করিয়াছি। আপন তেজে আপনি মরিয়াছি। সেই তেজেই পরকালে পাপের মত সাজা ভোগ করিব। ক্ষমায় কাজ নাই।'

এই সময়ে সিঁড়িতে ধপাস্ ধপাস্ করিয়া জুতা-সংযুক্ত পদাঘাত-শব্দ হইতে লাগিল। অবিলম্বে মাথায় চাদর জড়ান, দেহ পাঞ্জাবী জামায় ঢাকা, রক্ত-চক্ষু, অস্থিরগতি হরিচরণের মূর্ত্তি বারান্দায় দেখা গেল। হরিচরণ টলিতে টলিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "কি, শুয়ে যে? কালি অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত হুইস্কি চলেছে বুঝি? তা বেশ তো, এখন উঠে খোঁয়ারি কাটাও বাবা। কিন্তু এখানে সুবিধা হইবে না। এস আমার সঙ্গে, চল দিলজানের বাড়ী যাওয়া যাউক। সেখানে যোগাড় সব ঠিক আছে। আমি সেখান থেকেই আস্‌ছি। তুমি যদি তার বাড়ীর নিকট বাসা করিতে, তাহা হইলে আমার যাওয়া আসার বেশ সুবিধা হইত।"

বিধুমুখী কোন উত্তর দিলেন না। হরিচরণ বলিল,—"কি, কথা কহিতেছ না যে? যাবে না? তা যাবে কেন? তার সঙ্গে আলাপ হ'লে, কেতা-কায়দা শিখে, তুমি একটা নামজাদা মেয়েমানুষ হ'তে পারতে। তোমার কপালে তা হবে কেন?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"কালিদাসী, দুই জন দ্বারবানকে ডাকিয়া আন তো। একটু দরকার আছে।"

কালিদাসী প্রস্থান করিল। হরিচরণ আবার বলিল,—"কি বিবি, আজিকালি দরওয়ানের সঙ্গে ইয়ারকি চলেছে না কি? তা কাজেই।"

বিধুমুখী এখনও নীরব। কালিদাসীর সঙ্গে দুই জন দ্বারবান্ আসিয়া স্ফীত-বক্ষে বারান্দায় দণ্ডায়মান হইল। তখন বিধুমুখী সহসা প্রভূত শক্তি সহকারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—"তোমরা এখনই এই হতভাগাকে নাগরা জুতা মারিতে মারিতে আমার বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেও, একটা

কথা কহিবার সময়ও দিও না। আর এই বেইমান যেন কখন আমার বাটীর নিকটেও আসিতে না পায়। আসিলে তোমাদের সাজা হইবে।"

তৎক্ষণাৎ দুই ভোজপুরী আসিয়া হরিচরণের দুই বাহু ধারণ করিয়া বলিল,—"চল্ রে কুত্তা।"

তখন হরিচরণ অবাক্। সে ইদানীং বিধুমুখীকে যার-পর-নাই অবজ্ঞা করিয়া আসিতেছে; কিন্তু বিধুমুখী তাহার নিকট অনুনয়-বিনয়ই প্রকাশ করিতেছেন। সুতরাং হরিচরণ সাবধান হইয়া কথা কহার আবশ্যকতা কখনই অনুভব করে নাই। তাহার অসাবধানতার ফলে যে এইরূপ দাঁড়াইবে, ইহা সে একবারও মনে করে নাই। এক্ষণে সে আপনার বিপদের পরিমাণ বুঝিতে পারিল। বলিল,—"তুমি কি পাগল হইয়াছ বিধু! ইহার পর আমার সহিত আর সম্পর্ক থাকিবে না জানিবে।"

বিধুমুখী ক্রোধসহকৃত স্বরে বলিলেন,—"তোর সহিত সম্পর্ক? তুই আমার চাকর ছিলি, আমি তোকে দূর করিয়া দিতেছি। তোমরা কি দেখিতেছ? ঐ ছুঁচার মুখে লাথি মারিতে মারিতে সিঁড়ি হইতে ফেলিয়া দাও।"

একটা কথা হরিচরণের মনে হইল। সে বুঝিল, এরূপ গুরুতর কাণ্ড যখন ঘটিতেছে, তখন এখানকার সম্পর্ক নিশ্চয়ই শেষ হইতেছে। এখন যদি নিকাশ-প্রকাশের জন্য টানাটানি করে, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ। বলিল,—"তা আচ্ছা, আমি যাইতেছি; কিন্তু কাগজপত্র সব সদর কাছারীতে।"

আবার বিধুমুখী বলিলেন,—"দূর হ ছুঁচো। তোর হিসাব-নিকাশ লইতে চাহি না। আমি জানি, তুই আমার সর্ব্বস্ব চুরি করিয়াছিস্। এ সম্পত্তি অতঃপর যাঁহার হাতে পড়িবে, তিনি তাহার যেরূপ ইচ্ছা ব্যবস্থা করিবেন। আমাকে যেন জীবনে আর তোর মুখ দেখিতে বা তোর নাম শুনিতে না হয়। শূয়ারকে এখনই দূর কর। আর কথা কহিতে না পায়।"

দ্বারবান্দ্বয় হরিচরণকে জোরে আকর্ষণ করিয়া বাহিরে আনিল। হরিচরণ সেখান হইতে বলিল,—"বিল্—"

ভোজপুরীরা বাধা দিয়া বলিল,—"চুপ রহ বেইমান! ফের বাত কহনেসে তেরা হড্ডি তোড় ডালেঙ্গে হারামজাদ!"

হরিচরণকে সঙ্গে লইয়া দ্বারবানেরা প্রস্থান করিল।

নিরতিশয় উত্তেজনা ও পরিশ্রমে বিধুমুখী নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি কাতরভাবে শয্যায় পড়িয়া গেলেন। উভয় হস্তে কপাল চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন,—"জানি না, নরক কিরূপ! কিন্তু আমার এ দুরবস্থার অপেক্ষা নরক কখনই ভয়ানক হইতে পারে না। অদৃষ্ট, অদৃষ্ট, অদৃষ্ট।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দীক্ষা।

বিধুমুখীর অবস্থা আরও মন্দ। গত কল্য হরিচরণকে তাড়াইয়া দিয়া মূর্চ্ছিতপ্রায় হওয়ার পর হইতে বিধুমুখী আর শয্যা হইতে উঠিতে পারেন নাই। দুর্ব্বলতা বড়ই বাড়িয়া গিয়াছে।

বেলা ৮টা হইবে। বিধুমুখী সেই শয্যায় পড়িয়া আছেন। কালিদাসী নিকটে বসিয়া তাঁহার বিশৃঙ্খল কেশগুলি গুছাইতেছে ও একবার উঠিয়া বসিবার নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছে।

বিধুমুখী ভাবিতেছেন,—'কালি এমন সময় আসিয়াছিলেন, আজিও হয় ত আসিতে পারেন। আসেন আসুন। আমি কিন্তু তাঁহার সহিত দেখা করিব না। তাঁহার বিষয়, তাঁহারই বাসা, তাঁহারই দ্রব্য-সামগ্রী, তাঁহারই টাকা-কড়ি। তিনি আসিবেন না কেন? আজি তিনি আসিলে তাঁহাকে কর্ম্মচারিগণ সমাদর করিবে, যত্ন করিয়া তাঁহার সকল কথা শুনিবে ও তাঁহাকে সকল কথা বলিবে। তাঁহার সম্পত্তি তিনি গ্রহণ করিবেন। কিন্তু আমি তাঁহার সহিত আর দেখা করিব না। কেন দেখা করিব? আমি তাঁহার পত্নী নহি, তাঁহার দাসী নহি, তাঁহার প্রণয়িনী নহি। আমি কেন তাঁহার সহিত দেখা করিব? এখন তাঁহার সহিত মিষ্ট আলাপ করিতে যাওয়া কেবল বিদ্রূপ করা হইবে। যতদূর সম্ভব অত্যাচার করিয়া শিষ্টাচার করা বাতুলতা। হত্যা করিয়া ক্ষত-স্থানে তৈল দেওয়া বড়ই মূর্খতা; পাপেই ভাসিয়াছি, পাপেই মজিয়াছি, পাপের বোঝা কাঁধে লইয়াই মরিব। এ পাপ ধৌত হইবার নহে। এ পাপ পূর্ণ-ভাবে আমার সঙ্গে চলুক। এখন ইহার আর এক বিন্দুও ত্যাগ করিব না।'

এই সময়ে ভবনের নিম্নদেশ হইতে কোকিল-বিনিন্দিত-কণ্ঠে সঙ্গীত-ধ্বনি সমুত্থিত হইয়া বিধুমুখীর কর্ণে প্রবেশ করিল। তাঁহার হৃদয়ে সেই সঙ্গীতধ্বনি যেন অমৃত ঢালিয়া দিল। সেই ব্যাধিক্লিষ্ট, চিন্তা-প্রপীড়িত-বদনে আনন্দের চিহ্ন প্রকটিত হইল। ভাল করিয়া গান শুনিতে পাইবেন বলিয়া তিনি উঠিয়া

বসিলেন ; তাহার পর মাটীতে বসিয়া বসিয়া ধীরে ধীরে বাহিরের বারান্দায় আসিলেন।

পাশের ঘরে এক জন ঝি বসিয়াছিল। বিধুমুখীকে বারান্দায় আসিতে দেখিয়া সে ব্যস্ততা সহকারে তাঁহার নিকটস্থ হইল। বিধুমুখী তাহাকে আদেশ করিলেন,—"কে গান করিতেছে? তাহাকে ডাকিয়া আন।"

দাসী চলিয়া গেল এবং অবিলম্বে প্রত্যাগতা হইয়া নিবেদন করিল,—"সাক্ষাৎ কার্ত্তিকের ন্যায় শ্রীমান্ এক নবীন সন্ন্যাসী গান করিতেছেন। অন্তঃপুরে আসিতে তাঁহার নিষেধ; তিনি এখানে আসিবেন না।"

বিধুমুখী দুঃখিত স্বরে বলিলেন,—"তিনি গান করেন কেন? ভিক্ষার জন্য গান করেন কি?"

দাসী বলিল,—"হাঁ।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"বল গিয়া, তাঁহাকে আশার অধিক ভিক্ষা দিব। তিনি কৃপা করিয়া আমাকে দর্শন দেন।"

দাসী বলিল,—"আমি সে কথা বলিয়াছি। তাঁহার আশা অতি সামান্য। আধ সের চাউলের বেশী তাঁহাকে দিলেও তিনি গ্রহণ করিবেন না।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"তিনি মহাপুরুষ। তাঁহাকে কৃপা করিয়া একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া আইস। তাহার পর তোমরা দুই জনে আমাকে ধরিয়া ধীরে ধীরে নীচে লইয়া যাও। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিব।"

দাসী বলিল,—"এ কথাটা তাঁহাকে বলা হয় নাই। আপনি নিতান্ত দুর্ব্বল, অথচ তাঁহাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, ইহা জানাইলে হয় ত তিনি দয়া করিলেও করিতে পারেন।"

দাসী আবার প্রস্থান করিল এবং কিছু কাল পরে দেবোজ্জ্বল-কান্তি-সম্পন্ন এক নবীন সন্ন্যাসীকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। সেই সন্ন্যাসী উমাশঙ্কর। তাঁহাকে দর্শন করিয়া বিধুমুখীর মনে হইল যে, এই সন্ন্যাসী কখনই প্রকৃত মনুষ্য নহেন। তথায় কালিদাসী এবং আরও এক জন ঝি উপস্থিত হইয়াছিল। বিধুমুখী তাহাদিগকে সন্ন্যাসীর নিমিত্ত আসন পাতিয়া দিতে আদেশ করিলেন।

তখন উমাশঙ্কর বলিলেন,—"গৃহীর আশ্রমে আসন গ্রহণ করিতে বা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে আমার অনুমতি নাই। আপনার অনুরোধে মা, বিশেষ আপনার পীড়ার কথা শুনিয়া আমি একটি নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছি। ভরসা আছে, গুরুদেব এ জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। কিন্তু মা! আমাকে আর একটি নিয়ম ভঙ্গ করাইয়া অপরাধী করিবেন না।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"আপনি দাঁড়াইয়া থাকিবেন; কিন্তু আমার দাঁড়ান দূরে থাকুক, এরূপ ভাবে বসিয়া থাকিবারও সামর্থ্য নাই।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আপনার বসিয়া কাজ নাই। আপনাকে বড়ই দুর্ব্বল ও কাতর দেখিতেছি। আপনি শয্যায় শয়ন করুন। আমি স্বচ্ছন্দে আপনার সহিত দাঁড়াইয়া কথা-বার্ত্তা কহিতেছি। সমস্ত দিন দাঁড়াইয়া থাকিলেও ভিক্ষুক সন্ন্যাসীদিগের কোনই কষ্ট হয় না।"

উমাশঙ্কর তাঁহাকে শয়ন করিতে বারংবার অনুরোধ করিলে বিধুমুখী অগত্যা শয্যায় গিয়া পতিতা হইলেন। পীড়িতা তাঁহাকে দেখিতে পান, এরূপ স্থানে উমাশঙ্কর দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি বুঝিলেন, নিতান্ত কঠিন পীড়ায় অধুনা বিগতশ্রী হইলেও এই নারী অসামান্যা সুন্দরী। জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনার কি পীড়া মা!"

বিধুমুখী বলিলেন,—"আমার কঠিন পীড়া হইয়াছিল, এখন সারিয়াছে। আপনি দেবতা, আপনি না জানিতেছেন কি? পাপের আক্রমণে আমার এই দশা হইয়াছে। স্ত্রীলোকের যে পাপ ঘটিলে সর্ব্বনাশ হয়, এই পাপীয়সীর তাহাই ঘটিয়াছে। সেই পাপের প্রাবল্যে আমি সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি। তন্মধ্যে নারীজীবনের সার দেবতা স্বামীর সহিত কল্পনাতীত অসদ্ব্যবহার অন্যতম। আমার পাপের পরিমাণ আমি পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই এবং পাপানুষ্ঠানকে অপ্রিয় বলিয়া কখনও জ্ঞান করি নাই। কিছুদিন হইতে সহসা উভয় বোধই আমার জন্মিয়াছে। কোন প্রায়শ্চিত্তেই আমার এ পাপরাশি ধৌত হইবে না, তাহা আমি বুঝিয়াছি। আমার কালও পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। আপনি দেবতা। এ অবস্থায় আমার কি কর্ত্তব্য, যদি কৃপা করিয়া বলিয়া দেন, তাহা হইলে এখনও তাহা করিবার চেষ্টা করি।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আপনার কথা শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। কিন্তু মা! প্রায়শ্চিত্তের জন্য আপনি ব্যাকুল হইবেন না। আপনার হৃদয় যখন অনুতাপে দগ্ধ হইতেছে, তখন ভগবানের ব্যবস্থাকৃত চরম প্রায়শ্চিত্তেরই অনুষ্ঠান হইতেছে জানিবেন। আপাততঃ আপনাকে অন্য সকল চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দরকে চিন্তা করিতেই

পরামর্শ প্রদান করিতেছি। তাহাতে আপনার দৈহিক রোগের যাতনা বিদূরিত এবং অন্তঃকরণও শান্তিলাভ করিয়া প্রসন্ন হইবে। তাঁহার কৃপা হইলে সর্ব্বপ্রকার পাপের মলিনতা তৎক্ষণাৎ বিধৌত হইতে পারে; অতএব আপনি কায়-মানাবাক্যে কেবল তাঁহারই চিন্তা করিতে থাকুন।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"যে আজ্ঞা। আমি কখনও দীক্ষিত হই নাই, আজ আমার দীক্ষা হইল। আপনি আমার গুরুদেব। আপনাকে প্রণাম করি।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"ভগবান্‌কে প্রণাম করুন; তিনি আপনার সকল কামনা পূর্ণ করিয়া দিবেন। শুনিয়াছি, আপনি প্রভূত বিত্তশালিনী। আপনার সঙ্গে আপনার স্ব-সম্পর্কীয় লোক কে আছেন?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"এ সম্পত্তি আমার নহে। আমার স্বামীর সম্পত্তি, আমি বঞ্চনা করিয়া হস্তগত করিয়াছি। জগতে আমার স্বামী ছাড়া সম্পর্কীয় লোক আর কেহ নাই। তাঁহাকে আমি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়াছি। শুনিতেছি, অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট ভোগ করিয়া তিনি বোধ হয় কিছু সাহায্য প্রার্থনায় এখান পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। কিন্তু আমার দ্বারবান্‌গণ আমার পূর্ব্বপ্রকৃতি জানিত বলিয়া তাঁহাকে অবমাননা করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। তাঁহার সহিত আমার আর সাক্ষাৎ হইবে না; যেরূপ দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছি, তাহার পর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা। সে ইচ্ছা আমার আর নাই। কিন্তু তিনি কোথায় আছেন, সন্ধান করিয়া তাঁহার সম্পত্তি তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে।"

উমাশঙ্কর জিজ্ঞাসিলেন,—"বঙ্গদেশের কোন্ স্থানে আপনার নিবাস?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"সোনাপুর।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আপনি চিন্তিত হইবেন না। আমি আপনার স্বামীর সন্ধান করিব এবং আবার অদ্যই বৈকালে আপনার সন্ধান লইতে আসিব। পাপের পথে স্খলিতপদ হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে; কিন্তু যে ব্যক্তি ত্বরায় আপনার ভ্রান্তি অনুভব করিয়া পাপ পরিহার করে ও তজ্জন্য আন্তরিক অনুতপ্ত হয়, সে ব্যক্তি ইহলোক ও পরলোক উভয় স্থানেই ক্ষমাপ্রাপ্তির যোগ্য। আপনি সরলভাবে পাপ স্বীকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহা নিতান্ত শুভলক্ষণ। এক্ষণে পাপ আপনার অধীন হইয়াছে, আপনি আর পাপের অধীন নহেন। আপনাকে দর্শন করিয়া আনন্দিত হইলাম। প্রার্থনা করি, ভগবানের কৃপায় আপনি অচিরে সকল প্রকার শান্তির অধিকারিণী হইবেন। আমি এক্ষণে বিদায় হই মা।"

বিধুমুখী সাশ্রুনয়নে বলিলেন,—"এমন মধুমাখা কথা জীবনে কখন শুনি নাই। আমার হৃদয় এখনই অনেক প্রসন্ন হইয়াছে। আজ আমার সুপ্রভাত। আবার কখন্ দেবদর্শন ঘটিবে?"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"বৈকালেই আমি আসিব মা! আপাততঃ আপনি শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তা পরিত্যাগ করিবেন না।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"না। আমার যেমন পাপের সীমা নাই, আপনার সেইরূপ দয়ার সীমা নাই। এই জন্যই সাহস করিয়া আবার দর্শনের প্রার্থনা করিতেছি।"

উমাশঙ্কর বলিলেন—"আপনি সে জন্য চিন্তা করিবেন না। আমি আপনার স্বামীর সন্ধান করিব এবং বৈকালে আসিয়া আপনাকে সংবাদ দিব।"

বিধুমুখী প্রণাম করিলেন। উমাশঙ্কর প্রস্থান করিলেন।

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলে বিধুমুখী ভাবিতে লাগিলেন,—"এমন রূপ কখন দেখি নাই, এমন কথা কখন শুনি নাই, হৃদয়ের ভার যেন অনেক কমিয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণচিন্তা করিব কি? না। ধর্ম্মে আমার কাজ কি? পাপীয়সীর আবার ধর্ম্ম কি? কেবল পাপ লইয়া আসিয়াছি, পাপ লইয়াই যাইব। পাপের বোঝা একটুও কমাইব না। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমময়, শান্তিময়, সুখময়। আমি প্রেমহীনা, শান্তিহীনা, সুখহীনা। আমি তাঁহাকে ডাকিব না, আমি তাঁহাকে ভাবিব না। প্রেম ও শান্তি-সুখের সহিত আমার জীবনে ও মরণে চির-বিচ্ছেদ। সন্ন্যাসীর নিকট স্বীকার করিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তা করিব। তাঁহার নিকট মিথ্যাবাদিনী হইব। ক্ষতি কি? জীবনে কখন মিথ্যা ব্যবহার করি নাই কি? এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু করিয়াছি, সকলই মিথ্যা, সকলই কপটতা, সকলই অসার। তবে আর একটা মিথ্যায় ভয় কি? মিথ্যার সমুদ্রে একটা মিথ্যা বাড়িলই বা।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অধম।

উমাশঙ্কর নিতান্ত দুঃখিত-চিত্তে বিধুমুখীর ভবন হইতে বহির্গত হইলেন পাপ ও পুণ্য, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ইত্যাদি বিষয়ক নানা চিন্তা তাঁহার চিত্তকে অধিকার করিল। তিনি মনে করিলেন, মনুষ্য-সমাজ পুরুষের শত শত উৎকট অপরাধ সহজেই ক্ষমা করে; কিন্তু নারীর একটি অপরাধও ক্ষমা করিতে চাহে না। শিক্ষা ও ধর্ম্মের বলে চরিত্রের বল হয়। নারী স্বভাবতঃ দুর্ব্বলচিত্ত, তাহাতে আবার মনুষ্য-সমাজ তাহাদের সুশিক্ষা ও সুনীতিলাভের বিশেষ সুযোগ করিয়া দেয় না। অথচ তাহাদের নিকট প্রত্যাশা করে অনেক, তাহাদের স্কন্ধে দায়িত্ব প্রদান করিয়াছে বড়ই কঠিন ও ভয়ানক। ইহার অন্য কোন সদুপায়-নির্দ্ধারণে উদাসীন থাকিয়া, কেবল এক কঠোর অবরোধ-পদ্ধতির উপর নির্ভর করিয়া সমাজপতিরা নিশ্চিন্ত আছেন। আর কিছু উপায় চিন্তা করা উচিত নহে কি? বড়ই বিষম সমস্যা।

তাহার পর তাঁহার মনে হইল, 'এই নারীর জীবনের কোন ঘটনাই আমি জানি না। দেখিতেছি, ইনি ধনশালিনী ও যুবতী। জানি না, কেন ইঁহার সর্ব্বনাশ ঘটিল। হইতে পারে, স্বামীর উপেক্ষা এই-রূপ পতনের কারণ। কিন্তু সেই স্বামী সহস্র পাপ করিয়াও স্বচ্ছন্দে সমাজে সমাদৃত হইয়া কাল কাটাইতে পারিবেন; কিন্তু মনুষ্য-সমাজে এ সুন্দরীর আর স্থান নাই। যে কারণেই সর্ব্বনাশ ঘটুক, আপাততঃ এ নারী নিশ্চয়ই দয়ার পাত্রী। একে তো এই নারীর রোগের অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় না যে, ইঁহার জীবন অধিক দিন স্থায়ী হইবে। তাহার পর ইঁহার চিত্তের ভাবান্তর ও অনুতাপ ইঁহাকে বাস্তবিক দয়ার পাত্রই করিয়া তুলিয়াছে। দয়া সকলকেই করা ধর্ম্ম। এ দুঃখিনী কেন দয়ায় বঞ্চিত হইবে? আমি ইহার স্বামীকে অন্বেষণ করিব এবং সাধ্যমত জ্ঞানোপদেশ দিয়া ইহাকে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ করিবার চেষ্টা করিব।'

তাহার পর তাঁহার মনে হইল, 'যদি কোন উপায়ে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ ঘটাইতে পারি, তাহাতে পুণ্য ভিন্ন পাপ নাই। কিন্তু কাশী তো একটা লোকারণ্যবিশেষ; এ স্থানে তাঁহাকে সন্ধান করিয়া বাহির করা সহজ নয়; তথাপি চেষ্টা করিব। নীলরতন বাবুকে ও অন্যান্য অনেককে বলিব। অবশ্য সন্ধান হইবে। এই সময় হরকুমার বাবু এখানে থাকিলে অনেক উপায় হইত। বৈকালে আবার আসিব। ইহার স্বামীর বৃত্তান্ত আর একটু ভাল করিয়া জানিব।'

এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে উমাশঙ্কর ধীরে ধীরে ও অবনত-মস্তকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথের মধ্যে এক স্থানে বহু লোকের জনতা। কেহ 'ধর ধর!' কেহ 'কর কি?' ইত্যাদি শব্দে চীৎকার করিতেছে। কেহ বলিতেছে, 'আহা, বড় মারিয়াছে।' কেহ বলিতেছে, 'না—বড় মারে নাই, দুই ঘা জুতা মারিয়াছে।' কেহ বলিতেছে, 'আহা, কেন মারিল?' অপরে বলিতেছে, 'চোর হইবে হয় ত।' আর একজন বলিল,—'মার্ শালাকে।'

উমাশঙ্কর বুঝিলেন, কে কাহাকে মারিতেছে। অমনই মনে হইল, যদি রক্ষা করিতে পারা যায়, তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক। তিনি জন-সমাগমের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কাশীতে অনেকেই তাঁহাকে চিনিত এবং অনেকেই তাঁহাকে সম্মান করিত। এজন্য অনেকেই সরিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে পথ করিয়া দিল।

তিনি দেখিতে পাইলেন, একটা অতি কুৎসিতদর্শন স্থূলকায় কৃষ্ণবর্ণ লোক হেঁট-মুণ্ডে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার গায়ের দুই এক জায়গায় ধুলার দাগ লাগিয়া রহিয়াছে। আর একটা নিতান্ত বিলাসী খোস-পোষাক বাবু-গোছ লোক এক পায়ের জুতা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং হুঙ্কার সহকারে ঐ কৃষ্ণকায় ব্যক্তির প্রতি মধ্যে মধ্যে বিকট দৃষ্টিপাত করিতেছে। এ ব্যক্তির ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া তাহাকে উন্মাদ বলিয়াই উমাশঙ্করের বোধ হইল।

উমাশঙ্কর সন্নিহিত একটা লোককে জিজ্ঞাসিলেন, —"ব্যাপার কি?"

সে বুঝাইয়া দিল,—"এই বাবু লোকটা ঐ ছোট-লোকটাকে কয়েক ঘা জুতা মারিল। কেন জানি না। বেশী কথা কিছু শুনি নাই। কেবল শুনিয়াছি, বাবুটা বলিতেছে, 'আবার কাশী আসিয়াছিস্ পাজি? তুই এখানে আসায় আমার সর্ব্বনাশ হইল। আমি তোর হাড় এক ঠাঁই মাস এক ঠাঁই করিব জানিস্!' ছোট লোকটাও ইহার উত্তর দিয়াছে। সে বলিয়াছে, 'মানুষের যতদূর সর্ব্বনাশ করিতে পারা যায়, তুমি আমার তাহাই করিয়াছ। আমি কখনই তোমার কোনই অনিষ্ট করি নাই, করিতে আমার সাধ্যও নাই।' এইরূপ দুই চারি কথার পর বাবুটা এই লোকটাকে জুতা মারিয়াছে।"

উমাশঙ্করের মনে কৃষ্ণবর্ণ লোকটার ভাব দেখিয়া কিছু কষ্ট হইল। সে ব্যক্তি অপমানিত হইয়া নীরবে অধোমুখে দাঁড়াইয়া যেন কতই চিন্তা করিতেছে।

উমাশঙ্কর নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"মহাশয়! এ ব্যক্তি আপনার কি ক্ষতি করিয়াছেন?"

বাবু বলিলেন,—"তুমি কে হে বাবু, মাথায় নামাবলি বেঁধে, ঝুলি কাঁধে ক'রে মধ্যস্থ কর্‌তে হাজির হ'লে? কে তোমাকে ডাক্‌ছে বাবা? লাট সাহেব না কি? যাও, আপনার পথ দেখ।"

উমাশঙ্কর বুঝিলেন, লোকটা সুরাপান করিয়াছে। বলিলেন,—"আমি আপনাকে অন্যায় কথা কিছুই জিজ্ঞাসা করি নাই। এ ব্যক্তিকে যখন আপনি প্রহার করিয়াছেন, তখন ইনি নিশ্চয়ই আপনার কোন ক্ষতি করিয়াছেন, সেই কথাটা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি মাত্র। আপনি তাহাতে রাগ করিতেছেন কেন?"

বাবু বলিলেন,—"তুমি কি দুনিয়াদারির মালিক না কি যে, তোমাকে সকল কথা জানাইতে হইবে? আমার খুসী আমি মরিয়াছি। তোর তা কি রে হারামজাদা?"

উমাশঙ্কর সবিনয়ে বলিলেন,—"আমার কিছু নহে সত্য, কিন্তু মহাশয়! অন্যায় পূর্ব্বক কেহ কাহারও উপর অত্যাচার করা নিয়মবিরুদ্ধ। আপনি আমাকে দুটা গালি দিলে আমার গা পচিয়া যাইবে না। কিন্তু এরূপ ব্যবহার ভাল নহে।"

বাবু বলিলেন,—"তুই বেটা বড়ই বেয়াদব দেখিতেছি। তোর অদৃষ্টেও মার আছে। আমার কাজের ভাল মন্দ বিচার করিবার তুই কে রে বেটা?"

এই বলিয়া বাবু হস্তস্থিত জুতা লইয়া উমাশঙ্করকে তাড়া করিলেন। তৎক্ষণাৎ বহু লোক আসিয়া বাবুকে আক্রমণ করিল এবং দেখিতে দেখিতে বাবুর উপর কিল, চড়-চাপড়, জুতা, ধাক্কা বর্ষণ হইতে লাগিল। তিনি মাটীতে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার কোঁচান চাদর লোকের পায়ে পায়ে কোথায় চলিয়া গেল, উত্তম জামা ছিঁড়িয়া গেল, দেহ ধূলিমাখা হইল, মাথার টেরি ভাঙ্গিয়া চুল উচ্ছৃঙ্খল হইয়া গেল। উমাশঙ্কর সকল লোকের হাতে পায়ে ধরিয়া তাহাদিগকে এই প্রহারকার্য্য হইতে বিরত করিতে লাগিলেন।

বাবু বুঝিলেন, তাঁহার ক্রোধ বা প্রতাপ তাঁহাকে এ স্থানে রক্ষা করিতে পারিবে না। তখন তিনি ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে প্রস্থান করিলেন।

তখন উমাশঙ্কর সেই কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তির নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি কে? কেন উনি আপনাকে প্রহার করিলেন?"

কৃষ্ণকায় ব্যক্তি বলিল,—"আমি কে, তাহা বলিয়া কোন ফল নাই; বলিতে ইচ্ছাও নাই। আমি হতভাগা। উনি এক সময়ে আমার ক্ষুদ্র চাকর ছিলেন। তাহার পর আমার সর্ব্বপ্রকার সর্ব্বনাশ করিয়া ক্রমে আমাকে পথের ফকির করিয়া দিয়াছেন। সম্প্রতি বিনা কারণে নিরপরাধে আমাকে জুতা মারিলেন। আমার অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ। দুর্গতির চূড়ান্ত হইয়াছে, আরও কি হইবে, জানি না।"

উমাশঙ্কর জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি এখানে কোথায় থাকেন?"

হতভাগা পুরুষ বলিল,—"ভিক্ষা করিয়া খাই, যেখানে সেখানে থাকি।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আপনি আমার সঙ্গে আসুন। আপনার আহারাদির আমি সুব্যবস্থা করিয়া দিতেছি।"

উভয়ে প্রস্থান করিলেন।

পাঠকগণ বুঝিতে পারিয়াছেন বোধ হয়, ঐ বাবু লোকটি হরিচরণ, আর সেই কৃষ্ণকায় কুৎসিত লোকটি শ্যামলাল। শ্যামলালের দুর্গতির বোধ হয় চূড়ান্তই হইয়াছে। শ্যামলাল এখন ভিক্ষুক হইয়া পড়িয়াছেন। বিধুমুখী ও হরিচরণ পশ্চিমে চলিয়া আসার পর শ্যামলালের কষ্ট পূর্ণমাত্রায় বাড়িয়া উঠিয়াছে। ক্রমে তিনি আহারাদির কষ্টও ভোগ করিয়াছেন। একটি পয়সাও কোন উপায়ে হস্তগত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। বিধুমুখী ও হরিচরণের ধর্ম্মজ্ঞান নিতান্ত কম বলিতে পারি না; কারণ, তাঁহারা আসিবার সময় বাটীর সকল জিনিসপত্র চাবি দিয়া ও চারিজন দ্বারবান্ ব্যতীত আর সকল লোককে জবাব দিয়া আসিলেও শ্যামলালের আহারের ব্যবস্থা করিতে ভুলেন নাই। এক ব্রাহ্মণের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া শ্যামলালকে দুই বেলা চারিটি চারিটি ভাত দিবার ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছিলেন। কখন মন্দ ভোজন অভ্যাস না থাকায় সেই ব্রাহ্মণ-প্রদত্ত কুৎসিত অন্ন শ্যামলালকে বড়ই কষ্ট দিতে লাগিল। কিন্তু তাহাও ক্রমে বন্ধ হইয়া গেল। যে লোকের উপর শ্যামলালকে খাইতে দিবার ভার দিয়া হরিচরণ ও বিধুমুখী চলিয়া আসিয়াছিলেন, সে টাকা ফুরাইয়া গিয়াছে বলিয়া এবং গরিব মানুষ কোথায় পাইবে জানাইয়া শ্যামলালকে অন্ন দেওয়া বন্ধ করিল। তখন হতভাগা শ্যামলাল নিরুপায় হইয়া হরিচরণকে পত্র লিখিলেন; বিধুমুখীর নিকট ভিক্ষা চাহিলেন। সে পত্র তাঁহাদের হস্তগত হইল কি না, ভগবান্ জানেন; কিন্তু

কোনই উত্তর শ্যামলাল পাইলেন না এবং তাঁহার সম্বন্ধে আর কোন ব্যবস্থাও হইল না। শ্যামলাল জামা বিক্রয় করিলেন, জুতা বিক্রয় করিলেন—অতীব কষ্টে দিন কাটাইতে লাগিলেন। শেষে এই নরাধম কাপুরুষ শয্যা বিক্রয় করিয়া দশ টাকা সংগ্রহ করিলেন এবং হরিচরণ ও বিধুমুখী কাশী আসিয়াছেন শুনিয়া, কাশীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এখানে আসিয়া ভিক্ষাই অবলম্বন হইয়াছে। বিধুমুখীর সহিত দেখা করিবার তিনি চেষ্টা করিলেন; কিন্তু দ্বারবানেরা জানিত, বিধুমুখীর অন্দরে শ্যামলালের প্রবেশাধিকার নাই; এ জন্য তাহারা তাঁহাকে অন্তঃপুরে যাইতে দেয় নাই, অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। কল্য এই ঘটনা হইয়া গিয়াছে। তথাপি অদ্য হতভাগা নিস্তেজ ধিক্কৃত শ্যামলাল আবার বিধুমুখীর ভবনে যাত্রা করিতেছে। যদি কোনরূপে একটা সংবাদ পাঠাইয়া বা কোন প্রকারে সাক্ষাৎ করিয়া স্ত্রীর দয়া আকর্ষণ করিতে পারে, ইহাই হতভাগ্যের কামনা। সে তদুদ্দেশে গমন করিতেছিল। পথি-মধ্যে হরিচরণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। হরিচরণকে দেখিয়া নরপ্রেত শ্যামলালের বড়ই আহ্লাদ হইল। সে মনে করিল, আর কিছু হউক না হউক, আপাততঃ হরিচরণ নিশ্চয়ই তাহাকে কিছু অর্থসাহায্য করিবে। সে হরিচরণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। তাহার পর যাহা যাহা ঘটিল, তাহা পাঠকগণের অবিদিত নাই। হরিচরণের জুতা খাওয়া পর্য্যন্ত তাহার অদৃষ্টে ছিল। তাহাই হইল।

হরিচরণ কল্য বিধুমুখীর নিকট বড়ই অনাদর ও অপমান ভোগ করিয়াছে। সে ইদানীং অনেক অপমান ও অনাদর ভুগিতেছে বটে, কিন্তু তাহা বড় গ্রাহ্য করে নাই। কল্যকার ব্যাপার সে বড়ই গুরুতর বলিয়া মনে করিয়াছে এবং বুঝিয়াছে, বিধুমুখীর নিকট তাহার সমাদরের একবারেই শেষ হইয়াছে এবং বিধুমুখী সম্পূর্ণরূপে তাহার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু বিধুমুখীর সহিত একবারে সম্পর্কটা শেষ হয়, ইহা তাহার বাঞ্ছনীয় নহে। সত্য বটে, সে বিলক্ষণ দশ টাকার সংস্থান করিয়া লইয়াছে, কিন্তু তাহার ব্যয় অনেক। বিধুমুখী হাতে থাকিলে খরচের ভাবনাটা থাকে না, বাবুগিরি চলে ভাল, সর্ব্বপ্রকারেই সুখে থাকা যায়। বিধুমুখীর এ পরিবর্ত্তন সহসা ঘটে নাই। অনেক দিন হইতে বিধুমুখী ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছে; অনেক দিন হইতে তাহার মনের ভাব কেমন বদ্‌লাইয়া গিয়াছে; অনেক দিন হইতেই সে সময়ে সময়ে স্বামীর কথা ও স্বামীর প্রতি অত্যাচারের কথা বলিতেছে; অনেক দিন হইতেই হরিচরণকে ছোটলোক বলিয়া জ্ঞান করিতেছে এবং অনেক দিন হইতেই সে হরিচরণের দুর্ব্ব্যবহারের জন্য অনুযোগ করিয়া আসিতেছে। ইহাতে হরিচরণ বুঝিয়াছে যে, বিধুমুখীর মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বিধুমুখীকে সে বিদ্রূপ করিয়াছে, বৈষ্ণবী হইবার পরামর্শ দিয়াছে, হরিনাম সার করিতে বলিয়া তামাসা করিয়াছে। সে মনভাঙ্গা যে এত দূরে দাঁড়াইবে, ইহা সে কখন মনে করে নাই। এখন সে বুঝিয়াছে, বিধুমুখীরূপ সোনার পাখী শিকল কাটিয়াছে। এ পরিবর্ত্তন, এত ভয়ানক পরিবর্ত্তন কেন ঘটিল? যাহাই হউক, আশা কে সহজে ত্যাগ করে? হরিচরণ মনে করিল, একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না, দেখিতে হইবে, বিধুমুখীর মন ফিরে কি না। হয় ত রাগের বশেই বিধুমুখী তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। রাগ ক্রমে পড়িয়া যাইতে পারে। ক্রমে যেমন চলিতেছিল, সেইরূপ দাঁড়াইতে পারে। সে এইরূপ ভরসায় বুক বাঁধিয়া আজি প্রাতে আবার বিধুমুখীর বাটীতে প্রবেশ করিতে গিয়াছিল; কিন্তু দ্বারবানেরা তাহাকে প্রবেশ করিতে দেয় নাই, সেখানে অপেক্ষা করিতে দেয় নাই, অপমানের কথা অনেক কহিয়াছে, তখনই প্রস্থান না করিলে প্রহার করিবে বলিয়া ভয় দেখাইয়াছে। হরিচরণ বুঝিয়াছে, সর্ব্বনাশ যতদূর হইতে হয়, তাহাই হইয়াছে। সকল আশারই শেষ হইয়াছে। সে তখন শ্যামলালের উপর, বিধুমুখীর উপর, দ্বারবান্‌গণের উপর মর্ম্মান্তিক রাগ করিয়া ফিরিতে বাধ্য হইয়াছে। পথে সহসা শ্যামলালের সহিত অসম্ভাবিত সাক্ষাৎ। তখনই সেই সুরাপায়ী বর্ব্বরের মনে উদয় হইয়াছে যে, এই শ্যামলালের এখানে আগমনই তাহার সর্ব্বনাশের কারণ। তাহার পর শ্যামলাল সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে। সে কথাটা মর্ম্মাহত হরিচরণ বিদ্রূপ বলিয়াই মনে করিয়াছে। সে ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া পায়ের জুতা খুলিয়া শ্যামলালকে প্রহার করিয়াছে। হায়! এক দিন প্রভুর সন্তোষের নিমিত্ত যে ব্যক্তি হীনকর্ম্ম সম্পাদনে পশ্চাৎপদ হয় নাই, সে আজি স্বচ্ছন্দে সেই প্রভুকে প্রহার করিল। যাহার অনুগ্রহই এক সময়ে যে ব্যক্তির জীবনের প্রধান প্রার্থনীয় ছিল, আজি তাঁহাকে জনাকীর্ণ রাজপথে সে অনায়াসে পাদুকা-প্রহার করিল!

দোষ কাহার? শ্যামলাল, বিধুমুখী ও হরিচরণ—তিন জনের মধ্যে অধিক অপরাধী কে? অপরাধ

যাহারই অধিক হউক, কিন্তু শ্যামলাল! ন্যায়ময় ভগবান্ তোমার অত্যাচার ও অবিবেচনা-সমূহের যথেষ্ট সমুচিত শাস্তি হাতে হাতেই ঘটাইয়াছেন, সন্দেহ নাই। কেন তুমি হতভাগা, পরনারীর সর্ব্বনাশ করিতে ব্যস্ত থাকিয়া, আপনার বিবাহিতা বনিতার দিকে একবারও দৃষ্টিপাত কর নাই? কেন তুমি কখন তাহার সহিত একটি মুখের কথাও কহ নাই? কখনও তাহাকে একটুও আদর কর নাই? তোমার পাপ অসীম। তাহার শাস্তিও ভয়ানক। কিন্তু এই কি তোমার শাস্তির শেষ? কে বলিতে পারে?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নিরুদ্দেশ।

অপরাহ্ণকালে বিধুমুখী পাঁড়ে-ঘাটের সেই আবাসে, সেই প্রকোষ্ঠের সেই শয্যায় অধোমুখে শয়ন করিয়া, উপধানে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছেন। পাপের তাড়নায় অথবা অনুতাপের প্রাবল্যে কিংবা অন্য কোন কারণে সুন্দরীর হৃদয় বিগলিত হইয়াছে এবং নয়ন হইতে অশ্রুধারা নিঃসৃত হইয়া উপধান সিক্ত করিতেছে। নিকটে আর কেহ নাই। অনেকক্ষণ সুন্দরী এইরূপে রোদন করিলেন। সহসা বারান্দায় মনুষ্যাগমন-সূচক পদধ্বনি শ্রবণ করিয়া তিনি নয়ন মার্জ্জন করিলেন এবং সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই দেখিতে পাইলেন, সম্মুখে শান্তিপূর্ণ, আনন্দপূর্ণ ও তেজঃপূর্ণ উমাশঙ্করের দেব-মূর্ত্তি। অতিকষ্টে সুন্দরী উঠিয়া বসিলেন এবং উমাশঙ্করকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"আমার পরমভাগ্য যে, এখনই আপনার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"এ কি মা! আপনি কাঁদিতেছিলেন? আপনাকে কাতর দেখিতেছি কেন?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"কাতর! কৈ, নূতন করিয়া কিরূপ কাতর হইয়াছি, তাহা তো জানি না। আমার শরীর, মন সকলই অপবিত্র—পাপ-তাপে পরিপূর্ণ। সুতরাং কাতরতা আমার সঙ্গের সাথী। আর রোদনের কথা! রোদনই তো এখন আমার সম্বল। যে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়াছে, স্বেচ্ছায় চরণে কুঠারাঘাত করিয়াছে, পাপে প্রমত্ত হইয়া স্বর্গসুখকে পদাঘাত করিয়াছে, সে যদি না কাঁদিবে, তবে কাঁদিবে কে?"

আবার বিধুমুখীর চক্ষু জল-ভারাকুল হইল। আবার তিনি নয়ন মার্জ্জন করিয়া বলিলেন,—"আমার রোদন আপনি গণনায় আনিবেন না। এক দিন, দুই দিন বা দশ দিনের রোদনে আমার সমাপ্তি হইবে না। অনন্ত—অনন্তকাল আমাকে কাঁদিয়াই কাটাইতে হইবে!"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"রোদন বড়ই শুভলক্ষণ মা! হৃদয়ের নিরতিশয় কোমলতা ও দীনতা উপস্থিত না হইলে রোদন দেখা দেয় না; সুতরাং অশ্রু-বারি বড়ই কোমলতাব্যঞ্জক। অহংকার, তেজ, পাপের প্রাবল্য, অধর্ম্মের কাঠিন্য প্রভৃতি থাকিলে হৃদয় কখনই একান্ত কোমল ও নিতান্ত দীন হয় না। হিত-পরিবর্ত্তনের সূচনা উপস্থিত হইলেই নয়নের জল আপনিই বিগলিত হইয়া অন্তরে প্রেম, ধর্ম্ম ও পুণ্য-প্রবৃত্তির আবির্ভাব-বিষয়ক পরিচয় প্রদান করে। অতএব মা, রোদন বড়ই মঙ্গলজনক। ভরসা করি, এই অশ্রু-বারি আপনার অন্তর-প্রদেশ হইতে পাপ-পঙ্ক প্রক্ষালিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে।"

বিধুমুখীর সেই লাবণ্য-বিহীন ব্যাধি প্রপীড়িত বদনে বিষাদের হাস্য প্রকটিত হইল। তিনি বলিলেন,—"আমার এ রোদন কোন হিত-পরিবর্ত্তনের সূচনা কি না, তাহা আমি জানি না। কিন্তু ইহা আমি জানি যে, জীবনে ও মরণে অতঃপর আমাকে নিরন্তর রোদনই করিতে হইবে। আমার জীবন আর দুই দশ দিনের অধিক থাকিবে না, ইহাই আমার বিশ্বাস। এই দুই দিনের রোদনেই আমার রোদনের সমাপ্তি হইবে না; মরণের পরও কত যুগ, কত সংখ্যাতীত কাল আমাকে নিরন্তর রোদনই করিতে হইবে। আপনি আমার গুরু, আপনার নিকট মিথ্যা কহিব না। আমি স্বর্গ ও নরক, পাপ ও পুণ্য, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম কিছুই মানিতাম না। শরীরের মধ্যে দেহাতীত কোন স্থায়ী পদার্থ আছে, ইহাও আমি কখন স্বীকার করিতাম না। বর্ত্তমানে সুখ ব্যতীত আর কিছুতেই আমার লক্ষ্য ছিল না। সেই বর্ত্তমানের সুখ আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত আমি সকলই করিতে প্রস্তুত ছিলাম। সহসা আপনাকে দর্শন করার পর হইতে ক্রমশঃ আমার চিত্তের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই অল্প-সময়ের মধ্যেই আমি আমার ভ্রম প্রণিধান করিতে পারিয়াছি। বুঝিয়াছি, এই দেহের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ নিতান্ত অস্থায়ী ও ক্ষণিক; আর বুঝিয়াছি, এই জীবনই আমাদিগের শেষ নহে এবং ইহাও বুঝিয়াছি, হিতাহিত-কর্ম্ম-জনিত ফল

আমাদিগকে কখনই ত্যাগ করে না। এইরূপ বুঝিয়াছি বলিয়াই রোদন করিতেছি এবং অনন্ত কাল রোদনই করিতে হইবে স্থির করিয়াছি।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"শ্রীহরির জয়! যে জ্ঞান মুক্তির পূর্ব্ব-সূচনা, তাহাই আপনার উপস্থিত হইয়াছে। জ্ঞানের উদয় হইলে তৎক্ষণাৎ চির-সঞ্চিত পাপরাশি ভস্মীভূত হইয়া যায়। আপনার হৃদয়ে জ্ঞানের উন্মেষ হইয়াছে। এই জ্ঞানের সম্যক্ সঞ্চার হইবামাত্র আপনি পরম পুণ্যবতী হইয়া দেবত্ব লাভ করিবেন। আর আপনার সহিত পাপের সংস্পর্শ থাকিবে না। আপনি আমার কথামত শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তা করিয়াছিলেন কি?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"না; কেন করিব? আপনাকেই আমি পূর্ণ পুরুষ বলিয়া মনে করিয়াছি; সুতরাং আর শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তার প্রয়োজন হয় নাই। আমি কায়মনোবাক্যে পূর্ণব্রহ্ম-জ্ঞানে আপনাকেই চিন্তা করিয়াছি।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আমি ক্ষুদ্র মনুষ্য, দেবত্ব সংস্থাপনের কোন অধিকারই আমার নাই। তথাপি যদি আপনি আমাকে পূর্ণব্রহ্ম মনে করিয়াই চিন্তা করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও আপনার ফলপ্রাপ্তি সম্বন্ধে কোনই ব্যাঘাত হইবে না। এই বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ ব্রহ্মময়; মনুষ্য ও দেবতা, স্থাবর ও জঙ্গম সর্ব্বত্রই সেই মহাপুরুষ বিরাজমান। অতএব ব্রহ্মাববোধের নিমিত্ত প্রথম অধিকারীর পক্ষে যে কোন পদার্থ অবলম্বন করায় হানি নাই।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"আপনি ক্ষুদ্র মনুষ্য হইলেও আমি আপনাকে পূর্ণপুরুষরূপেই বুঝিয়াছি। আপনি স্বপ্নে বিশ্বাস করেন কি? বোধ হয় করেন না। আমি আজি মধ্যাহ্নে বড়ই অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছি। মধ্যাহ্নে আমার তন্দ্রাকালে দেখিলাম, ছয় জন দুরন্ত দস্যু একত্রিত হইয়া আমাকে এক ঘোর কৃষ্ণবর্ণ সমুদ্রজলে ফেলিয়া দিল। আমি ক্রমে সেই জলমধ্যে ডুবিয়া পড়িলাম। সেই জল সুগভীর। বহুক্ষণে আমি তাহার তলদেশ প্রাপ্ত হইলাম। বিজাতীয় অসহনীয় যাতনায় আমার সংজ্ঞা তিরোহিতপ্রায় হইল এবং সেই নিদারুণ অবক্তব্য দারুণ যন্ত্রণার প্রাবল্যে আমি অস্থির ও মৃতকল্প হইয়া পড়িলাম। তখন মৃত্যুই আমার একমাত্র প্রার্থনীয় হইল এবং আমি একান্তমনে কেবল মৃত্যুর নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। বুঝিলাম, এই নিদারুণ যাতনার হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করা অসম্ভব ও আমার সাধ্যাতীত। এইরূপ অবস্থায় দেখিলাম, এক পরম শোভাময়, তেজঃপুঞ্জকলেবর, প্রসন্ন-বদন মহাপুরুষ সেই জলরাশি ভেদ করিয়া সমাগত হইলেন এবং আমার মস্তকে চরণ সংস্থাপিত করিয়া ও স্বকীয় দক্ষিণ হস্ত বিস্তৃত করিয়া আমাকে নিষ্কৃতির পথ দেখাইয়া দিতেছেন। তখনই আনন্দ ও সন্তোষে আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল, যন্ত্রণার দাবদাহ প্রশমিত হইল এবং অননুভূতপূর্ব্ব শান্তিতে আমার হৃদয় ভরিয়া গেল। তাহার পর তাঁহার প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইবামাত্র আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। তখন যে যাতনা ও পরিতাপ আমার নিত্য-সঙ্গী, তাহারা আসিয়া আমাকে অধিকার করিল। তখন স্বপ্নদৃষ্ট ক্ষণিক সুখ স্মরণ করিয়া আমি নিরন্তর রোদন করিতে লাগিলাম এবং বুঝিলাম, অতঃপর রোদনের সহিত আমার অপরিহার্য্য সম্বন্ধ। কিন্তু সে কথা যাউক। আপনি বলিতে পারেন কি, আমি স্বপ্নে যে মহাপুরুষকে দর্শন করিয়াছি, তিনি কে?"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আমার বোধ হয়, তিনি দেবতা।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"তবে সে দেবতা আপনি। আমি স্বপ্নে আপনাকেই দর্শন করিয়াছি। তবে এ প্রত্যক্ষ দেবতা পরিত্যাগ করিয়া আমার অন্য দেবতা চিন্তা করিবার প্রয়োজন কি? আমি অতঃপর নিরন্তর আপনাকেই ধ্যান করিব এবং অন্তরের দুঃখ-শান্তির নিমিত্ত আপনার চরণোদ্দেশে কাঁদিব।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"ভগবান্ নিশ্চয়ই আপনার শান্তিবিধান করিবেন। আপাততঃ আমি আপনার স্বামীর সন্ধান পাইয়াছি এবং তাঁহাকে উপযুক্ত স্থানে আহারাদির সুব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া দিয়াছি। আপনি অনুমতি করিলে আমি তাঁহাকে আপনার নিকট উপস্থিত করিতে পারি।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"তাঁহার সহিত সাক্ষাতে আমার আর প্রয়োজন নাই। আপনি কৃপা করিয়া তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করিবেন। তিনি বিষয়-বুদ্ধিহীন বিলাসী ব্যক্তি। আপনি তাঁহার প্রতি দয়া রাখিবেন। যখন আপনার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছে, তখন তাঁহার বাহ্য ও আন্তরিক কোন কষ্ট আর থাকিবে না। আপনি তাঁহাকে বলিবেন, তাঁহার পাপীয়সী পত্নী আর তাঁহাকে মুখ দেখাইবে না। আমি পূর্ব্বে যত দুর্ব্বল ছিলাম, এক্ষণে তত নহি। আমার জীবন সহসা যদি না যায়, তাহা হইলে তাঁহার সম্পত্তির প্রত্যর্পণ-সূচক যে দলিল আমি লেখা-পড়া করিয়াছি, তাহা যখন ইচ্ছা রেজেষ্ট্রী করিয়া দিলেই চলিবে। বিষয়সম্পত্তি সমস্তই তাঁহার।

তাঁহার অন্ন-বস্ত্র গ্রহণ করিতে বা তাঁহার অর্থের ব্যবহার করিতে আমার কোনই অধিকার নাই। অতএব আমি আর সে সকল কিছু করিব না। আমাকে অতঃপর যদি অধিক দিন জীবিত থাকিতে হয়, তাহা হইলে আপনার চরণ চিন্তা করিতে করিতে ভিক্ষা করিয়া খাইব। স্বামী দেবতার নিকট আমার আর কোন প্রার্থনা নাই। আপনার কৃপায় আমার শারীরিক ও মানসিক অসুখ ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে; প্রভুর এ কৃপায় যেন বঞ্চিত না হই। আপনি আমাকে চরণ-ধূলা প্রদান করিয়া ধন্য করুন।"

তখন সেই ব্যাধি-ক্লিষ্টা নারী স্বচ্ছন্দে আসিয়া উমাশঙ্করের চরণ-ধূলা গ্রহণ করিয়া মস্তকে ও বক্ষে প্রলিপ্ত করিলেন। উমাশঙ্কর বলিলেন,—"ভগবানের কৃপায় আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। আমি এক্ষণে প্রস্থান করি; আপনার স্বামী যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহা আমি আপনাকে অবিলম্বে জানাইব।"

উমাশঙ্কর প্রস্থান করিলেন। পরদিন প্রাতে শ্যামলালকে সঙ্গে লইয়া তিনি সেই ভবনদ্বারে পুনরায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তথায় পুলিসের ও অন্যান্য লোকের ভয়ানক জনতা। পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ইন্‌স্পেক্টর, কোতোয়াল, জমাদার প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারী এবং আগন্তুক, দর্শক ও কৌতূহল-প্রি। লোক-সমাগমে সেই স্থান তখন লোকারণ্যবিশেষ। উমাশঙ্কর এক জন অভিজ্ঞ দর্শকের মুখ হইতে সমস্ত শ্রবণ করিলেন। গতরাত্রি দ্বিপ্রহরের পর হইতে বিধুমুখী অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন। কালিদাসী নাম্নী ঝি দ্বিপ্রহরকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে বিধুমুখীর শয্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পায়, তথায় কেহ নাই; সে বাহিরে অন্বেষণ করিয়াও বিধুমুখীকে দেখিতে না পাইয়া অন্যান্য দাসীদিগের নিদ্রা ভঙ্গ করে। তাহারা সকলে মিলিয়া নানা স্থানে বৃথা অন্বেষণ করিয়া শেষে আমলা ও দরওয়ানগণের ঘুম ভাঙ্গাইয়া সকল কথা বলে। কেহই কোনরূপ সন্ধান করিতে না পারায় অগত্যা আমলারা পুলিসে সংবাদ প্রদান করে; পুলিসও বিধিমতে অনুসন্ধান করিয়াছেন, তথাপি বাঙ্গালা মুলুকের এই রাণীর সন্ধান করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এক্ষণে স্বয়ং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব মূলস্থানে উপস্থিত হইয়া ঘটনার যথাযথ বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতেছেন।

উমাশঙ্কর ও শ্যামলাল এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। তখন কি কর্ত্তব্য, স্থির করিতে না পারিয়া উমাশঙ্কর অনেক চিন্তা করিলেন। এ দিকে সাহেবের কার্য্য শেষ হইলে, তিনি দলবলসহ প্রস্থান করিলেন। তখন উমাশঙ্কর শ্যামলালকে সঙ্গে লইয়া ধীরে ধীরে অবনতবদনে সেই ভবন-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভবন-দ্বারে এক জন উচ্চশ্রেণীর কর্ম্মচারী দাঁড়াইয়া ছিলেন; তিনি শ্যামলাল ও উমাশঙ্করকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং শ্যামলালকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"মা ঠাকুরাণী সমস্ত সম্পত্তি মহাশয়ের নামে এক দানপত্র দ্বারা লিখিয়া দিয়াছেন। আপনি আপাততঃ এখানকার জিনিস-পত্রের যেরূপ হয় ব্যবস্থা করুন।"

শ্যামলাল এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। উমাশঙ্কর সেই কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার পর তিনি স্বয়ং সেই ভবনে নানাপ্রকার সন্ধান করিলেন; কিন্তু ফল কিছুই হইল না। বিধুমুখীর এই অত্যাশ্চর্য্য নিরুদ্দেশ-ব্যাপার আলোচনা করিয়া উমাশঙ্কর কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না। কেহ কি তাঁহাকে খুন করিল? তবে লাস কোথায় গেল? তিনি কি স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগ করিলেন? গৃহত্যাগ করিলেই বা কোন্ স্থান দিয়া প্রস্থান করিলেন? যে এক দ্বার দিয়া গমনাগমন সম্ভব,তাহা দৌবারিকগণ দ্বারা সুরক্ষিত। দৌবারিকগণ বলিতেছে,—"তাঁহার পলায়নজনিত গোলমালের পর তাহারা দরজা খুলিয়াছে; তাহার পূর্ব্বে সেই প্রকাণ্ড দরজা লৌহ-অর্গল দ্বারা নিরুদ্ধ ছিল। সেরূপ নারীর পক্ষে ছাদে ছাদে কোথাও চলিয়া যাওয়া অসম্ভব। তবে তিনি কিরূপে কোথায় গেলেন? কোন দস্যু বা দুঃক্রিয়াশালী লোক মন্দ অভিসন্ধিতে তাঁহাকে হরণ করিল কি? কিরূপে কোথা দিয়া লইয়া গেল? ভবনের জিনিসপত্র কিছুই অপহৃত হয় নাই; কেবল বিধুমুখীর অন্তর্দ্ধান। বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার!

দ্বাদশ খণ্ড—শেষ

প্রথম পরিচ্ছেদ

সম্বন্ধ।

হরকুমার বাবু কাশীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, সঙ্গে অনেক লোকজন আসিয়াছে। স্ত্রী ও পুরুষ এতই লোক তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে যে, তাঁহার বাসায় স্থানের সঙ্কুলান হইতে পারে না। এ জন্য পার্শ্বের আর একটি বাড়ীও তাঁহাকে ভাড়া লইতে হইয়াছে। তিনি নবাগত লোকজন লইয়া এতই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে, আত্মীয়বন্ধু কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া তাঁহার ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু আত্মীয়বর্গ অনেকেই তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেছেন।

অপরাহ্নকালে বৃদ্ধ সার্ব্বভৌম মহাশয় আসিলেন। হরকুমার তাঁহাকে ভক্তিসহকারে প্রণামাদি করিলেন। তখন সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসিলেন,—"তবে ভায়া, এত দেরী হইল কেন? আমরা সকলেই ভাবিয়া আকুল। শরীর ভাল ছিল তো?"

হরকুমার বলিলেন,—"আপনার আশীর্ব্বাদে শরীর ভালই ছিল। অনেক কাজের ভার লইয়া গিয়াছিলাম। কাজেই বিলম্ব ঘটিয়া পড়িল।

সার্ব্বভৌম মুণ্ডিত মস্তকে একবার হাত বুলাইয়া, বামস্কন্ধস্থিত উত্তরীয় দক্ষিণ-স্কন্ধে স্থাপন করিয়া, টেঁক হইতে নস্যের শামুক বাহির করিলেন এবং অনেকখানি তাম্রকূট-চূর্ণ নাসারন্ধ্রদ্বয়ে প্রেরণ করিয়া বলিলেন,—"কি তোমার কর্ম্ম, তুমিই জান। যাহাই হউক, তবে ভায়া, যে যে কর্ম্মে গিয়াছিলে, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে তো?"

হরকুমার বলিলেন,—"আপনার কৃপায় উদ্দেশ্য সবই আশার অধিক সিদ্ধ হইয়াছে।"

সার্ব্বভৌম ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন,—"ভাল! ভাল! যে ভাল, তাহার সকলই ভাল। এখন তোমার অপেক্ষায় একটা বড় দরকারী কাজ আটকাইয়া রহিয়াছে। তা আজি বোধ হয় তুমি বড়ই ব্যস্ত, আজি সে কথা না হয় থাকুক। কল্যই হইবে। বড়ই দরকারী বিষয়।"

হরকুমার বলিলেন,—"আমি ব্যস্ত আছি বটে, কিন্তু আপনার দরকারী কাজের কথা শুনিবার সময় হইবে না, এমন ব্যস্ততা এ জগতে আমার কিছুই হইতে পারে না।"

তখন তত্রত্য আসনবিশেষে চাপিয়া বসিয়া সার্ব্বভৌম আবার নস্যের শামুক বাহির করিলেন এবং তাহাতে টোকা দিতে দিতে বলিলেন—"কথাটা কি জান ভায়া, নবীনের তো একটা বিবাহ না দিলেই নয়।"

হরকুমার বলিলেন,—"আজ্ঞে। তা আবার বিবাহ কেন? সে বউমার কোন অশুভ সংবাদ পাইয়াছেন না কি?"

সার্ব্বভৌম অতিশয় বিরক্তির সহিত এক টিপি নস্য নাসিকায় গুঁজিয়া বলিলেন,—"আরে রাধাকৃষ্ণ! তার শুভাশুভ কোন খবর পাই নাই, পাইতে ইচ্ছাও করি না; সে কথা যাইতে দেও। সেটা ব্যভিচারিণী, চণ্ডালের সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। ছিঃ ছিঃ! তার কথা আলোচনা করিলেও পাপ হয়।"

হরকুমার বলিলেন,—"আজ্ঞে।"

সার্ব্বভৌম বলিতে লাগিলেন,—"ছেলে উপযুক্ত, শিষ্ট, শান্ত, কতকটা পণ্ডিতও বটে। এরূপ পুত্র গৃহশূন্যভাবে থাকা ভাল হয় না।"

হরকুমার বলিলেন,—"আজ্ঞে।"

সার্ব্বভৌম বলিতে লাগিলেন,—"সত্বর পুত্রের বিবাহটা সম্পন্ন করা আবশ্যক। এখানে একটি পাত্রী উপস্থিত হইয়াছে। ঘরও উত্তম, পাত্রীও সুন্দরী, কিছু প্রাপ্য হইবে।"

হরকুমার বলিলেন,—"আজ্ঞে।"

সার্ব্বভৌম বলিতে লাগিলেন,—"এক্ষণে তুমি দেখিয়া মত করিলেই শুভকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি। তোমার মতামতের উপর সমস্ত নির্ভর করিতেছে।"

হরকুমার বলিলেন,—"কাশী স্থানে কন্যা গ্রহণ করা বড়ই বিবেচনা-সাপেক্ষ। কারণ, এখানে অনেক বেশ্যা-কন্যা ভদ্রলোকের মেয়ে বলিয়া দশ টাকা খরচ করিয়া সাধুলোকের ঘাড়ে চাপাইয়া দেয়।"

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—"বল কি? রাধাকৃষ্ণ! এ সকল নারকী কাণ্ড দেখিতেছি। বেশ্যা-কন্যা ভদ্রলোকের সহিত বিবাহ! জাতি-কুল নাশ! কি ভয়ানক!"

হরকুমার বলিলেন,—"আজ্ঞে, এরূপ ভয়ানক কাণ্ড এখানে প্রতিনিয়তই ঘটিয়া থাকে। আমার চক্ষের উপরই এমন অনেক কাজ ঘটিয়াছে। শেষে

জাতি-কুল হারাইয়া অনেককে সমাজচ্যুত হইয়া থাকিতে হইয়াছে।”

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—“কি সর্ব্বনাশ! কিন্তু ভায়া, এ ক্ষেত্রে সেরূপ কোন আশঙ্কা নাই বলিয়াই বোধ হয়।”

হরকুমার বলিলেন,—“তাহা না থাকিলেই মঙ্গল। তবে আমি এখানকার কোন ক্ষেত্রেই সহসা বিশ্বাস করি না। প্রথমটা এমনই দেখা যায় যে, কোন দিকে কোন গোলের অঙ্কুরও নাই; তাহার পর সত্বরেই সর্ব্বনাশ বাহির হইয়া পড়ে।”

সার্ব্বভৌম কহিলেন,—“এক্ষণে উপায়?”

হরকুমার বলিলেন,—“বাবাজীর যে বিবাহ দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে, তাহা আমিও বুঝিয়াছি। দেশে গিয়াও আমি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম না। আমি একটি পাত্রীর সন্ধান করিয়াছি। কুলে, শীলে, রূপে, গুণে সেই পাত্রী সর্ব্বাংশেই মহাশয়ের পুত্রবধূ হওয়ার উপযুক্ত। বিলক্ষণ দশ টাকা লাভ হওয়ারও সম্ভাবনা আছে।”

সার্ব্বভৌম উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সাগ্রহে বলিলেন, “বল কি? তুমি আমার পরম শুভানুধ্যায়ী। তোমার স্বতঃপরতঃ কেবল আমার হিত-চেষ্টা। কিরূপ প্রাপ্তির সম্ভাবনা?”

হরকুমার বলিলেন,—“আপাততঃ বেশী কিছু নয়, তবে কমও নয়। অন্ততঃ এক হাজার টাকার অলঙ্কার পাওয়া যাইবে। পরে বিলক্ষণ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। পাত্রীর সহিত বঙ্গদেশের এক জন প্রধান লোকের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সে সম্বন্ধে উপকার-প্রাপ্তির আশা যথেষ্ট থাকিবে। পাত্রীর এক বিধবা মা ছাড়া আর কেহ নাই। তাঁহার কিঞ্চিৎ সম্পত্তি আছে। তাহাও পরে এই কন্যা পাইবেন।”

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—“সাধু সাধু! তোমার বুদ্ধি-বিবেচনার তুলনা নাই। বড় উত্তম সম্বন্ধ তুমি স্থির করিয়াছ। এক্ষণে কত দিনে কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিবে?”

হরকুমার বলিলেন,—“কার্য্য সম্পন্ন হইতে অধিক বিলম্ব না করিলেও করা যাইতে পারে। তবে এই সময়ে আপনাকে জানাইয়া রাখা আবশ্যক, পাত্রীর বয়স কিছু বেশী হইয়াছে। কুলীন-কন্যা; ঘর না মিলিলে অঘরে তো বিবাহ দিতে পারে না। আপনিই তাহাদের ঠিক পাল্টী।”

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—“উত্তম! উত্তম! ঘর গুণ তোমার সকলই জানা আছে। তুমি কি সকল দিক্ না বিবেচনা করিয়া সম্বন্ধ স্থির করিয়াছ? বেশী বয়সের কথা বলিতেছ? সে তো ভালই কথা। এ অবস্থায় আমাদের একটু বয়স্কা পাত্রীরই প্রয়োজন।”

হরকুমার বলিলেন,—“ঘর নির্দ্দোষ। সে বিষয়ে বেশ করিয়া না জানিয়া কি আমি কথা উত্থাপন করিয়াছি? আপনার যখন মত হইল, তখন আমি অন্যান্য আয়োজনে প্রবৃত্ত হই?”

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—“অবিলম্বে। কিন্তু ভায়া, দেশে গিয়া পুত্রের বিবাহ দিতে আমার ইচ্ছা নাই। আপাততঃ সেখানে যাওয়াও ঘটিবে না।”

হরকুমার বলিলেন,—“প্রয়োজন কি? আপনার আশীর্ব্বাদে আমি এখানে বসিয়াই ছেলের বিবাহ দিব।”

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—“বটে, বটে! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। তুমি মনে করিলে না পার কি? কিন্তু ভায়া, পাত্রীকে তাহা হইলে এখানে আনাইতে হইবে তো। যাহাতে বিলম্ব না হয়, তাহার ব্যবস্থা কর। আজি বোধ হয় আর ডাকে পত্র পাঠাইবার সময় নাই।”

হরকুমার বলিলেন,—“আপনি যেরূপ ইচ্ছা করেন, তাহাই করিয়া দিব। অদ্য রাত্রে পুত্রের বিবাহ দিতে যদি ইচ্ছা করেন, তাহাও হইতে পারে।”

সার্ব্বভৌম সবিস্ময়ে হরকুমারের পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন,—“বল কি? তবে কি পাত্রী এখানেই আছেন?”

হরকুমার বলিলেন,—“আপনি আজি পাত্রী দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে ইচ্ছা করেন কি?”

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—“তবে কি পাত্রী তোমার সঙ্গেই আছেন ভায়া?”

হরকুমার বলিলেন,—“আপনার আশীর্ব্বাদে আমি কাঁচা কাজ করিয়া আসি নাই। যখন দেখিলাম, পাত্রী পরমা সুন্দরী, একটু বয়স্কা, কিছু লাভালাভ আছে, ঘরও নিখুঁত, তখনই মনে করিলাম, এ পাত্রীর সহিত নবীনকৃষ্ণের বিবাহ দেওয়াই চাহি। দেশে আসিয়া বিবাহ করা যে সুবিধা হইবে না, তাহা কি আমি বুঝি নাই দাদা! কাজেই এমন সর্ব্বাংশে সুপাত্রী যদি হাত-ছাড়া হইয়া যায়, এই ভয়ে একেবারে পাত্রী ও পাত্রীর মাতাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি। এক্ষণে বিবাহের দিন স্থির করুন। বিশেষ আড়ম্বরে প্রয়োজন নহে। কোন রকমে দুহাত এক হইলেই হইল।”

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—“তা বই কি, তা বই কি! ধন্য তোমার বুদ্ধি! ধন্য তোমার বিবেচনা! তুমি সে

দিন স্থির করিবে, সেই দিনই বিবাহ হইবে। তবে শুভ কর্ম্ম যত শীঘ্র শেষ হয়, ততই মঙ্গল।"

হরকুমার বলিলেন,—"সে সব আমি স্থির করিব। দুই তিন দিনের মধ্যেই কার্য্য বোধ হয় শেষ হইবে। আপাততঃ মহাশয় যখন আসিয়াছেন, তখন একবার স্বচক্ষে পাত্রী দেখিয়া গেলে হয় না?"

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—"প্রয়োজনাভাব ভায়া, তুমি দেখিয়া মনোনীত করিযাছ, ইহাই যথেষ্ট। তবে তুমি যদি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে না হয় একবার দেখি।"

হরকুমার বাবু সার্ব্বভৌম মহাশয়কে বাহিরে বসাইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং অনতিকালমধ্যে পুনরাগমন করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় বিস্তৃত গালিচার উপর সার্ব্বভৌম মহাশয় উপবেশন করিলেন। তাহার পর একটি নতমুখী ঈষদবগুণ্ঠনাবৃত-বদনা, পরমা সুন্দরী যুবতী এক জন স্ত্রীলোকের সঙ্গে ধীরে ধীরে আসিয়া অতীব কোমলভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিল। সেই লাবণ্যময়ীর গতি ও কোমলতাপূর্ণ ভাবভঙ্গী, দেহের চম্পক-সদৃশ বর্ণ, গঠনাদির পারিপাট্য দেখিয়া সার্ব্বভৌম অবাক্ হইলেন; সুন্দরীর মুখে অল্প অবগুণ্ঠন ছিল এবং তিনি নিতান্ত নত-বদনে দাঁড়াইয়া ছিলেন; এ জন্য সার্ব্বভৌম ভাল করিয়া পাত্রীর মুখখানি দেখিতে পাইলেন না। তাহা না হউক, যাহা দেখিলেন, তাহাতেই তিনি পরম পরিতুষ্ট হইলেন। একটা কথা না জিজ্ঞাসা করা পাত্রী দেখার নিয়ম-বিরুদ্ধ মনে করিয়া তিনি জিজ্ঞাসিলেন, —"তোমার নাম কি মা-লক্ষ্মি?"

মা-লক্ষ্মীর তখন চক্ষে জল, কণ্ঠস্বর বিকৃত। তিনি সেইরূপ বিকৃত স্বরে উত্তর দিলেন,— "সতী"।

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—"আহা, কি মধুর! সাক্ষাৎ সতীর ন্যায় আকার-প্রকারই বটে। তা এখন এস মা। আমার বড়ই মনের মত হইয়াছে।"

সতী সেই স্ত্রীলোকের সঙ্গে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। এই সময়ে বাটীর মধ্য হইতে শঙ্খ-বাদন-শব্দ ও হুলুধ্বনি হইল।

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—"সে অভাগীও এমনই সুন্দরী ছিল।"

সার্ব্বভৌম মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া বাহিরে আসিতে আসিতে হরকুমার বলিলেন,—"কোন চিন্তা করিবেন না দাদা; আমার উপর নির্ভর করুন, আমি আপনার যাহা ছিল, অবিকল সেইরূপ করিয়া ঘর বজায় করিয়া দিব।"

"আমার সকল বিষয়ে তোমার উপরই একান্ত নির্ভর। এ বিষয়েও তুমি যাহা করিবে, তাহাই হইবে। ইহার আর কথা কি?"

সার্ব্বভৌম সানন্দে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মর্ম্মান্তিক।

পরদিন প্রাতঃকালে নীলরতন বাবুর প্রকাণ্ড বৈঠকখানায় অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে। নীলরতন বাবু, হরকুমার বাবু, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, তাঁহার পুত্র নবীনকৃষ্ণ, উমাশঙ্কর, প্রতিবাসী দুই চারি জন প্রবীণ ভদ্রলোক, চণ্ডী গুলীখোর, শরিফ কোচম্যান প্রভৃতি অনেকে তথায় উপস্থিত। আর উপস্থিত শ্যামলাল। ভৃত্য অনবরত তামাক দিতেছে। চণ্ডীচরণ চক্ষু মুদিয়া ধীরে ধীরে এক পার্শ্বে বসিয়া অতি সন্তর্পণে তামাকু টানিতেছে। হরকুমার বাবু শুষ্ক শালপাতার নলযুক্ত হুঁকা টানিয়া যথেষ্ট ধূম উদ্গিরণ করিতেছেন। তাঁহার পার্শ্বে অনেক কাগজ-পত্র, খাতা প্রভৃতি। হরকুমার বাবু বলিলেন,— "শ্যামলাল বাবু, আপনি কাশী আসিয়াছেন, এ সংবাদ আমি বাটীতেই জানিয়া আসিয়াছি। আপনার নিকট আজ আমি একটি গুরুতর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছি। আপনি মনোযোগ সহকারে তাহা শ্রবণ করিয়া উচিত ব্যবস্থা করিলেই ভাল হয়।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আপনার অনেক কথা শুনিয়া কান ঝালাপালা হইয়াছে। বিস্তর জ্বালায় পড়িয়া অতি দুঃখে কাশী আসিয়াছি। এখানে আপনি আমাকে আর উপদেশ দিয়া জ্বালাতন করিবেন না। আপনার সহিত দেখা হইবে জানিলে আমি এখানে আসিতাম না। আপনার সহিত আমার সকল সম্পর্কেরই শেষ হইয়াছে। তবে কেন আপনি আমাকে ত্যক্ত করেন?"

হরকুমার বলিলেন,—"আপনাকে উপদেশ দিবার আমার কোনই প্রয়োজন নাই। যে কথা আমি এখন বলিব, তাহা আপনি শুনিতে বাধ্য। সহজে না শুনেন, আইন-আদালতের দ্বারা তাহা আপনাকে শুনাইব।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"যদি সহজে কথা শেষ করিতে পারেন ত বলুন। আইন-আদালতের আমি কোন ধার ধারি না। শুনিবার মত কথা হয়, আমি

শুনিব, নচেৎ কোন আইন-আদালত আমাকে তাহা শুনাইতে পারিবে না।"

হরকুমার বলিলেন,—"আপনি যেরূপ ভাবেই গ্রহণ করুন, আমার কার্য্য আমি করি। শুনুন, শ্যামলাল বাবু, আপনি স্বর্গীয় রাধাবিনোদ বাবুর পুত্র নহেন; যে সম্পত্তি এত দিন আপনি ভোগ করিয়া আসিতেছেন, তাহা আপনার নহে। এই নবীন সন্ন্যাসী উমাশঙ্কর ৺রাধাবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ঔরসজাত পুত্র এবং পিতৃ-পরিত্যক্ত সম্পত্তির যথার্থ উত্তরাধিকারী।"

শ্যামলাল ক্রোধসহকারে বলিলেন,—"জুয়াচুরি মতলবটা বাহির করিয়াছ মন্দ নহে। চাকরী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছি বলিয়া আমাকে ভয় দেখাইবার বেশ ফন্দি বাহির করিয়াছ দেখিতেছি। তোমার একার মতলবে এ কাজ হয় নাই—আমার পরমশত্রু ঐ ভট্টাচার্য্যি ঠাকুর আর উহার ছেলে নবীনও ইহার মধ্যে আছে। আমি তোমাদিগকে বিলক্ষণ রকম শিক্ষা দিব। আমার স্ত্রী গতকল্য নিরুদ্দেশ হইয়াছে। আছে কি না সন্দেহ। তাহার পীড়াও খুব কঠিন। আপাততঃ বুদ্ধির ভুলে সম্পত্তি আমার স্ত্রীর হাতে গিয়া পড়িয়াছে বটে; কিন্তু ভগবান্ দয়া করিয়া সে কণ্টক দুর করিয়া দিতেছেন। তোমরা বুঝি তাই জানিতে পারিয়া আমাকে দম দিয়া কিছু মারিয়া লইতে চাহ?"

চণ্ডী বলিল,—"কে মহাপ্রভু আপনি! বুদ্ধিটা ত বড়ই সরু দেখিতেছি। বাবার জন্মেও কখন একটান গুলী খাও নাই! তা হইলে বুদ্ধিটা কখনই এত নিরেট থাকিত না।"

হরকুমার বলিলেন,—"আপনার নিকট কিছুই মারিয়া লইবার ইচ্ছা নাই; আপনাকে জব্দ করিবার কোনই ফন্দি নাই। শৃগাল-কুক্কুর পর্য্যন্ত এখন আপনার দুঃখে কাঁদে। বুদ্ধির দোষে আপনি নিজের পায়ে নিজে কুঠার মারিয়াছেন। আপনি এখন দয়ার পাত্র। আমাদিগকে আপনি যেরূপ শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন দিবেন, তাহাতে আমরা একটুও ভীত নহি। এক্ষণে আপনি আমার কথা শুনিয়া যাউন। সমস্ত শুনিয়া আপনার যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপ কার্য্য করিবেন; আমি কোন অনুরোধও করিব না, কোনও ভয়ও দেখাইব না।"

শ্যামলাল নীরবে বসিয়া রহিলেন। হরকুমার বাবু বলিতে লাগিলেন,—"আপনার পিতার দুই বিবাহ; তাহা আপনি জানেন। জ্যেষ্ঠা স্ত্রী মাতঙ্গিনী দেবীর অনেক বয়সেও সন্তান না হওয়ায়, রাধাবিনোদ বাবু শ্যামনগরের ৺নিধিরাম চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা জগত্তারিণী দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন; জগত্তারিণী পরমা সুন্দরী ও গুণবতী ছিলেন। সরলতা, ভয় ও সঙ্কোচে তাঁহার দেহ পরিপূর্ণ ছিল। স্বামিভবনে আসার পর এক বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত মাতঙ্গিনী দেবীর বিশেষ মনান্তর ঘটে নাই। এক বৎসর পরে জগত্তারিণীর গর্ভ-সঞ্চারের পর হইতেই তিনি মাতঙ্গিনীর চক্ষুঃশূল হইয়া উঠেন। রাধাবিনোদ বাবু দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে বংশধরের আবির্ভাব হইতেছে জানিয়া, স্বভাবতঃ তাঁহার প্রতি একটু বিশেষ যত্নপরায়ণ হন। ক্রুর-হৃদয়া মাতঙ্গিনীও সঙ্গে সঙ্গে নিজের গর্ভ-সঞ্চার হইয়াছে বলিয়া মিথ্যা সংবাদ প্রচার করেন এবং গর্ভোদয় হইলে যেরূপ বমনেচ্ছা, অরুচি প্রভৃতি হইয়া থাকে, তৎসমস্তের ভাণ করিতে থাকেন। সপত্নীরূপ কণ্টককে দূর করিবার জন্য তিনি এক অদ্ভুত উপায়ও অবলম্বন করেন। গঙ্গাস্নানের ছলনায় জগত্তারিণীকে সঙ্গে লইয়া তিনি কলিকাতায় আইসেন। তথায় কালীঘাটে পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদের নিমিত্ত এক বাসা স্থির ছিল। সে বাসায় অবস্থানকালে তিনি জগত্তারিণীকে বলেন যে, 'আমি তোমাকে এই স্থানে লোকের দ্বারা হত্যা করিয়া গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিব বলিয়াই সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি। এখানে তোমার স্বামী নাই। তুমি জান, আমার হাতে অনেক টাকা আছে। সেই টাকার বলে আমাদিগের সঙ্গে যে পাঁচ-সাত জন লোক আছে, তাহাদিগকে আমি সহজেই বাধ্য করিয়া ফেলিব এবং যাহা বলিতে বলিব, তাহারা বাটী ফিরিয়া তাহাই বলিবে।' অতি সরলা, নিতান্ত ভীতা জগত্তারিণী তাঁহার পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, 'আমার গর্ভে সন্তান আছে দিদি! তুমি আমাকে মারিলে আমার সন্তান মারা যাইবে। আর যাহা করিলে তোমার সুবিধা হয় বল; কিন্তু আমাকে প্রাণে মারিও না।' অনেক বিবেচনা করিয়া মাতঙ্গিনী বলেন যে, 'তুই কাশী চলিয়া যা। তোর যাহা অলঙ্কার-প্রতিকার সঙ্গে আছে এবং যে বাক্স সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিস, তাহাই তুই সঙ্গে লইতে পাইবি। আর কখন স্বামীর সহিত পত্র লেখালিখি করিতে পাইবি না। আমি প্রচার করিব, কালীঘাটে ওলাউঠা রোগে তুই মারা গিয়াছিস্ এবং এখানকার গঙ্গাতীরে তোর যথারীতি সৎকার হইয়াছে। যদি তুই কখনও স্বামীর সহিত আলাপ-পরিচয়ের চেষ্টা করিস বা নিজের সংবাদ প্রকাশ করিস, তাহা

হইলে আমি তখনই প্রমাণ করাইয়া দিব, তুই কালীঘাটে আমাদের সঙ্গ ছাড়িয়া এক মাড়োয়ারীর সহিত পলাইয়া গিয়াছিস। বৃদ্ধ স্বামীকে ত্যাগ করিবার চেষ্টায় তুই অনেক দিন ফিকির খুঁজিতেছিলি। কালীঘাটে গিয়া সুযোগ পাইয়া তুই কুলে কালী দিয়া চলিয়া গিয়াছিস্। কলঙ্কের ভয়ে আমি সে কথা এত কাল বলি নাই। সঙ্গের লোকজনও এইরূপ সাক্ষ্য দিবে। সে কথা শুনিলে তোকে গ্রহণ করা দূরে থাকুক, স্বামী তোর ছায়াও স্পর্শ করিবেন না। বাড়াব ভাগ তোর গর্ভের সন্তান যদি জীবিত থাকে, সেও বেশ্যার পুত্ররূপে কলঙ্কিত হইয়া কোন সমাজেই স্থান পাইবে না।’ কোথায় কাশী? কেমন করিয়া সেখানে যাইব? কোথায় থাকিব? এই সকল ভাবিয়া জগত্তারিণী আকুলভাবে রোদন করিতে লাগিলেন; কিন্তু প্রাণে মারা যাওয়া বা কোনরূপে কলঙ্কিত হওয়ার অপেক্ষা কাশী-গমনই তাঁহার শ্রেয়ঃ মনে হইল। তাঁহাদের সঙ্গে সোনামণি-নাম্নী এক প্রবীণা পাচিকা ব্রাহ্মণী ছিলেন। তিনি জগত্তারিণীর অবস্থা অনুভব করিযা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া কাশী যাইতে ইচ্ছা করিলেন এবং মাতঙ্গিনীর নিকট করযোড়ে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। বলিলেন, ‘তাঁহার বৃদ্ধকাল, সন্তানাদি নাই, দেশে ফিরিয়া আসিবারও কোন প্রয়োজন নাই। এ অবস্থায় কাশীবাসই তাঁহার প্রার্থনীয়।’ অনেক বিবেচনা করিয়া মাতঙ্গিনী বলিলেন,—‘যাইতে ইচ্ছা কর যাইতে পার; কিন্তু যদি তুমি কখন এই সকল কথা প্রকাশ করিবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে তোমার ও জগত্তারিণীর উভয়েরই সর্ব্বনাশ না করিয়া আমি ছাড়িব না। তুমিই যে টাকা খাইয়া জগত্তারিণীকে কুপথে লইয়া গিয়াছ, ইহা আমি উত্তমরূপে প্রমাণ করিব। তাহা হইলে তোমাকে ফাটক খাটিতে হইবে।’ জগত্তারিণী সোনামণির সহিত কাশী চলিয়া আসিলেন এবং তাঁহারা দুই জনে একটি ক্ষুদ্র বাটীতে অতি দীনভাবে মনের দুঃখে কাল কাটাইতে লাগিলেন। গায়ে কয়েকখানি গহনা ছিল, সঙ্গের বাক্সেও দুই একখানি গহনা ও কতকগুলি প্রয়োজনীয় জিনিস ছিল। মাতঙ্গিনী দয়া করিয়া নগদ ২৫০৲ টাকা দিয়াছিলেন। সুতরাং সামান্যভাবে গ্রাসাচ্ছাদন চলার কোনই অসুবিধা হইল না। কাশীতে যথাকালে জগত্তারিণী এক ভুবনমোহন সন্তান প্রসব করিলেন। সেই সন্তান এই মহাপুরুষ উমাশঙ্কর। সন্তানের বয়স দুই বৎসর ছাড়াইলে জগত্তারিণীর কাশীলাভ ঘটে। তখন সোনামণি অগত্যা উমাশঙ্করকে লালন-পালন করিতে থাকেন। শরীর রোগজীর্ণ হওয়ায় ক্রমে সোনামণির আসন্নকাল উপস্থিত হয়। পূর্ব্ব হইতেই মানবরূপী দেবতা ঘনানন্দ স্বামীর সহিত সোনামণির পরিচয় ছিল। আসন্নকালে সোনামণি সেই মহাপুরুষকে ডাকিয়া তাঁহার হস্তে এই দেব-শিশুকে সমর্পণ করেন; পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি অনুসারে তিনি ঘনানন্দের নিকট শিশুর কোনই পরিচয় প্রকাশ না করিয়া কেবল এইমাত্র বলেন যে, এই বালক ব্রাহ্মণ-সন্তান এবং যদি কখন কাহারও এই বালকের পরিচয় জানিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে বঙ্গদেশে রামনগর নামক গ্রামে গঙ্গামণি-নাম্নী এক ব্রাহ্মণীর হস্তস্থিত কতকগুলি কাগজ দেখিলেই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন; সোনামণি স্বর্গলাভ করার পর হইতে ঘনানন্দ স্বামী এ পর্য্যন্ত উমাশঙ্করকে পুত্রাধিক যত্নে শিক্ষাদি প্রদান করিতে করিতে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিতেছেন।

এ দিকে মাতঙ্গিনী গৃহাগতা হইয়া জগত্তারিণীর ওলাউঠা রোগে মৃত্যুর সংবাদ ঘোষণা করিয়া দিলেন, রাধাবিনোদ বাবুর দুঃখের সীমা রহিল না। কথাটা তৎকালেই আমার একটু সন্দেহজনক বলিয়া বোধ হইয়াছিল। বাড়ীতে সেই সময়ে সৌরভী নামে তন্তুবায়-জাতীয়া এক বিধবা ব্যভিচারিণী ঝি ছিল। এক জন দ্বারবানের সহিত তাহার বিশেষ প্রণয় ঘটে। এই সময়ে তাহার গর্ভোদয় হয়। মাতঙ্গিনী বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে নিরাপদ্ স্থানে রক্ষা করেন। তাহার যে মুহূর্ত্তে প্রসব-বেদনা উপস্থিত হয়, মাতঙ্গিনীও সেই সময়ে প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া সূতিকাগারে প্রবেশ করেন এবং সমুচিত সময়ে ধাত্রী ডাকাইব বলিয়া উৎকণ্ঠিত স্বামীকে নিরস্ত করিয়া রাখেন। যথাকালে সৌরভী এক পুত্র-সন্তান প্রসব করিল। সেই পুত্র ধাত্রীর কৌশলে মাতঙ্গিনীর সূতিকাগারে আনীত হইয়া রাধাবিনোদ বাবুর সন্তানরূপে পরিচিত হইল। সেই সন্তান এই শ্যামলাল।”

হরকুমার বাবু নিরস্ত হইলেন। চণ্ডী গুলীখোর বলিল,—“দাদা, এ কেচ্ছার কাছে মহাভারত-রামায়ণ লাগে না। শ্যামলাল ভায়া, বাপ-মার সকল পরিচয় তো শুন্‌লে; তা এখন তুমি কি বল্‌তে চাও, বল।”

শ্যামলাল বলিল,—“যে দুরাত্মা এইরূপে আমার পিতৃ-মাতৃ-নামে কলঙ্ক আরোপ করিতে চাহে, তাহাকে টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া কাটা আবশ্যক। এই নরাধম হরকুমার চিরকাল আমার পিতার অন্নে

পালিত হইয়া এক্ষণে বৃদ্ধ-বয়সে আমার পিতা-মাতার দুর্নাম করিতে বসিয়াছে। কি বলিব, আমি এক্ষণে অক্ষম, আর তোমাদের হাতে পড়িয়াছি; নচেৎ এখনই ইহার প্রতিফল দিয়া তবে কথা কহিতাম।"

হরকুমার বলিলেন,—"তোমার কোন প্রতিফল দিবার সাধ্য এখনও নাই, পরেও হইবে না। তোমার কথায় আমি রাগ করিব না। কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তুমি দয়ার পাত্র। রাধাবিনোদ বাবু আমার ভাই বল, বন্ধু বল, প্রভু বল, সকলই ছিলেন। তিনি তোমাকে পুত্র বলিয়াই জানিয়া গিয়াছেন। অনেক সময়ে তোমার ইতরাচরণ দেখিয়া তোমাকে বিজাতক বলিয়া তিনিও সন্দেহ না করিয়াছেন, এমন নহে। সে যাহাই হউক, তিনি তোমাকে পুত্র মনে করিয়া পরলোক-গমন করিয়াছেন। সেই খাতিরে শ্যামলাল, আমরা এখনো তোমার সহিত বাক্যালাপ করিতেছি ও তোমাকে বিছানায় বসিতে দিয়াছি। তুমি এ সকল কথা বিশ্বাস না করিলেও কোন ক্ষতি নাই। কারণ. ইহার প্রত্যেক কথার অখণ্ডনীয় প্রমাণ আমার হাতে রহিয়াছে; রাজ-বিচারে দশের সমক্ষে সে প্রমাণ উত্থাপিত করিলে তোমার কথা কহিবার উপায় থাকিবে না এবং যে পথের ভিখারী তুমি এখন হইয়াছ, তোমাকে চিরদিনই তাহাই থাকিতে হইবে। তোমার জন্ম-বৃত্তান্ত আমি আর এই জরিফ কোচ্‌ম্যান পূর্ব্ব হইতেই জানি। জগত্তারিণী তখন যে মারা যান নাই, এ সন্দেহ আমার চিরদিনই মনে ছিল। কিন্তু তিনি কোথায় আছেন, তাঁহার কি সন্তান হইয়াছে, সে সন্তান জীবিত আছে কি না, এই সকল কোন সন্ধানই করিবার আমার সুযোগ হয় নাই। শুভক্ষণে তুমি আমাকে কর্ম্ম হইতে অবসর দিলে, তাই সকল সন্ধান করিবার সুযোগ উপস্থিত হইল। এ দিকে সন্ধান না হইলে তোমার জন্ম-বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া এত বড় বিষয়টা সরকার বাহাদুরের হাতে তুলিয়া দেওয়ার অপেক্ষা যে সে এক জন ভোগ করাও ভাল বিবেচনায় আমি এত দিন নিরস্ত ছিলাম। এক্ষণে আমার সকল প্রমাণ ঠিক হইয়াছে। কোন স্থানে আর একটুও সন্দেহ নাই। ভগবানের কৃপায় প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা রাধাবিনোদের ঔরসজাত পুত্রের সন্ধান পাইয়াছি, ইহা আমার পরমানন্দের বিষয়। তাঁহার অন্নে আমার শরীর; কথঞ্চিৎ প্রত্যুপকার এ অধমের দ্বারা সাধিত হইল, ইহা আমার পরম ভাগ্য।"

চণ্ডী বলিল,—"দাদা, হেলায় সব মাটী করিয়াছ! তোমার এমন সুন্দর কথার জুত, এমন পাকা বন্দোবস্ত, এর পর যদি তুমি দুই একটান গুলী টানিতে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই একটা অতি বড়লোক হইতে। এখনও সময় আছে, কা'ল হইতে ছোট ভাইয়ের পরামর্শ শুনিয়া দুই একটি করিয়া ছিটা টানিতে অভ্যাস কর দাদা।"

শ্যামলাল বলিল,—"লোকটা বলিতেছে মন্দ নয়। হরকুমারের এ গল্প গুলীখোরেরই কথা বটে। আগে ত গুলী খাইতে না তুমি? চাকরী যাওয়ার পর হইতে এই বিদ্যা শিখিয়াছ বুঝি?"

হরকুমার বলিলেন,—"ভাল, দেখুন প্রমাণ।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রমাণ।

হরকুমার বলিলেন,—"আমি এমন কোন কথাই বলিব না, যাহার অখণ্ডনীয় প্রমাণ আমার হস্তে নাই। এই ভাবিয়া প্রমাণ সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত আমি পরিশ্রম, যত্ন ও ব্যয়ের কোন ত্রুটি করি নাই। স্বর্গীয় রাধাবিনোদ বাবুর সহিত আমার যেরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহাতে কর্ত্তব্যানুসারে তাঁহার ঔরসজাত পুত্রকে অন্বেষণ করিয়া তদীয় বিষয়-সম্পত্তির অধিকার প্রদান করিতে আমি বাধ্য। এত দিন আমি এই কর্ত্তব্য-পালন করিতে পারি নাই; এ জন্য আমি সাতিশয় অপরাধী হইয়াছি সত্য; কিন্তু ভগবান্ যাহা করেন, সকলই ভালর জন্য। রাধা-বিনোদ বাবুর পুত্র উমাশঙ্কর অধুনা যেরূপ দেব-তুল্য-চরিত্র-সম্পন্ন হইয়াছেন, যেরূপ শিক্ষা ও জ্ঞানে বিভূষিত হইয়াছেন, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাকে তাঁহার বর্ত্তমান সংসর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে কখনই এরূপ ঘটিতে পারিত না। এক্ষণে আমি যেরূপ পরিশ্রম করিয়া যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা আপনারা সকলে দেখুন—শুনুন; তাহার পর ইচ্ছা হয়, শ্যামলাল তাহা মানিয়া লইবেন, না লন, রাজ-বিচারে তাঁহাকে যে পরাভূত হইতে হইবে, সে বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নাই।"

নীলরতন বলিলেন,—"তুমি যেরূপ কাণ্ডের কথা বলিতেছ, কোন উপন্যাস-লেখকের কল্পনাও এরূপ ব্যাপারের অবতারণা করিতে পারে না। এক্ষণে তুমি প্রথম হইতে সব কথা বল।"

হরকুমার বলিতে লাগিলেন,—"জগত্তারিণীর বিবাহের অনতিকাল পরে তাঁহার দরিদ্র পিতা-মাতা

লোকান্তরিত হন। একমাত্র বিধবা জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ভিন্ন তাঁহার আর কেহ ছিলেন না। সে জ্যেষ্ঠা ভগ্নী শ্বশুরালয়ে বাস করিতেন। জগত্তারিণীর পিতামাতার সহিত সেই কন্যা-জামাতার অতিশয় মনান্তর ছিল। বিতাড়িত হইয়া কাশী আসিবার সময় জগত্তারিণীর সহিত একটি বাক্‌সে কয়েকখানা অলঙ্কার ও নগদ ১৫০৲ টাকা ছিল, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেই অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া ও নগদ টাকা ব্যয় করিয়া তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের কোন বিশেষ কষ্ট হয় নাই। তাঁহার লোকান্তরের পরও ধর্ম্ম-পরায়ণা সোনামণির কৃপায় বালক উমাশঙ্করকে বিশেষ কোন কষ্ট পাইতে হয় নাই। উমাশঙ্করের জন্ম হইলে কাশীধামের প্রধান জ্যোতির্ব্বিৎ শ্রীযুক্ত অদ্বৈতচরণ আচার্য্য মহাশয় বালকের এক জন্ম-পত্র প্রস্তুত করেন। সেই জন্ম-পত্র দেখিলে বুঝা যাইবে যে, এই বালক উমাশঙ্কর যথা-সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং জগত্তারিণীর গর্ভে ও রাধাবিনোদের ঔরসে ইঁহার জন্ম হইয়াছে। যিনি এই কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়াছেন, তিনি এখনও জীবিত আছেন এবং আমি ডাকিবামাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে এখানে উপস্থিত হইলেন, এরূপ ব্যবস্থা আমি করিয়া রাখিয়াছি। তিনি জগত্তারিণীকে দেখিয়াছেন এবং তাঁহার বয়স, আকৃতি-প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় সকল কথাই জানেন। আপাততঃ আপনারা সেই কোষ্ঠী দর্শন করুন।"

এই বলিয়া হরকুমার একখানি হরিদ্রা-বর্ণ কাগজে লিখিত জন্ম-পত্রিকা ফেলিয়া দিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহা দেখিতে দেখিতে সবিস্ময়ে একবার উমাশঙ্করের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। হরকুমার বলিতে লাগিলেন,—"উমাশঙ্করের জননীকে উক্ত জ্যোতির্ব্বিৎ বলিয়াছেন, 'মা, কালে তোমার এই সন্তান দেবতুল্য ব্যক্তি হইবে। তুমি কেন এরূপ অল্পবয়সে এমন করিয়া আছ, বলিতে পারি না; কিন্তু ভবিষ্যতে সন্তানের জন্য সুব্যবস্থা করিতে ভুলিও না।' জগত্তারিণী যখন বুঝিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুকাল নিকটস্থ, তখন পাছে পিতৃ-পরিচয়ের অভাবে সন্তানকে অপমানিত হইতে হয়, ইহা মনে করিয়া এবং উক্ত জ্যোতির্ব্বিৎ মহাত্মার বাক্য স্মরণ করিয়া, বিবাহ হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত ধারাবাহিকরূপে লিখাইয়াছিলেন। অত্রত্য গণেশমহল্লার শ্রীবামনদাস চক্রবর্ত্তী তাহার লেখক। জগত্তারিণী সামান্য লেখা-পড়া জানিতেন; তিনি স্বয়ং সেই বৃত্তান্তে স্বাক্ষর করিয়াছেন। চারিজন ভদ্রলোক তাহার সাক্ষী ছিল। তন্মধ্যে উক্ত লেখক বামনদাস চক্রবর্ত্তী, হরিপদ ভট্টাচার্য্য এবং দুর্গাগতি রায় এই তিন ব্যক্তি এখনও জীবিত আছেন এবং এক্ষণে এমন স্থানে অপেক্ষা করিতেছেন যে, আমি ডাকিবামাত্রই এ স্থানে উপস্থিত হইতে পারিবেন। আপাততঃ আপনারা সেই লিখিত বৃত্তান্ত পাঠ করুন। ইহাতে যাহা লিখিত আছে, তাহার সমস্ত মর্ম্ম পূর্ব্বেই আপনাদিগকে জানাইয়াছি।"

হরকুমার বাবু এক তাড়া কাগজ ফেলিয়া দিলেন; নীলরতন বাবু তাহা হস্তে তুলিয়া লইলেন। হরকুমার বাবু বলিতে লাগিলেন,—"বিবাহের পর রাধাবিনোদ বাবু এই পরমা রূপবতী ও গুণবতী ভার্য্যা জগত্তারিণীর প্রতি সাতিশয় অনুরাগী হইয়া উঠেন। এক দিন তিনি সেই অনুরাগের প্রাবল্যে জগত্তারিণীর সহিত স্বকীয় বিবাহ ও প্রেমের পরিচায়ক একটি সুললিত সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন এবং স্বকীয় প্রেমের অখণ্ডনীয় নিদর্শন-স্বরূপে তাহা স্বহস্তে অতি উৎকৃষ্ট কাগজে লিখিয়া জগত্তারিণীকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। বিবাহের অনতি-কাল পরে পিতার মৃত্যুর সময়ে জগত্তারিণী একবার পিত্রালয়ে আসিয়াছিলেন। সেই সময়ে রাধাবিনোদ তাঁহাকে প্রতিদিন একখানি করিয়া পত্র লিখিতেন। প্রথম গর্ভোদয় হইলে নিরতিশয় আনন্দিত হইয়া রাধাবিনোদ বাবু জগত্তারিণীর নাম সংযোগে স্বকীয় সন্তানের আবির্ভাবসূচক এক শ্লোক রচনা করিয়া-ছিলেন। সে শ্লোক তৎকালে আমরা সকলেই দেখিয়াছিলাম এবং গণ্যমান্য অনেক ব্যক্তি তাহা পাঠ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, এই সার্ব্বভৌম মহাশয়ও তাহা অবগত আছেন।"

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—"আমার তাহা বেশ মনে আছে। বোধ হয়, আমি একটু চেষ্টা করিলে তাহা আবৃত্তি করিতেও পারি।"

হরকুমার বলিতে লাগিলেন,—"জগত্তারিণীর বাক্‌সে ঐ সকল চিঠি ও শ্লোক অমূল্য সম্পত্তির ন্যায় যত্ন সহকারে রক্ষিত ছিল। আপনারা রাধাবিনোদ বাবুর স্বহস্ত-লিখিত সেই সকল পত্র ও শ্লোক পাঠ করুন।"

এই বলিয়া হরকুমার বাবু আরও কতকগুলি কাগজ ফেলিয়া দিলেন। সার্ব্বভৌম মহাশয় তৎসমস্ত গ্রহণ করিলেন।

হরকুমার বাবু বলিতে লাগিলেন,—"রাধাবিনোদ বাবুর হস্তাক্ষর লক্ষ স্থানে এখনও বিদ্যমান আছে এবং তাহা সুন্দররূপ চিনিতে পারেন, এমন অনেক লোকও বর্ত্তমান আছেন, সুতরাং সে সম্বন্ধে সন্দেহের

কোন কারণ নাই। জগত্তারিণী এই সকল পত্রাদি ও স্বলিখিত বৃত্তান্ত পুত্রের পিতৃ-পরিচয় বিষয়ে যথেষ্ট হইবে জ্ঞান করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বে তৎসমস্ত করুণ-হৃদয়া সোনামণির হস্তে সমর্পণ করেন। সোনামণি কিছু দিন পরে আপনার শরীর অধিক দিন থাকিবে না বুঝিয়া বঙ্গদেশের রামনগর-নিবাসিনী সহোদরা গঙ্গা-মণি দেবীর হস্তে সেই সকল কাগজ সযত্নে রক্ষা করিবার ভার প্রদান করেন। কাগজগুলির প্রয়োজনীতা ও মূল্য গঙ্গামণিকে বুঝাইয়া দিতে তিনি ত্রুটি করেন নাই। গঙ্গামণির সন্তান ছিল না। অন্য দুই সহোদরার দুই পুত্র আছেন। তাহার মধ্যে এই চণ্ডীচরণ এক জন; আর এক জন বর্দ্ধমানের আদালতে মোক্তারী করেন। গঙ্গামণি মৃত্যুর পূর্ব্বে আপনার যে সকল সম্পত্তি ছিল, তাহা চণ্ডীচরণকে দান করিয়াছিলেন। আর সেই কাগজ-পত্র দ্বারা কোন না কোন সময়ে কিছু আর্থিক লাভ হইবে মনে করিয়া উক্ত মোক্তারকে দিয়া গিয়াছিলেন। আমি স্বয়ং গঙ্গামণি দেবীর বাটী তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছি। সোনামণি মরিবার পূর্ব্বে জগত্তারিণীর বৃত্তান্তলেখক অত্রত্য বামনদাস চক্রবর্ত্তীর দ্বারা সেই কাগজগুলি ভাল করিয়া রাখিবার নিমিত্ত গঙ্গামণিকে এক পত্র লেখাইয়াছিলেন; সেই পত্রের ছিন্ন কিয়দংশ আমি সোণামণির বাটীর জঞ্জালের মধ্য হইতে প্রাপ্ত হই। সেই ছিন্ন অংশ মিলাইয়া অনেক যত্নে আমি প্রকৃত পত্র প্রস্তুত করিয়াছি; উভয়ই আপনারা দেখুন।”

হরকুমার একখানি গলিত ও একখান ভাল কাগজ ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর আবার বলিতে লাগিলেন,—“তাহার পর গঙ্গামণির বাটীর উক্ত জঞ্জালের মধ্য হইতে আর একখানি পত্র পাই। সে পত্র উক্ত বর্দ্ধমানের মোক্তারের লিখিত। সেই মোক্তারের পত্র না পাইলে এ কাগজ সকল যে তাঁহার হস্তগত হইয়াছে, ইহা জানিতে পারা আমার পক্ষে অসম্ভব হইত। সে পত্র এই, আপনারা দেখুন। সেই পত্রের সাহায্যে সন্ধান করিয়া মোক্তার রাম-চন্দ্রের নিকট হইতে চণ্ডীচরণের কৌশলে কাগজগুলি হস্তগত করিতে পারিয়াছি। আমি জগত্তারিণীর পিত্রালয়ে গিয়াছিলাম এবং তাঁহার বিধবা জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর বাটীতেও গমন করিয়াছিলাম। উক্ত জ্যেষ্ঠা ভগ্নীকে আমি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি; তিনি এখানেই আছেন। এতক্ষণে আপনারা বুঝিয়া থাকিবেন বোধ হয় যে, জগত্তারিণীর রাধাবিনোদ বাবুর সহিত বিবাহ, তাঁহার গর্ভসঞ্চার, কাশীবাস এবং এই পুত্র উমাশঙ্করকে রাখিয়া মৃত্যু, এ সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণের কোনই অভাব নাই। তথাপি আর এক বিষয়ে আপনাদিগের মনে সন্দেহ হইলেও হইতে পারে। জগত্তারিণী কালীঘাটে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন, ইহাই সর্ব্বত্র প্রচার। ১২৬২ সালে রাধাবিনোদ বাবুর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১২৭৪ সালে তাঁহার গর্ভসঞ্চার হয়; যখন চারি মাসের গর্ভ, তখন তিনি কালীঘাটে আইসেন। সরকারী জমা-খরচের খাতায় সে সম্বন্ধে অনেক খরচ পড়িয়াছে। আমি সেই সালের জমা-খরচের খাতা সংগ্রহ করিয়াছি। আপনারা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, উক্ত সালের চৈত্র মাসে তাঁহারা কালীঘাটে আসিয়াছিলেন এবং দশ দিন তথায় ছিলেন। উক্ত সালের ৭ই চৈত্র বিশেষ যোগ ছিল; সেই যোগ উপলক্ষেই তাঁহারা গঙ্গা-স্নানে আসিয়াছিলেন আমি সেই সনের পঞ্জিকা সংগ্রহ করিয়াছি। এই পঞ্জিকার সহিত জমা-খরচের ঐক্য করিয়া দেখিলে সময় সম্বন্ধে আপনাদের আর কোন গোল থাকিবে না।”

হরকুমার বাবু একখানি জীর্ণ জমা-খরচের খাতা ও একখানি জীর্ণ পঞ্জিকা ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর আবার বলিতে লাগিলেন,—“কালীঘাটে জন্ম-মৃত্যুর রেজিষ্টারী আছে। আমি সেই রেজিষ্টারী বহি হইতে ১২৬৪ সালের ফাল্গুন, চৈত্র এবং ৬৫ সালের বৈশাখ এই তিন মাসের মৃত্যু-তালিকার সহি-মোহর-যুক্ত নকল সংগ্রহ করিয়াছি। তাহাতে জগত্তারিণীর মৃত্যুর কোনই উল্লেখ নাই। সুতরাং এটা যে মিথ্যা কথা, তাহার কোনই সন্দেহ থাকিতেছে না। আপনারা সেই মৃত্যু-তালিকার নকল দেখিতে পারেন।”

এই বলিয়া হরকুমার আর একটা মোহরকরা কাগজ ফেলিয়া দিলেন।

চণ্ডী কহিল,—“দাদা, তুমি হেলায় হারাইয়াছ। এত বুদ্ধি তোমার; যদি সকালে বিকালে বেশী না হউক, দশটা করিয়াও ছিটা টানিতে, তাহা হইলে তুমি মানুষের শেরা হইতে পারিতে।”

হরকুমার বলিলেন,—“এই ঘটনার ঠিক ছয় মাস পরে—১২৬৫ সালের কার্ত্তিক মাসের ১৭ই তারিখে উমাশঙ্করের জন্ম হয়। সুতরাং কালবিষয়ে আর কোনই গোল থাকিতেছে না। জগত্তারিণীর যখন মৃত্যু হয়, তখন রামনগরের এক কায়স্থ কাশী আসিয়াছিলেন। তিনি জগত্তারিণীর মৃত্যু-সময়ে উপস্থিত ছিলেন এবং সৎকারের সহায়তা করিয়াছিলেন।

বালক উমাশঙ্করকে তিনি দেখিয়াছিলেন এবং এই বালকের ভবিষ্যৎ যে বড়ই শুভ, তাহার মাতা যে সপত্নীর শাসনে পলাতকা, তাঁহার পিতা যে বঙ্গদেশের এক জন প্রধান ধনবান্ ব্যক্তি এবং কালে এই বালকেরই যে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়া সম্ভব, এ সকল সংবাদই তিনি তৎকালে শুনিয়াছিলেন ও দেশে আপনার পত্নীর নিকট সেই সংবাদ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। পত্র-লেখক মহাশয় এখন জীবিত নাই, কিন্তু তাঁহার পত্নী এখনও জীবিতা আছেন। আমি তাঁহার নিকট হইতে অনুকূল প্রমাণ বোধে সেই পত্রখানি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাও আপনারা দেখিতে পারেন।"

হরকুমার আর একখানি পত্র ফেলিয়া দিলেন। বলিলেন,—"এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য প্রায় শেষ হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, প্রমাণ আবশ্যকের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছে। আপনারা যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমি যে যে ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিলাম, তাহাদিগকে ডাকাইয়া বাচনিক প্রমাণও গ্রহণ করিতে পারেন।"

নীলরতন বলিলেন,—"আমরা যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে তোমার যুক্তি ও প্রমাণ আমাদিগের যথেষ্ট বলিয়াই মনে হইয়াছে। কিন্তু আমরা বুঝিলেও এ বিষয়ে ফল কি?"

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—"অদ্ভুত পরিশ্রম, অপরিসীম ধৈর্য্য ও অত্যাশ্চর্য্য কৌশল সহকারে তুমি সত্য ঘটনা প্রকাশ করিয়াছ। স্বর্গীয় কর্ত্তার দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহের বিষয় আমাদিগের ভালই জানা আছে। সে পত্নীর গর্ভোদয়ের পর কালীঘাটে মৃত্যুর কথা, সে দিনকার ঘটনা বলিয়া আমাদিগের মনে হইতেছে। সে সকল বৃত্তান্ত যে অলীক, তাহা বুঝিতে পারিয়া আজি আমাদের হৃদয় সুস্থ হইল। এ সকল বিষয়ে আমাদিগের আর কোন সংশয় নাই। কিন্তু আমাদিগের বিশ্বাসে কি যায় আসে?"

হরকুমার বলিলেন,—"আপনাদের বিশ্বাসই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমি এ জন্য মামলা-মোকদ্দমা করিব না; অদ্যই অথবা কল্যই উমাশঙ্করের নামে রাধাবিনোদ বাবুর পরিত্যক্ত যাবতীয় সম্পত্তির রীতিমত দখল লইবার নিমিত্ত লোক যাত্রা করিবে। এই মুহূর্ত্ত হইতেই সেই সম্পত্তিতে শ্যামলাল বা তাহার পত্নী বিধুমুখীর কোন দখল আমি থাকিতে দিব না। আপনারা দশ জন বিজ্ঞ ভদ্রলোক সমস্ত ঘটনা শুনিয়া, আমি কোনরূপ অন্যায় বা অত্যাচার করিতেছি কি না, তদ্বিষয়ে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেই যথেষ্ট জ্ঞান করিব। মানুষ ভ্রমশীল হইতে পারে; আমারও যেন ভ্রম হইয়াছে। যদি তাহা হইয়া থাকে, অবশ্য বুদ্ধিমান্ লোকের বিবেচনায় তাহা ধরা পড়িবে। এই জন্যই আপনাদিগকে সমস্ত কথা জানাইয়া আপনাদিগের অভিপ্রায় জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছি। আপনারা যখন কোন সংশয় নাই বলিতেছেন, তখনই উমাশঙ্করের বিষয়প্রাপ্তি হইয়া গিয়াছে। আমি আজন্ম বিপুল বিভবের দেওয়ানী করিয়া আসিয়াছি; আইন-আদালত জানিতে আমার বাকী নাই। সুতরাং আমি এ জন্য একটুও ভীত নহি। উমাশঙ্কর অদ্য হইতে পিতৃ-সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। মোকর্দ্দমা করিতে হয়, শ্যামলাল করিবেন, আমি তখন তাহার জবাব দিব।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আমিই বা তাহা করিব কেন? দুই দিনমাত্র ঐ সন্ন্যাসী ঠাকুরের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে। আমি ঐ দেবতার গুণে মোহিত হইয়াছি। বিষয় যদি উঁহার হয়, তাহাতে আমার দুঃখ নাই। আপনি যেরূপ বলিতেছেন ও যে সকল কাগজপত্র দেখাইতেছেন, তাহাতে বুঝিতেছি, উমাশঙ্কর জগত্তারিণী দেবীর সন্তান বটে, কিন্তু আমার যে মাতঙ্গিনী দেবীর গর্ভে জন্ম হয় নাই, তাহার বিশেষ প্রমাণ আপনি কিছু বলেন নাই।"

হরকুমার বলিলেন,—"ঠিক কথা, তাহার প্রমাণ আমার নিকট আছে। এই জরিফ কোচ্‌ম্যান এবং আমি তাহার বিশেষ প্রমাণ জানি। যখন দ্বারবানের সহিত তোমার জননীর প্রসক্তি হয়, তখনই আমি এ সংবাদ জানিতে পারি। তাহার পর সে অন্তঃসত্ত্বা হইলে বাটীতে গর্ভপাতাদি পাপ ঘটিবে ভাবিয়া আমি তাহাকে তাড়াইয়া দিতে ইচ্ছা করি। সেই সময়ে সে মাতঙ্গিনী দেবীর এক পরওয়ানা লইয়া আমাকে দেয়। মাতঙ্গিনী দেবী সেই পরওয়ানা দ্বারা আমাকে উক্ত দাসীর কর্ম্ম রাখিয়া দিবার নিমিত্ত আদেশ করেন। সে পরওয়ানা আমার নিকট আছে; ইচ্ছা হয়, এই দেখ। কিন্তু তদবধি উক্ত দাসীর আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। অতীব গোপনে রাধাকিশোর জীউর মন্দিরের পশ্চাতে ভাঙ্গা বাটীতে মাতঙ্গিনী তাহাকে রাখিয়া দেন। সে বাটীতে অন্য লোকের প্রবেশাধিকার ছিল না। তথায় লোকও কখন কেহ যাতায়াত করিত না। এক দিন এই জরিফ কোচ্‌ম্যান রাত্রিকালে বিশেষ প্রয়োজনে সেই বাটীর পশ্চাদ্ভাগে গমন করিয়া, মনুষ্যের যন্ত্রণাসূচক ধ্বনি শুনিতে পায়। সাহসী জরিফ কৌতূহলপরবশ হইয়া, ভগ্ন প্রাচীর অতিক্রম

করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করে। সে তথায় দেখিতে পায় যে, সেই সৌরভী চাকরাণী এক সন্তান প্রসব করিয়াছে এবং বামা ধাত্রী তাহার শুশ্রূষা করিতেছে। প্রসূতি প্রকৃতিস্থ হইলে বামা গায়ের কাপড়ে ঢাকিয়া সেই সন্তান লইয়া প্রস্থান করিল। জরিফও লুক্কায়িত স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বামার অনুগমন করিল। দেখিল, বামা সন্তান সহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। অনতিকালমধ্যে প্রচার হইল, 'বড় ঠাকুরাণী পুত্র প্রসব করিয়াছেন।' তোমার মনে পড়ে বোধ হয়, কর্ত্তার মৃত্যুর পর এক দিন তুমি মাতঙ্গিনী দেবীকে প্রহার করিয়াছিলে। মাতঙ্গিনী দেবী তাহার প্রতীকারের জন্য আমাকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সেখানে তখন তুমিও উপস্থিত ছিলে। মাতঙ্গিনী সে সময় ক্রোধভরে কি বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহা তোমার মনে আছে কি? তিনি বলিয়াছিলেন, 'ইতরের পুত্র কখনও ভদ্র হইতে পারে কি? আমি নিজেই শ্বশুরবংশের সর্ব্বনাশ করিয়াছি'।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"এ কথা আমার মনে আছে। আপনি যে দিন কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন, সেই দিনও এরূপ একটা কথা বলিয়াছিলেন, তাহাও আমি ভুলি নাই। আর এক দিন জরিফ কোচ্‌ম্যান আমাকে বলিয়াছিল,—'এঁটকুড়ের পাত কখনও স্বর্গে যায় না।' সে কথাও আমার বেশ মনে আছে। এ সকল কথা ঐক্য করিয়া আমি সময়ে সময়ে অনেক ভাবিয়াছি।"

হরকুমার বলিতে লাগিলেন,—"জরিফ তোমার জন্মবৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়ার পর নির্জ্জনে আমার নিকট সকল কথা জানাইয়াছিল। ব্যাপারটা ঘোর কলঙ্কজনক এবং কর্ত্তার নিতান্ত মনস্তাপজনক হইবে বুঝিয়া, বিশেষতঃ যখন পোষ্যপুত্র-গ্রহণ ব্যতীত সম্পত্তির অন্য উত্তরাধিকারী পাইবার উপায় নাই দেখা যাইতেছে, তখন অনর্থক গোল করা অনাবশ্যক ভাবিয়া জরিফ ও আমি পরামর্শ করিয়া এ বিষয়ের কোনই গোল করি নাই। তাহার পর এ সম্বন্ধে আরও অবিসংবাদিত প্রমাণ আছে। স্বর্গীয় কর্ত্তার মৃত্যুর পর তুমি মাতঙ্গিনী দেবীর সহিত বড়ই অসদ্ব্যবহার করিতে। মাতঙ্গিনী দেবীর নিজের কিঞ্চিৎ বিষয়-সম্পত্তি ছিল। তিনি স্বয়ং তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন, ইহা তুমি জান। সেই সম্পত্তি এক্ষণে সরকারী বিষয়ের সামিল হইয়া গিয়াছে। তাঁহার সেই সম্পত্তির জন্য তাঁহাকে অনেক কাগজ-পত্রে নাম সহি করিতে হইত। তিনি সহি করিয়া তাহার নীচে একটা মোহরের ছাপ দিয়া দিতেন। তাঁহার সেই সহি ও মোহরের ছাপ সহস্র স্থানে আছে; সুতরাং মিলাইয়া দেখিবার কোনই অসুবিধা নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর আমি তাঁহার যাবতীয় স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তির এক তালিকা প্রস্তুত করি। সেই তালিকাপ্রস্তুতকালে আমি তাঁহার বাক্স হইতে সহি-মোহরযুক্ত একখণ্ড কাগজ পাই। তাহাতে এই কয়টি মাত্র কথা লিখিত আছে,—'আমার স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি যে ব্যক্তি এখন ভোগে করিতেছে, সে ইহার প্রকৃত অধিকারী নহে। প্রকৃত অধিকারী জীবিত আছে কি না সন্দেহ। যদি জীবিত থাকে এবং কখনও বিষয়ের দখল লইতে আইসে, তাহা হইলে সে-ই ইহা পাইবে।' সে কাগজ এই দেখুন। তিনি স্ত্রীলোক, কিরূপ ভাবে লিখিলে ইহা সুসঙ্গত হইত, তাহা না জানায় এবং নিজের অপরাধের বৃত্তান্ত সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করিতে সাহস না করায়, কেবল অনুতাপের তাড়নায় সত্য কথা ব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে এইটুকু লিখিয়া রাখিয়াছেন। তদবধি এই কাগজ আমার নিকটেই আছে। এ সম্বন্ধে প্রমাণের এখনও শেষ হয় নাই। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তোমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু মাতা জীবিতা আছেন; বামা ধাইও বাঁচিয়া আছে। উভয়েই আমার সঙ্গে আসিয়াছে। এখানে ডাকিব কি?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"প্রমাণ যথেষ্ট হইয়াছে। যাহা হওয়া উচিত, তাহাই হউক। ব্যভিচারিণীর সন্তান, ব্যভিচারিণীর স্বামী, সতী স্ত্রীর ধর্ম্মনাশক, ব্রাহ্মণের অপমানকারী, ঘোর দুরাত্মার হস্তে সম্পত্তি ও প্রতাপ কখনই থাকিতে পারে না। এক্ষণে আসুন সন্ন্যাসী ঠাকুর, চরণের ধূলা দিয়া এ অধম দুরাত্মাকে বিদায় দিন এবং আপনার পিতৃ-সম্পত্তি আপনি স্বচ্ছন্দে ভোগ করুন।"

এই বলিয়া শ্যামলাল উমাশঙ্করের নিকটস্থ হইয়া তাঁহার চরণ ধারণ করিলেন। উমাশঙ্কর তাঁহাকে সাদরে তুলিয়া বলিলেন,—"আপনাকে আমার বিমাতা সন্তান বলিয়াই লালন-পালন করিয়াছেন এবং আমার পিতা আপনাকে সন্তান জানিয়াই স্বর্গলাভ করিয়াছেন; সুতরাং আপনি আমার জ্যেষ্ঠ। কেন আপনি বিদায় হইবেন? আমি চিরদিন আপনার অনুগত কনিষ্ঠভাবেই থাকিব।"

শ্যামলালের চক্ষু জল-ভারাক্রান্ত হইল। জীবনে হতভাগ্য পাষণ্ডের হৃদয় আর কখনই এরূপ কোমল হয় নাই। সে বলিল,—"কি মধুর! কি স্নেহময়! আপনার অঙ্গের বায়ু লাগায় কল্য হইতে আমি ধর্ম্ম

ও সুনীতির দ্বারা পবিত্র হইতেছি। রে অধম বেশ্যাপুত্র! সাধু-সংস্পর্শে তুই আজ ধন্য হইলি।"

তাহার পর হরকুমার বাবুর চরণ ধারণ করিয়া শ্যামলাল বলিল,—"আপনি পিতার ন্যায় গুরুজন। অনেক দুর্ব্ব্যবহার করিয়া, অনেক দুর্ব্বাক্য বলিয়া আপনাকে কষ্ট দিয়াছি। আমি অধম বেশ্যাপুত্র! কৃপা করিয়া আমার অপরাধ আপনি ক্ষমা করিবেন কি?"

হরকুমার বলিলেন,—"তুমি যেই হও, আমি তোমাকে লালন-পালন করিয়াছি। সুতরাং তোমার অপরাধ আমি কখনই গ্রহণ করিতে পারি না। আর তুমি আপনাকে বেশ্যাপুত্র বলিয়া কেন ঘৃণা করিতেছ? তুমি বেশ্যাপুত্র হইলেও সে অপরাধ তোমার নহে। তুমি চিত্তকে স্থির কর; আমি সকল বিষয়েই তোমার সুব্যবস্থা করিয়া দিব।"

শ্যামলাল অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল,—"সন্ন্যাসী উমাশঙ্কর ঠাকুরের কৃপা ছাড়া আর কোন সুব্যবস্থার আমি প্রার্থী নহি। আপাততঃ আমি মাতৃ-চরণে প্রণাম করিব। তাহার পর যে ব্রাহ্মণ-কন্যা এত দিন আমার পত্নী-পরিচয়ে জীবন কাটাইয়াছেন, আমি তাঁহার সন্ধান করিব। আমার বিশ্বাস, যে দুরাত্মা সহায়তা করিয়া আমাকে অশেষ পাপে মজাইয়াছে, সেই পাষণ্ডই বিধুমুখীর সর্ব্বনাশ করিয়া এক্ষণে তাঁহাকে হয় ত ঘোর দুরবস্থায় ফেলিয়াছে। তাহার অপরাধের অনুরূপ শাস্তির ব্যবস্থা করিতে আমি বাধ্য। যদি সেই বিশ্বাসঘাতক নরাধমের সন্ধান পাই, তাহা হইলে আপনাদিগের নিকট সংবাদ দিব; যদি কৃতকার্য্য না হই, তাহা হইলেও আপনাদের শরণাগত হইয়া কর্ত্তব্য বিষয়ের উপদেশ গ্রহণ করিব।"

সৎসঙ্গের মাহাত্ম্যে অধম, ভীরু ও কাপুরুষের হৃদয়েও কর্ত্তব্য-বোধের আবির্ভাব হইতেছে এবং তেজস্বিতা ও সাহসের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। হরকুমার বলিলেন, "বিধুমুখীর সম্বন্ধে তুমি যেরূপ আশঙ্কা করিতেছ, আমারও সেইরূপ মনে হইতেছে বটে। কোন দুষ্ট লোক তাঁহাকে মন্দ অভিপ্রায়ে কোথায় লইয়া গিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু সে সম্বন্ধে তোমার অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই। পুলিসের লোক ও অন্যান্য অনেকেই সে কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদের অপেক্ষা তুমি যে বেশী কার্য্য করিতে পারিবে, এরূপ আমার বোধ হয় না।"

শ্যামলাল বলিল,—"সে কথা ঠিক, কিন্তু আমি বিধুমুখীর নিকট জ্ঞানতঃ ও অজ্ঞানতঃ অনেক অপরাধী। আমি তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু কদাপি তাঁহার সহিত একটা মুখের কথাও কহি নাই। আমি অধম বেশ্যাপুত্র, তিনি ব্রাহ্মণের কন্যা। আমার এখন মনে হয়, তাঁহার সকল অপরাধ ক্ষমার যোগ্য। কিন্তু আমার অপরাধসমূহ নিতান্ত গুরুতর ও ক্ষমার অতীত। এইরূপ বিবেচনায় আমার এখন মনে হইতেছে, আমি যথাসাধ্য যত্নে তাঁহার যাবতীয় ক্লেশ দূর করিবার নিমিত্ত দায়ী। কিন্তু সে পরামর্শ পরে হইবে; আপাততঃ আপনি কৃপা করিয়া আমাকে জননীর নিকট লইয়া চলুন।"

সকলেই গাত্রোত্থান করিলেন। শ্যামলাল ও হরকুমার প্রস্থান করিলেন। মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া অনেকক্ষণ পরে শ্যামলাল বাহিরে আসিল। তাহার পর কিয়ৎকাল নির্ব্বাক্‌ভাবে বাহিরে বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ "এখনই আসিতেছি" বলিয়া কোথায় চলিয়া গেল; কিন্তু অনেক রাত্রি হইল, তথাপি ফিরিল না। সেই রাত্রিতে এবং পরদিন প্রাতেও উমাশঙ্কর, নীলরতন, হরকুমার এবং তাঁহাদিগের নিয়োজিত অন্যান্য লোক তাহার জন্য বিস্তর অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু কুত্রাপি তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

একে দুই।

পরদিন সন্ধ্যার পর সার্ব্বভৌম-পুত্র নবীনকৃষ্ণের সহিত সতীর বিবাহ হইয়া গেল। হরকুমার বাবুর বাটীতে পাত্রী ছিলেন; সেই স্থানেই পাত্রীর মাতা কন্যা সম্প্রদান করিলেন। সম্প্রদানকালে চতুর চূড়ামণি হরকুমারের নিয়োজিত এক পুরোহিত ছিলেন। বিবাহ উপলক্ষে অনেকেই আহার করিলেন। নীলরতন, উমাশঙ্কর, স্বয়ং সার্ব্বভৌম এবং আরও অনেকে বিবাহ-রাত্রিতে বিবাহ-বাটীতে জলপান করিলেন। উমাশঙ্করের বেশ এখনও পূর্ব্ববৎ। গুরু-পি । ও গুরু-মাতার অনুমতিক্রমে তিনি জীবন-মধ্যে অদ্য প্রথমে সামাজিক মনুষ্যের ন্যায় পঙ্‌ক্তি-ভোজন করিলেন।

বিবাহের পর হরকুমার বাবুর পত্নী কর্ত্তৃক নবীনকৃষ্ণ ও সতী মঙ্গলাচরণ সহ বাসরঘরে আনীত হইলেন। বর স্বভাবতই সুপুরুষ; বিশেষতঃ অদ্য চন্দনচর্চ্চিত-কলেবরে মল্লিকামালা ও পীতাম্বর-সংযোগে তাঁহাকে বড়ই ভাল দেখাইতেছে। কিন্তু তিনি নিতান্ত বিষণ্ণ ও কাতর। তাঁহার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে

যে, আনন্দ ও উৎসাহ তাঁহাকে যেন চিরদিনের মত ত্যাগ করিতেছে।

যথাস্থানে বর উপবেশন করিলে কন্যা সতী অদূরে উপবেশন করিলেন। বাসরে অন্য কেহ থাকিল না।

সহসা সতী অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া বলিলেন,—"দাসী চরণে প্রণাম করিতেছে।"

নব-বধূর কণ্ঠস্বর ও রূপরাশি দেখিয়া নবীনকৃষ্ণ চমকিত হইলেন। এ যে সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর! এ যে হৃদয়াঙ্কিত সেই চিরনবীন রূপরাশি! সবিস্ময়ে নবীনকৃষ্ণ বলিলেন,—"এ কি সুহাস! তুমি? ধন্য পরমেশ্বর!"

ঈষৎ হাস্যের সহিত সতী বলিলেন,—"অবিশ্বাসিনী সুহাসিনী মরিয়া গিয়াছে—এ সতী।"

নবীনকৃষ্ণ বলিলেন,—"আমার সুহাস চিরদিন সতী। আমি সতী চাহি না—সুহাসে মন-প্রাণ আমার ভরিয়া আছে।"

সতী বলিলেন,—"এ কথা সত্য হইলে আবার নূতন করিয়া টোপর মাথায় দিয়া বর সাজিতে না। ভাগ্যে সুহাস মরিয়াছিল, তাই ত আমার অদৃষ্টে ঐ দেব-দুর্ল্লভ চরণে স্থান হইল!"

নবীনকৃষ্ণ বলিলেন,—"সংসারের সকল লোকের চক্ষেই সুহাস মরিয়াছিল বটে, কিন্তু আমার হৃদয়ে তুমি সজীব মূর্ত্তিতেই জাগরূক ছিলে। লোকে কি বুঝিয়াছিল, জানি না; কিন্তু আমি জানি, আমার সুহাস শিবমোহিনীর ন্যায় সতী। বড়ই শুভাদৃষ্ট আমার, তাই সেই হারানিধি সুহাস আজি সতীরূপে আবার আমার হইলেন।"

সুহাসিনী তাঁহার সেই মধুমাখা হাস্যের সহিত মিশাইয়া বলিলেন,—"কিন্তু যাই বল, মনে নিশ্চয়ই বড় রাগ ও দুঃখ হইতেছে। বড় আশা করিয়া আসিয়াছিলে, আজ নূতন নারী লাভ করিবে। কিন্তু বড়ই মন্দ কপাল তোমার; তাহা না হইয়া সেই পোড়ারমুখী হতভাগিনী সুহাসিনীই আবার জুটিল।"

নবীনকৃষ্ণ বলিলেন,—"আমি এ অনুযোগের পাত্র হইয়াছি বটে, আমি বড় আশা করিয়া আসিয়াছিলাম। আজি কিন্তু আমার মাথায় বজ্রাঘাত হইবে অথবা সর্পাঘাত হইবে, অথবা কোন দৈব-দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়া এ ব্যাপারের প্রতিবন্ধক ঘটাইবে। বড়ই ভাগ্যবান্ আমি, সেরূপ কোন ঘটনাই ঘটিল না। যিনি আমার অন্তরে ও বাহিরে—ঈশ্বর জানেন, যাঁহার চিন্তা আমার অন্তরে ও বাহিরে, যাঁহার মূর্ত্তি মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিতে পারি নাই, সেই দেবীকে আজি অসম্ভাবিত উপায়ে পুনরায় প্রাপ্ত হইলাম। জান তুমি, আমরা আর্য্যসন্তান। স্বামী যেমন তোমাদের প্রত্যক্ষ দেবতা, আমাদেরও জনক-জননী সেইরূপ প্রত্যক্ষ দেবতা। স্বামীর সেবা ও তাঁহার প্রসন্নতাসাধন যেমন তোমাদের অত্র ও পরত্র সকল কল্যাণের হেতুভূত, সেইরূপ জনক-জননীর প্রসাদন ও প্রিয়ানুষ্ঠান আমাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল মঙ্গলের নিদানস্বরূপ। জান তুমি, ভগবান্ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন মাতৃ-আজ্ঞায় এই ধরণীকে শোণিত-স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন এবং পৃথিবীকে এক-বিংশবার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। জান তুমি, স্বয়ং রামচন্দ্র পিতৃবাক্যপালনের জন্য সুদীর্ঘকাল দুঃসহ বনবাস ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন। জান তুমি, পূর্ণ-ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সানন্দে নন্দের বাধা বহন করিয়াছিলেন ও যশোমতী দেবীর বন্ধনও অকাতরে সহ্য করিয়াছিলেন। সেই আর্য্যবংশে আমাদিগের জন্ম। সহস্র দুষ্কর্ম্ম হইলেও জনক-জননীর আজ্ঞাপালনে আমরা বাধ্য। সেই প্রত্যক্ষ দেবতা-স্বরূপ পিতার একান্ত অনুরোধ এবং মাতার অশ্রুবারি উপেক্ষা করিতে আমার কখনই সাধ্য নাই। এত দিন সুহাস, তুমি ত নিরুদ্দেশ ছিলে। এরূপ না হইয়া যদি তুমি পূর্ব্বের মত গৃহেই থাকিতে, অথচ আমার পিতা-মাতা ন্যায়তঃ বা অন্যায়তঃ আমাকে আবার বিবাহ করিবার নিমিত্ত আদেশ করিতেন, তাহা হইলে আমাকে কি করিতে হইত সুহাস? আমি দুইবার অনিচ্ছা প্রকাশ, একটু অসন্তোষ ব্যক্ত করিতাম মাত্র। কিন্তু তাঁহারা আমার সেই অনিচ্ছা ও অসন্তোষ উপেক্ষা করিয়া যদি আপনাদের আদেশ বলবান্ রাখিতেন, তাহা হইলে হৃদয় ফাটিয়া গেলেও আমাকে অবশ্যই সেই আদেশ পালন করিতে হইত। তুমি কি জান না সুহাস, আর্য্য-সন্তান অবিচলিত-চিত্তে পিতা-মাতার আদেশ পালন করিতে বাধ্য? সেই জনক-জননীর একান্ত অনুরোধেই জানিয়া শুনিয়াও এই দুষ্কর্ম্মে আমি প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।"

সুহাসিনী বলিলেন,—"ভালই করিয়াছিলে। ভাগ্যে কোন আপত্তি কর নাই, কোন প্রতিবন্ধক ঘটাও নাই, তাই ত দাসীর অদৃষ্টে চরণে স্থানলাভ হইল! তা না হয়, সুহাসিনী নামে একটা সতীন কোথায় পড়িয়া আছে; এমন দুটা পাঁচটা সতীন ত থেকেই থাকে।"

নবীনকৃষ্ণ বলিলেন,—"সে কথাই বা মন্দ কি সুহাসিনী? তুমি আধুনিক কুৎসিত শিক্ষায় বিকল-চিত্ত হও নাই। স্বামীর একমাত্র পত্নীতেই আবদ্ধ

থাকা আবশ্যক। আধুনিক সভ্যতার এই নীতি কিছু দিন হইতে আমাদিগের দেশের রুচি বিকৃত করিয়া দিতেছে। তুমি জান, এ নীতি বড়ই নিন্দনীয়। পতি-দেবতা যদি ইচ্ছা করিয়া বা প্রয়োজনানুরোধে বহু-বিবাহ করেন, সতী পত্নী তাহাতে দুঃখের কারণ কিছুই দেখিতে পান না। কেন না, পতি তাঁহার চক্ষে দেবতা ভিন্ন আর কিছুই নহেন। তিনি অযুত মহিলাবেষ্টিত হইলেও সতী-পত্নীর চক্ষে তাঁহার দেবত্ব কখনই অপচিত হয় না। স্বামীর সহিত কেবল ইন্দ্রিয়-ব্যাপারের সম্বন্ধ মনে করিলেই অশেষ অনর্থের উদ্ভব হইয়া থাকে। ইহলোক ও পরলোক তাঁহার কৃপাসূত্রে গ্রথিত আছে, ইহা যে নারী জ্ঞান করেন, তিনি কখনই স্বামীকে মনুষ্য বলিয়া মনে করিতে পারেন না এবং তুচ্ছ ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে তাঁহাকে অভিভূত বা বিচলিত করিতে পারে না। অবশ্য, যে স্বামী পত্নীকে কষ্ট দিবার বাসনায় বা কেবল ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির কামনায় দারান্তর গ্রহণ করে, সে নরাধম পশুরই রূপান্তরমাত্র। তাদৃশ হতভাগার কথা বিচার্য্য নহে। কিন্তু যাহারা প্রকৃত প্রয়োজন বা উচ্চাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া দারান্তর গ্রহণ করেন, তাঁহাদের পত্নীগণের দৃষ্টিতে স্বামীর দেবত্ব কখনই কণামাত্র অপগত হয় না। সুহাসিনী, তোমাকে আমি চিরদিন দেবী বলিয়াই বিশ্বাস করি। আমি যদি আর একটা বিবাহ করিয়া দুষ্কর্ম্মসাধন করিতাম, তাহা হইলেও তোমার ন্যায় কামিনীর চক্ষে আমার মর্য্যাদা ও সম্মান একটুও কমিত না। তাই বলিতেছি, সোহাগের সুহাসিনীর না হয় আর একটা সতী-সতীন জুটিল, তাহাতে ক্ষতিই বা কি ?"

সুহাসিনী বলিলেন,—"তা জুটুক না কেন হাজারটা, আমার দেবতা আমার প্রাণ জুড়িয়াই আছেন। আমি এখন নূতন হইয়া আজ একবার প্রত্যক্ষ দেবতার চরণে প্রাণ ভরিয়া প্রণাম করি।"

সুহাসিনী অশ্রুপূর্ণ-নয়নে গলায় কাপড় দিয়া স্বামী দেবতাকে প্রণাম করিলেন। নবীনকৃষ্ণ অতীব আদরে তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া বলিলেন,—"প্রার্থনা করি, জীবনে ও মরণে কখনই যেন আর এক মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার সঙ্গশূন্য হইতে না হয়। যে যন্ত্রণা আমি এত দিন সহ্য করিয়াছি, তাহা বলিয়া শেষ করিবার নহে। যে মহাপুরুষের কৃপায় ও কৌশলে আমার সেই বিষম যাতনার অবসান হইল, আমি এক্ষণে সেই হরকুমার কাকার চরণোদ্দেশে বার বার প্রণাম করি।"

সুহাসিনী বলিলেন,—"আমিও স্বামী দেবতার সহিত একপ্রাণে সেই পরম-হিতৈষী মহাত্মাকে অন্তরের সহিত প্রণাম করি।"

তাহার পর তাঁহারা সুখের দুঃখের কথায় ব্যাপৃত হইলেন। সুহাসিনীর সমস্ত দুরবস্থা ও বহুবিধ ক্লেশের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে করিতে নবীনকৃষ্ণ অশ্রু-বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে বাহিরে সার্ব্বভৌম মহাশয় ভোজনাদি সমাপ্তির পর হরকুমার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভায়া, বিবাহ ত হইয়া গেল। তুমি যে বলিয়াছিলে, এই বিবাহে বঙ্গদেশের এক জন প্রধান লোকের সহিত কুটুম্বিতা হইবে, সে ব্যাপারটা কি, এখন বুঝাইয়া দেও।"

হরকুমার বলিলেন,—"এই উমাশঙ্কর বাবু বঙ্গদেশের এক জন প্রধান ধনবান্, বিদ্বান্ এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তি, এ কথা আপনি স্বীকার করেন কি না ?"

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—"তাহা আর বলিতে? এ সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি অসম্ভব।"

হরকুমার বলিলেন,—"এই উমাশঙ্কর আপনার পুত্রবধূর সাক্ষাৎ মাসতুত ভাই।"

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—"বল কি? বড়ই শুভ সংবাদ! তাহা হইলে যে জগত্তারিণীর সহিত স্বর্গীয় রাধাবিনোদ বাবুর বিবাহ হইয়াছিল, তিনি আমার পুত্র-বধূর মাতৃষ্বসা ?"

হরকুমার বলিলেন,—"আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু এ সম্বন্ধ আজ নূতন করিয়া হয় নাই—অনেক দিনই হইয়াছে। আপনারা কেহই তাহা জানিতেন না। উমাশঙ্করের জননীর বিবাহের বহুকাল পরে গোপালপুরনিবাসী জগদ্বন্ধু ভট্টাচার্য্যের কন্যার সহিত আপনার পুত্রের বিবাহ হয়। সেই জগদ্বন্ধুর স্ত্রী ও রাধাবিনোদ বাবুর পত্নী জগত্তারিণী সহোদরা ভগ্নী।"

সার্ব্বভৌম সবিস্ময়ে বলিলেন,—"তুমি গত কল্য শ্যামলালের জন্মাদিঘটিত বৃত্তান্ত যখন ব্যক্ত করিয়াছিলে, তখনই আমার এইরূপ একটা কথা মনে হইয়াছিল; কিন্তু সে ত আমার সেই ভ্রষ্টা পুত্র-বধূর কথা। এ বিবাহের সহিত সে কথার কি সম্পর্ক বল।"

হরকুমার বলিলেন,—"সেই সম্পর্কই এ বিবাহে নূতন করিয়া বজায় হইল দাদা। জগত্তারিণীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর সহিত পিতামাতার মনান্তর থাকায় এবং জগত্তারিণী ও রাধাবিনোদ বাবুর মৃত্যুর অনেক পরে নবীনকৃষ্ণের বিবাহ হওয়ায় তৎকালে এ সম্পর্কের বিশেষ আন্দোলন হয় নাই। আপনার সেই

পুত্র-বধূই আজি আবার নূতন হইয়া আপনার ঘর বজায় করিলেন।"

তখন সার্ব্বভৌম ক্রোধে কম্পিত-কলেবর হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"হরকুমার! দুর্ব্বৃত্ত, পাষণ্ড, নরাধম হরকুমার, তুই আমার সর্ব্বনাশ করিলি। তুই হতভাগা আমার জাতি, কুল, ধর্ম্ম, সকলই ঘুচাইয়া দিলি!"

হরকুমার বাবু সবিনয়ে সার্ব্বভৌমের পদদ্বয় ধারণ করিয়া বলিলেন,—"আপনার লজ্জা বা কলঙ্ক হইলে, সে কি আমার লজ্জা ও কলঙ্ক নহে? আপনি ধীরভাবে আমার সকল কথা শ্রবণ করুন দাদা; তাহার পর আমার অপরাধ হইয়া থাকিলে, যে দণ্ড আপনার ইচ্ছা হয়, তাহাই আমাকে প্রদান করুন; আমি অবনত-মস্তকে তাহা গ্রহণ করিব। আমি চিরকাল আপনার অনুগত আত্মীয়; আমি আপনার ইষ্ট ভিন্ন কোন অনিষ্ট করিতে পারি কি দাদা? আপনি দেশমান্য ব্যক্তি; আপনার মান ও গৌরবে আমাদের সম্মান ও গৌরব।"

সার্ব্বভৌম কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে, হরকুমার আদ্যোপান্ত ঘটনাসমূহ একে একে বিবৃত করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কথিত বৃত্তান্তসমূহের সমর্থনসূচক প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রদর্শনেরও তিনি ত্রুটি করিলেন না। সুহাসিনী যে নিতান্ত নিরপরাধা, অশেষ বিপদে পড়িয়াও তিনি যে আপন সতীত্বধর্ম্ম আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কাহারও কোন সংশয় থাকিল না। সকলেই তাঁহাকে নারীজাতির আদর্শ বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার অসম্ভাবিত বিপন্মুক্তির ও জীবনপ্রাপ্তির বৃত্তান্তশ্রবণে ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে থাকিলেন। সমস্ত শুনিয়া সার্ব্বভৌম হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"আরে, তাই বল! এত কথা আমি জানিব কিরূপে? বিষয়ী লোকের এইরূপ বুদ্ধিচাতুর্য্যের মধ্যে প্রবেশ করা আমাদিগের ন্যায় আতপ ও কদলীভোজী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার। চিরদিনই জানি, হরকুমার ভায়া একটা দেবতুল্য মনুষ্য। বড় শুভ-সংঘটনই তুমি ঘটাইয়াছ ভায়া। নূতন করিয়া বিবাহ-ব্যাপার ঘটাইয়া তুমি বস্তুতঃ বড় আমোদ করিয়াছ। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সুখে থাক। উমাশঙ্কর বাবু আর তুমি আমাদিগের পর নহ। এখন তুমি আমাদিগের অতিনিকট-কুটুম্ব। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি এই কুটুম্বদিগের সহিত প্রীতি সংকাবে পরম সুখে দীর্ঘজীবন অতিবাহিত কর।"

হায়! ধন-সম্পত্তি! তোমার কি মহীয়সী ক্ষমতা! সন্ন্যাসীর শিষ্য, আজন্ম ভিক্ষোপজীবী, এখনও সন্ন্যাসিবেশধারী উমাশঙ্করের সহিত যেমন আসিয়া তুমি মিলিয়াছ, অমনই তিনি সকলেরই নিকট বাবু সম্ভাষণে সম্ভাষিত হইতেছেন। আর কেহই তাঁহাকে সন্ন্যাসী বলিয়া ডাকিতে ইচ্ছা করিতেছেন না।

উমাশঙ্কর আসিয়া সার্ব্বভৌম মহাশয়ের চরণে প্রণাম করিলেন। বলিলেন,—"আমার কি সৌভাগ্য! অতঃপর আপনার ন্যায় দেশবিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তিকে কুটুম্ব বলিয়া গৌরব অনুভব করিতে পাইব।"

উমাশঙ্কর তদনন্তর হরকুমার বাবুর চরণ স্পর্শ করিয়া বলিলেন,—"আপনাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আপনাকে পিতা বলিতেই আমার ইচ্ছা হইতেছে। আপনার—"

সার্ব্বভৌম বাধা দিয়া বলিলেন,—"আর যা হয় একটা বল বাবাজি। সংসার শুদ্ধ লোককে বাবা বলাটা কিন্তু ভাল নয়।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আপনার কৃপায় আমি মাসী পাইলাম এবং পরম-গুণবতী ভগ্নী পাইলাম। আপনি বলিয়াছেন, মাসী-মা আপনার সঙ্গে এখানে আসিয়াছেন। কৃপা করিয়া আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া চলুন; আমি তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া এবং ভগ্নীকে দর্শন করিয়া জীবনকে আনন্দময় করি।"

সার্ব্বভৌম বলিলেন,—"বাবাজি, তোমার মাসীমা যে কেবল হরকুমার ভায়ার সঙ্গেই চলিয়া আসিয়াছেন, এমন নহে। এমন চলিয়া তিনি অনেকের সঙ্গেই গিয়াছিলেন এবং এখনও মাঝে মাঝে গিয়া থাকেন। চল ভায়া, আমাকেও একবার বিহাইনের কাছে লইয়া চল। আমি সে মাগীর গালে খানিকটা চূণকালী দিয়া আসি।"

হরকুমারের সঙ্গে সার্ব্বভৌম ও উমাশঙ্কর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। সকলই আনন্দময়, সকলই শান্তিময় ও সকলই ধর্ম্মময় হইয়া গেল।

বলা বাহুল্য যে, এই সার্ব্বভৌমটা বর্ত্তমান-কাল-প্রচলিত সভ্যতা-বিষয়ে একান্ত অনভিজ্ঞ। এরূপ অসভ্য জীবকে পণ্ডিত না বলিয়া বর্ব্বর বলাই বিধেয়। এমন লোকের কথা বহিতে লিখিতে আছে কি? স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এ ব্যক্তি আপনার পুত্র-বধূর জননীকে ব্যভিচারিণী বলিয়া বিশ্বাস করে, অথচ সে জন্য জাতি-কুলের কোন ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া, মনে করে না; কিন্তু সতী পুত্র-বধূর চরিত্র সম্বন্ধে মিথ্যা আশঙ্কা করিয়া তাঁহাকে চিরদিনের জন্য বর্জ্জন করিতে চাহে। লজিক অর্থাৎ তর্কশাস্ত্রের ফেলাসি অর্থাৎ

ভ্রম-পরিচ্ছেদ ইহার কস্মিন্‌কালেও দেখা নাই। লোকটা দয়ার অযোগ্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অনুমতি

বেলা দশটার সময় উমাশঙ্কর ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইয়া আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন। ঘনানন্দ স্বামী তৎকালে চর্ম্মাসনে উপবেশন করিয়া একখানি গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন। উমাশঙ্কর ভিক্ষার ঝুলি যথাস্থানে রাখিয়া গুরুদেবের নিকটস্থ হইলেন এবং ভক্তি সহকারে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ঘনানন্দ গ্রন্থ হইতে নয়ন অপসারিত করিয়া নিতান্ত করুণভাবে উমাশঙ্করের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিলেন,—"এক ক্ষেত্রে দুইটি বিরোধী ধর্ম্মের সম্মিলন অসঙ্গত। রৌদ্র ও ছায়া যেমন সমসময়ে একস্থানে থাকিতে পারে না, তদ্রূপ ধন-সম্পত্তি ও দারিদ্র্য উভয়ই এক ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না। বৎস উমাশঙ্কর! তুমি প্রভূত বিত্তের অধিকারী হইয়াছ; সুতরাং তোমার পক্ষে ভিক্ষাবৃত্তি অতঃপর শোভা পায় না।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"প্রভুর কি ইচ্ছা, তাহা জানি না; কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, ভিক্ষাই আমার চিরদিন শোভা পাইয়াছে এবং চিরদিনই শোভা পাইবে। জ্ঞানোদয় হইতে এ কাল পর্য্যন্ত আমি গুরুসেবা, শাস্ত্রালোচনা, ধর্ম্মশিক্ষা, একান্তমনে গুরুর আদেশ পালন, জ্ঞানোন্নতির উপায় অন্বেষণ এবং ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াই আসিতেছি। এই সকল কার্য্যই আমার নিরতিশয় প্রীতিজনক এবং সম্পূর্ণ সুসঙ্গত বলিয়া হৃদ্‌গত হইয়াছে। এইরূপ কার্য্যসমূহ আমার যেরূপ শোভা পায়, অন্য কিছুই তাহার অনুরূপ হইতে পারে না। তবে প্রভু যদি নিগ্রহপরবশ হইয়া এক্ষণে এই সকল কর্ম্ম আমার শোভাজনক নহে বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে অগত্যা আমাকেও সেইরূপ মনে করিতে হইবে। কিন্তু কোন প্রকার অবস্থান্তর ঘটিলে এ দীন সেবকের চিত্ত বড়ই অবসন্ন হইবে বলিয়া বোধ হয়। আর প্রভু যে বিত্তের কথা বলিতেছেন, তাহা আমাকে আশ্রয় করে নাই এবং তাহাকে আশ্রয় দিতেও আমার ইচ্ছা নাই। এই রুদ্রাক্ষ, এই নামাবলী, এই গৈরিক-রঞ্জিত বস্ত্র, এই ভস্মরাশি এবং ভিক্ষার ঝুলি আমার শ্রেষ্ঠ বিষয় ও পরম ঐশ্বর্য্য। আর প্রভুর ঐ পাদপদ্ম আমার অনন্ত বিত্তের অক্ষয় ভাণ্ডার। এতদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বিত্ত জগতের আর কিছুই নাই; সুতরাং তৎ-প্রাপ্তির কামনাও আমার নাই।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"বৎস! তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তোমার হৃদয় সর্ব্বাবস্থার সম্মুখীন হইবার উপযুক্ত হইয়াছে। তুমি প্রার্থনা না করিলেও প্রভূত বিত্ত তোমাকে অন্বেষণ করিয়া আশ্রয় করিয়াছে। তাহার প্রকৃষ্ট ব্যবহার করিতে তুমি বাধ্য। আর বৎস, বিষয়-ভোগে হানিও কিছুই নাই। কেন না, বিষয়ও বিষয় নহে এবং ভোগও ভোগ নহে। কর্ত্তব্যসাধনমাত্র লক্ষ্য রাখিয়া বিষয়ভোগে নিমগ্ন থাকিলে আত্মা এবং জগৎ উভয়ই উপকৃত হয়। বিষয়-ভোগেই জ্ঞানের পরীক্ষা হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি আজন্ম লালসাবর্দ্ধক পদার্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা বিরহিত হইয়া ভোগবর্জ্জিতভাবে কালপাত করে, তাহার সেই ভোগ-রাহিত্যে জ্ঞানোন্নতির কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না। হয় ত তাহার চিত্ত সাধুতার দিক্‌ দিয়াও যায় না এবং তাহার জ্ঞানও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ঘৃণিত জীবগণের জ্ঞানকে অতিক্রম করে না। নিরুদ্ধ-দর্শন বলীবর্দ্দ স্বভাবতঃ সুস্থির, এ মীমাংসা সুসঙ্গত নহে। যাহার শাকান্ন ব্যতীত ভোজ্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, সে ব্যক্তিকে নিতান্ত মিতাহারী বলিয়া স্থির করিবার কোন কারণ নাই। সর্ব্বভোগোপকরণ-সংবেষ্টিত হইয়াও যিনি স্পৃহাশূন্য এবং নির্লিপ্তভাবে তৎসমস্ত ভোগ করিতে সমর্থ, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী এবং তিনিই প্রকৃষ্ট তত্ত্বদর্শী। তাদৃশ ব্যক্তির বিষয়-ভোগ অশেষ কল্যাণের হেতুভূত। প্রত্যুত জলে ভাসমান পদ্মপত্রের ন্যায় বিষয়রূপ জলের প্রলেপ গায়ে না মাখিয়া,বিষয়-সাগরে নিমগ্ন থাকিলে ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট-সম্ভাবনা কিছুই নাই। অতএব তোমার যে বিষয়-সম্ভোগের সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে, তুমি তাহা সমুচিতরূপে ভোগ করিয়া জগতে ভোগনির্লিপ্ত-তার অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন কর, ইহাই আমার ইচ্ছা।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"প্রভুর যথা ইচ্ছা, অবি-চলিতচিত্তে তাহা পালন করিতে এ সেবক বাধ্য। ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিতানুচিত কিছুই জানি না; জানি কেবল আপনার অনুমতি। আপনি যাহা আদেশ করিবেন, অতি দুষ্কর হইলেও দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাই পালন করিতে আমি বাধ্য। প্রভুর বাক্যের প্রতিবাদ করিবার কল্পনা করিতেও আমার সামর্থ্য নাই। প্রভু যদি অতঃপর আমাকে

সঙ্গ হইতে বঞ্চিত করিতে বাসনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার অন্যথা করিতে আমার বা অপর কাহারও সাধ্য নাই। প্রভুর সঙ্গ-শূন্য হইলে আমার অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে; সে ভাবনা অনাবশ্যক। কিন্তু আমি যে সকল সামান্য সামান্য কার্য্য দ্বারা প্রভুর পরিচর্য্যা করিয়া আসিতেছি, তদভাবে আপনার হয় ত অনেক কষ্ট হইবে বলিয়া আমার আশঙ্কা হইতেছে।"

ঘনানন্দ হাসিয়া বলিলেন,—"অদ্য এই মুহূর্ত্তেই তোমার মৃত্যু হ'তে পারে; তাহার পর আমার পরিচর্য্যার বিহিত ব্যবস্থা করিতে তোমার কোনই অধিকার থাকিবে না। আমরা কর্ত্তৃত্বাভিমান সহকারে কার্য্য করি বলিয়াই আমাদিগকে অশেষ ভাবনা ও অসুবিধা ভোগ করিতে হয়; কিন্তু বৎস! যাবতীয় কর্ত্তৃত্ব একান্তভাবে পরম কর্ত্তার হস্তে সমর্পণ করিলে, সকল অসুবিধা ও যাবতীয় চিন্তা তিরোহিত হইয়া যায়। পরিণামচিন্তাই মনুষ্যকে নিতান্ত বিব্রত করে। কল্য কি হইবে? মৃত্যু হইলে স্ত্রী-পুত্রের কি হইবে? কি কার্য্য করিলে সম্মান-বৃদ্ধি হইবে? কিসে পরে সুখ হইবে? কি উপায়ে শরীর সুস্থ থাকিবে? ইত্যাকার ভবিষ্যৎ ভাবনাই মানবকে প্রতিনিয়ত অবসন্ন করে। কিন্তু সেই উদ্বিগ্ন ভ্রান্ত মানবগণ একবারও ভাবে না যে, ভবিষ্যৎসম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে তাহাদের কোনই অধিকার নাই। কেন না, মৃত্যু প্রতিমুহূর্ত্তেই উপস্থিত হইয়া তাহাদের সকল ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করিতে পারে এবং অচিন্তিতপূর্ব্ব প্রতিকূল ঘটনা উপস্থিত হইয়া তাহাদের সাবধানতা-সহকৃত যাবতীয় সতর্ক আয়োজনের উচ্ছেদ করিয়া দিতে পারে। কার্য্য আমরা করি বটে; কিন্তু কর্ত্তৃত্ব আমাদের হাতে নাই। যিনি বিশ্বের কর্ত্তা, যিনি কার্য্যাকার্য্যের কর্ত্তা, যিনি তোমার আমার সকলেরই রক্ষক ও পালক, তিনিই আমার পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন এবং প্রতিনিয়তই করিবেন। অতএব সে চিন্তা নিতান্ত অনাবশ্যক।"

উমাশঙ্কর নীরব। তিনি বুঝিয়া দেখিলেন, বাস্তবিকই গুরুদেবের ভাবী অসুবিধার বিষয় কল্পনা করিয়া তিনি নিতান্ত অজ্ঞের ন্যায় ব্যবহারই করিয়াছেন। যদি পরম-ভক্তিভাজন জ্ঞানার্ণব-সদৃশ গুরুদেব তাঁহার জন্য অন্যরূপ নূতন ব্যবস্থা করিবার আবশ্যকতা অনুভব করেন; তাহা হইলে সে জন্য কোনরূপ ভবিষ্যৎ ইষ্টানিষ্ট চিন্তা না করিয়া, অবিচলিতচিত্তে তাহা পালন করাই তাঁহার ধর্ম্ম। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন,—"ভগবন্! আমার সম্বন্ধে মাতৃদেবীরও কি এইরূপ ইচ্ছা?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"তাঁহার কি ইচ্ছা, আমি তাহা জানি না। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা না হইলে এরূপ সংঘটন হইবে কেন? তিনি ইচ্ছাময়ী, তাঁহার ইচ্ছাতেই আমরা কর্ম্মের অবধারণ করিয়া থাকি।"

তৎক্ষণাৎ সেই কুটীর-দ্বারে যোগেশ্বরী দেবীর সমুজ্জ্বল প্রতিমার ন্যায় মূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হইল। ঘনানন্দ বলিলেন,—"যাহার ইচ্ছা জানিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়াছিলে, দেখ বৎস! সেই ইচ্ছাময়ী তোমার ইচ্ছা জানিতে পারিয়াই সম্মুখে উপস্থিত।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"আমার সময় বড় কম। পুত্র পুত্র-বধূর জন্য ঘর পাতাইতে হইবে। সংসারে আর কেহ নাই; আমি না শিখাইলে কে শিখাইবে? তোমাকে প্রণাম করিয়া যাই ঠাকুর; আশীর্ব্বাদ করিও, আমার ছেলে যেন পূর্ণমনোরথ হয়।"

যোগেশ্বরী ভক্তিসহকারে ঘনানন্দকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার চিরন্তন প্রণালী অনুসারে তত্রত্য ধূলি মস্তকে, ললাটে ও রসনায় সমর্পণ করিলেন। তখন উমাশঙ্কর তাঁহার নিকটস্থ হইয়া সাগ্রহে হস্ত ধারণ করত কহিলেন,—"মা!—মা! বাবা আমাকে ত্যাগ করিতেছেন; তুমিও কি আমাকে ত্যাগ করিবে? তবে আমি কি করিব?"

যোগেশ্বরী সবিস্ময়ে বলিলেন,—"ত্যাগ! ত্যাগ এই সংসারে নাই ত বাবা। এ প্রেমের রাজ্য, ভক্তির সংসার, আকর্ষণের ব্রহ্মাণ্ড, ইহাতে ত্যাগ কোথায়? একটা পরমাণুকেও যিনি ত্যাগ করেন না, কীট পতঙ্গও যাহার কৃপাদৃষ্টির বহির্ভূত নহে, যাহার বিশ্বে স্থাবর ও জঙ্গম প্রত্যেকই অপরের উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে, তিনি তোমাকে ত্যাগ করিতেছেন, ইহাও কি সম্ভব? এ সংসারে ত্যাগের স্থান নাই বাবা। ঠাকুর তোমাকে ত্যাগ করিতেছেন, ইহা তুমি ভ্রমেও কল্পনা করিও না; তিনি দয়াময়। তোমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিবার এই এক অভিনব উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন জানিবে। আর আমি? আমি ত ঐ চরণের দাসী। প্রভু যাহা বলিবেন, তাহাই পালন করিতে আমি বাধ্য। আর তুমি কি করিবে? তা সে ভাবনা তুমি ভাবিতেছ কেন বাবা? যাঁহার ভাবনা, তাঁহার ঘাড়ে সকল বোঝা চাপাইয়া দিয়া তুমি কেন নিশ্চিন্ত হও না? আমি এখন আসি। বড় ব্যস্ত—অনেক কাজ। একটা ঘর পাতান সহজ কথা কি গা?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"তোমার কাজ অনন্ত—

তুমিও অনন্ত। তোমার আসা যাওয়া বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার সন্দেহ নাই। তুমি যাও কোথায়? আস বা কোথায়? তাহার তত্ত্ব বুঝে কাহার সাধ্য? তুমি নিরন্তর ব্যস্ত অথচ তোমার কার্য্য ইচ্ছায় সম্পন্ন হয়। সংসারের সর্ব্বত্র তোমার পুত্র, পুত্রবধূ। তুমি সকলের জন্যই ঘর পাতাইয়া দিতে ব্যস্ত। এ সংসারে তুমি ছাড়া আর কাহারও কিছু নাই। জনক ও জননী, কন্যা ও পুত্র, ভাই ও ভগ্নী সকলই মিথ্যা, সকলই ক্ষণিক সম্বন্ধ। কেবল তুমি সার, তুমিই নিত্য, তুমিই অক্ষয়। চন্দ্র-সূর্য্য নিভিয়া যাইবে, বিশ্ব-সংসার ধ্বংস হইবে, সৃষ্টির সকলেই বিলুপ্ত হইবে, কিন্তু তুমি থাকিবে। তোমাকে চিনিতে পারা বড়ই দুঃসাধ্য। যে তোমাকে চিনিয়াছে, সে অনন্ত-কালের নিমিত্ত ধন্য হইয়াছে। জরা, মরণ, রোগ ও শোক, সুখ ও দুঃখ তাহার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছে। তোমার কার্য্য অন্যের দুরবগম্য এবং কল্পনাতীত কাণ্ড, তোমার কার্য্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে কেবল বিস্ময়ে নিমগ্ন হইতে হয়। কিন্তু তুমি সেই অনন্ত কার্য্যরাশি হেলায় সম্পন্ন করিতেছ। উমাশঙ্করকে পূর্ণমনোরথ করিবার নিমিত্ত আমার আশীর্ব্বাদ নিতান্ত অনাবশ্যক। কেন না, সৌভাগ্যবান্ উমাশঙ্কর তোমাকে মা বলিয়া চিনিয়াছেন এবং দুঃখ ও সুখ তোমার চরণে নিবেদন করিয়া, নিরস্ত হইতে অভ্যাস করিয়াছেন। ধন্য উমাশঙ্কর! আশ্চর্য্য তাহার অদৃষ্ট ও সাধনা!"

আর কোন কথা না বলিয়াই যোগেশ্বরী প্রস্থান করিলেন। উমাশঙ্কর কাতরভাবে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন; কিন্তু ঘনানন্দ মৃদুস্বরে হাস্য করিয়া বলিলেন,—"বৎস! তোমার দৃষ্টি কাতরতাপূর্ণ কেন? যোগেশ্বরী দেবী তোমার নর-নয়নের অন্তরালে প্রস্থান করিলেন বলিয়া তুমি ব্যাকুলিত হইতেছ? কিন্তু তুমি কি জান না যে, মরণধর্ম্মশীল এই দেহের ইন্দ্রিয়গ্রাম আমাদের চিরসঙ্গী নহে? এই সকল ব্যাহেন্দ্রিয়ের হ্রাস, বৃদ্ধি, বিনাশ ও উৎপত্তি আছে; কিন্তু আমাদের অন্তরে যে ইন্দ্রিয় আছে, তাহা আমাদের সঙ্গী এবং কোন বাহ্য কারণে তাহার উৎপত্তি ও ক্ষয় হয় না। অতএব বৎস! এ বাহ্যেন্দ্রিয়ের উপর আর নির্ভর করিও না; তুমি সেই অন্তরিন্দ্রিয়ের সহায়তায় যোগেশ্বরী দেবীকে দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হও। তাহা হইলে আর তাঁহার অদর্শন হেতু তোমাকে ক্লিষ্ট হইতে হইবে না। সেরূপ নির্ভর করিতে শিখিলে বাহ্য বিষয়ই তোমাকে আর অভিভূত করিতে পারিবে না এবং সাগর, কানন ও পর্ব্বত কিছুই আর তোমাকে তোমার প্রার্থিত পদার্থ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে পারিবে না। আর বৎস! দেবী যোগেশ্বরী আপাততঃ তোমার সম্মুখে না থাকিলেও তোমার সঙ্গেই আছেন সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি সাধনাবলে তাঁহার কৃপাভাজন হইয়াছে, সে আর কদাপি তাঁহার কৃপায় বঞ্চিত হয় না। তোমার জননী করুণাময়ী। তুমি সকলই জান, অথচ যোগেশ্বরীর অদর্শনে কাতর হইতেছ, ইহা বাস্তবিকই হাস্যজনক। এই জন্যই আমি হাস্য করিতেছি।"

উমাশঙ্কর স্বকীয় অপূর্ণতা ও অজ্ঞতা আলোচনা করিয়া বদন বিনত করিলেন।

ঘনানন্দ বলিলেন,—"বৎস! তুমি শাস্ত্রার্থবিৎ ও জ্ঞানী হইলেও বয়সের অল্পতাজনিত বহুদর্শিতার অভাব হেতু এখনও সম্পূর্ণরূপে সাংসারিক মোহাদি অতিক্রম করিয়া উঠিতে পার নাই। এই জন্যই তোমার জ্ঞানপ্রদীপ সমুজ্জ্বল করিবার অভিপ্রায়ে সময়ে সময়ে উত্তেজিত করিয়া দিতে হয়। নচেৎ তোমার ন্যায় ভাগ্যবান্ ও তত্ত্বদর্শী সাধুকে কোন শিক্ষা দিবার আর প্রয়োজনীয়তা নাই। তুমি পথ দেখিতে পাইয়াছ এবং যে যে উপায়ে সে পথে নির্ব্বিঘ্নভাবে পর্য্যটন করিয়া শেষ সীমায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, তাহাও বিলক্ষণরূপ হৃদ্গত করিয়াছ। নীলরতন-তনয়া অন্নপূর্ণার প্রতি তুমি নিরতিশয় অনুরাগী হইয়াছ, ইহা তুমি না বলিলেও আমি বিশেষরূপ জ্ঞাত আছি। সেই কুমারীও তোমার প্রণয়িনী হইবার সম্পূর্ণ যোগ্যা বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। সেই কিশোরী কামিনীর সহিত তোমার বিবাহ হইলেও হইতে পারে। বোধ হয়, সম্প্রতি আমার সম্মতি ও অনুকূল অভিপ্রায়ের উপরেই সমস্ত নির্ভর করিতেছে। মনে কর, যদি নানা কারণে ঐ কুমারীর সহিত তোমার বিবাহ আমি যুক্তিবিরুদ্ধ বোধে ঘটিতে না দিই, তাহা হইলে তোমার অবস্থা কিরূপ হইবে?"

উমাশঙ্কর সবিনয়ে বলিলেন,—"বাস্তবিকই আমি সেই কুমারীর প্রতি নিরতিশয় অনুরাগী। আমার সে অনুরাগের পরিমাণ স্থির করা অসম্ভব। আমার বোধ হয়, আমার মন-প্রাণ সমস্তই সেই কুমারী অধিকার করিয়াছেন এবং আমি যেন সেই কুমারীকে মানবজীবনের সারসর্ব্বস্ব বলিয়া জ্ঞান করিয়াছি। কিন্তু আমার আকর্ষণ এত সুকঠিন এবং অনুরাগ এত প্রবল হইলেও আমি কর্ত্তব্য-পালনে বিমুখ হই নাই এবং আমার জ্ঞান একটুও বিলুপ্ত বা বিচলিত হয় নাই। সুতরাং প্রভুর প্রশ্নের উত্তর প্রদানার্থ আমাকে

একটুও ইতস্ততঃ করিতে বা চিন্তান্বিত হইতে হইবে না। হে ভগবান্! আমি আপনাকে সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন পরমপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করি এবং আপনার বিচার ও কার্য্য সকলই ভ্রান্তিশূন্য বলিয়া জানি। সুতরাং যাহা আপনার ইচ্ছা'র বিরোধী, তাহা কদাপি কাহারও পক্ষে শ্রেয়স্কর হইতে পারে না। অতএব আপনি দয়া করিয়া এ অধমের জন্য যে ব্যবস্থা করিবেন, নিরতিশয় ক্লেশকর হইলেও আমি বুঝিব, তাহা নিশ্চয়ই আমার অশেষ কল্যাণের হেতুভূত। চিত্তের অবস্থা যেরূপই হউক না কেন, আপনার আজ্ঞা প্রতিপালনে যদি কোন দিন আমার বিরাগ জন্মে, জানিবেন, সে দিন অধম উমাশঙ্করের মৃত্যু হইয়াছে।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"তোমার এ উত্তর আমার সন্তোষজনক হইলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে আমার মনের মত হয় নাই। এ সম্বন্ধে তোমার আর কোন কথা বলিবার আছে কি?"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আছে—অনেক কথা বলিবার আছে। যদি প্রভু অন্নপূর্ণার সহিত বিবাহসংঘটনের অনুকূল অভিপ্রায় প্রদান না করেন, তাহা হইলে কখনই সে বিবাহ ঘটিবে না; কিন্তু আমি সে জন্য একটুও দুঃখিত বা কাতর হইব না। কারণ, অন্নপূর্ণার সহিত বিবাহজনিত সম্বন্ধই আমার প্রার্থনীয় নহে। যদি প্রভু তাঁহাকে মনে মনেও ভালবাসিতে নিষেধ করেন, তাহা হইলেই আমার কঠোর পরীক্ষা উপস্থিত হইবে। বোধ হয়, অন্নপূর্ণাকে মনে মনেও ভাল না বাসিয়া থাকা আমার পক্ষে নিতান্ত সুকঠিন হইবে।"

ঘনানন্দ জিজ্ঞাসিলেন,—"বিবাহ না ঘটিলে তোমার তাদৃশ ক্লেশ হইবে না; কিন্তু মনে মনেও ভালবাসিতে না পাইলে তুমি অবসন্ন হইবে, তোমার এরূপ ভাবের তাৎপর্য্য কি, আমাকে বুঝাইয়া দেও।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"অন্নপূর্ণা ধনি গৃহস্থ-তনয়া। আমি ভিক্ষুক-সন্ন্যাসী। আমার সহিত তাঁহার বিবাহ সম্ভব নহে। তাহার পর বিবাহ না হইলেও বিশেষ ক্ষতির কথা আমি কিছুই দেখিতেছি না। আমি অন্নপূর্ণাকে ভালবাসি। বিবাহ না হইলেও সে ভালবাসার বিশেষ তারতম্য ঘটিবার কোন কারণ নাই এবং সে ভালবাসার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে আপনি ভিন্ন এ জগতে আর কাহারও সাধ্য নাই। সত্য বটে, বিবাহ ঘটিলে ভালবাসা একটু ভাবান্তর গ্রহণ করিবে। কিন্তু সে ভাবান্তর পরিহার করিয়াও যদি কোন নারীকে আমি ভালবাসিতে সক্ষম না হইয়া থাকি, তাহা হইলে বৃথা এত কাল গুরুদেবের উপদেশ শ্রবণ করিলাম এবং বৃথা এত দিন জগন্মাতা যোগেশ্বরী দেবীর মর্ম্ম প্রণিধান করিবার প্রযত্ন করিলাম। অন্নপূর্ণার সহিত আমার বিবাহ ঘটিবে, এ আশা আমার কখন ছিল না, এখনও নাই। সে আশা ত্যাগ করিয়াও আমি তাঁহাকে ভালবাসিয়াছি এবং আজীবন এইরূপে ভালবাসিয়াই আমি পরম পরিতুষ্ট হইব স্থির করিয়াছি। সত্য বটে, বিবাহ ঘটিলে ইন্দ্রিয়-সংঘটিত অধিকারবিশেষের উদ্ভব হয়। গুরুদেবের মুখে শুনিয়াছি, ইন্দ্রিয়বৃত্তির বৈধ ব্যবহার, অবস্থাবিশেষের অপ্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত বিধেয়। আমার বয়স ও জ্ঞানোন্নতির অবস্থা ইন্দ্রিয়চর্চ্চার অনুকূল হইলেও আমি তাদৃশ কল্পনা বর্জ্জন করিয়াই অন্নপূর্ণাকে ভালবাসিতে অভ্যাস করিয়াছি।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"যদি অন্নপূর্ণার সহিত তোমার বিবাহ ঘটে, তাহা হইলে—তোমার সন্তোষ পূর্ণ হইবে কি?"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"প্রভু অন্তর্যামী; আপনি কখন যোগানন্দরূপে ক্রিয়াশীল এবং কখন ঘনানন্দরূপে নিষ্ক্রিয়। আপনি যোগানন্দ বলিয়াই ঘনানন্দ এবং ঘনানন্দ বলিয়াই যোগানন্দ। আপনার তত্ত্ব যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে হৃদ্গত করিয়াছে, সে অনন্ত সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছে। আমি অধম ও অপূর্ণ সাধক। আপনাকে প্রণিধান করিবার শক্তি আমার না থাকিলেও আমি অসীম ভাগ্যবলে আপনার মহিমা, অনন্ত শক্তি ও অপরিমেয় প্রতাপের বৃত্তান্ত কিয়ৎপরিমাণে অবগত হইয়াছি। সুতরাং আপনার নিকট হৃদয়ভাব প্রচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা। প্রার্থনা করি, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, সামান্য লজ্জা বা সঙ্কোচের বশবর্ত্তী হইয়া পরমারাধ্য গুরুদেবের নিকট কোন মনোবৃত্তি প্রচ্ছন্ন করিবার বাসনাও যেন কখন না জন্মে। অন্নপূর্ণার সহিত বিবাহ সংঘটন হইলে আমি বাস্তবিকই নিরতিশয় সুখী হইব।"

তখন সাধকের যোগানন্দ এবং সিদ্ধের ঘনানন্দ প্রীতিপূর্ণ হাস্য সহকারে বলিলেন,—"বৎস! তোমার সহিত শীঘ্রই অন্নপূর্ণার বিবাহ ঘটিবে। এখনই তদ্বিষয়ক সমস্ত কথা সুস্থির হইবে। আমি তোমার কথায় পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি। কেবল রূপ ও ইন্দ্রিয়-তৃষ্ণায় প্রবল ভালবাসার উৎপাদন করে বটে, কিন্তু সে ভালবাসা সেই তৃষ্ণা-নিবৃত্তির

সঙ্গে সঙ্গেই নিবৃত্ত হইয়া যায়। যে ভালবাসা কামশূন্য, যে ভালবাসা কেবল ভালবাসিতেই জানে এবং ভালবাসিয়াই পূর্ণ পরিতৃপ্তি উপভোগ করে, তাহাই স্থায়ী, তাহাই সার, তাহাই ধর্ম্ম এবং তাহাই চরমে ব্রহ্মাববোধক। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মনোরথ সফল হউক। আমার শিক্ষাপ্রদান সার্থক হইয়াছে। আশা করি, তোমার গৌরবে আমি গৌরবান্বিত হইবে।"

এই সময় নীলরতন বাবু ও হরকুমার বাবু সেই কুটীরদ্বারে দর্শন দিলেন। তাঁহাদিগকে দর্শনমাত্র ঘনানন্দ বলিলেন,—"বিষয়ী ব্যক্তিগণের ব্যবহারে অনভিজ্ঞ হইলেও আজি আমি আপনাদিগকে সংসারী লোকের ন্যায় আদর ও অভ্যর্থনা করিতেছি। আমি অনুমান করিতেছি, আপনারা আমার পুত্র উমাশঙ্করের সহিত নীলরতন বাবুর কন্যা অন্নপূর্ণার বিবাহবিষয়ক অনুমতি গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন।"

নীলরতন ও হরকুমার বিস্ময়সহকারে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলেন। হরকুমার বলিলেন,—"ভগবান্ অন্তর্যামী। বিশ্বের সর্ব্বত্র সকলেই আপনার পুত্রকন্যা। তত্তাবতের সংযোগ ও বিয়োগ, বন্ধন ও মোক্ষ আপনার কৃপাপ্রভাবেই সম্পন্ন হয়। আপনার অনুমতি ও আদেশ ব্যতীত কোন যোগই অসম্ভব; এই জন্যই আপনি যোগানন্দ। আপনার অনুকম্পা না হইলে সংসারে এক বিন্দুও আনন্দের উদ্ভব হইতে পারে না; এই জন্যই আপনি ঘনানন্দ। কৃপা করিয়া অধমগণের মনোভীষ্ট পূরণ করুন।"

সে কথায় মনঃসংযোগ না করিয়া ঘনানন্দ বলিলেন,—"এই বিবাহ আমার সম্পূর্ণ অনুমোদিত জানিবেন এবং আমি অনুরোধ করিতেছি, যত শীঘ্র সম্ভব, আপনারা এ কার্য্য সমাধা করুন। আমি সংসারত্যাগী ভিক্ষাজীবী হইলেও আপনারা অতঃপর আমার কুটুম্ব। কৃপাসহকারে কুটীরমধ্যে আসিয়া আপনারা এই আসনে উপবেশন করুন।"

নীলরতন বলিলেন,—"অপরিসীম পুণ্যফলে আপনি আমাদিগের ন্যায় অধম জনকেও কুটুম্ব বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছেন। আমরা আপনার ন্যায় মহাপুরুষের চরণধূলার প্রার্থী।"

যোগানন্দ হাস্য সহকারে বলিলেন,—"আপনারা বৈবাহিক। সামাজিক লোকেরা বৈবাহিককে ধূলা-কাদা দিয়াই তামাসা করিয়া থাকে। সে যাহা হউক, উমাশঙ্কর আমার একার সামগ্রী নহেন। সনাতনী যোগেশ্বরী দেবী উঁহার জননী। এই বিবাহ-ব্যাপারে কেবল যে আমারই সম্মতি আছে, এমন নহে; যোগেশ্বরীরও এই সম্বন্ধ অতিশয় অনুমোদিত।"

হরকুমার বলিলেন,—"আমাদিগের অশেষ সৌভাগ্য। আমরা কেমন করিয়া প্রভুর সমক্ষে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিব, তাহাই ভাবিতেছিলাম। দয়াময় প্রথমেই স্বয়ং আমাদিগের সে উদ্বেগ দূর করিয়া দিয়াছেন। যোগানন্দ ও যোগেশ্বরী এবং যোগেশ্বরী ও ঘনানন্দ অভিন্ন বলিয়াই আমরা জ্ঞান করি; সকল বিষয়েই একের অনুমোদন প্রত্যেকের অনুমোদন বলিয়াই আমরা জানি এবং প্রত্যেক কার্য্যেই এক জনের আদেশ সকলেরই আদেশ বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। অতএব যখন প্রভুর অনুমোদন পরিব্যক্ত হইয়াছে, তখনই যোগেশ্বরী দেবীর অনুমোদনও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে বলিয়া আমরা স্থির করিয়াছি। আমরা বিষয়-কূপে নিমগ্ন পাপাত্মা; সম্মুখে দেখিতে না পাইলেও ইহা আমরা সম্যক্ জ্ঞাত আছি যে, সেই প্রকৃতিরূপা সনাতনী যোগেশ্বরী দেবী পরম-পুরুষস্বরূপ যোগানন্দের নিত্যসঙ্গিনী এবং ভুষারূপ সর্ব্বান্তর-নিহিত ঘনানন্দের অবিচ্ছিন্ন সহচরী। আমরা সেই পরমেশ্বরীকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করি।"

নীলরতন ও হরকুমার তথায় উপবেশন করিলেন এবং উমাশঙ্করের সম্বন্ধে নানা কথা সন্ন্যাসীর গোচর করিতে লাগিলেন। অনেক বিষয়ে তাঁহারা ঘনানন্দের অভিপ্রায়-জিজ্ঞাসু হইলেন। যোগানন্দও তাঁহাদিগকে নানাবিষয়ে সমুচিত পরামর্শ প্রদান করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অবরোধ।

কাশীর অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দির-সন্নিধানে কালিকা গলির মধ্যে এক অপরিষ্কৃত ও জীর্ণ ভবন পরিদৃষ্ট হয়। ভবনের কুত্রাপি জনসমাগমের চিহ্ন নাই। তাহার প্রবেশদ্বার বহির্দ্দিক্ হইতে তালা দ্বারা বদ্ধ। এই জীর্ণ বাটীর সকল ঘরই মনুষ্য-বাসের অযোগ্য। ভবন বাহ্যতঃ দ্বিতল হইলেও বস্তুতঃ ত্রিতল। তাহার নিম্নতল হয় কালসহকারে, না হয় মূল নির্ম্মাণকারের ইচ্ছানুসারে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট। ভূগর্ভস্থিত প্রকোষ্ঠেও গমনাগমনের উপায় আছে। বাটীর সকল ভাগই অব্যবহার্য্য ও জনশূন্য হইলেও ভূগর্ভস্থিত প্রকোষ্ঠে এক ক্ষীণকায়া নারী ভূ-শয্যায় পড়িয়া আছেন। সেই কামিনী বিধুমুখী।

রাত্রি প্রায় এক প্রহর। ভূগর্ভস্থ সেই স্বভাবতঃ

অন্ধকার প্রকোষ্ঠ সম্প্রতি নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন। সেই অন্ধকারের মধ্যে একাকিনী বিধুমুখী চেতনাহীন শবের ন্যায় পড়িয়া আছেন। সহসা উচ্চতলে মনুষ্যের পদশব্দ শ্রুত হইল। বিধুমুখী সে শব্দে একটুও বিচলিত হইলেন না। তিনি যে প্রকোষ্ঠে অবস্থিত ছিলেন, তাহার দ্বার বাহির হইতে তালা দ্বারা আবদ্ধ ছিল। সেই দ্বারসন্নিধানে দুই জন মনুষ্যের কথোপকথন-শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল; তাহাতেও তিনি বিচলিত হইলেন না। ক্রমশঃ ঘরের তালা খোলার শব্দ বিধুমুখীর কর্ণগোচর হইল; তথাপি তিনি অবিচলিত। এক পুরুষ ও নারী গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং দিয়াশালাই ও বাতী বাহির করিয়া আলোক জ্বালিল; তথাপি বিধুমুখী অবিচলিত। সেই পুরুষ হরিচরণ ও নারী সারদা। সারদা বলিল,—"এ কি! নড়ে না চড়ে না যে, মরে নাই ত?"

হরিচরণ। মরিবার জন্য উঁহার দায় পড়িয়াছে। এও এক রকম ছলনা। মনে ভাবিয়াছে, এরূপ দেখিলে ছাড়িয়া দিবে। দাঁড়াও, দেখি আমি।

হরিচরণ এই বলিয়া বিধুমুখীর নিকটস্থ হইল এবং তাহার পৃষ্ঠদেশে পাদুকা সমেত পদাঘাত করিতে করিতে বলিল,—"বড় আরাম করিয়া ঘুমান হচ্ছে যে! আমি যে কথা বলিয়া গিয়াছিলাম, তাহার কি হইল?"

বিধুমুখী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন—"আমি ঘুমাই নাই; তোমার মুখ দেখিতে হইবে বলিয়া আমি চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া ছিলাম। এ জীবনে তোমার মুখ আর দেখিতে না হয়, ইহাই আমার কামনা। তাই বা কেন করি? বাস্তবিক তোমার দোষ কিছুই নাই। আমি নিজেই পাপে মজিয়া আপনার অশেষ কষ্টের সৃষ্টি করিয়াছি। তোমাকে দোষী করিয়া আমি অপরাধী হইতেছি। বরং তুমি প্রকারান্তরে আমার বড়ই উপকার করিয়াছ। তুমি যদি আমাকে ঘৃণা না করিতে, যদি তোমার অনাদরে আমার মনে ক্লেশের উদ্ভব না হইত, তাহা হইলে আমার মতিগতি কখনই এরূপ পরিবর্ত্তিত হইত না এবং পাপের সাগরে আমাকে চিরদিনই ডুবিয়া থাকিতে হইত। তোমার ঘৃণায় আমার অন্তরে আলোকের আবির্ভাব হইয়াছে। তুমি আমার বড় উপকার করিয়াছ। আমি তোমাকে প্রণাম করি। তুমি আমাকে কি কথা বলিয়াছিলে? বিষয়-সম্পত্তি সমস্ত তোমার নামে লিখিয়া দিবার নিমিত্ত দলিলে নাম সহি করিতে বলিয়াছিলে তো? তা সে কাজ আমা দ্বারা কখন হইবে না। আমি সে কথা তোমাকে পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি। সে কাজের জন্য তুমি আমাকে গভীর রাত্রে মুখে কাপড় বাঁধিয়া লোকজন দ্বারা অনর্থক ধরিয়া আনিয়া, বৃথা আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ। এ কার্য্য আমি কদাচ করিব না, ইহা তুমি স্থির জানিবে।"

হরিচরণ ক্রোধসহকারে বলিল,—"বটে! করবি না? তোর অদৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে। আমি তোকে ভয়ানক সাজা দিব জানিস্?"

বিধুমুখী ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিলেন,—"আমার অদৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে, তাহা আমি জানি। যে দিন সারদার পরামর্শে তোমার সহিত ঘৃণিত পরিচয় ঘটাইয়াছি, সেই দিন হইতেই আমার দুঃখের আরম্ভ হইয়াছে; কোথায় গিয়া এ দুঃখের শেষ হইবে, তাহা ভাবিয়া ঠিক করা ভার। আমি নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করিয়াছি। তুমি আমাকে কি বিশেষ সাজা দিবে? যে সাজা ভগবান্ আমাকে দিয়াছেন ও দিতেছেন, তাহা কল্পনা করিলেও ভয় হয়। তুমি দশটা লাথি মারিবে? তাহাতে আমার গা পচিয়া যাইবে না। যতক্ষণ দেহ সহিতে পারে, ততক্ষণ সহ্য করিব। সহ্য করিতে না পারি, দেহ হইতে প্রাণ চলিয়া যাইবে। সে সকল কিছুই আমার পক্ষে আর সাজা বলিয়া গণ্য নহে।"

হরিচরণ বলিল,—"জানিস তুই, এই সারদা এক সময়ে তোর দাসী ছিল?"

বিধুমুখী বলিল—"জানি।"

হরিচরণ বলিল,—"এক্ষণে এই সারদা আমার প্রাণেশ্বরী হইয়াছে।"

সেই নরপ্রেত হরিচরণ এই বলিয়া সারদার কণ্ঠালিঙ্গন করিল এবং পুনঃ পুনঃ তাহার বদন চুম্বন করিতে লাগিল। বলিল,—"তোকে অতঃপর এই সারদার পদসেবা করিতে হইবে। সারদা তোর সেবায় পরিতুষ্ট হইলে তবে তুই ভাত-কাপড় পাইবি।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"ভাত-কাপড় পাই না পাই, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। সারদা তোমার প্রাণেশ্বরীই হউক অথবা যাহাই হউক, অথবা আর যাহাকেই তুমি মন প্রাণ সমর্পণ কর, আমার তাহা জানিবার কোনই প্রয়োজন নাই। তোমার সংস্রবে আসিয়া আমার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। তোমার সম্বন্ধে ইহা ছাড়া আর কিছুই আমার মনে নাই। সারদার পদসেবার কথা বলিতেছ? পৃথিবীর কীটপতঙ্গ সকলের অপেক্ষা আমি এখন ঘৃণিত ও অধম; সুতরাং সারদার পদসেবা করায় আমার কোনই

অপমান নাই। আইস সারদা, আমি ইচ্ছা করিয়া তোমার পদসেবা করি।"

হরিচরণ বলিল, "কিন্তু সেই দলিলে নাম সহি করিলে তোর কিছুই করিতে হয় না। বল্, তুই এখনও তাহাতে নাম সহি করবি কি না?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"কেন তুমি বার বার আমাকে এ কথা বলিতেছ? তোমার চক্রান্তে একবার বিষয়-সম্পত্তি নিজ নামে লেখাইয়া লইয়া অশেষ সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছি; আবার আমি সে সম্বন্ধে কোন কাগজেই নাম সহি করিব না। বিষয় আমার নহে। যাহার বিষয়, তাঁহাকে তাহা ফিরাইয়া দিয়াছি। সে সম্বন্ধে আর কোন ব্যবস্থা করিতে আমার অধিকার নাই। তুমি আমাকে মার, কাট, অথবা যত ইচ্ছা যন্ত্রণা দেও, আমি আর কিছুতেই নাম সহি করিয়া অপরের ক্ষতি করিব না, ইহা তুমি স্থির জানিবে।"

হরিচরণ বলিল,—"কি! এত বড় স্পর্দ্ধা! আমার কথার উপর তোমার জেদ? আমি দেখি, তোর অহঙ্কার কোথায় থাকে?"

তখন সেই বর্ব্বর সেই মরণাপন্না সুন্দরীকে হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা একবার প্রহার করিবামাত্র সারদা অগ্রসর হইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং বলিল,—"তুমি যাও—বাহিরে বইস গিয়া। আমি বউদিকে বুঝাইয়া সকল বিষয় ঠিক করিতেছি। রাগারাগির কর্ম্ম নয়।"

সারদা হাত ধরিয়া হরিচরণকে বাহিরে টানিয়া আনিল এবং উপরের একটি ঘরে তাহাকে বসাইয়া রাখিয়া স্বয়ং পুনরায় বিধুমুখীর নিকট আগমন করিল। তাহার পর তাঁহার কানের কাছে মুখ আনিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল,—"তোমার স্বামী তোমার সন্ধানে ফিরিতেছেন। অনেক কষ্টে, অনেক সন্ধানে তিনি আমার নিকট আসিয়াছিলেন। তুমি তাঁহার সহিত দেখা করিবে কি? তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে হয় ত তোমার মুক্তির উপায় হইতে পারে।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"মুক্তি বা অবরোধ আমার দুই-ই সমান। তথাপি আমি এখন তাঁহার সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা করি। দুই দিন আগে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন ছিল না; এখন হইয়াছে। তুমি যদি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ঘটাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে আমি সুখী হইব।"

সারদা বলিল,—"আমি তাহার চেষ্টা করিব। পারি যদি, তাহা হইলে দুই ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া এখানে আবার আসিব। আপাততঃ আমি কৌশল করিয়া হরিচরণকে লইয়া যাইতেছি। মনে করিও না বউদিদি, এ বিষয়ে আমার কোন দোষ আছে। আমি তোমাকে দলিলে নাম সহি করিতে বারণ করিতেছি। হরিচরণের সম্মুখে তাহার মনের মত কথা না কহিলে আমার দ্বারা যদি কোন উপকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহাও হইবে না; হয় ত উভয়েরই সমান বিপদ ঘটিবে। আমি তোমার দাসী। তোমার অনেক খাইয়াছি। হরিচরণের সহিত প্রণয় দেখিয়া মনে করিও না, আমি তাহার প্রতি আসক্ত। সে তো জানোয়ার। তাহার অসংখ্য উপপত্নী। স্ত্রীলোককে সে খেলার জিনিস ছাড়া আর কিছুই মনে করে না, কাহাকেও সে ভালবাসে না, ভালবাসিতে সে জানেও না। তবে যে আমি তাহার সহিত মিশিয়া রহিয়াছি, সে কেবল কিঞ্চিৎ অর্থলাভ ও তাহাকে হাতে রাখার প্রত্যাশায়। অনেক কথা আছে, সময় পাই তো বলিব। এখন যাই, বিলম্ব হইলে সকল দিকে ক্ষতি হইবে।"

সারদা চলিয়া গেল। আবার সেই দ্বার নিরুদ্ধ হইল ও চাবী বন্ধ হইল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে ধীরে ধীরে সেই দ্বার আবার খুলিয়া গেল। সারদা এক ব্যক্তিকে ঘরে প্রবেশ করিতে বলিল। সেই আগন্তুক শ্যামলাল।

বিধুমুখীর নিকটস্থ হইয়া শ্যামলাল বলিলেন,—"আমি তোমার সকল ক্লেশের মূল। তোমার সমস্ত অবস্থাই আমি জানিয়াছি। আমার সহায়-সম্পত্তির অভাব নাই; আমি সহজেই তোমাকে মুক্ত করিব। আর আমি রূপের মোহে মুগ্ধ হইয়া তোমার শরণাগত নহি; আমি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজনায় তোমার চরণাশ্রিত নহি। এখন আমি তোমার নিকট ক্ষমার ভিখারী। আমার অনেক অপরাধ। তোমাকে দয়া করিয়া সকলই ক্ষমা করিতে হইবে। আমি তোমার স্বামী, তোমাকে বিপদে ও সম্পদে রক্ষা করিতে আমি বাধ্য। যেমন করিয়া পারি, এখনই তোমার কষ্টের অবসান করিব।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"আমি বিশেষ কোন কষ্ট ভোগ করিতেছি না। তুমি মহাত্মা, তাই যাহাকে চরণে দলিত করা উচিত, তাহার জন্য এত ভাবিতেছ। তোমাকে স্বামী বলিয়া সম্বোধন করিতে আমার অধিকার নাই। তথাপি জীবনে ও মরণে তোমার সহিত আমার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। এক দিন তুমি আমার রূপে মোহিত হইয়া আমার চরণ ধারণ করিয়াছিলে। আমি তোমার ক্রীতদাসী হইলেও

তখন তোমার বাসনা পূরণ করি নাই। আমার অপরাধ অসীম ও ক্ষমার অযোগ্য। আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি না; কেন না, সে স্পর্দ্ধা ও সাহস আমার নাই। চাহিতেছি কেবল তোমার পদ-ধূলি। তুমি দাসীকে তাহা মস্তকে ধারণ করিতে দিবে না কি?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"তুমি এমন কথা বলিও না বিধুমুখি! তুমি পাপ-পথে পড়িয়াছিলে সত্য, কিন্তু আমিই তাহার কারণ; আমার অনাদর ও অযত্ন না ঘটিলে হয় ত বিধুমুখি, তুমি সংসারে দেবতা হইতে। যে দেবতার নিকট তুমি ধর্ম্মশিক্ষা করিয়াছ, আমার কপালক্রমে সেই দেবতা আমাকেও চরণে আশ্রয় দিয়াছেন। এখন বুঝিয়াছি, আমার অপরাধের সীমা নাই। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তোমার প্রসন্নতা লাভ করিবার জন্য প্রাণপাত প্রয়োজন হইলে তাহাও করিব।"

সহসা প্রকাণ্ড লাঠি লইয়া টলিতে টলিতে হরিচরণ তথায় প্রবেশ করিল এবং বলিল,—"আবার তুই সন্ধান করিয়া এখানেও আসিয়া জুটিয়াছিস্? আজি তোর মাথা ফাটাইয়া তবে অন্য কাজ। দেখি, তোকে কে রক্ষা করে?"

হরিচরণ শ্যামলালের মস্তক লক্ষ্য করিয়া লাঠি তুলিল। তৎক্ষণাৎ বিধুমুখী উভয়ের মধ্যগত হইয়া বলিলেন,—"মারিতে হয়, আমাকে মার, উনি নিরপরাধ।"

হরিচরণ বলিল,—"মারিব—আজি তোরও প্রাণ থাকিবে না। কিন্তু আগে এই হতভাগার জীবন শেষ করিব।"

শ্যামলাল ত্বরিত আসিয়া হরিচরণের যষ্টি ধারণ করিলেন এবং বলিলেন,—"আমি ইচ্ছা করিলে এখনই তোমাকে নিপাত করিতে পারি। কিন্তু তাহা করিব না। অনেক পাপ করিয়াছি, আবার নরহত্যার বোঝা ঘাড়ে চাপাইব না। তোমার অপেক্ষা আমার শরীরের শক্তি অনেক বেশী। বিশেষতঃ তুমি এক্ষণে মাতাল; সুতরাং তোমাকে এখন মারিয়া ফেলা আমার পক্ষে বিশেষ কঠিন কাজ নহে। তথাপি তোমাকে আমি মারিব না। কারণ, তাহা আমার উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধ। আজি তুমিই এখানে অবরুদ্ধ থাকিবে। বিধুমুখী ও আমি তোমাকে বদ্ধ করিয়া এখনই প্রস্থান করিব। সারদারও এই দশা হইত, কেবল আমাকে এই স্থানে আসিবার উপায় করিয়া দিয়াছে বলিয়া আমি তাহাকে ক্ষমা করিলাম।"

শ্যামলাল তখনই হরিচরণকে ভূতলে ফেলিয়া দিলেন এবং তাহার উড়ানি লইয়া তদ্দ্বারা তাহার হস্ত ও পদ একত্র বাঁধিয়া ফেলিলেন। হরিচরণ শারীরিক শক্তি নিষ্ফল দেখিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। শ্যামলাল তাহাতে একটুও মনোযোগ না করিয়া তাহাকে ঘরের মধ্যে ফেলিয়া রাখিলেন এবং বিধুমুখীর হাত ধরিয়া বাহিরে আসিয়া দরজায় তালা লাগাইয়া দিলেন। সারদা সেখানে অপেক্ষা করিতেছিল। তিন জনে সেই গভীর রাত্রিকালে সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্দ্ধান হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সংসারী।

সোনাপুরে ৺রাধাবিনোদ বাবুর বিশাল ভবনে বড়ই সমারোহ। কিছু দিন হইতে সেই বাটী পরিত্যক্ত ও জনশূন্য ছিল; সুতরাং শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছিল। অধুনা তাহার সর্ব্বত্র লোকপূর্ণ হইয়াছে এবং চতুর্দ্দিকেই অশেষ সমৃদ্ধির চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইতেছে। দ্বারে সুরঞ্জিত পরিচ্ছদধারী প্রহরিগণ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া অপেক্ষা করিতেছে; অশ্বশালায় নানাপ্রকার অশ্ব নিবদ্ধ রহিয়াছে; অন্যত্র বহু হস্তী শুণ্ড আন্দোলন করিতে করিতে দুলিতেছে; স্থানান্তরে নানাবিধ অশ্বযান রহিয়াছে; সিংহদ্বারের সন্নিকটে অশ্বচতুষ্টয়সংযুক্ত একখানি ল্যাণ্ডো অপেক্ষা করিতেছে; জরিফ কোচ্‌ম্যান উত্তম বেশভূষা করিয়া লাগামহস্তে সানন্দমনে কোচ্‌বাক্সে বসিয়া আছে।

ভবনমধ্যেও উৎসাহের সীমা নাই। এক স্থানে অনেক পরিচারিকা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বঁটি লইয়া রাশীকৃত মাছ কুটিতেছে; স্থানান্তরে স্তূপাকার তরকারী কোটা হইতেছে, কোথাও বা অনেক শিল পাতিয়া অনেকে মসলা পিষিতে পিষিতে মেঘগর্জ্জনের সমুৎপাদন করিতেছে; কোথাও বা সারি সারি উনানে বড় বড় হাঁড়ি, কড়া প্রভৃতি চাপাইয়া পাচকেরা পাক করিতেছে। অন্য দিকে দুই এক জন রসিক ভৃত্য চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া এবং সমুচিত সুযোগ বুঝিয়া কোন যুবতী পরিচারিকাকে দুটা মনের কথা কহিয়া লইতেছে; কোথাও বা দুই জন পরিচারিকা মসলা চুরি করিয়া নাতিনীর বাটীতে তত্ত্ব পাঠাইবার উপায় করিয়া রাখিতেছে; কোথাও বা কোন পরিচারিকা ঝুড়িতে করিয়া মাছ ধুইবার ওজরে বাহিরে আসিয়া তাহার অর্দ্ধভাগ তথায় অপেক্ষিত ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা

বাড়ীতে চালান করিয়া আসিতেছে। ইত্যাদিরূপ ব্যাপারে এ অংশের সকলেই ব্যস্ত ও উৎসাহময়।

ভবনের বৈঠকখানা-ভাগের কোন স্থানে কয়েক জন পক্ককেশ বৃদ্ধ বসিয়া তামাকের শ্রাদ্ধ করিতে করিতে সে কালের কীর্ত্তি-কাহিনীর আলোচনা করিতেছেন। আর এক দিকে কয়েকজন গুম্ফ ও শ্মশ্রু-বিহীন অধ্যাপক বসিয়া পুরাণাদি শাস্ত্রের এক বর্ণও মিথ্যা নহে, তাহার মধ্যে কুত্রাপি যে কল্পনার সমাবেশ নাই এবং তৎসমস্তই যে সাক্ষাৎ বেদোক্তি, তাহাই সপ্রমাণিত করিতেছেন। অবশ্য প্রত্যেকের টিকিগুলি ক্ষণকালও একস্থানে স্থির থাকিতে পাইতেছে না এবং পরিধান-বস্ত্রের কাছাগুলিও যেখানে থাকা উচিত, সেখানে থাকিতেছে না। আর এক দিকে কতকগুলি নব্য, সভ্য যুবা বসিয়া ভারতোদ্ধারের বাসনায় অনেক মৌখিক আক্ষেপ ব্যক্ত করিতেছেন; বলা বাহুল্য, তাঁহাদিগের সেই বাগ্‌বিতণ্ডার মধ্যে মাতৃভাষা ষোল আনা রকম পরিত্যক্ত হইয়া মাতৃভূমির হিতৈষিতা সংঘোষিত করিতেছে। ইত্যাদিরূপে নানা স্থানে, নানারূপ জটলা চলিতেছে।

হরকুমার বাবু সপরিবারে সার্ব্বভৌম মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া কয়েক দিন হইল কাশী হইতে এ স্থানে আগমন করিয়াছেন এবং এখানকার ভবনাদির সুব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। অদ্য এই ভবন ও এতৎসংসৃষ্ট বিষয়সম্পত্তির অধিকারী এখানে আগমন করিবেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত হরকুমার বাবুর আহ্বান অনুসারে সন্নিহিত সমস্ত জনপদের বহুতর ভদ্রাভদ্র ব্যক্তি অদ্য এখানে সমবেত হইয়াছেন। সমাগত ব্যক্তিবৃন্দের জন্য অদ্য এই বাটীতে ভূরি-ভোজনের আয়োজন হইয়াছে।

হরকুমার বাবু আজি বড় ব্যস্ত। তিনি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে এক একবার উপস্থিত হইতেছেন এবং অনেকের সহিত দুই একটি কথা কহিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেছেন। সনাতনপুরের হরিশ কামার এবং চণ্ডীতলার রামহরি কৈবর্ত্ত পরমানন্দে তাঁহার আদেশ বহন করিয়া ফিরিতেছে। তাহাদের বেশভূষা অবস্থার বিশেষ উন্নতি ও আন্তরিক সন্তোষের পরিচয় প্রদান করিতেছে। অনেক কর্ম্মচারী নানা প্রয়োজনে চারিদিকে ঘুরিতেছে, তাহারা মধ্যে মধ্যে হরকুমার বাবুর নিকটস্থ হইয়া কৃত কর্ম্মের বিবরণ জানাইতেছে এবং তাঁহার নূতন আদেশ শুনিয়া লইতেছে।

চণ্ডী গুলীখোর বৈঠকখানা-বাটীর এক বারান্দায় দাঁড়াইয়া হাত ও মাথা নাড়িতে নাড়িতে রামহরির নিকট একটা ভয়ানক কথা ব্যক্ত করিতেছে। উত্তম ঢাকাই ধুতি সে পরিয়াছে, উত্তম গরদের জামা তাহার গায়ে, উত্তম সোনার চেন তাহার বুকে, উত্তম বার্ণিস করা জুতা তাহার পায়ে, উত্তম রূপাবাঁধা সুরভি-ধূমোদ্গারী হুঁকা তাহার বাম-হাতে! চণ্ডী বলিতেছেন,—"শীঘ্রই যে সংসারের প্রলয় ঘটিবে, তাহার সন্দেহ নাই। শাস্ত্রে স্পষ্টই বলিয়াছে, কলিতে সকলই বিপরীত হইবে, আর তাহার পরেই পৃথিবী উল্টাইয়া যাইবে। এখন তো লক্ষণ দেখিয়া বোধ হয়, তাহার আর দেরি নাই।"

রামহরি জিজ্ঞাসিল,—"কি লক্ষণ দেখিয়া আপনি এরূপ মনে করিতেছেন বাবাঠাকুর?"

চণ্ডী বলিল,—"দেখ না কেন, দেবের দেব মহাদেব গাঁজা, গুলী, চরস, সিদ্ধি প্রভৃতি সকল নেশাতেই সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। ব্রহ্মাও নলমেরু লইয়া গুলী খাইতেন, বেদে এমন প্রমাণ আছে; আর তাঁহার সৃষ্টির সকল জায়গায়—যেমন লাউ-গাছের ফল আর বট-গাছের ফল—যেমন সূক্ষ্মবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি গুলী খাইতেন। আর বিষ্ণু ঠাকুর যে গুলী খাইতেন, এ কথা অনেক পুরাণে লেখা আছে। তার সাক্ষী তাঁর অবতারেই দেখ, কখন মাছ, কখন মাছি, কখন শূয়ার, কখন সিংহ সাজিয়া তাঁহাকে ভূমণ্ডল রক্ষা করিতে হইয়াছে। লোকে বলে, তিনি ইচ্ছাময়, স্বয়ং এত কষ্ট না করিয়া ইচ্ছা করিলে সকলই হইতে পারিত। তবে এত করেন কেন? এই ত বাবা অবুঝের কথা! আরে, তাহা হইলে গুলীর মাহাত্ম্য প্রকাশিত হয় কই? যিনি ভগবান্, তিনি যদি অদ্ভুত কার্য্য করিয়া গুলীর মহাত্ম্য প্রচার না করেন, তবে এ মহৎ কার্য্য করে কে? আমি তোমাকে দেখাইতে পারি, ইন্দ্র, চন্দ্র বায়ু, বরুণ, যম, কুবের, নল, নীল, গয়, গবাক্ষ, হনুমান, মর্কট সকল দেবতাই চিরদিন গুলী খাইয়াছেন এবং এখনও স্বর্গের আড্ডা গুলজার করিয়া গুলী খাইতেছেন। অই মেঘগুলা কি বল দেখি? ওগুলা দেবতাদের গুলীর ধোঁয়া ছাড়া আর কিছুই নহে। এ হেন গুলী সামগ্রী পৃথিবী হইতে উঠিয়া গেল। ইহাতে সৃষ্টি রসাতলে যাইবে না? অবশ্য যাইবে।"

রামহরি বলিল,—"উঠিয়া যাইতেছে বুঝিলেন কিসে? এই আপনি খান, আরও কত লোক খায়। আপনাদের পুণ্যে সৃষ্টি বজায় থাকিবে।"

চণ্ডী বলিল,—"উঁহু। আমার খাওয়ায় আর

কিছু হয় না। হরকুমার দাদার এত বুদ্ধি, তিনি একটা ছিটাও টানেন না ; উমাশঙ্কর বাবু এত পণ্ডিত, এমন জ্ঞানী, কখন গুলী খান না ; ঘনানন্দ ঠাকুর পরম সন্ন্যাসী, অথচ গুলী-বর্জ্জিত। নেশা না করিয়া কখন সন্ন্যাসী হয় শুনিয়াছ কি? কলিতে এ সকলই আশ্চর্য্য কাণ্ড। মনে করিয়াছিলাম, তুমি লোকটা নিশ্চয়ই আমার জুড়িদার। আরে ছ্যাঃ! কেবল গুড়ুক তামাক !"

রামহরি বলিল,—"আপনি তামাক খান ; আমি একটু কাজ সারিয়া শীঘ্র ফিরিতেছি। তা আপনি একাই ত একশ।"

চণ্ডী বলিল,—"একটা কথা শুনিয়া যাও। দেখ, ঐ একা কথাটায় প্রাণে যেন ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেয়। চৌদ্দ বেদ আর ছত্রিশ শাস্ত্রের সর্ব্বত্র লিখিয়াছে, সঙ্গদোষে মানুষ নষ্ট হইয়া যায়। আমি বড়ই কুসংসর্গে পড়িয়াছি। এখন ঘোর কলির প্রতাপে আর কুসংসর্গের দোষে আমারই সময়ে সময়ে ইচ্ছা হয় যে, দাদাকে আমার গুলীর বন্দোবস্তটা উঠাইয়া দিতে বলি। অদৃষ্টে হয় ত সে দুর্দ্দশাও শেষে ঘটে বা! দাদাকে ছাড়িতে পারিব না—মরিলেও না। তিনি দাতাকর্ণ। তিনি সবই বুঝেন, কেবল গুলীর মাহাত্ম্য বুঝেন না। তা একটা দোষের জন্য মানুষের উপর রাগ করা অন্যায়। তিনি যদি বলেন, আমি গুলী ছাড়িলে সৃষ্টি রসাতলে যাইবে না, তাহা হইলে না হয়—তা থাক সে কথা এখন—পরে ভাবা যাইবে। চল যাই দাদার কাছে।"

অন্তঃপুরমধ্যে এক অংশে সুহাসিনী রামহরির পত্নী দাসীকে সঙ্গে লইয়া একটি ঘরে অপূর্ব্ব বিছানা পাতাইতেছেন। আর তাঁহার মা ও শাশুড়ী অন্য স্থানে রূপার থালায় নানাপ্রকার জলখাবার সাজাইতেছেন। দাসীর দেহের যথাযথ স্থানে স্বর্ণালঙ্কার শোভা পাইতেছে। অঙ্গনের মধ্যস্থলে কয়েক জন পুরস্ত্রী বরণের আয়োজন করিয়া রাখিতেছেন। তথায় রজতকলসে আম্রশাখা বিন্যস্ত হইয়াছে এবং আলপোনার দ্বারা সন্নিহিত স্থান সুশোভিত হইয়াছে। রামনগরের কায়স্থ-কন্যা বিধবা ভবসুন্দরী কয়েক জন পরিচারিকা সঙ্গে লইয়া ভাণ্ডারের সামগ্রী গুছাইয়া রাখিতেছেন এবং যাহাকে যাহা দিবার প্রয়োজন হইতেছে, তাহাকে তাহা দিতেছেন।

হরকুমার বাবু ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এক জন কর্ম্মচারীকে আর দুইখানি জুড়ি জুতিয়া আনিবার আদেশ করিলেন। কর্ম্মচারী প্রস্থান করিলে হরকুমার বাবু অধ্যাপকমণ্ডলীর মধ্য হইতে সার্ব্বভৌম মহাশয়কে ডাকিয়া আনিলেন। কর্ম্মচারী গাড়ী তৈয়ার হইয়া আসার সংবাদ দিল। সার্ব্বভৌম মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া হরকুমার একখানি গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন এবং কোচ্ম্যানকে নদীর ঘাটে গাড়ী চালাইতে আদেশ করিলেন। গাড়ী অগ্রসর হইল ; জরিফচালিত চৌঘুড়ি এবং আর একখানি জুড়িও তাঁহাদের সঙ্গে চলিল।

প্রায় একঘণ্টা পরে সকল গাড়ী আরোহিপরিপূর্ণ হইয়া সেই ভবনের সিংহদ্বারে পুনরাগত হইল। গাড়ী পৌঁছিবামাত্র হরকুমার বাবুর আদেশক্রমে এক সঙ্গে অনেক বোমা ও বন্দুকের আওয়াজ হইতে লাগিল। সঙ্গেসঙ্গে নহবৎখানা হইতে নাগারা বাজিয়া উঠিল এবং দ্বারের পার্শ্বদেশ হইতে রোসনচৌকি বাজিতে লাগিল। তখনই অন্তঃপুর হইতে শতাধিক নারী-রসনা-সম্ভূত হুলুধ্বনি দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত করিয়া তুলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খসমূহের গুরুগম্ভীর রব সমুত্থিত হইল। দ্বারসন্নিধানে গাড়ী থামিবামাত্র হরকুমার বাবু লাফাইয়া পড়িলেন এবং ল্যাণ্ডো গাড়ীর নিকটস্থ হইয়া পরম সমাদরে এক ভুবনমোহন বর এবং এক সুন্দরী শিরোমণি কন্যাকে হাত ধরিয়া নামাইলেন। সমুচিত মঙ্গলাচরণ সহকারে বর-কন্যা অন্তঃপুরে নীত হইলেন। হরকুমার, সার্ব্বভৌম, নবীনকৃষ্ণ প্রভৃতি বিশিষ্ট আত্মীয়গণ অন্তঃপুর পর্য্যন্ত সঙ্গে চলিলেন। বর-কন্যাকে বরণ করিবার নিমিত্ত যথাস্থানে লইয়া যাওয়া হইল। বর-কন্যা নির্দ্দিষ্ট স্থানে দণ্ডায়মান হইলে সুহাসিনী বরণ করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন এবং নানাপ্রকার মাঙ্গলিক আচার সম্পন্ন করিয়া দম্পতিকে গৃহমধ্যে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এমন সময় সহসা দশ দিক্ আলোকিত করিয়া পরম শোভাময়ী, বিচিত্র বসন-ভূষণধারিণী এক দেবী-মূর্ত্তি যেন নভস্থল হইতে অবতীর্ণ হইয়া হাসিতে হাসিতে বর-কন্যার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। সমাগত তাবৎলোক এই অলৌকিক শোভাসম্পন্না দেবীকে দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। বর তখনই অগ্রসর হইয়া সেই দেবীর চরণে প্রণাম করিলেন এবং আনন্দজনিত গদ্গদস্বরে বলিলেন,—"মা, এই বিষয়-ঐশ্বর্য্যের আবিলতাপূর্ণ সংসারে তোমাকে দেখিতে পাইলাম, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। তোমার কৃপা থাকিলে আমি এই বিষম পরীক্ষাতেও নিশ্চয়ই উত্তীর্ণ হইতে পারিব। মা যোগেশ্বরি, এ অধম সন্তান যেন কখনই তোমার কৃপায় বঞ্চিত না হয়।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"বাবা উমাশঙ্কর, এ সংসারে ছেলে মাকে ত্যাগ করার অনেক বৃত্তান্ত শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাবা! মা ছেলেকে ত্যাগ করিয়াছে, এমন কথা কেহ কখন শুনিয়াছে কি? আশীর্ব্বাদ করি, তোমার সকল মনোরথ সফল হউক।"

এ দিকে কন্যা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া সেই দেবীর চরণযুগল ধারণ করিলেন এবং অস্ফুট স্বরে বলিলেন,—"আপনার ছেলের আদর সবাই করে; কিন্তু পরের মেয়ের খোঁজ এমন মাও করেন না। আমার প্রতি মা, তোমার একটুও দয়া নাই। কতদিন পরে আজি কপালক্রমে আবার তোমাকে দেখিতে পাইলাম।"

তখন যোগেশ্বরী কন্যাকে সস্নেহে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া বলিলেন,—"অন্নপূর্ণা! তোমার প্রতি আমার অসীম স্নেহ মা; তুমি আমার বড়ই আদরের পুত্রবধূ। আশীর্ব্বাদ করি, মা অন্নপূর্ণা, মা অন্নপূর্ণার ন্যায় তুমি উমাশঙ্করের অনুগামিনী হও এবং স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে উমাশঙ্করে পর্য্যবসিত হও।"

সুহাসিনী উমাশঙ্করকে জিজ্ঞাসিলেন,—"দাদা, কে এই দেবী?"

উমাশঙ্কর উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"ইনিই মা যোগেশ্বরী।"

তখন চারিদিক্ হইতে সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া সেই দেবীকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। তখন যোগেশ্বরী দেবী সুহাসিনীর হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—"তুমি আমার মেয়ে যে মা! বড় ভাল মেয়ে তুমি। আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার সকল দিকেই মঙ্গল হইবে।"

হরকুমার বাবু সেই দেবীর সম্মুখীন হইয়া বলিলেন,—"এখানে এ সময়ে যে আপনাকে দেখিতে পাওয়া গেল, ইহা আমাদের সকলেরই পরম সৌভাগ্য। আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"আমার পুত্র, পুত্র-বধূ, কন্যা, জামাতা, সংসারধর্ম্ম সকলই। আমি যদি এখানে না আসিব, তবে আসিবে কে? তুমি যে বিহাই। কি লজ্জা! বিহাইয়ের সঙ্গে এত কথা কহিতেছি? কিন্তু বিহাই! তুমিই যথার্থ সাধু, তুমিই প্রকৃত জ্ঞানী এবং বিষয়ী হইলেও বস্তুতঃ সন্ন্যাসী। আমি যাঁহার চরণের দাসী, সেই পরমেশ্বর ঘনানন্দরূপী যোগানন্দ তোমাদের সহায়; সুতরাং আমি আর বলিব কি? তা আমি বিহাইএর সঙ্গে এত কথা কহিতে পারি না—লজ্জা করে। আমার অনেক কাজ। ছেলে, বৌ লইয়া আমি এখন ঘরে যাই।"

হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, বাদ্যধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। তখন যোগেশ্বরী দেবী বরকন্যা সঙ্গে লইয়া হাসিতে হাসিতে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সমাপ্ত

দুই ভগ্নী

[সামাজিক উপন্যাস]

দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত

উৎসর্গ

সোদর-প্রতিম আত্মীয় এবং অভিন্ন-হৃদয় বান্ধব

শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষের

চিরপ্রেমময় নাম

এই গ্রন্থ-শিরে অতি সমাদরে সংযোজিত হইল

এবং

অকপট প্রীতির নিদর্শন-স্বরূপ ইহা তাঁহারই

উদ্দেশে গ্রন্থকার কর্তৃক

উৎসর্গীকৃত হইল

দুই ভগ্নী

প্রথম পরিচ্ছেদ

যুগল।

হাসিতে হাসিতে, দুলিতে দুলিতে, চন্দ্রমা আকাশ-সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে কে জানে, কোথায় যাইতেছে। অসংখ্য তারকারাজি বিকসিত প্রসূনসমূহের ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে ধাইতেছে। সরস বসন্ত-বায়ু নাচিতে নাচিতে, নাচাইতে নাচাইতে ছুটাছুটি করিতেছে। রজনী শুভ্রা। পৃথিবী, আর্য্য-বিধবা পৌরকামিনীর ন্যায় শুক্লাম্বর-বিশোভিতা।

এইরূপ সময়ে যুবক-যুবতী এক পরম রমণীয় উদ্যানমধ্যস্থ সরোবর-তীরে বসিয়া আছেন। সরোবর-তীরে মর্ম্মর-প্রস্তরের অতি মনোহর সোপানাবলী; সেই সোপানে যুবক-যুবতী উপবিষ্ট—তাঁহাদের পদ-নিম্নে সরসীর সুনির্ম্মল বারিরাশি। সরসী-বক্ষে চন্দ্রমা হাসিতে হাসিতে দৌড়িতেছে, ডুবিতেছে, ভাসিতেছে। আবার স্থির হইতেছে। বালক খেলিতে খেলিতে ক্লান্ত হইয়া যেমন এক একবার স্থির হয়, স্থির হইয়া সঙ্গীদের প্রতি যেমন এক একবার চাহে, চন্দ্রমা যেন সেইরূপ স্থির হইয়া সেইরূপ চাহিতেছে। উদ্যানস্থ বিকসিত কুসুমসমূহ দাতার সম্পত্তির ন্যায় স্ব স্ব সুরভিরাশি অকাতরে বিলাইতেছে। বায়ু পুষ্পরাশি লইয়া বড় রঙ্গ করিতেছে। এক একটি বিকসিত গোলাপকে শাখাসহ অবনত করিয়া পার্শ্বস্থ অপর গোলাপের গায়ে ফেলিয়া দিতেছে। গোলাপদ্বয় যেন 'ছি! কর কি?' বলিয়া সলাজ হাসির সহিত বিপরীত দিকে সরিয়া যাইতেছে। বায়ু সকলেরই আত্মীয়, নীচ বা মহৎ, বায়ু কাহাকেও উপেক্ষা করে না। বায়ু কখন দরিদ্রের কুটীরে গিয়া তাহার ঝাঁপ নাড়িতেছে, আবার তাহার ছিন্ন কন্থা দুলাইতেছে; কখন বা ধনীর প্রাসাদে গিয়া তাঁহার ঝাড়ের কলম বাজাইতেছে বা তাঁহার সার্সীর কবাট ঠেলিয়া ভিতরে উঁকি মারিতেছে, কখন বা পুস্তকরাশি-পরিবৃত লেখকের প্রকোষ্ঠে গিয়া তাঁহার লিখিত কাগজস্তূপ একটি-একটি করিয়া চুরি করিতেছে, তাহার অধীয়মান পুস্তকের পাতা উল্টাইয়া দিতেছে, কখন বা ধীরে ধীরে পুর-মধ্যে প্রবেশ করিয়া চিন্তামগ্না নবীনার অলক-দাম নাচাইতেছে বা তাঁহার বস্ত্রাদি স্থানভ্রষ্ট করিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছে। অদ্য সুরসিক বায়ু মনোহর চন্দ্র-রশ্মিতে গা ঢালিয়া হাসিয়া হাসিয়া বেড়াইতেছে। যে স্থানে যুবক-যুবতী বসিয়া আছেন, বায়ু তথায় গিয়া একের বস্ত্র অপরের সহিত মিশাইয়া দিতেছে, নবীনার আলুলায়িত কুন্তলরাশি যুবকের পৃষ্ঠে ফেলিতেছে এবং উভয়ের বস্ত্র সরসী-জলে ফেলিয়া ভিজাইয়া দিতেছে। যুবক-যুবতী কথোপকথনে বিনিবিষ্ট; কিন্তু কি জানি কেন, সহসা তাঁহাদের কথাবার্ত্তা ক্ষান্ত হইল। অনেকক্ষণ পরে যুবতী জিজ্ঞাসিলেন,—"মানুষ মরিলে কি হয় যোগেন্দ্র?"

যোগেন্দ্র সবিস্ময়ে কহিলেন,—"এ কথা কেন বিনোদিনি?"

বিনোদিনী ধীরে ধীরে নভোমণ্ডলের প্রতি নেত্র-পাত করিয়া কহিলেন,—"আমি যদি মরি?"

"কেন বিনোদ! তোমার মনে এ দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইল কেন?"

"কি জানি, অদৃষ্টের কথা ত কিছু বলা যায় না। যদিই মরি, তাহা হইলে কি হইবে, ইহাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—"তুমি একা মরিতে পার না, তোমার মৃত্যুর সহিত আর এক জনের মৃত্যু দৃঢ়সংবদ্ধ। তুমি মরিলে সেও মরিবে, পরে উভয়ে অনন্ত জীবন লাভ করিয়া অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করিবে।"

বিনোদিনী ঈষদ্ধাস্যে কহিলেন,—"কে সে জন?"

"সে কে, তুমি জান না? সে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি তোমার সম্মুখেই উপস্থিত।"

বিনোদিনী মুখে কাপড় দিয়া খল্ খল্ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"তুমি!!!"

"কেন, আমাকে তোমার বিশ্বাস হয় না?"

"না, তুমি বড় দুষ্ট। দেখ দেখি, তোমার কি অন্যায় কথা। তুমি সেবার যখন কলিকাতায় যাও, আমায় সঙ্গে লও নাই। আমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া খুন। সপ্তাহ পরে স্বয়ং আসিয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলে। তাহার পর হইতে আমরা একবারও কাছছাড়া হই নাই। আজ আবার তুমি

আমায় ফেলিয়া যাইবার কথা বলিতেছ। যাও, কিন্তু আমার শাপ লাগিবে; যেন তিন দিনের মধ্যে তোমাকে অধীর হইয়া ছুটিয়া আসিতে হয়।"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—"বিনোদ, তুমি সঙ্গে থাকা কি আমার অসাধ? কিন্তু তুমি জান ত, এবার আমার শেষ পরীক্ষা—"

বিনোদ বাধা দিয়া কহিলেন,—"এ পাপ পরীক্ষায় তোমার প্রয়োজন? যাহারা চাকরী বা অর্থের জন্য বিদ্যা শিক্ষা করে, পরীক্ষা বা উপাধি তাহাদের আবশ্যক। মনের আনন্দ ও সংসারের উপকারার্থ যাহারা বিদ্যা শিখে, পরীক্ষায় তাহাদের কোনই প্রয়োজন নাই।"

"তোমার কথা মিথ্যা নহে। কিন্তু আমি যে উদ্দেশ্যে চিকিৎসা-শাস্ত্র আলোচনা করিতেছি, তাহাতে উপাধির বিশেষ আবশ্যকতা আছে।"

"আমি কোনই দরকার দেখিতেছি না। টাকা বা চাকরী ঈশ্বরেচ্ছায় তোমার অনুসন্ধান করিতে হইবে না। তুমিই বলিয়া থাক, 'লোকের উপকার করা অপেক্ষা পরম ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। ঔষধ ও চিকিৎসার দ্বারা আসন্নমৃত্যু হইতে পীড়িত ব্যক্তিকে রক্ষা করা উপকারের পরাকাষ্ঠা।' সেই উদ্দেশ্যেই তুমি এ কঠোর পরিশ্রম, স্বাস্থ্যভঙ্গ ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া কলিকাতায় থাকিয়া চিকিৎসা শিখিতেছ; কিন্তু আজ তোমার কথায় বোধ হইতেছে, তোমার যেন আরও কি উদ্দেশ্য আছে।"

যোগেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন,—"তুমি যাহা বলিলে, তদ্ব্যতীত আমার আর কোনই উদ্দেশ্য নাই। তবে পরীক্ষার প্রয়োজন কি, তাহা তোমায় বুঝাইয়া দিতেছি। চিকিৎসকের প্রতি ও তাঁহার ঔষধের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকা আরোগ্যের একটা প্রধান কারণ। চিকিৎসক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, তাঁহার প্রতি সাধারণের বিশ্বাস অত্যন্ত দৃঢ় হয়। পরীক্ষার এই এক প্রয়োজন, আর এক প্রয়োজন, যে কার্য্য করা গিয়াছে, অল্পের জন্য তাহার শেষ রাখা ভাল নয়।"

বিনোদিনী চুপ করিয়া রহিলেন; কথাটা বুঝি তাঁহার মনে লাগিল। যোগেন্দ্র আবার বলিলেন,—"বিনোদ, তাহা না হইলে তোমায় ছাড়িয়া আমি কি যাইতে পারি? তোমায় ছাড়িয়া থাকিতে আমার যে যাতনা, বোধ করি, তাহার সিকিও তোমার হয় না।"

বিনোদিনী বলিলেন,—"তুমি বড় মিথ্যাবাদী।"

"কেন বিনোদ?"

"কে কবে ইচ্ছা করিয়া যাতনা সহে? আমায় সঙ্গে লইয়া যাইতে দোষ কি?"

যোগেন্দ্র কহিলেন,—"এবার আমাকে পড়াশুনায় এত বিব্রত থাকিতে হইবে যে, হয় তো তোমাকে লইয়া আমায় বিপদাপন্ন হইতে হইবে।"

বিনোদিনী ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন,—"পড়াশুনার মুখে আগুন।"

যোগেন্দ্র বিনোদিনীকে আলিঙ্গন করিয়া সস্নেহে কহিলেন,—"তুমি পাগল!"

এই সময়ে তাঁহাদের পশ্চাতে এক 'ভুবনমোহিনী সুন্দরী আসিয়া দাঁড়াইলেন। যুবক-যুবতী কেহই তাহা জানিতে পারিলেন না। নবাগতা সুন্দরীর বয়স অনুমান অষ্টাদশ বৎসর। তাঁহার দেহ নিরাভরণ। বিধাতা তাঁহাকে যে রূপরাশি প্রদান করিয়াছেন, অলঙ্কারে তাহার কি বাড়াইবে? সুন্দরী বিধবা। তিনি অনেকক্ষণ সমভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার বদনে ঘৃণা ও বিরক্তিচিহ্ন ব্যক্ত হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে বোধ হয়, তাঁহার যাতনা অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন,—"ভাল মেয়ে যা হোক।"

যুবক-যুবতী চমকিয়া উঠিলেন। বিনোদিনী সলজ্জভাবে কহিলেন,—"কে ও, দিদি, তবু রক্ষা।"

দিদি বলিলেন,—"বিনি! তোর কি একটু লজ্জা নাই?"

বিনোদ মস্তকে কাপড় দিয়া, যোগেন্দ্রের নিকট হইতে অনেক দূরে সরিয়া বসিলেন। যোগেন্দ্র বলিলেন,—"ঠাকুরঝি! তোমার সাক্ষাতে আবার লজ্জা কি?"

ঠাকুরঝি কমলিনী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বিনোদিনীকে কহিলেন,—"বিনি! মা তোকে সেই অবধি ডাকছেন। ঝি-রা কোথাও তোর দেখা পেলে না। মাষ্টার মহাশয় দুবার তোর খোঁজ করেছেন।"

বিনোদিনী বিনা বাক্যব্যয়ে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দুরাশা।

বিনোদিনী প্রস্থান করিলে কমলিনী সেই শ্বেত-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত সরসী-সোপানে রাজ-রাজ-মোহিনীরূপে উপবেশন করিলেন। শুভ্র চন্দ্ররশ্মি, ক্রীড়াশীল বসন্ত-বায়ু, বিকসিত কুসুমাবলী, প্রশান্ত সরসী-বারি,

শোভাময়ী প্রকৃতি, কমলিনীর আগমনে যেন সকলই সমধিক সমুজ্জল হইল। সেই শোভাই শোভা—যাহা নিজগুণে পরের শোভা সংবর্দ্ধন করিতে সমর্থ; সেই শ্রীই শ্রী,—যাহা অচেষ্টিতভাবে সন্নিহিত পদার্থের শ্রী-সংবিধান করে; সেই সৌন্দর্য্যই সৌন্দর্য্য,—যাহা আপনি না মাতিয়া পরকে মাতাইতে সক্ষম। কমলিনী সেই স্থানে চিন্তিত, ব্যথিত ও কথঞ্চিৎ ক্রুদ্ধভাবে উপবেশন করিলেন। তাঁহার হৃদয়ের ভাব যাহাই হউক, প্রকৃতি তাঁহার আগমনে প্রফুল্ল হইল।

যোগেন্দ্র যেখানে বসিয়াছিলেন, সেই স্থানেই রহিলেন, কমলিনী কয়েক স্তর ঊর্দ্ধসোপানে উপবেশন করিলেন। তিনি যেন যোগেন্দ্রকে কি বলিবেন মনে করিতে লাগিলেন; কিন্তু কি জানি কেন, পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়-গগনে কি তাড়িত-প্রবাহ ছুটিতেছিল, কে বলিতে পারে? কে জানে, বিধবা কি ভাবিতেছিলেন!

যোগেন্দ্র অনেকক্ষণ অন্য দিকে মুখ করিয়া অন্য-মনে বসিয়া রহিলেন। ক্রমে সুন্দরীর মুখের সে পরুষ ভাব তিরোহিত হইল। যোগেন্দ্র উঠিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"কমল! তুমি কি এখানে বসিবে?"

কমল কোন উত্তর না দিয়া যোগেন্দ্রের মুখের প্রতি চাহিলেন। দেখিলেন, কৈ, যোগেন্দ্রের মুখে তাঁহার মত ভাবনার চিহ্ন নাই ত! অবনতমস্তকে কহিলেন,—"না, বইস—একসঙ্গে যাইব।"

যোগেন্দ্র বসিলেন। জিজ্ঞাসিলেন,—"কমল, কি ভাবিতেছ?"

কমল যেন কি বলিতে গেলেন, আবার সাবধান হইয়া বিষণ্ণস্বরে বলিলেন,—"না"—

যোগেন্দ্র বলিলেন,—"তুমি বল বা না-ই বল, আমি বেশ বুঝিতে পারি, ইদানীং কিছু কাল হইতে তুমি কি ভাবিয়া থাক। তুমি বালবিধবা! আমাদের সমাজে বিধবার ন্যায় ক্লেশ আর কাহার? এই ভাবিয়া দুই বৎসর পূর্ব্বে তোমার বিবাহের জন্য আমি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলাম। তুমি তখন সর্ব্বদা হাসিতে—আনন্দ তোমার সর্ব্বাঙ্গে মাখা থাকিত। তুমি কোনক্রমেই বিবাহে সম্মত হইলে না। আমিও ভাবিলাম, বিধবার বিবাহের প্রধান প্রয়োজন, তাহার ক্লেশ-নিবারণ; যাহার ক্লেশ নাই, তাহার বিবাহ না হইলেও চলে। কিন্তু এবার বাটী আসিয়া অবধি দেখিতেছি, তোমার মনের শান্তি, তোমার আনন্দ, আর তেমন নাই। কিন্তু কমলিনি! তোমার ক্লেশের কথা শুনিতে আমার কি কোন অধিকার নাই?"

কমলিনী নীরব। একবার যোগেন্দ্রের মুখের প্রতি চাহিলেন, আবার মস্তক বিনত করিলেন। যোগেন্দ্র দেখিতে পাইলেন না—কমলিনীর চক্ষে দুই বিন্দু অশ্রু সমাবিষ্ট হইল। যোগেন্দ্র আবার বলিলেন, —"কিন্তু আমার বোধ হয়, তোমার ক্লেশ সামান্য না হইবে। যাহাই হউক, কমলিনি! আমার দ্বারা তোমার ক্লেশ কি কোনক্রমে বিদূরিত হয় না?"

কমলিনী ধীরে ধীরে বলিলেন,—"হয়। তুমি—"

কথার শেষ ভাগ যোগেন্দ্র শুনিতে পাইলেন না। তিনি কহিলেন,—"তবে বল কমল, আমাকে তোমার মনোবেদনা জানিতে দাও।"

কমলিনী বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া রোদনবিজড়িত-স্বরে বলিলেন,—"আমি কেন মরিলাম না?"

যোগেন্দ্র বুঝিলেন, কমলিনী রোদন করিতেছেন। নিকটস্থ হইয়া কাতরভাবে জিজ্ঞাসিলেন,—"কমল, তুমি কাঁদিতেছ কেন?"

কমল মুখ তুলিলেন। দেখিলেন, যোগেন্দ্রের বদনে যথার্থ সহানুভূতির চিহ্ন প্রকটিত। চক্ষের জল বন্ধ হইল। কি বলিবেন মনে করিলেন, কিন্তু বলিতে পারিলেন না; আবার মস্তক বিনত করিলেন। যোগেন্দ্র পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—"বল কমল, কি করিলে তোমার এ যাতনার অবসান হয়?"

সহসা কমলিনী পাগলিনীর ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ঘোর মর্ম্মবিদারকস্বরে কহিলেন,—"হায়! এ পাপ দুরাশা কেন হইল?"

যোগেন্দ্র সবিস্ময়ে সুন্দরীর বদনের প্রতি চাহিলেন, কথা শেষ হইবামাত্র কমলিনী বেগে ভবনোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। যোগেন্দ্র বহুক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। অবশেষে দীর্ঘনিশ্বাস সহ বলিলেন, —"কমল কি পাগল হইল?"

তিনি ঘোর চিন্তিতের ন্যায় সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন।

উপস্থিত উপাখ্যানমধ্যে আর অধিক দূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে তৎসংক্রান্ত প্রধান ব্যক্তিগণের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা বিধেয়। আমরা এক্ষণে তাহাতেই প্রবৃত্ত হইতেছি।

বীরগ্রামে রামনারায়ণ রায় নামক এক জন অতুল সম্পত্তিশালী লোক বাস করিতেন। তাঁহার দুই কন্যা;—কমলিনী ও বিনোদিনী। কমলিনী যখন অষ্টমবর্ষবয়স্কা, তখন কলিকাতার রাধাগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় নামক এক সমৃদ্ধিশালী সচ্চরিত্র যুবকের

সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের বৎসরদ্বয় পরে রাধাগোবিন্দ কাল-কবলিত হন। দশমবর্ষ বয়ঃক্রম-কালে শরদিন্দু-নিভাননা কমলিনী দারুণ বৈধব্য-চক্রে নিবদ্ধা হইলেন। রাধাগোবিন্দের যথেষ্ট স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি ছিল। তাঁহার জীবনান্ত সহ কমলিনী তৎসমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেন। কিন্তু কমলিনী ধনবান্-তনয়া; সুতরাং তিনি তাঁহার স্বামীর অর্জ্জিত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইলেও তাহা গ্রহণ ও অধিকার করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। কমলিনীর পিতা রামনারায়ণ রায়ও সে সম্বন্ধে মনোযোগী ছিলেন না। রাধাগোবিন্দের জীবন-বিয়োগকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ রাধাসুন্দর চট্টোপাধ্যায়ের একটি এক বৎসর-বয়স্ক পুত্র ছিল। সেই পুত্র এবং তাহার সম্ভাবিত ভ্রাতৃগণ এই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে, ইহাই সকলের অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু কাহারও মুখ হইতে সে অভিপ্রায় স্ফূর্ত্তি পায় নাই। এই সকল কারণে বিধবা হইয়াও রাধাগোবিন্দের স্বসম্পর্কীয় ব্যক্তিগণের সহিত কমলিনীর যথেষ্ট আত্মীয়তা ছিল। কমলিনীর মাতা, আপনার সন্তানেরা সম্পত্তি পাইতে পারে, এমন আশা করিতেন। সেই কারণেই হউক, বা অন্য যে কারণেই হউক, তিনি মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত যত্ন করিয়া কমলিনীকে আনিয়া কলিকাতায় রাখিতেন এবং কখন কখন তাঁহার পুত্র নীলরতনকে কমলিনীর নিকট থাকিবার নিমিত্ত বীরগ্রামে পাঠাইয়া দিতেন।

কমলিনীর বিবাহের সম-সময়েই রামনারায়ণ রায়, বিনোদিনীর সহিত বিবাহ দিবার নিমিত্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক এক পিতৃমাতৃহীন, নিরাশ্রয়, কুলীনসন্তানকে নিজগৃহে রাখিয়া প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করেন। বিনোদিনী তখন পাঁচ বছরের এবং যোগেন্দ্র বারো বছরের। উভয়ে এক স্থানে অবস্থান করায় ও একত্র প্রতিপালিত হওয়ায় পরিণামে এই বিবাহ বড় সুখের হইয়া উঠিল। বিনোদিনীর বয়স যখন আট বৎসর, তখন যোগেন্দ্রের সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। যোগেন্দ্র বৃদ্ধ রামনারায়ণ রায় ও তাঁহার গৃহিণীর পুত্রাধিক যত্নের সামগ্রী হইলেন, কমলিনীর পরম সুহৃদ্ হইলেন এবং বিনোদিনীর হৃদয়ের সখা, মনের আনন্দ এবং হাসির ভাণ্ডার হইলেন। যোগেন্দ্র বিদ্যাও যথেষ্ট অর্জ্জন করিলেন; কিন্তু তাঁহার অদম্য জ্ঞান-তৃষ্ণা কিছুতেই নিবৃত্ত হইবার নহে। ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষায় সুশিক্ষা লাভ করিয়া তিনি পরহিত-সাধনোদ্দেশে ও চিকিৎসা-বিদ্যায় জ্ঞান-লাভ করিয়া অতুল আনন্দ-সম্ভোগ-বাসনায় কলিকাতার মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। যোগেন্দ্র মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রামনারায়ণ রায় মানবলীলা সংবরণ করেন। হরগোবিন্দ বাবু নামক এক জন সচ্চরিত্র সুশিক্ষিত ব্যক্তি রামনারায়ণের সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি এই সংসারে চির-প্রতিপালিত, যথেষ্ট বিশ্বাসভাজন ও পরিবারভুক্ত ছিলেন। যোগেন্দ্রনাথ, কমলিনী ও বিনোদিনী কোন নূতন পুস্তক পাঠকালে, কোন প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইলে, হরগোবিন্দ বাবুর নিকট হইতে সে সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইতে হইত। জমীদারী নির্ব্বাহ করা যদিও হরগোবিন্দের কার্য্য, তথাপি তাঁহার 'মাষ্টার মহাশয়' এই উপাধিটাই প্রচার ছিল। আমাদের এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকায় এই কয় নর-নারীই প্রধান পাত্র। এতদ্ভিন্ন আর যে দুই এক জন এই গ্রন্থ-কলেবরে অভিনয়ার্থ উপস্থিত হইবেন, তাঁহাদের বিবরণ তত্তৎস্থানেই সন্নিবিষ্ট হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ফাঁদ

"যে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছি, তাহার তলে কি রত্ন আছে, অবশ্যই দেখিব; যে লোভ হৃদয়ে পোষণ করিয়াছি, তাহার সফলতা করিবই করিব; যে আশা-লতা এত দিনের যত্নে লালিত হইয়াছে, তাহার ফল-ভোগ করিবই করিব। এ দুর্দ্দমনীয় আশা ত্যাগ করা যায় না তো! এ লোভ ত্যাগ করিতে পারিব না; ইহা এ জীবনে ত্যাগ করিব না। লোক নিন্দা করিবে—করুক; সকলে ঘৃণা করিবে—করুক; পরকালে নরক-বাস হইবে—হউক; বিনোদিনীকে অসুখের সাগরে ভাসান হইবে—কি করিব? বিনোদ আমার সুখের পথে কণ্টক—বিনোদ আমার বাসনার অন্তরায়—সে আমার পরম শত্রু। তাহার যাহাই হউক না কেন, আমি মনের সাধ মিটাইব।"

বেলা দ্বিপ্রহরকালে, একান্তে, একটি প্রকোষ্ঠমধ্যে বসিয়া, কমলিনী উক্তরূপ আলোচনা করিতেছেন। এমন সময় হাসিতে হাসিতে হেলিতে দুলিতে মাধী নাম্নী ঝি সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। মাধীর বয়স যেন যৌবনের শেষ-সীমা ছাড়াইয়াছে বোধ হয়, কিন্তু মনের উত্তাল বেগ কিছুই কমে নাই। মাধীর বয়স যতই হউক, তাহাকে দেখিলে সময়ে সময়ে যুবতী বলিয়া ভ্রম হয়। তাহার পরিষ্কার লালপেড়ে সাটী, হাতের বালা ও লাল বেলোয়ারি চুড়ি দেখিয়া কে

বলিবে, মাধীর যৌবন নাই ? তাহার বাহুর স্বর্ণময় তাগা, কপালে ক্ষুদ্র টিপ—অধরৌষ্ঠের সহাস্য ভাব ও পাণের রং, মার্জ্জিত চুলের মোহিনী কবরী এবং সর্ব্বোপরি তাহার বিলাসময়ী গতি—তুমি মাধীকে যুবতী নয় বলিয়া সন্দেহ করিলে, তোমার সহিত দারুণ বিবাদ করিবে এবং সম্ভবতঃ তোমাকে পরাজয় স্বীকার করাইয়া ছাড়িবে। হিংসা পরবশ প্রতিবাসিগণ মাধীর চরিত্র সম্বন্ধে নানা কথা কহে, কিন্তু মাধী নানাবিধ কারণ দর্শাইয়া বলে, লোকেরা সব মিথ্যাবাদী। ফলতঃ কলহ-দ্বন্দ্বে মাধী যেরূপ নিপুণা, তাহাতে তাহার অপ্রীতিকর কোন কথাই না বলা ভাল।

মাধীর বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। যেখানে ছুঁচ না চলে, মাধী সেখানে বেটে চালাইতে পারে বলিয়া খ্যাতি আছে। মাধী বীরগ্রামের রায়দের বাড়ীর ঝি। সাধারণ ঝি-সকলের শ্রেণীতে মাধীর স্থান নহে। তাহাকে অত্যন্ত কর্ম্মিষ্ঠা, বিশ্বাসিনী ও চতুরা বলিয়া বাটীর সকলেই সমাদর করে। মাধীর সহিত বিনোদিনীর বিশেষ সৌহৃদ্য, কারণ, তাঁহার নিত্য একখান দুইখান করিয়া কলিকাতায় যোগেন্দ্র বাবুর নিকট যে চিঠি লিখিতে হয়, মাধী তাহা চিরকাল সুনিয়মে ডাকঘরে পৌছাইয়া দেয় এবং কলিকাতা হইতে তাঁহার যে সমস্ত চিঠি আইসে, মাধী তাহা গ্রাম্য ডাক বাবুর নিকট হইতে যথাকলে আনিয়া হাজির করে। সাদা-মাটা ঝিরা এ কার্য্য এমন করিয়া নির্ব্বাহ করিতে পারে না। কমলিনীর সহিত মাধীর আজিকালি বিশেষ ভাব দেখা যাইতেছে ; কেন যে এরূপ ঘটিয়াছে, তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না। মাধীকে আসিতে দেখিয়া কমলিনী জিজ্ঞাসিলেন,—

"হাসি যে ?"

"আবার চিঠি আসিয়াছে।"

"বিনীর হাতে ?"

"মাধী থাকিতে ?"

"কই ?"

মাধী বস্ত্রমধ্য হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া দিল ? পত্রখানি বিনোদিনীর নামে লিখিত। কমলিনী ব্যস্ততা সহ পত্র খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন,—

"প্রিয়তমে !

তোমার কি হইয়াছে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এখানে আসিয়া অবধি তোমাকে ছয়খানি পত্র লিখিয়াছি, কিন্তু কোনই উত্তর পাই নাই। তোমার চিন্তায় আমার পড়া-শুনা বন্ধ হইয়াছে। এই পত্রের উত্তরার্থে দুই দিন অপেক্ষা করিব, এই সময়মধ্যে সংবাদ না পাইলে আমার সমস্ত কর্ম্ম ফেলিয়া তোমার নিকট যাইতে হইবে। চিন্তায় আমি মৃতপ্রায় হইয়াছি ; যদি আমাকে বাঁচাইতে বাসনা থাকে, ত্বরায় সংবাদ দিবে। ইতি তাং—সন ১২—সাল। ২২নং শান্ত সিংহের লেন, কলিকাতা

তোমারই যোগেন্দ্র।"

মাধী পত্র শুনিয়া বলিল,—"ভালই হইয়াছে, আমিও ঐরূপ চাই।"

কমলিনী বলিলেন,—"আসিলে কি কর্‌বি ?"

"আসিলে এমন কল পাতিব যে, ওদের মুখ দেখাদেখি থাকিবে না।"

কমলিনী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন, "তাহাতে আমার কি উপকার ?"

"কলসীতে জল বোঝাই থাকিলে আর জল ধরে না, তা জান ? সে জল ফেলিয়া দিলে, তবে—তাহাতে অন্য জলের স্থান হইবে। বড় দিদি ! যাহাতে ওদের এই ভালবাসা একেবারে ভাসিয়া যায়, সেই মতলবে এখন সব কাজ করিতে হইবে। এমন অগাধ ভালবাসা থাকিতে কিছুই হবে না। আগে এ গুড়ে বালি দিয়ে তার পর অন্য চেষ্টা।"

"আমার এ রাজকার্য্যে তুমিই মন্ত্রী। দেখো ভাই, যেন মন্ত্রণার দোষে সব না যায়।"

"সে ভাবনা আমার।"

"পত্রখানি কি করিব ?"

"সে ছয়খানিরও যে দশা, এখানিরও সে দশা—আমাকে দাও।"

কমলিনী মাধীর হস্তে পত্র দিলেন। মাধী পত্র লইয়া বলিল,—"একবার দেখে আসি, ছোট দি'দি কি কচ্চেন।"

"চুপ চুপ ! বিনী বুঝি ঐ আসছে।"

অতি ধীরে ধীরে, নিতান্ত বিষণ্ণ-বদনে বিনোদিনী তথায় আগমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কমলিনী জিজ্ঞাসিলেন,—"বিনোদ ! তোকে এত ম্লান দেখাচ্ছে কেন ?"

বিনোদিনীর চক্ষু ছল-ছল করিতে লাগিল, তিনি এ প্রশ্নের কোনই উত্তর দিতে পারিলেন না। কমলিনী পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন,—"যোগীনের সংবাদ পেয়েছিস্ তো ?"

বিনোদিনী "না" বলিয়া বালিকার ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। কমলিনী বলিলেন,—"এর জন্য এত চিন্তা কেন ? বোধ হয়, কোন কার্য্যের গতিকে যোগেন্দ্র

সংবাদ দিতে পারেন নাই। না হয় দশ দিন পরেই সংবাদ পাওয়া যাইবে।"

বিনোদিনী মুখে কাপড় দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"প্রতিদিন একখানা, কখন বা দু-খানা পত্র পাই ; এবার তাঁহার কি হইল ?"

কমলিনী বলিলেন,—"বোধ হয়, পরীক্ষার গোলে পত্র লেখা হয় নাই।"

বিনোদিনী নয়ন পরিষ্কার করিয়া কহিলেন,—"হাজার গোলেও এমন হইবার কথা নয় ত দিদি।"

মাধী ঈষৎ হাস্য করিয়া পরিহাস-স্বরে কহিল, "ছোট-দিদি! তুমি এখনও ছেলেমানুষ। আর একটু বয়স হইলে বুঝিতে পারিবে, পুরুষমানুষকে অত বিশ্বাস করা ভাল নয়।"

বিনোদিনী-সবিস্ময়ে কহিলেন,—"সে কি কথা ?"

মাধী সেইরূপ স্বরে বলিল,—"সে কলিকাতা সহর ; সেখানে তোমার মতন বিনোদিনীর ছড়াছড়ি আছে দিদি! জামাইবাবু নূতন বিনোদিনী পেয়েছেন হয় তো।"

বিনোদিনী ঈষদ্ধাস্যে কহিলেন,—"ছিঃ, তাও কি হয় ? তাঁহার চরিত্রে এরূপ দোষ হওয়া অসম্ভব।"

মাধী হাসিতে হাসিতে বলিল,—"সম্ভব কি অসম্ভব, তা ও বয়সে বুঝা যায় না। তুমি যাহাই ভাব, আমি দেখ্‌ছি জামাইবাবু শিকলি কেটেছেন।

কমলিনী কপট-ক্রোধ সহ বলিলেন,—"তোর এক কথা!"

"কেন, কি অন্যায় ?"

"না—হ'লে ও দোষ পুরুষের সহজেই হ'তে পারে বটে। তবে যোগেন্দ্রের যেমন স্বভাব, তাতে ও সন্দেহ হয় না।"

"স্বভাব যেমনই হউক বড় দিদি, তিনি এবারে ছোট দিদিকে সঙ্গে না লওয়াতে সব সন্দেহ হয়।"

কমলিনী যেন অত্যন্ত চিন্তার সহিত বলিলেন,—"তাই তো মাধী, যোগীন বিনীকে ছেড়ে এক দিনও থাকিতে পারে না, তা এবার সঙ্গে লইয়া গেল না,—আশ্চর্য্য!"

"তাতেই তো সন্দেহ হচ্ছে দিদি-ঠাকুরাণী—জামাইবাবুর স্বভাব মন্দ হয়েছে। ছোট-দিদি সঙ্গে থাকিলে সুবিধা হয় না বলিয়া, এবার রাখিয়া গিয়াছেন।"

"কে জানে ভাই, কাহার মনে কি আছে ?"

সত্য হউক, মিথ্যা হউক, সম্ভব হউক, অসম্ভব হউক, কথা শুনিয়া বিনোদিনীর হৃদয় ফাটিয়া গেল। তিনি একটা কার্য্যের ছলনা করিয়া, মন খুলিয়া ভাবিবার নিমিত্ত সে প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিয়া গেলেন। বিনোদিনী চলিয়া গেলে মাধী ও কমলিনী খুব খানিকটা হাসিলেন।

মাধী বলিল,—"এইরূপেই ঔষধ ধরে।"

কমলিনী বলিলেন,—"যাই বল, বিনীর কষ্ট দেখিয়া আমার বড় যাতনা হয়।"

মাধী উদাসভাবে বলিল,—"তবে কাজ কি ?"

কমলিনী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"কাজ কি ? আমি বিশেষ বুঝিতেছি, কাজ ভাল হইতেছে না ; কে যেন বলিতেছে, ইহাতে সর্ব্বনাশ ঘটিবে। উঃ! তথাপি এ সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে পারিতেছি না তো! বিনোদিনীর যাহা হয় হউক, অদৃষ্টে যাহা থাকে হউক, আমি এ সঙ্কল্প কখন ত্যাগ করিব না। এ বাসনা আমাকে যেরূপে হউক মিটাইতে হইবে।"

সহসা বাটীর মধ্যে একটা গোল উঠিল। ব্যস্ততাসহ এক জন দাসী আসিয়া সংবাদ দিল—"ছোট দিদি ঠাকুরাণীর মূর্চ্ছা হইয়াছে।" মাধী ও কমলিনী সে দিকে দৌড়িলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্ত্রী-দেবতা।

সন্ধ্যাসময়ে কলিকাতা রাজধানী চমৎকার শোভা ধারণ করিল। প্রশস্ত রাজপথ-সমূহে প্রদীপ্ত গ্যাসালোক প্রজ্বলিত হইল। মূল্যবান্ রমণীয় অশ্বযানসমূহ বিলাসী আরোহী লইয়া সজোরে ছুটিতে লাগিল। দলে দলে মুটিয়ারা ইলিস মাছ লইয়া বাটী ফিরিতে লাগিল। সাহেবগণ বাঙ্গালা কেরাণীর পক্ষে বড় সদয় নহেন, নচেৎ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, এখনও চাপকানঢাকা, কোঁচাওয়ালা, অদ্ভুত-বেশধারী কেরাণীবাবুরা কেহ বা একটা ওল, কেহ বা মাছ, কেহ রুমালে করিয়া আলু-পটল লইয়া অবনত-বদনে বাটী ফিরিতেছেন কেন ? চীনাবাজারের দোকানদার চাবীর গোছা হাতে করিয়া লাভালাভ চিন্তা করিতে করিতে বাটী ফিরিতেছে। "চাই বরফ," "মরিচের নকলদানা," "চ্যানা-চুর্‌ গরমাগরম" প্রভৃতি নৈশ-ফিরিওয়ালাগণ সহরের রাস্তায় মধুবর্ষণ করিতেছে। লোক ব্যস্ততায় পরিপূর্ণ। কেহ ব্যস্ত ক্ষুধার জ্বালায়, কেহ ব্যস্ত কাজের খাতিরে, কেহ ব্যস্ত ফাঁকি দিবার জন্য, কেহ ব্যস্ত সভ্যতার দায়ে, আর ঐ যে চশমা চোখে বাবু ধীরে ধীরে, গজেন্দ্রগমনে চলিতেছেন, উনি ব্যস্ত ভণ্ডামির অনুরোধে! এইরূপ ভাল মন্দ ব্যস্ততায় লোকগুলা

ব্যতিব্যস্ত। ফলতঃ নির্লিপ্তভাবে সন্ধ্যাসময়ে কলিকাতার জনপ্রবাহ দেখিতে পারিলে সাংসারিক অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারা যায়।

এইরূপ সময়ে গোলদীঘির পার্শ্বস্থ পথে দুই ব্যক্তি পরিভ্রমণ করিতেছেন। দারুণ গ্রীষ্ম হেতু তাঁহাদের ললাট হইতে ঘর্ম্মবারি বিগলিত হইতেছে। যুবকদ্বয়ের এক জন আমাদের পরিচিত—যোগেন্দ্র, অপর যোগেন্দ্রের সহাধ্যায়ী সুরেশ। অন্যান্য কথার পর যোগেন্দ্র বলিলেন,—"কি আশ্চর্য্য সুরেশ! আমি এখানে আসিয়া অবধি একে একে বিনোদিনীকে ছয়খানি পত্র লিখিয়াছি, কিন্তু তাহার একখানিরও উত্তর পাইলাম না।"

সুরেশ নিশ্চিন্তভাবে বলিলেন, "এর আর আশ্চর্য্য কি?"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—"বল কি? যে আমাকে প্রতিদিন পত্র লিখিয়া থাকে, আমার পত্র না পাইলে যে অধীরা হইয়া উঠে, দুই সপ্তাহমধ্যে তাহার কোনই সংবাদ নাই। ইহা অপেক্ষা ভয়ানক কাণ্ড আর কি হইতে পারে?"

সুরেশ হাসিয়া বলিলেন,—"তিনি হয় ত তোমার পত্র পান নাই।"

"কোন পত্রই পান নাই, ইহা অসম্ভব।"

"পাইয়াও হয় ত উত্তর দেন নাই।"

যোগেন্দ্র ঘৃণাসূচক হাসির সহিত বলিলেন,—"তুমি পাগলের মত কথা বলিতেছ। বিনোদিনী আমার পত্র পাইয়াও উত্তর দেন নাই, ইহার মত অসম্ভব আর কিছুই নাই।"

সুরেশ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"তুমি অতিশয় স্ত্রৈণ।"

যোগেন্দ্র গর্ব্বিতভাবে বলিলেন, "তোমার অদৃষ্ট মন্দ! বিনোদিনীর ন্যায় স্ত্রীর স্বামী হইয়া স্ত্রৈণ অপবাদ কত সুখের, তাহা তুমি কি বুঝিবে?"

"ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, যেন আমায় তাহা বুঝিতেও না হয়। তোমরা স্ত্রীদেবতার উপাসক —তোমরা ও কথা বলিতে পার, কিন্তু আমার নিশ্চয় বিশ্বাস, সংসারের জঘন্যতার যদি কিছু আকর থাকে, তাহা স্ত্রীলোক।"

যোগেন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিলেন, "সুরেশ, তোমার অধিকাংশ মতামত আমি অতি সারবান্ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি, কিন্তু স্ত্রী-চরিত্রে তোমার যে অযথা বিদ্বেষ, ইহাতে আমার একটুও সহানুভূতি নাই। তুমি যাই বল, বিনোদিনীর চিন্তায় আমার আহার-নিদ্রা বন্ধ হইতেছে। সম্মুখে পরীক্ষা উপস্থিত, কিন্তু আমার পরীক্ষা দেওয়া হইতেছে না। আমি কল্যই বাটী যাইব।"

"যাও, গিয়া দেখিবে, বিনোদিনী সুস্থশরীরে হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছেন।"

"ভাল—তাহাই হউক।"

সুরেশ আপনা-আপনি বলিতে লাগিলেন,— "এই দুষ্ট স্ত্রীলোকগুলা—ইহারাই সকল অনর্থের মূল। ইহাদের এমনি আশ্চর্য্য মোহ-মন্ত্র যে, লোকে ইহাদের দোষ দেখিয়াও দেখিতে পায় না।"

যোগেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন,—"সুরেশ, আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, তোমারই মতিভ্রম হইতেছে।"

"তা হউক; কিন্তু তুমি এই ভয়ানক জাতিকে চেন না! বিনোদিনীকে যখন জিজ্ঞাসা করিবে, 'বিনোদ, পত্র লেখ নাই কেন?' বিনোদ উত্তর করিবেন, 'অমুকের ছেলের জন্য এক জোড়া মোজা তৈয়ার করিয়া দিতে বড় ব্যস্ত ছিলাম,' অথবা বলিবেন, 'সূর্পণখা নাটক পড়িতে বড় ব্যস্ত ছিলাম,' কিংবা বলিলেন, 'শ্যামার মার সঙ্গে নুটোর পিসী ক'দিন ধ'রে যে ঝগড়া কল্লে, তাতে পাড়ায় কান পাতবার যো ছিল না, পত্র লিখি কি ক'রে?' ভাই, ওঁরা না পারেন, এমন কর্ম্মই নাই। ওঁদের উপর অত বিশ্বাস করো না।"

যোগেন্দ্র কিছু বিরক্তির সহিত বলিলেন,—"ছিঃ সুরেশ!"

সু। আচ্ছা, এখন আমার ডিউটি পড়িবে, আমি চলিলাম; তোমার সঙ্গে এ সম্বন্ধে সময়ান্তরে আবার তর্ক করিব। তুমি কালি বাটী যাইবে, সত্য না কি?

যোগেন্দ্র বলিলেন,—"বোধ হয়। বোধ হয় কেন—নিশ্চয় যাইব।"

"তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহা কর। তবে এইমাত্র বলিতেছি যে, কেন অকারণ অধীর হইয়া একটা বৎসর বৃথা নষ্ট করিবে?"

এই বলিয়া সুরেশ প্রস্থান করিলেন। যোগেন্দ্র একাকী পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দারুণ চিন্তার হেতু সুশীতল সমীরণ সেবন করিয়াও চিত্তের শান্তি হইল না। তিনি মনে মনে বলিলেন,—"সুরেশ যেরূপ বলিলেন, বিনোদ কি সেইরূপ! ছি! বিনোদ চিঠি লিখেন না কেন? বিনোদের অসুখ হইয়াছে। তাহাই ঠিক।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যোগেন্দ্র বাসায় ফিরিবার উদ্যোগ করিলেন। তিনি প্রত্যাবর্ত্তনকালে দেখিলেন, একটা বৃদ্ধা অতিশয়

কাতরভাবে রোদন করিতে করিতে পথ দিয়া যাইতেছে। বৃদ্ধার অবস্থা ও কাতরতা দেখিয়া সদয়-স্বভাব যোগেন্দ্রের হৃদয় বিগলিত হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কাঁদিতেছ কেন ?"

বৃদ্ধা এই প্রশ্নে আরও কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বিকৃত স্বরে বলিল, "আমার পোড়া কপাল পুড়েছে গো বাবু !"

আবার উচ্চ ক্রন্দন। ক্রমে চারিদিকে লোক জমিয়া গেল। বৃদ্ধা আবার বলিল,—"একে একে যম আমার সব খেয়েছে। আমার এক ঘর ছেলে-মেয়ে ছিল, আমি অভাগী তাদের সব যমের মুখে দিয়ে অমর হয়ে ব'সে আছি।"

বৃদ্ধার কাতরতা ও তাহার মলিন বেশ দেখিয়া যোগেন্দ্রের চক্ষু জলভরাক্রান্ত হইল। বৃদ্ধা আবার বলিল,"একটি নাতি ছিল, তাও পোড়া যমের সহে না গো বাবা !"

এই বলিয়া বৃদ্ধা তথায় আছড়াইয়া পড়িল। ক্রমে ক্রমে জনতা বৃদ্ধি হইল। সে জনতা—তামাসা দেখিতে। কলিকাতা, অর্থের জন্য, অর্জ্জনের জন্য, প্রতারণার জন্য, ইন্দ্রিয়সুখের জন্য ; ইহা স্বার্থপরতা শিক্ষার স্থান, কুনীতির আকর এবং স্বর্গীয় মনোবৃত্তিসকলের বধ্যভূমি। সুতরাং বৃদ্ধার পার্শ্ববেষ্টন করিয়া যে নিষ্কর্ম্মা মানবসমূহ দণ্ডায়মান হইল, তাহারা এই ব্যাপারকে স্বতন্ত্র নয়নে দেখিতে লাগিল। এক জন দর্শক বলিল,—"চল ভাই, কাজে যাই, কার দুঃখ কে দেখে ?" অপর এক জন বলিল,—"হয় ত জুয়াচুরি।" তৃতীয় এক ব্যক্তি বলিল,—"ভিক্ষার এই উপায়।" এক জন নবাগত দর্শক কৌতূহল সহ নিকটস্থ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিল,—"ব্যাপারটা কি ভাই ?" সে ব্যক্তি সংক্ষেপে সমস্ত কথা বলিল। শুনিয়া জিজ্ঞাসাকারী বলিল,—"ওঃ, এই কথা—তবু রক্ষা!" যোগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার নাতির কি হইয়াছে বাছা ?"

"ব্যারাম—এতক্ষণ—ওরে আমার কি হবে রে বাবা।"

"তুমি কোথায় থাক ?"

"বাগবাজার।"

"এখানে কেন আসিয়াছিলে ?"

বৃদ্ধা বলিল,—"শুনেছি, এই ডাক্তারখানায় অমনি ওষুধ দেয়, তাই ম'রে ম'রে এতদূর এসেছি। তা বাবা, কেহ এ দুখিনীর কথা শুনিল না। আহা ! এক কৌটা অষুধও বাছার পেটে পড়িল না।"

বৃদ্ধা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। যোগেন্দ্র বুঝিলেন, রোগী সঙ্গে নাই—ঔষধ দিবে কেন ? পথ দিয়া একখানি খালি গাড়ী যাইতেছিল, যোগেন্দ্র তাহার চালককে গাড়ী থামাইতে বলিলেন। গাড়ী থামিল। যোগেন্দ্র বৃদ্ধাকে বলিলেন,—"এই গাড়ীতে উঠ, আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি। আমি ডাক্তারী জানি—তোমার কোন ভাবনা নাই।"

বৃদ্ধা বলিল,—"বাবা তুমি রাজ্যেশ্বর হও। কিন্তু বাবা, গাড়ীভাড়ার পয়সা ত আমার নাই।"

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"সে জন্য কোন চিন্তা নাই। ঔষধ বা গাড়ীভাড়া কিছুরই জন্য তোমার ভাবিতে হইবে না।"

বৃদ্ধা হাতে স্বর্গ পাইল ; অনবরত আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে গাড়ীতে উঠিল। যোগেন্দ্রও সেই গাড়ীতে উঠিয়া বাগবাজার চলিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শরীর ও মন।

পরদিন বেলা দ্বিপ্রহরকালে যোগেন্দ্র বাসায় ফিরিলেন। বিনোদিনীর জন্য উৎকণ্ঠায় তিনি যৎপরোনাস্তি কাতর ছিলেন, আবার এই বৃদ্ধার বাটীতে সমস্ত রাত্রি অনাহার ও জাগরণ এবং অদ্য দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত স্নান আহার বন্ধ করিয়া রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করায়, যোগেন্দ্রের শরীর ও মন অবসন্ন হইয়া আসিল। রোগী তাঁহার অপরিমেয় যত্নে নিরাপদ হইল। তাহার পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া ও তন্নির্ব্বাহার্থ বৃদ্ধার নিকট কিছু অর্থ দিয়া যোগেন্দ্রনাথ গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী বাসার দ্বারে লাগিল, গাড়ী হইতে নামিয়া বাসায় যাওয়া যোগেন্দ্রের পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি বুঝিলেন যে, অদ্যই তাঁহার কোন কঠিন পীড়া জন্মিবে। অতি কষ্টে উপরে উঠিয়া, যেমন ছিলেন, সেইরূপ অবস্থায় তিনি শয্যায় পড়িলেন। কতক্ষণ তিনি এইরূপে থাকিলেন, তাহা তিনি জানিলেন না। বাসায় এক জন ভৃত্য ও এক জন পাচক ব্যতীত আর কেহ ছিল না। তাহারা আসিয়া সময়ে সময়ে যোগেন্দ্র বাবুর সংবাদ লইতে লাগিল। বুঝিল, বাবু বড় ঘুমাইতেছেন—এখন ডাকিলে হয় ত রাগ করিবেন। অতএব আর অপেক্ষা করা অনাবশ্যক ভাবিয়া, তাহারা আহারাদি সমাপন করিল।

বেলা চারিটার সময় যোগেন্দ্রের চেতনা হইল। তিনি বুঝিলেন, জ্বর হইয়াছে। মনে করিলেন, মানসিক উদ্বেগ ও শারীরিক শ্রমই এই জ্বরের কারণ। আবার যোগেন্দ্রনাথ নিদ্রাভিভূত হইলেন। তাঁহার ভৃত্য আসিয়াও বুঝিল, বাবুর জ্বর হইয়াছে। সে গিয়া ঠাকুর মহাশয়কে সংবাদ জানাইল। ঠাকুর মহাশয়ের মনে বিশ্বাস ছিল যে, নাড়ী পরীক্ষা করিতে তিনি অদ্বিতীয়। সে সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান যেমনই হউক, ইহা আমরা বেশ জানি যে, তিনি তরকারিতে কখনই ঠিক লবণ দিতে পারিতেন না। ঠাকুর মহাশয় যোগেন্দ্রের হাত দেখিয়া ভৃত্য সধুচরণকে আসিয়া বলিলেন,—"বাবুর নাড়ী কুপিত বটে, বায়ুর কোপই অধিক। অদ্য লঙ্ঘন ব্যবস্থা। কল্য অন্য ব্যবস্থা করা যাইবে।"

ভৃত্য বলিল,—"আমি বাবুকে ব্যারামের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কথা কহিলেন না—বোধ হয় কিছুই নয়।"

ঠাকুর মহাশয় বলিলেন,—"তা বই কি? তুমি রাত্রের আহারের যোগাড় কর।"

যোগেন্দ্র বাবুর নিয়োজিত ব্যক্তিদ্বয় তাঁহার ব্যাধিসম্বন্ধে এইরূপ মীমাংসা করিয়া নিশ্চিন্ত হইল, যোগেন্দ্রনাথ সেই গৃহে একাকী রহিলেন। নিদ্রিতাবস্থায় বহুবিধ স্বপ্ন ও বিভীষিকা তাঁহাকে নিরন্তর অবসন্ন করিতে লাগিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহরকালে যোগেন্দ্রনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং তিনি বিভীষিকাপূর্ণ স্বপ্নসকলের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। জ্বর কমে নাই। জ্বর বড় তেজের নয় বটে, কিন্তু যোগেন্দ্র বুঝিলেন, এই কয় ঘণ্টার জ্বর তাঁহাকে মুমূর্ষু রোগীর ন্যায় দুর্ব্বল ও ক্ষীণ করিয়াছে। মাথা ঘুরিতেছে, পৃথিবী ঘুরিতেছে, চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারময়, চিন্তার শ্রেণী নাই; সম্মুখে যেন ভয়ানক বিপদ্ তিনি বুঝিলেন, জ্বরটা সহজ নয়। ডাকিলেন,—"সাধুচরণ!"

তাঁহার ক্ষীণস্বর নিম্নতলস্থ সাধুচরণের কর্ণে প্রবেশ করিল না। ক্ষণেক পরে আবার ডাকিলেন, —কোনই উত্তর নাই। তৃতীয়বারে সাধুচরণ চক্ষু মর্দ্দন করিতে করিতে আসিয়া বলিল,—"আমাকে ডাকিতেছেন?"

কি জন্য যোগেন্দ্র সাধুচরণকে ডাকিতেছিলেন, তাহা আর মনে হইল না। তিনি নীরবে রহিলেন। সাধুচরণ আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"আমাকে কি বলিতেছিলেন?"

যোগেন্দ্র চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন; বলিলেন,— "ওঃ—তুমি একবার বিনোদিনীকে ডাক। তিনি কোথায়?"

বিনোদিনী কে, তাহা সাধুচরণ জানে না। ভাবিল,—"এ কি? বাবুর উপর উপরকার দৃষ্টি পড়িয়াছে না কি?" সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল,— "আমাকে কি বলিলেন, বুঝিতে পারিলাম না।"

যোগেন্দ্র আবার চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। বলিলেন,—"আঃ—সুরেশ বাবু—"

সাধু এবারও বিশেষ কিছু বুঝিল না। কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস করিল না। সে মন্ত্রিবর ঠাকুর মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিতে গেল। 'কিন্তু ঠাকুর মহাশয় তখন যেরূপ নিবিষ্টমনে নাক ডাকাইতেছেন, তাহাতে তাঁহার সহিত কোনই পরামর্শ হওয়া সম্ভাবিত নহে, তাহা হইলও না। প্রাতে ঠাকুর মহাশয় নাসিকাধ্বনির ডিউটি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলে সাধুচরণ তাঁহাকে সমস্ত বিবরণ জানাইল। তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"হয়েছে —বাবুর রীত বিগড়েছে।"

"কিসে বুঝিলে ঠাকুর মহাশয়? বাবু তো সে রকম মানুষ নয়।"

ঠাকুর মহাশয় হাসিয়া বলিলেন,—"দূর পাগল! মানুষ কে কি রকম, তা কি কেউ বল্‌তে পারে? দেখছিস্ না, ইদানীং বাবুর আর কিছুতেই মন নাই। কোনখানে কিছু নাই, পরন্তু বিকাল থেকে দিন-রাত কাটাইয়া কা'ল দুপুরবেলা বাসায় ফিরে এলেন। এ সকল কুরীত। জ্বরে আবোল-তাবোল বকিতে বকিতেও মেয়েমানুষের নাম করছেন। নিশ্চয় বাবুর রীত বিগ্‌ড়েছে। আমি এমন ঢের দেখেছি!"

সাধুচরণ চক্ষু বিস্তৃত করিয়া কহিল,—"উপায়?"

"তোমার মাথা, আর আমার মুণ্ড।"

এই দুই জন মনীষী বসিয়া যখন এবংবিধ পরামর্শ করিতেছেন, সেই সময় সুরেশ বাবু তথায় আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"বাবু বাড়ী গিয়াছেন?"

সাধুচরণ উত্তর দিল,—"আজ্ঞে না, তাঁহার জ্বর হইয়াছে।"

"জ্বর হইয়াছে?"

"আজ্ঞে।"

আর কিছু না বলিয়া সুরেশ রোগীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। সমস্ত লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া সুরেশ মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। যোগেন্দ্রের জ্বর সহজ নয়; যোগেন্দ্র ধীরে ধীরে কষ্টস্বরে বলিলেন,— "সুরেশ! দেখিলে কি ভাই? জ্বর তো সহজ নয় বোধ হয়, আর এ জীবনে বিনোদিনীর সহিত সাক্ষা

হইবে না। আমি কালি সমস্ত রাত্রি স্বপ্ন দেখিয়াছি, বিনোদিনী আকাশের মধ্যে নক্ষত্র-সংবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন, আমি নীচে বসিয়া তাঁহাকে উচ্চশব্দে ডাকিতেছি। বলিতেছি, বিনোদ! আমাকে ফেলিয়া কোথায় গেলে? বহুক্ষণ পরে আমার প্রতি বিনোদিনীর স্নেহপূর্ণ-দৃষ্টি পড়িল। তিনি বলিলেন,—'আগে কেন বল নাই, আগে কেন বুঝ নাই, তোমাকে দেখাইবার জন্যই তো এত দূর আসিয়াছি। কিন্তু আর তো এখান হইতে ফিরিবার উপায় নাই! যোগেন্দ্র! তোমার সহিত আর ইহজন্মে সাক্ষাতের আশা নাই।' আমি পাগলের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলাম। বিনোদ আবার বলিলেন,—'কাঁদিলে কি হইবে? পার যদি এখানে আইস।' আমি পারিলাম না। বিনোদ আবার বলিলেন, 'ছিঃ যোগিন্! দাঁড়াও তুমি—আমি তোমার কাছে একবার দুটি কথা বলিতে যাইতেছি।' বিনোদ আসিলেন। আমি বাহু-প্রসারণ করিয়া তাঁহাকে ধরিতে গেলে তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'যোগিন্! আমাকে ধরা এক্ষণে তোমার অসাধ্য।' আমি তাঁহাকে ধরিতে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, তিনিও ততই পশ্চাতে চলিতে লাগিলেন। অবশেষে এক দুস্তর সমুদ্র বিনোদের পশ্চাতে পড়িল। আমি ভাবিলাম, বিনোদ আর কোথায় পলাইবেন? কিন্তু বিনোদ হাসিতে হাসিতে সেই জলরাশির উপর দিয়া চলিয়া গেলেন, আমি অভাগা পারিলাম না; তীরে বসিয়া মিনতি করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। বিনোদ মধ্য-সমুদ্র হইতে হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিলেন—'ফিরিয়া যাও, আর চেষ্টা করিও না।' অবশেষে বিনোদ সমুদ্রের অপর পারে পৌঁছিলেন।

"তখনও তাঁহার মূর্ত্তি অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতে লাগিল। তিনি সেখানেও স্থির হইলেন না, অনবরত চলিতে লাগিলেন এবং হস্তান্দোলনে আমাকে ফিরিতে বলিতে থাকিলেন। তার পর ক্রমে তিনি এত দূর গিয়া পড়িলেন যে, আর তাঁহাকে দেখা গেল না। ঘোর যন্ত্রণায় আমি মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলাম। এমন সময়ে তোমার আগমনে আমার নিদ্রাভঙ্গ ও তৎসঙ্গে এই যাতনার অবসান হইল। সুরেশ! এ কি দুঃস্বপ্ন ভাই? আমার কি হইবে?"

সুরেশ দেখিলেন, বিনোদিনীর চিন্তাতেই যোগেন্দ্রের এই কঠিন পীড়া জন্মিয়াছে, এখনও সে চিন্তা হইতে অবসর না পাইলে, জীবনের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। বলিলেন,—"চিন্তা কি? আমি বিনোদিনীকে আসিতে লিখি।"

"আসিতে লিখিবে? সে আমার পত্রের উত্তর দিতে পারে না—সে ভাল নাই—সে আসিতে পারিবে না। কি হইবে ভাই?"

সুরেশ বুঝিলেন, এই চিন্তাস্রোত যতদূর সম্ভব বর্দ্ধিত হইয়াছে; বলিলেন,—"আমি রেজেষ্টারী করিয়া পত্র লিখিতেছি। যদি বিনোদ সুস্থ থাকেন, তাহা হইলে অবশ্যই পত্রপাঠমাত্র এখানে আসিবেন।"

"যদি তিনি ভাল না থাকেন?"

"তাহা হইলেও তোমার পীড়ার সংবাদ পাইয়া কেহ না কেহ আসিবে।"

"যদি বিনোদ ভাল থাকিয়াও না আসেন?"

"তাহা হইলে—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, বিনোদ পাপীয়সী। চিন্তা দূরে থাকুক, তুমি তাহার নামও করিও না।"

যোগেন্দ্র মুদিত-নয়নে ধীরে ধীরে বলিলেন,—"আচ্ছা! পরশ্ব বুঝিব, বিনোদ মানুষ, কি পাষাণ।"

সুরেশ ব্যস্ততা সহকারে পত্র লিখিলেন। যাহা লিখিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রত্যয় হইল যে, বিনোদ যদি সুস্থ থাকেন, তাহা হইলে অবশ্য পত্রপাঠ এখানে চলিয়া আসিবেন।

সাধুচরণ আদেশ-ক্রমে পত্র ডাকে দিয়া রেজেষ্টারী রসিদ সুরেশের হস্তে দিল। তিনি যোগেন্দ্রকে রসিদ দেখাইয়া বলিলেন,—"এই দেখ রসিদ। তুমি চিন্তা ত্যাগ কর। পরশ্ব লোক-জনের সহিত বিনোদিনীর পাল্কী তোমার বাসার দ্বারে লাগিবে। এক্ষণে তুমি স্থির হও, আমি চিকিৎসার উপায় করি।"

সুরেশ ব্যস্ততা সহ কলেজে গিয়া অধ্যক্ষ সাহেবকে গলদশ্রুলোচনে সমস্ত বলিলেন। ডাক্তার সাহেব অবিলম্বে সুরেশকে সঙ্গে লইয়া যোগেন্দ্রের বাসায় আসিলেন এবং যথারীতি চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। সুরেশ অনন্যকর্ম্মা হইয়া ব্যাধি-ক্লিষ্ট সুহৃদের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া নিয়ত শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কুপথ্য।

দেখিতে দেখিতে ছয় দিন অতীত হইয়া গেল—যোগেন্দ্র রুগ্ন-শয্যায় শয়ান আছেন।

চল পাঠক, তাঁহার সংবাদ লওয়া যাউক।

বড় গ্রীষ্ম; বেলা ৩টা। যোগেন্দ্র সেই প্রকোষ্ঠে সেই শয্যায় শয়ান রোগী চক্ষু মুদিয়া আছেন।

শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া এক জগন্মোহিনী সুন্দরী ধীরে ধীরে রোগীর শরীরে বায়ুসঞ্চালন করিতেছেন—সেই সুন্দরী কমলিনী। তাঁহার সমীপে, পর্য্যঙ্ক-নিম্নে আর এক কামিনী উপবিষ্টা—সে মাধী। প্রকোষ্ঠে আর কেহ নাই। পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে একখানি চেয়ারে বসিয়া সুরেশ ঘুমাইতেছেন। সেই ঘরে সুরেশের সন্নিকটে আর একখানি চেয়ারে একটি বালক উপবিষ্ট। সে বালক নীলরতন—কমলিনীর ভাসুর-পো।

ভবন-দ্বারের ছায়ায় একখানি পাল্কী পড়িয়া আছে। পাল্কীর সঙ্গী দ্বারবান্ চৌবে ঠাকুর দরজার ছায়ায় বসিয়া, থাম হেলান দিয়া নাক ডাকাইতেছেন। উড়িষ্যার আমদানী অলকাতিলকা-বিশোভিত বাহক মহাশয়েরা রাস্তার অপর পারে ঘরের ছায়ায় কাপড় বিছাইয়া ঘুমাইতেছেন; কেবল এক জন বসিয়া তামাক খাইতেছেন।

যোগেন্দ্র একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন—কমলিনীর পরম রমণীয় বদন তাঁহার নেত্র-পথে পতিত হইল। কমল বলিলেন,—"যোগীন্!"

যোগীন তখন আবার নয়ন মুদিত করিয়াছেন। হয় তো কমলিনীর সম্বোধন তাঁহার কর্ণগোচর হইল না। কিন্তু অল্প বিলম্বেই যোগেন্দ্র আবার চাহিলেন। চাহিয়া বলিলেন,—"কমল! তুমি?"

কমলিনী বলিলেন,—"তোমার পীড়ার সংবাদ পাইয়া আসিয়াছি।"

যোগেন্দ্র। বিনোদ?

কমলিনী। বিনোদ ভাল আছে।

যোগেন্দ্র। আমার পত্র?

মাধী কমলিনীর গা টিপিল। কমলিনী বলিলেন,—"তোমার পত্র বিনোদিনীকে দেওয়া হয় নাই। বিনোদ অন্তঃসত্ত্বা, এ কুসংবাদ তাহাকে দেওয়া ভাল নয়।"

এত যাতনা সত্ত্বেও যোগেন্দ্রের মুখে হাসি আসিল। মায়া! তোমার প্রভুত্ব অসীম! বলিলেন,—"বেশ করিয়াছ।"

কমলিনী ধীরে ধীরে বলিলেন,—"পত্র আমার হাতে পড়িলে দেখিলাম, লেখাটা আর এক হাতের। পাঠ করিলাম। চিন্তায় আমার নিদ্রা হইল না। কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভাত হইল। প্রত্যূষে সকলকে বলিলাম, আমার ভাসুরপোর সম্বন্ধে বড় দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি, আমি অদ্যই তাহাকে দেখিতে যাইব। কেহই আপত্তি করিল না—আমি চলিয়া আসিলাম।"

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কলিকাতায় কমলের শ্বশুরালয়—তিনি সেই সূত্রে সময়ে সময়ে কলিকাতায় যাওয়া-আসা করিতেন। এবারেও সেই ছলনায় আসিলেন।

যোগেন্দ্র বলিলেন,—"কমল! তোমার গুণের সীমা নাই। তোমার নিকট আমি যে ঋণে বদ্ধ, কখনও তাহার পরিশোধ হয় না।"

কমলিনী বলিলেন,—"যোগেন্দ্র। তোমার জন্য আমার যে কষ্ট, তাহা আর কি বলিব? ভগবান্ তোমাকে নীরোগ করুন, সুখে রাখুন, সেই আমার পরম লাভ।"

কমলিনীর নয়ন-কোণে দুই বিন্দু অশ্রু আবির্ভূত হইল। যোগেন্দ্র তাহা দেখিতে পাইলেন না; কারণ, তিনি ক্লান্তি হেতু পুনরায় চক্ষু মুদিয়াছেন।

কমলিনী যোগেন্দ্রের মস্তকে হস্ত মর্দ্দন করিতে করিতে অতৃপ্তনয়নে তাঁহার বদনশ্রী দর্শন করিতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন,—"শরীর রক্তমাংসে গঠিত। হৃদয় মানব-হৃদয়ের হীন বৃত্তিসমূহে পূর্ণ। তবে কেমন করিয়া আমি এ লোভ সংবরণ করিব? জগতে কোন্ রমণী এ লোভ দমন করিতে পারিয়াছে? যদি কেহ পারিয়া থাকে, সে দেবী। কিন্তু আমি সে দেবত্ব প্রার্থনা করি না। আমি এ অদম্য আকাঙ্ক্ষা কখন নিবারণ করিতে পারিব না। লোকে ইচ্ছা হয়, আমাকে পিশাচী বলুক, যদি এ পাপে অনন্তকাল আমায় নরক-ভোগ করিতে হয়, তাহাও স্বীকার, তথাপি এ লোভ ত্যাগ করা আমার অসাধ্য। বিনোদিনীর সর্ব্বনাশ হইবে। তাহাতে কি? এ জগতে কে কবে পরের সর্ব্বনাশ না করিয়া আত্মসুখ-সংস্থান করিয়াছে? কোন্ নরপতি মানব-শোণিতে পদ-প্রক্ষালন না করিয়া মুকুটে মস্তক শোভিত করিয়াছেন? কিন্তু বিনোদ তো আমার পর নহে। বিনোদ পর নহে বটে, কিন্তু যোগেন্দ্রের সহিত তাহার চির-বিচ্ছেদ না ঘটিলে আমার আশা মিটে কই? তাহাতে আমার কি দোষ? কত বাদশাহ, কত নরপতি পিতৃহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা, পুত্রহত্যা করিয়া রাজপদ লাভ করিয়াছে। তাঁহারা যদি সামান্য রাজপদ-লোভে সে সকল দুষ্কর্ম্ম করিতে পারিয়া থাকেন, তবে আমি এই অতুলনীয় সম্পদ হইতে আমার ভগ্নীকে কেন বঞ্চিত করিতে পারিব না?"

সুরেশ রুদ্ধদ্বার-সমীপস্থ হইয়া বলিলেন,—"ঔষধ খাওয়াইবার সময় হইয়াছে। মাথার কাছে শিশি আছে,তাহা হইতে এক দাগ ঔষধ খাওয়াইয়া দিউন।"

কমলিনী তাহার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নূতন ব্যাধি।

কলেজের সাহেবের সুচিকিৎসায় এবং সুরেশ ও কমলিনীর যত্নে ক্রমশঃ যোগেন্দ্র রোগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। এক মাস পরে অদ্য আমাদের তাঁহার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ ঘটিতেছে। এই এক মাসে তাঁহার এমনই পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, তিনি যেন এক্ষণে আর সে যোগেন্দ্র নহেন। তাঁহার সে কান্তি, সে রূপ, সকলই যেন রোগের কঠোর আক্রমণে বিনষ্ট হইয়াছে।

যোগেন্দ্র একাকী বসিয়া আছেন, এইরূপ সময়ে মাধী তথায় আগমন করিল। যোগেন্দ্র মাধীকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসিলেন,—"কি সংবাদ ?"

"বড়-দিদি এখনই আসিবেন ; আমাকে আগে সংবাদ দিতে পাঠাইলেন।"

"তোমার বড়-দিদির গুণের সীমা নাই। কিন্তু তোমার ছোট-দিদি তো আমায় একেবারে চরণে ঠেলেছেন।"

মাধী ঈষৎ হাসির সহিত বলিল,—"সে কি কথা। মাথার জিনিস কেউ কি চরণে ঠেলিতে পারে গা ?"

"তাই তো দেখ্‌ছি।"

"কেন জামাইবাবু ?"

"তিনি আর আমার খবরটিও লয়েন না। ভাল, অন্তঃসত্ত্বা যেন হয়েছেন—তা কি আমার খবরটাও নিতে নাই ?"

কথা শুনিয়া মাধী যেন আকাশ হইতে পড়িল! বিস্মিতের ন্যায় চক্ষু স্থির করিয়া বলিল, "অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন, কে বলিল ?"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—"বাঃ—তোমার বড়-দিদি !"

মাধী পূর্ব্বের ন্যায় চক্ষু স্থির করিয়া বলিল,—"কি জানি বাবু! বাড়ীর কোন কথা তো আমার ছাপা নাই। তা এত বড় খবরটা শুনলেম না—তা হবে।"

"বল কি ?"

"আমি তো বেশ জানি, ছোট-দিদি পোয়াতি নন। কেন, আসিবার আগের দিনও ত ছোটদিদি ঠাকুরুণ তোমার পত্র হাতে ক'রে এসে বড়-দিদির সঙ্গে এক যুগ ধ'রে কথা কইলেন, তা এ কথার তো কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না।"

যোগেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিলেন,—"আমার পত্র—আমার পত্র কি তোমার ছোটদিদি পেয়েছেন ?"

মাধী বলিল,—"ও মা, এ আবার কি কথা! এ যে আমার ঘাড়ে দোষ পড়ে দেখছি। পাবেন না কেন গা ?"

যোগেন্দ্র অস্থির হইয়া উঠিলেন। এ ব্যাপারে কোন্ কথা সত্য, তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, মাধীর কথাই মিথ্যা। তাঁহার হৃদয়ে একটু ক্রোধের আবির্ভাব হইল। কহিলেন,—"মাধী, তুই কি আমার সহিত পরিহাস করিতেছিস্ ?"

মাধী সঙ্কুচিতভাবে বলিল,—"সে কি কথা জামাই-বাবু ? এমন কথা নিয়ে তোমার সঙ্গে কি পরিহাস করা যায় ?"

যোগেন্দ্রের আরও ক্রোধ হইল, তিনি কহিলেন,—"তবে কি তোমার বড়দিদি মিথ্যাবাদিনী ?"

"কেমন ক'রে কি বলি ?"

যোগেন্দ্রের ক্রোধ সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিল। তিনি কহিলেন,—"মিথ্যাবাদিনী! আমার সম্মুখ হইতে দূর হ।"

মাধী কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল,—"আমার কি দোষ ? আমায় না জিজ্ঞাসা করিলে আমি কিছুই বল্‌তেম না। আমি যা জানি, তাই বলেছি, এতে আমার অপরাধ কি ?"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—"তুমি পিশাচী, তুমি রাক্ষসী, তুমি সর্ব্বনাশিনী। তুমি এখনই আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও।"

মাধী কাঁদিতে কাঁদিতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনুচ্চস্বরে কাঁদিতে লাগিল। সে শব্দও যোগেন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল, তিনি অত্যন্ত বিরক্তির সহিত বলিলেন,—"স্ত্রী-রসনা সমস্ত অনিষ্টের মূল।"

এই চেষ্টাজনিত ক্লেশে যোগেন্দ্র কাতর হইলেন। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মাথায় হাত দিয়া শয়ন করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিকার।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে কমলিনী ও নীলরতন যোগেন্দ্রের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যোগেন্দ্রের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে কমলিনীর সহিত মাধীর সাক্ষাৎ হইল। মাধী অস্ফুট-স্বরে কহিল,—"রোগ ধরিয়াছে।"

"ঔষধ ?"

"এখন কেন—বাড়ুক।"

"আপনি বাড়িবে ?"

"কুপথ্য চাই—আমি কিছু দিয়াছি, তুমি কিছু দেও গে।"

"কি রকম ?"

"যেমন যেমন কথা আছে। কিন্তু দেখ দিদি, তোমার জন্য আমি বুঝি মারা যাই। আমার উপর জামাইবাবুর বড় রাগ। যত দূর হয়েছে ভাই, সেই ভাল, এখন আমি গরিব স'রে দাঁড়াই—তোমরা যা জান, তাই কর।"

"ভাবনা কি ? পেটে খেলে পিটে সয়।"

"তোমার হাতে বিচার।"

যখন কমলিনী মাধীর সহিত কথাবার্ত্তায় নিযুক্তা ছিলেন, নীলরতন তখন উপরে গিয়া যোগেন্দ্র বাবুর সহিত কথা কহিতেছিল। এক্ষণে ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"খুড়ী-মা! আজ আবার যোগেন্দ্র বাবুর অসুখ হইয়াছে।"

কমলিনী ত্বরায় উপরে উঠিলেন।

যোগেন্দ্র বাবুর দুইটা বিলাতী কুকুর ছিল, নীলরতন তাহাদের শিকল খুলিয়া দিয়া খেলায় মত্ত হইল।

উপরে উঠিয়া কমলিনী দেখিলেন, যোগেন্দ্র শয্যায় নয়ন মুদিয়া শয়ন করিয়া আছেন। ডাকিলেন—"যোগিন্ !"

যোগেন্দ্র উঠিয়া বসিলেন, কিন্তু কোন কথা কহিলেন না। কি বলিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। কমলিনী জিজ্ঞাসিলেন,—"যোগিন্, তোমার কি আজ অসুখ হইয়াছে ?"

"হাঁ।"

"কেন এরূপ হইল ?"

যোগেন্দ্র উদ্ধতভাবে বলিলেন,—"মাধী—তুমি জান না—মাধী সর্ব্বনাশিনী—মাধী অক্লেশে তোমার গলায় ছুরি দিতে পারে। তুমি এখনই তাহার সংস্রব ত্যাগ কর।"

কমলিনী বিস্মিতের ন্যায় বলিলেন,—"কেন যোগেন্দ্র, মাধী কি করেছে ?"

তখন যোগেন্দ্র একে একে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। শুনিয়া কমলিনী বলিলেন,—"অতি অন্যায়! মাধী চাকরাণী—সে দাসীর মত থাকিবে, সত্য হউক, মিথ্যা হউক, আমাদের ঘরাও কথায় তাহার থাকিবার কি দরকার ? আমি এ জন্য এখনই মাধীকে তাড়াইয়া দিব। কি ভয়ানক! বিনোদের কথায় মাধীর কি কাজ ?"

যোগেন্দ্র কিছু চঞ্চল হইলেন। ভাবিলেন, ইহার মধ্যে কি একটা কথা আছে—কমলিনী তাহা গোপন করিতেছেন। বলিলেন,—"হয় তো মাধী আমার সহিত পরিহাস করিয়াছে। তুমি এখন আমাকে ঠিক কথা বুঝাইয়া দেও।"

"এরূপ কথা বলিয়া তাহার পরিহাস করা অন্যায়! পরিহাসের কি অন্য কথা ছিল না ? যাহা বলিবার নহে, তাহা সে বলিল কেন ?"

যোগেন্দ্রের মন আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি ধীরতা সহকারে বলিলেন,—"তবে কি তাহার কথা সত্য—সে যদি সত্য বলিয়া থাকে, তবে তাহার দোষ কি ?"

কমলিনী রাগতস্বরে বলিলেন,—"দোষ কি ? সত্য হউক, মিথ্যা হউক, তাহাতে তাহার কি ? বিনোদিনী ছেলেমানুষ, তাহার যদি কোন দোষ হইয়া থাকে, তাহা তোমাকে জানাইবার মাধীর কি দরকার ছিল ? আমি আর মাধীর মুখ দেখিব না। তাহাকে এখনই তাড়াইয়া দিব।"

যোগেন্দ্রের চিত্ত যার-পর-নাই বিচলিত হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন যে, বিনোদের সম্বন্ধে কোন ভয়ানক কথা কমলিনী জানিয়াও বলিতেছেন না। নিতান্ত ব্যাকুলভাবে তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—"বল কমলিনী, তোমার পায়ে পড়ি, বল, ইহার মধ্যে কি কথা আছে ?"

"কি বলিব যোগেন্দ্র ?"

"বিনোদিনী অন্তঃসত্ত্বা কি না ?"

"দেখ যোগেন্দ্র, বিনোদিনী বালিকা। ন্যায় অন্যায় বিবেচনা করিবার ক্ষমতা তাহার আজিও হয় নাই। তাহার কার্য্যে তোমার এখন মনোযোগ দেওয়া উচিত নহে।"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—"আহা. সে অন্তঃসত্ত্বা কি না, এ সুসংবাদ জানাও কি আমার উচিত নহে ?"

কমলিনী আবার পূর্ব্বের ন্যায় অন্য কথায় প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর গোপন করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—"বিনোদ আমার ভগ্নী—আমি তাহাকে কোলে পিটে করিয়া মানুষ করিয়াছি। আমার কে আছে ? আমি তাহাকে প্রাণের অপেক্ষা ভালবাসি। তাহার যাহা দোষ—অপরাধ, তাহা আমি কিছুতেই বলিব না। আমার গলায় ছুরি দিলেও আমি বিনোদের বিরুদ্ধ-কথা ব্যক্ত করিব না।"

কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কমলিনীর নয়নকোণে অশ্রুর আবির্ভাব হইল। যোগেন্দ্রের সন্দেহ, বিশ্বাস, কৌতূহল এতই বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল যে, তিনি যেন ক্ষণে ক্ষণে আত্মহৃদয়ের উপর প্রভুতা হারাইতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, বিনোদের সম্বন্ধে এমন

কোন দোষের কথা আছে, যাহা আমার নিকট ব্যক্ত করিলে বিনোদের অনিষ্ট হইতে পারে। কি ভয়ানক! অতি কাতরভাবে বলিলেন,—"কমলিনি! বিনোদিনী তোমার অত্যন্ত যত্নের পাত্রী, তাহা কি আমি জানি না? কিন্তু আমিই কি তোমার পর? যে স্নেহ-বলে বিনোদ তোমার আপনার, সে স্নেহে কি আমারও অধিকার নাই? মাধীর মুখে আমি যাহা শুনিলাম, তাহাতে প্রকৃত কথা না জানিলে সন্দেহের যাতনায় আমার মৃত্যু হইবে; তুমি কি তাহা বুঝিতেছ না? তাহা বুঝিয়াও যদি তুমি আমাকে ভিতরকার কথা না বল, তাহা হইলে কেমন করিয়া বলিব যে, তুমি আমাকে স্নেহ কর? যদি আমাকে এরূপ কষ্টে ফেলিয়া তুমি থাকিতে পার, তবে কেন তুমি আমার পীড়ার সংবাদ পাইয়া আসিয়াছিলে? কেন আমাকে এত যত্ন করিয়া মৃত্যুমুখ হইতে বাঁচাইলে? তোমার স্নেহ কি কেবল মৌখিক? তুমি এত পাষাণহৃদয়, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। স্ত্রী-চরিত্র এতাদৃশ দুরবগম্য, তাহা কে জানিত?"

কমলিনীর চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। তিনি বলিলেন,—"যোগেন্দ্র! তুমি আমার উপর অভিমান করিতে পার। তোমার প্রতি আমার যে কত ভালবাসা বা স্নেহ, তাহা কি বলিয়া বুঝাইব? যোগেন্দ্র! আমার হৃদয়ে যে—যে—যে ভালবাসা আছে, তাহা তুমি কখনই বুঝিতে পার না। তাহা পার না—সেই জন্যই আমার দুঃখ। যোগিন্! তুমি আমার আপন হইতেও আপন। আমি বিনোদিনীকে দুঃখের সাগরে ভাসাইয়া দিতে পারি, কিন্তু তোমার চরণে কুশাঙ্কুর বিঁধিলে তাহাও সহ্য করিতে পারি না। যোগিন্! আমাকে গালি দিও না। জগৎ নির্দ্দয়—তুমি নিষ্ঠুর—তুমি—"

কমলিনী আর কিছু বলিলেন না—বলিতে পারিলেনও না। মুখে কাপড় দিয়া কাঁদিতে লগিলেন।

দুঃখের বিষয়, সকল মানবের মনের গতি সমান নহে। কমলিনী যে কারণে ও যে প্রবৃত্তির উত্তেজনায় এত কথা বলিলেন. যোগেন্দ্রের মনের গতি অন্যবিধ হওয়ায় তিনি তাহার অন্যবিধ অর্থ করিয়া লইলেন। তিনি বুঝিলেন যে, কমলিনীর ন্যায় উদার-স্বভাবা,—স্নেহপরায়ণা কামিনীকে পাষাণী বলিয়া দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করায় তাঁহার মর্ম্মে আঘাত লাগিয়াছে; সেই জন্য তিনি কাঁদিয়াছেন এবং আমাকে নিষ্ঠুর বলিয়াছেন। ভাবিলেন. কথাটা ভাল হয় নাই। বলিলেন, —"কমলিনি! আমার উপর রাগ করিও না, বিনোদিনী তোমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা, তাহা আমি জানি। তাহার নিন্দাসূচক কোন কথা বলিতে তোমার অনেক কষ্ট হয়, সন্দেহ কি? কিন্তু আমি তাহা জানিবার জন্য যেরূপ ব্যাকুল হইয়াছি, তাহা তোমায় বলিয়া কি বুঝাইব? সেই জন্যই যদি একটা রূঢ় কথা মুখ হইতে বাহির হইয়া থাকে, তবে আমাকে ক্ষমা কর। তোমার চক্ষে জল দেখিলে আমি অত্যন্ত কষ্ট পাই। আমাকে সমস্ত কথা বলিয়া এ যাতনা হইতে নিষ্কৃতি দেও।"

কমলিনী মনে মনে বলিলেন,—"পাপ বিনোদিনি! বিনোদিনীর চিন্তায় তুমি ব্যাকুল হইয়াছ। বিনোদিনীকে না ভুলিলে—সে তোমার চক্ষে বিষ না হইলে, আমার আশা নাই। তাহাই করিব। আমার বাসনা পূর্ণ না হয়, সেও ভাল, তথাপি তোমাকে আমি বিনোদিনীর থাকিতে দিব না।" প্রকাশ্যে বলিলেন,—"যোগেন্দ্র! তুমি অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছ, তাহা অমি বুঝিতেছি। তোমাকে এ কষ্ট হইতে উদ্ধার করিতেছি, কিন্তু তুমি বল যে, বিনোদিনীর কোন দোষ গ্রহণ করিবে না?"

যোগেন্দ্র জানিতেন না যে, কিরূপ ঘটনার প্রাবল্যে কিরূপ মানসিক প্রবৃত্তি কিরূপ পরিবর্ত্তন পরিগ্রহ করে। এই জন্যই বলিলেন,—"এ বিষয়ে তোমার অনুরোধ করা বাহুল্য। বিনোদিনী সহস্র অপরাধে অপরাধিনী হইলেও মার্জ্জনীয়া,আমার চক্ষে বিনোদ সততই অমৃতের আগার।"

কমলিনী মনে মনে বলিলেন,—"যতক্ষণ সে বিষ না হয়, ততক্ষণ আমিই কোন্ ছাড়িব?" প্রকাশ্যে বলিলেন,—"ভগবানের কাছে প্রার্থনা, যেন তাহার প্রতি তোমার এইরূপ স্নেহই চিরদিন থাকে। সে বালিকা—তাহার কোন দোষ হইলে তোমার মর্জ্জনা করাই উচিত। কোন্ সংবাদ তোমার প্রয়োজনীয়, বল।"

"বল, বিনোদ অন্তর্ব্বত্নী কি না।"

"না।"

যোগেন্দ্র চমকিয়া বলিলেন,—"তবে তুমি আমায় তাহা বলিয়াছিলে কেন?"

"তোমারই জন্য;—একটা ওরূপ কথা না বলিলে তখন তোমার চিন্তা যায় না, সুতরাং তোমার রোগও সারে না।"

"বিনোদিনী ভাল আছে?"

"আছে।"

"আমার পত্র তাহার হস্তগত হইয়াছে?"

"আমি তো দেখিয়াছি, সে তোমার কয়খানি পত্র পাইয়াছে।"

যোগেন্দ্র কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, —"তাহার উত্তর দেয় নাই কেন, বলিতে পার ?"

"জানি না। আমি এ কথা তাহাকে বার বার বলিয়াছি, কিন্তু কি জানি, সে আজকাল কি এক রকম হইয়াছে।"

যোগেন্দ্র অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,— "দেখ কমলিনি, আমি অন্য যাহা হইবার নহে, তাহাই শুনিতেছি। অন্যে এরূপ কথা বলিলে আমার তাহা বিশ্বাসই হইত না। কিন্তু তুমি নিতান্ত অনিচ্ছায়, আমার বার বার অনুরোধে এ কথা বলিতেছ, আমার বোধ হয়, বিনোদ বা পাগল হইয়াছে।"

কমলিনী মনে মনে বলিলেন,—"বিনোদ! এ জগতে তুই-ই সুখী। তোর প্রতি যোগেন্দ্রের ভালবাসার পরিমাণ নাই। কিন্তু আমি তাহা থাকিতে দিব না। কখনই না।" প্রকাশ্যে বলিলেন,— "তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব ? বিনোদ সাংসারিক কোন কার্য্যে ভুল করে না, কখন একটি অসংলগ্ন কথা বলে না, হাস্য-কৌতুকে তাহার বিরাম নাই, তবে কেমন করিয়া বলি, বিনোদ পাগল হইয়াছে ? তোমায় বলিতে কি যোগেন্দ্র, আমি বিনোদিনীর চিন্তায় অস্থির হইয়াছি। সুযোগমতে সময়ক্রমে তোমার সহিত এ বিষয়ের পরামর্শ করিব ভাবিয়াছিলাম। অন্য ঘটনাক্রমে তাহা তুমি জানিতে পারিলে, ভালই হইল। এক্ষণে শান্তমনে তাহার দোষ গ্রহণ না করিয়া, সুপরামর্শ স্থির কর। আর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও না। আমি আর কিছুই জানি না—আর কিছু বলিবও না।"

যোগেন্দ্র হতাশের ন্যায় বলিলেন,—"আমার আর কিছু জানিবার প্রয়োজন নাই। মাধীর দোষ নাই। আমি তাহার প্রতি অকারণ কটূক্তি করিয়াছি। তুমি তাহাকে আর কিছু বলিও না।" ক্ষণেক চিন্তা করিয়া আবার বলিলেন,—"আরও দুই একটি কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করিব।"

"বিনোদের সম্বন্ধে ?"

"হাঁ।"

"আর কেন ? ভাই, রাগ করিও না। বিনোদ বালিকা।"

"কেন কমলিনি, আমি তো বলিয়াছি, বিনোদের দোষ গ্রহণ করিব না। বিনোদ আমার পীড়ার সংবাদ পাইয়াছিল কি ?"

"মাথা-মুণ্ড তোমায় কি বলিব ? তুমি কি-ই-বা শুনিবে ? আমি তখনই জানি, অভাগী বিনীর সর্ব্বনাশ শিয়রে। এখন দেখিতেছি, তোমার অনুরোধে পড়িয়া আমি পোড়াকপালী তাহার সর্ব্বনাশ শীঘ্র ডাকিয়া আনিতেছি। যোগেন্দ্র! আমি যখন তোমাকে এত বলিয়াছি, তখন আরও যাহা জিজ্ঞাসিবে, তাহাও বলিতেছি, কিন্তু তোমার এত অনুরোধ শুনিলাম, তুমি আমার একটি অনুরোধ শুনিও। তুমি বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্ ও ধীর। বিনোদ বালিকা। আমার মাথা খাও যোগেন্দ্র, আমার মরা মুখ দেখ, যদি তুমি তাহার প্রতি সহসা রাগ কর, কি তাহার প্রতি কঠিন বিচার কর। আমি জন্ম-দুঃখিনী—আমার মুখ তাকাইয়া ভাই, বিনোদের প্রতি রাগ করিও না।"

কমলিনীর চক্ষে জল আসিল। তিনি বস্ত্রাঞ্চলে নয়ন মার্জ্জনা করিলেন। মানব-হৃদয় কত দূর সহিতে পারে, তাহা কমলিনী জানিতেন।

যোগেন্দ্র বলিলেন,—"তাহাই হইবে—এক্ষণে বল, বিনোদ আমার পীড়ার সংবাদ পাইয়াছিল কি না ?"

"সেই ত আমাকে রেজেষ্টারী পত্র দেখাইয়া বলিল, —'দিদি! এই সংবাদ আসিয়াছে, কি করা যায় ? কলিকাতার বাসায় যাওয়া সুবিধা নহে। বিশেষ আমার শরীরটা এক্ষণে বড় ভাল নয়। তিনি তিলকে তাল করেন; হয় তো একটু অসুখ হইয়াছে, আপনিই সারিয়া যাইবে—আমি গিয়া কি করিব ?' তাহার কথা শুনিয়া আমি অবাক হইলাম। বলিলাম, —'বিনি! তোর মতিচ্ছন্ন হইয়াছে।' তার পর আমি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।"

যোগেন্দ্র অনেকক্ষণ কপালে করবিন্যাস করিয়া বসিয়া রহিলেন। সংসার অনন্ত সমুদ্রবৎ বোধ হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, এই অনন্ত সমুদ্রমধ্যে তিনিই একমাত্র জীব, প্রতি মুহূর্ত্তেই তরঙ্গে তরঙ্গে আন্দোলিত, বিচলিত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া দূরদূরান্তরে গিয়া পড়িতেছেন। অনবরতই দেখিতেছেন, এই অনন্তরূপ সংসারে আশ্রয় নাই—অবলম্বন নাই, বিপদের সীমা নাই—সম্মুখে, পশ্চাতে, পার্শ্বে, অগণ্য হিংস্র বিকট প্রাণী বদনব্যাদান করিয়া গ্রাসিতে আসিতেছে।

কমলিনী ভাবিতে লাগিলেন,—"কুপথ্য যথেষ্ট হইল বটে, কিন্তু এতেও তো হইল না; একটা বিরেচক দিলেই তো এ দোষ কাটিয়া যাইবে। আরও চাই।" প্রকাশ্যে বলিলেন,—"এখন ওকথায় আর কাজ নাই, অন্য কথা কহ।"

গম্ভীরস্বরে যোগেন্দ্র বলিলেন,—"পাষাণ নহি। এ প্রসঙ্গ জীবনে ছাড়িব না। তোমাকে আবার

জিজ্ঞাসা করি, এখানে আসার পর বিনোদ তোমাকে পত্র লিখিয়াছে ?"

কমলিনী যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় বলিলেন—"চিঠি—হাঁ—তা—দুই চারিখানা লিখেছে বৈ কি ?"

"তোমার সঙ্গে আছে ?"

"কেমন করিয়া থাকিবে ?"—ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"এখানে আসিবার সময় যখন গাড়ীতে উঠিয়াছি, তখন নীলরতন একখানি পত্র দিয়াছিল। সেখানা ভাল করিয়া পড়াও হয় নাই। তাহাই কেবল সঙ্গে আছে।"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—"আমাকে সেখানি দাও।"

কমলিনী বলিলেন,—"তুমি তাহার কি দেখিবে ? আমি তাহা দিব না।"

যোগেন্দ্র চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কুপিত স্বরে বলিলেন, "আমাকে তাহা দিতেই হইবে।"

কমলিনী পত্র বাহির করিয়া বলিলেন,—"তোমায় পত্র দিব না। আমি উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতেছি।"

যোগেন্দ্র ব্যস্ততা সহ কমলিনীর হস্ত হইতে পত্র কাড়িয়া লইলেন। দেখিলেন, সেই হস্তাক্ষর—সেই চিরপরিচিত হস্তাক্ষর ! পত্র পাঠ করিলেন,—

(গোপনীয়)

"দিদি ! তুমি আর আমায় যোগেন্দ্রের সংবাদ দিও না। যদি তাহার কাছে আমার কথা বলিতে হয়, তবে বলিও, আমি সুখে আছি। তিনি যেন আমার সুখের ব্যাঘাত না করেন। আমার কোন কথা তাঁহাকে না বলাই ভাল। ইতি—

বিনোদিনী।"

"পুনঃ। তুমি কবে আসিবে ?"

যোগেন্দ্র একবার পত্র পাঠ করিলেন। ভাবিলেন, অসম্ভব ! দ্বিতীয়বার পত্রপাঠসময়ে হাত হইতে পত্র পড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন,—"কমলিনি ! তোমার সংবাদ শুভ ! আমি যে প্রতারণা-জালে জড়িত ছিলাম, তাহা হইতে অদ্য তুমি আমায় মুক্ত করিলে। কে জানিত যে, পৃথিবীতে এত পাপ থাকিতে পারে।"

যোগেন্দ্র অচেতনবৎ শয্যায় পড়িয়া গেলেন।

কমলিনি মনে মনে বলিলেন, "এতক্ষণে সম্পূর্ণ বিকার উপস্থিত।"

নবম পরিচ্ছেদ

আর এক দিক্।

এই সময়ে একবার বিনোদিনীর তত্ত্ব লওয়া আবশ্যক। তাঁহার অন্তরের কি অবস্থা, তাহা একবার জানা উচিত নয় কি ?

বীরগ্রামের সেই ভবনের এক প্রকোষ্ঠে বিনোদিনী শয়ন করিয়া আছেন। প্রকোষ্ঠের দ্বারাদি উন্মুক্ত। হর্ম্ম্যসংলগ্ন সেই মনোহর উদ্যান বিনোদিনীর নেত্রপথে পতিত—কিন্তু তিনি উদ্যানের কিছুই দেখিতেছেন না। বিনোদিনী বিষণ্ণা—ঘোর উৎকণ্ঠায় তাঁহাকে যার-পর-নাই কাতর করিয়াছে। তাঁহার শরীর রোগীর ন্যায় দুর্ব্বল। তাঁহার দেহে লাবণ্য নাই, অঙ্গে ভূষণ নাই, কেশের পারিপাট্য নাই। সময়ে সময়ে এক এক বিন্দু অশ্রু তাঁহার নয়নকোণে দেখা দিতেছে। বহুক্ষণ সমভাবে থাকিয়া বিনোদিনী "হা জগদীশ্বর ! তোমার মনে কি এই ছিল ?" বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ক্ষণেক সমস্ত ভুলিবেন স্থির করিয়া সেই উদ্যানের প্রতি নিবিষ্টভাবে চাহিলেন। দেখিলেন, সরসী-হৃদয়ে অমল ধবল মরালমালা, বিকসিত প্রসূনের ন্যায় ভাসিতেছে। একটি পাণকৌড়ি বাতিকাশ্রিত ব্যক্তির ন্যায় অনবরত জলে ডুবিতেছে ও উঠিতেছে। ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ বক তটে উপবেশন করিয়া আয়ত্তাগত নিরীহ মৎস্যজীবননাশের উপায় অন্বেষণ করিতেছে। সরোবর-পার্শ্বস্থ অশোক-বৃক্ষের শাখা হইতে সহসা এক মৎস্যরঙ্গ জলে আসিয়া পড়িল এবং তৎক্ষণাৎ একটি জীবন্ত সফরী চঞ্চুপুটে ধারণ করিয়া প্রস্থান করিল। সরোবরের চতুষ্পার্শ্বে নানাবিধ ফুলের গাছ পর্য্যায়ক্রমে স্থাপিত ; তৎসমস্তের পুষ্প-সমস্ত বিবিধবর্ণসম্পন্ন। কাহারও পুষ্প প্রস্ফুটিত, কাহারও বা মুকুলিত, কাহারও বা দলরাজিচ্যুত হইয়া ভূ-পতিত। স্থানে স্থানে মনোহর লতাসমস্ত নিকুঞ্জাকারে পরিণত। বিনোদিনী দেখিলেন, একটি নিকুঞ্জমধ্যে দুইটি বুল্‌বুল্ প্রবেশ করিল। একটি বুল্‌বুল্ পার্শ্বস্থ লতিকায় যে লোহিত ফল লম্বিত ছিল, তাহা ঠোক্‌রাইল, অপরটিও তদ্রূপ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সে যেখানে ছিল, সে স্থান হইতে তাহার চঞ্চু ফলসংলগ্ন হওয়া সম্ভাবিত নহে। সে ব্যর্থপ্রযত্ন হইয়া নিরস্ত হইল, অমনি প্রথম বুল্‌বুল্‌টি সরিয়া গিয়া দ্বিতীয়টিকে স্বীয় স্থান প্রদান করিল। দ্বিতীয়টি ফল না ঠোক্‌রাইয়া প্রথমটির চঞ্চু সহ স্বীয় চঞ্চু ঘর্ষণ করিল। প্রথম বুল্‌বুল্ 'পিক্‌ড়ু পিক্‌ড়ু' শব্দ

করিল। সে শব্দের অর্থ কে বলিতে পারে? বুলবুল্ কি বলিল,—"কি ব'লে বুঝাব রে প্রাণ, তোমায় কত ভালবাসি?" হইবে!! মানব-প্রকৃতির উচ্চ মনোবৃত্তি কি বিহঙ্গম-হৃদয়েও প্রবেশ করিয়াছে? তাহা যদি হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে হয় ত কোন বুলবুল্-দম্পতি রোমিও এবং জুলিয়েট বা ওথেলো এবং দেস্‌দিমোনা অথবা দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার স্থলাভিষিক্ত হইয়া কোন কাব্য-বিশেষে নায়ক-নায়িকারূপে জগতে অমরতা লাভ করিতে পারে।

বিনোদিনী সমস্তই প্রত্যক্ষ করিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে যে অগ্নি জ্বলিতেছিল, কিছুতেই তাহার শান্তি হইল না। তিনি সে দিক্ হইতে দৃষ্টি অপসারিত করিয়া উঠিয়া বসিলেন। বালিসের নীচে হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া পাঠ করিলেন,—

"প্রিয় ভগ্নি! ক্রমশই তোমার পত্র পাইতেছি ও তাহার উত্তরও লিখিতেছি। তুমি যে কষ্টে পড়িয়াছ, তাহা আমি সবই বুঝিতেছি। কথাটা বড়ই কষ্টের কথা বটে। কিন্তু ভগ্নি, যৌবনে পুরুষের এ দোষ না হয়, এমন নয়; আর একবার এ দোষ হইলে যে আর সারে না, এমনও নয়। আমার ভরসা আছে যে, আমি যেরূপ যত্ন করিতেছি, তাহাতে যোগেন্দ্রের এ দোষ ক্রমে সারিয়া যাইবে। তবে সম্প্রতি যোগেন্দ্রের যে প্রকার মনের গতি, তাহাতে তিনি যেন সেই বারনারীর দাসবৎ! এ জগতে তিনি যেন তাহার ভিন্ন আর কাহারও নহেন। শুনিতেছি, সম্প্রতি এক আইন হইয়াছে, তাহাতে বেশ্যারাও ইচ্ছা করিলে বিবাহ করিতে পারে। সেই আইনের বলে যোগেন্দ্র বাবু না কি সেই দুশ্চরিত্রাকে বিবাহ করিবেন। পোড়া কপাল! আমি একবার সেই পাপিষ্ঠাকে দেখিতে পাই তো এক কিলে তাহার নাক ভাঙ্গিয়া দেই। তুমি এ জন্য ভাবিও না। আমার বোধ হয়, এরূপ নেশা অধিক দিন থাকিবে না। তোমার শেষ পত্র যোগেন্দ্রকে দেখাইয়াছিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'উত্তম।' বোধ হয়, আমি শীঘ্রই বাটী যাইব। যদি পারি, তবে যোগেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া যাইব। প্রধান অসুবিধা—প্রায়ই তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। যখন যেমন হয় লিখিব। তুমি সর্ব্বদা সাবধানে থাকিবে। তোমার চিন্তায় আমি বড়ই অস্থির আছি। ইতি।

কমলিনী।"

বিনোদিনী পত্র পাঠ করিয়া বহুক্ষণ নীরবে রোদন করিলেন। ভাবিলেন,—"কমলিনীই ধন্যা! এ জগতে সে-ই পুণ্যবতী, তাহারই জন্ম সার্থক; সে যোগেন্দ্রের অক্ষয় প্রেম লাভ করিয়াছে। আর আমি? আমি মন্দভাগিনী—আমাতে এমন কি গুণ আছে, যাহাতে সেই অমূল্য হৃদয়রাজ্যে আমি আধিপত্য লাভ করিতে পারি! প্রাণেশ্বর! তুমি বর্ত্তমান পদবীতে সুখে আছ। সুখে থাক; পাপ হউক, তাপ হউক, নাথ! ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, জগতে তোমার সুখ যেন অব্যাহত হয়। কিন্তু আমার দশা! আমার এ যাতনা সহে না যে। আমি কি বলিয়া মনকে প্রবোধ দিই নাথ? স্বর্গ হইতে নরকে পড়িয়া বাঁচিব কেন? হৃদয়েশ, কিন্তু বাঁচিয়াই বা কাজ কি? যোগেন্ সুখে আছেন বুঝিয়া মরিব, ইহার অপেক্ষা সুখের মরণ আর কি আছে? মরিবই স্থির; কিন্তু প্রাণেশ্বর! তোমার চরণ আর একবার না দেখিয়া মরিতেও পারি না তো।"

এক জন ঝি আসিয়া বলিল,—"মাষ্টার মহাশয় আসিয়াছেন।"

বিনোদিনী বলিলেন,—"তাঁহাকে আসিতে বল।"

অনতিবিলম্বে হরগোবিন্দ বাবু—মাষ্টার মহাশয় সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি বিনোদিনীর অবস্থা দেখিয়া সবিস্ময়ে কহিলেন,—"এ কি মা! তোমার এ কি অবস্থা হয়েছে?"

বিনোদিনী কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, কেবল অবনত-মস্তকে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

হরগোবিন্দ বাবু আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"কেন বিনোদ, কাঁদিতেছ কেন মা? তোমার কি হইয়াছে, তাহা তো আমি কিছুই জানি না। যোগেন্দ্র ভাল আছেন তো?"

শেষ প্রশ্ন শুনিয়া বিনোদিনী আরও কাঁদিতে লাগিলেন।

মাষ্টার মহাশয় কহিলেন,—"সে কি! আমাকে কেবল তোমার কান্না দেখিতে ডাকিয়াছ?"

বিনোদিনী বালিসের নীচে হইতে এক তাড়া চিঠি বাহির করিয়া হরগোবিন্দের হস্তে দিয়া অধোবদনে শয়ন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হরগোবিন্দ বাবু একে একে ছয়খানি পত্র পাঠ করিলেন। দেখিলেন, পত্রগুলি কমলিনীর হস্তলিখিত। বলিলেন,—"তা—ই—ত।"—ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিলেন,—"বিশ্বাস হয় না—কমলিনীর জানিবার ভুল।"

রোদন-বিজড়িত-স্বরে বিনোদিনী বলিলেন,—"তিনি আমাকে একখানিও পত্র লিখেন নাই কেন?"

"এবার তুমি তাঁহার একখানিও পত্র পাও নাই ?"

"না। দিদির কাছেও তিনি আমার নাম করেন নাই। তিনি আমাকে এমন পর করিলেন কেন ?"

আবার বিনোদিনী কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার কাতরতায় মাষ্টার মহাশয়ের চক্ষেও জল আসিল। তিনি আবার ধীরে ধীরে কহিলেন—"তাই—ত।"

বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া হরগোবিন্দ বাবু তাঁহার অর্দ্ধ-ধবল কেশরাশি একবার উভয় হস্ত দ্বারা আন্দোলন করিয়া বলিলেন,—"আমি স্বয়ং ইহার অনুসন্ধান না লইয়া কোন কথা বলিতে পারিতেছি না।"

বিনোদিনী বলিলেন, "এ কথা ব্যক্ত করিবার নহে, কাহাকেও বলিবার নহে। সদুপায় ও সৎপরামর্শের জন্যই আপনাকে বলিলাম। তিনি এবং আমি, আমরা উভয়েই আপনার সন্তান বলিলে হয়। এ বিপদ্ হইতে আপনি আমায় রক্ষা করুন। আমার কি হইবে ?"

কাঁদিতে কাঁদিতে বিনোদিনী মাষ্টার মহাশয়ের পদ-স্পর্শ করিলেন।

হরগোবিন্দ তাঁহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন, "বাছা! কি বলিব বল ? আজি যাহা শুনিতেছি, তাহা যার-পর-নাই অসম্ভব। আমি শীঘ্রই সমস্ত জানিতে পারিব। পত্র কয়খানি আমার নিকট থাকুক। এ সব আমার বোধ হয় কিছুই নয়—কমলিনীর ভুল, কাঁদিও না—চিন্তা করিও না। আমি এখনই ইহার অনুসন্ধান করিতেছি।"

মাষ্টার মহাশয় চলিয়া গেলেন। বিনোদিনী কপালে হাত দিয়া ভূমিতলে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার অবিন্যস্ত কেশরাশি ভূমিতলে লুটাইয়া রহিল।

দশম পরিচ্ছেদ

অনেক দূর।

বেলা ৩টার সময় কমলিনী ও মাধবী যোগেন্দ্রের বাসায় আসিলেন। যোগেন্দ্রের চিত্তের অবস্থা বড়ই ভয়ানক। দারুণ সন্দেহে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ। সেই বিনোদিনী—যাহার জীবনে তাঁহার জীবন, তাঁহার জীবনে যাহার জীবন—সে আজি এমন! ইহার অপেক্ষা ভয়ানক কথা আর কি আছে ? যোগেন্দ্র কমলিনীকে দেখিয়া বলিলেন,—"এমন হইবার পূর্ব্বে, এত কথা শুনিবার পূর্ব্বে—কেন মরি নাই ?"

কমলিনী বলিলেন,—"যোগেন্দ্র! সর্ব্বদাই ঐ আলোচনা—ইহাতে শরীর থাকিবে কেন ?"

নিতান্ত উদাসীনের ন্যায় যোগেন্দ্র বলিলেন, "শরীরের প্রয়োজন ?"

"সে কি যোগিন্ ? তুমি বার বার বলিয়াছ, কিছুতেই তাহার দোষ লইবে না, তবে এ ভাব কেন ?"

যোগেন্দ্র কাতরতার সহিত বলিলেন,—"কমলিনি! এ জগতে আমার আর কি সুখ আছে ? আমি তাহার দোষ গ্রহণ করিতেছি না সত্য, কিন্তু আমার হৃদয় তো শূন্য। আমি কি বলিয়া মনকে বুঝাইব ?"

কমলিনী বলিলেন, "একটা বালিকার ব্যবহারে কেন যোগেন্দ্র, তুমি আত্মসুখশান্তি নষ্ট করিতেছ ? আমার অনুরোধ যোগেন্দ্র, তুমি এ সকল ভুলিয়া যাও। আমি তোমাকে বড় ভালবাসি, তোমাকে কাতর দেখিলে আমি যে কষ্ট পাই, তোমাকে কি বলিয়া বুঝাইব ? যোগেন্দ্র! আমার কি অপরাধ ? কেন তুমি এমন করিয়া আমাকে কষ্ট দিতেছ ? তুমি জান না, তোমার জন্য এ হৃদয় কতদূর সহ্য করে। যোগেন্দ্র! তোমার হাতে ধরি—আমাকে উপেক্ষা করিও না—"

কমলিনী উন্মত্তার ন্যায় বলিতেছিলেন, কিন্তু মাধবী তাঁহার গা টিপিল, নচেৎ এই বাক্যস্রোত কোথায় গিয়া থামিত, তাহা কে বলিতে পারে ? যোগেন্দ্র অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"তাহাই হইবে। তোমার যাহাতে কষ্ট হয়, তাহা করিব না, তোমার সুখের কামনায় এ ব্যাপার যতদূর পারি, ভুলিতে চেষ্টা করিব।"

কমলিনীর অধর-প্রান্তে একটু হাসি দেখা দিল। ভাবিলেন, তাঁহার বাসনার পথ ক্রমেই সহজ হইয়া আসিতেছে। বলিলেন,—"আমি তো কালি বাটী যাইব, তুমি কবে যাইবে বল।"

যোগেন্দ্র চমকিয়া বলিলেন, "আমি বাটী ?—এ জীবনে না।"

আবার সেই অমৃতময় স্বরে কমলিনী বলিলেন,—"সে কি কথা যোগেন্দ্র ? এই তো তুমি বলিলে, আমার যাহাতে কষ্ট হয়, তাহা করিবে না। তোমার অদর্শনে আমি কি কষ্ট পাই না ? যোগেন্দ্র! জগতে আমার প্রধান দুঃখ যে, তুমি আমার চিত্ত বুঝিলে না!"

কমলিনী মস্তক বিনত করিলেন। যোগেন্দ্র অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তাহাও স্বীকার। বাটী যাইব। কিছু দিন বিলম্বে। একবার স্বচক্ষে দেখিয়া আসিব, আমাকে ভুলিয়া বিনোদিনী কেমন করিয়া আছে। ওঃ—"

"বেশ।"

কমলিনী অনেকক্ষণ মস্তক বিনত করিয়া চিন্তা করিলেন। পরে কহিলেন, "তবে যোগিন্, আমাদের বিদায় দাও।"

তাঁহার চক্ষে জল আসিল, গলদশ্রুলোচনে আবার বলিলেন, "তোমার সহিত সদ্ভাব যেন চিরদিনই থাকে। এই অনুরাগ যেন শতগুণে বর্দ্ধিত হয়। তুমি যেন—"

কমলিনী আর কথা বলিলেন না। কাঁদিতে কাঁদিতে সে প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন। যোগেন্দ্র ভাবিলেন, "কমলিনী দেবীর আমার প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ!" কমলিনী চলিয়া গেলে মাধী যোগেন্দ্রকে প্রণাম করিয়া বলিল,—"জামাই-বাবু, দোষ অপরাধ নিও না; কি বল্‌তে কি বলেছি।"

যোগেন্দ্র যেন কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,—"আর সে কথা কেন? আমারই বুঝিবার ভুল।"

"তবে আসি গো জামাইবাবু?"

"না, তুমি আর একটু থেকে যাও। তোমার দিদি ঠাকুরাণীকে যেতে বল। তুমি একটু পরে যেও।"

মাধী বাহিরে আসিল: দেখিল, দিদি ঠাকুরাণী একটি গৃহ-প্রাচীরের দিকে মুখ ফিরাইয়া রোদন করিতেছেন। কমলিনী রোদন করিতেছেন কেন?

"যে আগুন জ্বালিলাম, কে জানে, তাহা কোথায় গিয়া থামিবে? কে জানে, অদৃষ্টে কি আছে? আমি তো চলিলাম.—বিনোদিনীর মাথা যত দূর খাইতে পারা যায়, খাইলাম। কিন্তু তাহার দোষ কি? সে সরলা বালিকা, স্নেহ তাহার জীবন, ভালবাসা তাহার সর্ব্বস্ব, তাহাকে তো অসুখের সাগরে ভাসাইলাম। সে তো পর নয়। যাহার প্রতি মমতা আপনি হয়, যাহাকে না ভালবাসিয়া থাকা যায় না, তাহার প্রতি এ অত্যাচার কেন? আমি যে তাহার সর্ব্বনাশ করিতেছি, সে কি তা জানে? জানিলে—ওঃ—জানিলে ছিল ভাল। হায়! কেন এ পাপমতি হইল? এখন করি কি? জগদীশ্বর! না, এ পাপ-হৃদয়ে, এ পাপকার্য্যে তোমার নামে কাজ নাই। জগদীশ্বরে কাজ নাই, তোমাকে ডাকিব না, তুমি এ কার্য্য দেখিও না। কি যাতনা! ওঃ! কি করিব? তবে কি ফিরিব? অসম্ভব—এতদূর আসিয়া ফেরা অসম্ভব। সম্ভাবনা থাকিলেও কি ফিরিতে পারি? না—না—না। স্নেহ—ধর্ম্ম—সমাজ কিসের জন্য? আমি এ সুখের আশা ত্যাগ করিতে পারিব না কি—কিন্তু ওঃ! কি হইবে! যদি এ আগুন ক্রমশঃ প্রবল হইয়া সব ভস্ম করিয়া ফেলে! তবে? এত করিয়াও যদি আশা না মিটে! তবে? যদি—ওঃ—ওঃ! এ চিন্তা আগে হয় নাই কেন? কি করি? না, তাহা হইবে না, তাহা হইতে দিব না, এ বাসনা সফল করিতেই হইবে। ওঃ, জগ—আঃ, আবার কেন? সে নাম আবার কেন? তবে কাহাকে ডাকিব? কে এ বিপদে আমার সহায় হইবে?"

কমলিনী এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রোদন করিতেছেন, এমন সময় মাধী তাঁহার সমীপস্থ হইয়া, একটু থাকিয়া যাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিল। কমলিনী তাহার কথা শুনিয়া বলিলেন,—"মাধী! আমায় এ মৃত্যুযাতনা হইতে রক্ষা কর। আমার কি হইবে? আমি কি করিতে কি করিলাম? এ যাতনা সহে না আর মাধী!"

"এত দূরে আসিয়া এ বিবেচনা মন্দ নয়।"

"যত দূর হইয়াছে, সেই ভাল, আর না।"

"যত দূর হইয়াছে, তাহাতে তোমার সাধ মিটে কই? তবে তুমি নিরস্ত হও।"

কমলিনী ক্ষণেক চিন্তা করিলেন। তাঁহর উজ্জ্বল চক্ষু দিয়া যেন অগ্নি বাহিরিতে লাগিল। কহিলেন, —"নিরস্ত হইব—জীবন থাকিতে? না—না—না। ঐ আশা—ঐ ধ্যান—ঐ জ্ঞান! জীবন-মরণের সহিত ও বাসনার সম্বন্ধ।"

"তবে এখনও কল পাতিতে হইবে। এখনও ঠিক হয় নাই—আরও বুদ্ধি খরচ করিতে হইবে।"

তখন শোণিতপিপাসু ভৈরবীর ন্যায় চক্ষু বিকট করিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় বিকৃত স্বরে কমলিনী বলিলেন,—"তাহাই কর—অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে —তাহাই কর—ডুবিয়াছি তো পাতাল কত দূর দেখিব, বিনোদ আমার শত্রু, তাহার হাড়ে হাড়ে আগুন জ্বালাইয়া দেও—কিসের মায়া?"

কমলিনী আর কথা বলিলেন না, ব্যস্ততাসহ গাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। মাধী গাড়ী পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে আসিল। বলিল,—"তুমি যাও দিদি-ঠাকরুণ, আমি একটু পরে যাব।"

দ্বারবান্ কোচ্‌ম্যানকে গাড়ী চালাইতে বলিল। গাড়ী ক্রমে অদৃশ্য হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ওঃ !!

মাধী আসিয়া দেখিল, যোগেন্দ্র বাবু একখানি চেয়ারে বসিয়া আছেন। জিজ্ঞাসিল, "আমাকে কি বলিতেছেন ?"

যোগেন্দ্র একটু হাসিয়া বলিলেন, "মাধী, বল্ দেখি, সুখ কিসে হয় ?"

মাধীও একটু হাসিয়া উত্তর দিল, "সুখ ? অনেক টাকা-কড়ি, ভাল ঘর-বাড়ী, যথেষ্ট সোনা-রূপা থাকিলে সুখ হয়।"

"তোর কি কি আছে ?"

"আমার ? আমি গরিব মানুষ, আমার কি থাক্‌বে ? একখানি খড়ের ঘর, দুই একখানি কুচো গয়না, আর দুই শত টাকা নগদ আছে, তোমাদের চরণ ধ'রে আছি, তোমরা মনে কর্‌লে সবই হয়।"

"কত টাকা হ'লে তোর পাকা বাড়ী হয় ?"

"রমজান মিস্ত্রীকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সে বলে, দেড় হাজার টাকা হ'লে কোঠাবাড়ী হয়। তা কোথায় পাব জামাইবাবু ? সে সুখ আর এ ফেরায় হলো না।"

"তোরে আমি যা জিজ্ঞাসা করি, তুই যদি তার ঠিক জবাব দিস্, তবে আমি তোর কো'ঠা ক'রে দিই।

"তা আর বলবো না জামাইবাবু ? কোঠা না ক'রে দিলেই কি ঠিক কথা বলবো না গো ? সে কি কথা ?"

মাধী মনে মনে ভাবিল, তার কপালটা পাতা-চাপা। একটু জোর হাওয়া লেগে পাতাটা হঠাৎ সারে গিয়েছে। বড়-দিদি বলেছেন, বড়মানুষ ক'রে দেবেন। আবার জামাইবাবু বল্‌ছেন, কোঠা ক'রে দেব। মন্দ নয়। জামাইবাবু আমার কেহ নন, বড়দিদিও আমার কেহ নন। আমার কোন রকমে কিছু হ'লেই হলো। তাঁহাদের যাহাই কেন হউক না—আমার তাহাতে কি ?

যোগেন্দ্র জিজ্ঞাসিলেন,—"আচ্ছা, বিনোদিনী কেন আমাকে পত্র লেখে না, কেন আমার নাম করে না, বলিতে পারিস্ ?"

মাধী বলিল, "তা—তা—আ—আমি কি জানি ?"

যোগেন্দ্র বলিলেন, "মাধী ! আমি সব বুঝিতে পারি। কেন যে বিনোদিনী এমন হইয়াছে, তাহা তোমার দিদিও জানেন, তুমিও জান। তোমার দিদি, বিবেচনা কর, ভগ্নীর কথা বলিবেন কেন ? কিন্তু তোমার বলিতে দোষ কি ?"

মাধী মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "তা বাবু—তা কি বলিব ?"

"যা জানিস্, তাই বল, দেড় হাজার টাকার কোঠা হচ্ছে আর কি ?"

"বড় ঘরের বড় কথা জামাইবাবু। আমি গরিব।"

"তোর কোন ভয় নাই, তুই বল।"

"কথাটা বড় শক্ত। না বাবু ! আমার কোঠার কাজ নাই—তোমার শুনেও কাজ নাই।"

"না মাধি বল ! আমি রাগ করিব না।"

"পোড়া লোক কত কথা কয়, সব কি শুনতে হয় ?"

"তোমার ছোট দিদির কথা কি বলে, বলো।"

"তা বাবু ! আমি বলিতে পারিব না। আমি যাই, বড়-দিদি আবার রাগ করিবেন।"

মাধীর এইরূপ কৃত্রিম সঙ্গোপন-চেষ্টায় যোগেন্দ্র-নাথের সন্দেহ ও কৌতূহল চরম সীমায় উঠিল। তিনি তখন বলিলেন, "মাধী ! তুই আমার নিকট যাহা চাহিবি, তোকে তাহাই দিব। তুই কি জানিস, বল।"

"না বাবু, আমি যাই।"

মাধী পা বাড়াইল। যোগেন্দ্র তখন অধীর হইয়াছেন। তিনি ব্যস্ততাসহ মাধীর সমীপস্থ হইয়া বলিলেন, "মাধি ! তোর পায়ে পড়ি, তুই যাহা বলিবি, তাই দিব তোর কোন ভয় নাই, তুই বল্।"

তখন মাধী বলিল, "কি আর বলিব মাথামুণ্ডু ! লোকে বলে, ছোট-দিদি—"

মাধী চুপ করিল। তখন যোগেন্দ্রনাথের শরীর কাঁপিতেছে। তিনি চক্ষু বিস্তৃত করিয়া মাধীর কথার শেষ অংশ শুনিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া আছেন। মাধী চুপ করিল দেখিয়া তিনি বলিলেন, "কি কি, লোকে কি বলে ? বল, ভয় কি ?"

"লোকে বলে, ছোট-দিদির স্বভাব ভাল নাই।"

কথা যোগেন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি প্রথমেই চমকিয়া উঠিলেন। সহসা সেই প্রকোষ্ঠে বজ্র পড়িলে বা সহসা গলদেশে হলাহলধারী ভুজঙ্গ দেখিলেও যোগেন্দ্রনাথ তাদৃশ চমকিত হইতেন না। সেই শব্দ তাঁহার হৃৎপিণ্ড কাঁপাইয়া দিল। তাড়িত প্রবাহের ন্যায় সেই কথা তাঁহার সমস্ত শিরায় প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিকম্পিত করিল। সংসার অন্ধকার দেখিলেন। বোধ হইল যেন, অনন্ত অন্ধকারময় শূন্যরাজ্যে তিনি রহিয়াছেন। বোধ হইল, তাঁহার

দেহে শোণিত নাই, অস্থি নাই, মজ্জা নাই, চর্ম্ম নাই, কিন্তু তিনি আছেন। তাহার পর সংজ্ঞা। সংজ্ঞার প্রথম চিহ্ন যাতনা। সে যাতনা,—তাহার তুলনা নাই! শত সহস্র বৃশ্চিক, শত সহস্র ভুজঙ্গম এককালে দংশন করিলে বা শত সহস্র শাণিত অসি সহসা শরীরে বিদ্ধ হইলে সে যাতনার সমান হয় না। বহুক্ষণ পরে যোগেন্দ্র বলিলেন, "তুমি যাও। আমার কথা হইয়াছে।"

মাধী চলিয়া গেল। কোঠার কথা বলিতে তাহার তখন সাহস হইল না। ভাবিল, সময়ান্তরে সে প্রস্তাব করা যাইবে। কি মনে হইল, যোগেন্দ্র উঠিয়া আবার চীৎকার করিতে লাগিলেন, "মাধী! মাধী!" মাধী আবার আসিল। যোগেন্দ্র জিজ্ঞাসিলেন,—"তাঁহার দোষের প্রমাণ দেখাইতে পার?"

"তা বাবু, চেষ্টা ক'রে দেখিলে বলা যায়। কেমন করিয়া বলি?"

"কে এই কুলটার হৃদয়বল্লভ, জান?"

"কি জানি বাবু? লোকে বলে হরগোবিন্দ বাবু মাষ্টার মহাশয়।"

যোগেন্দ্র বক্ষের উপর হস্ত, তাহার উপর আর এক হস্ত দিয়া উন্মাদের ন্যায় সেই গৃহের চতুর্দ্দিক্ অনেকক্ষণ ঘুরিলেন। মাধী সভয়ে দেখিল, তাঁহার লোচন-যুগল রক্তবর্ণ, পলকশূন্য, তাঁহার মূর্ত্তি চিত্রিত পটের ন্যায়। ভাবিল, কি সর্ব্বনাশ! বলিল, "আমি চলিলাম জামাইবাবু!"

যোগেন্দ্র কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহার তখন কথা কহিবার শক্তি নাই, হৃদয়ে হৃদয় নাই। মাধী চলিয়া গেল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। যোগেন্দ্র সেইরূপ ভাবেই রহিয়াছেন। সাধু আসিয়া একটি সেজ জ্বালিয়া দিয়া গেল। আলোক দর্শনে যোগেন্দ্রের মনে বাহ্য-জগতের অস্তিত্বের উপলব্ধি হইল। তখন তিনি গৃহমধ্যস্থ পর্য্যঙ্কে অধোবদনে শয়ন করিলেন;—নিদ্রার জন্য নহে, আরামের জন্য নহে, অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত যদি হৃদয় একটুও শান্ত হয়, সেই প্রত্যাশায়। ভ্রান্ত! শান্তি আর তোমার নিকট আসিবে না। তুমি যে চক্রে নিবদ্ধ হইয়া আবর্ত্তিত হইতেছ, কে জানে, তাহা কোথায় গিয়া থামিবে! এ জগৎ সুখের স্থান নহে। ইহা পাপ, তাপ, দুষ্প্রবৃত্তি ও যাতনার আকর। কেন বৃথা শান্তির অন্বেষণ করিতেছ? এ জীবনে সে আশা করিও না। ভাঙ্গিতে সকলেই পারে, কিন্তু হায়! গঠন করা মানব-সাধ্যের অতীত! সুতরাং যোগেন্দ্র! যাহা গিয়াছে, তাহা আর আসিবে না, তাহা আর হইবে না। তবে কেন ভাই কষ্ট পাও? এ কথা কে বুঝে? যোগেন্দ্র সেইরূপ শয়ন করিয়া আছেন। সাধু আসিয়া জিজ্ঞাসিল,—"রাত্রে কি আহার হইবে?"

উত্তর,—"কিছুই না।"

ক্রমে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইল। কলিকাতা নিস্তব্ধ, জীবনের চিহ্ন যেন নগরী হইতে বিদূরিত হইয়াছে। মৃত্যু আসিয়া যেন সমস্ত নগরীকে গ্রাস করিয়াছে বোধ হইতে লাগিল। দূরস্থিত কল-সকলের বিকট শব্দ যেন সেই বোধের আরও সহায়তা করিতে লাগিল। যোগেন্দ্র শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। কি করিবেন, স্থির করিতে পারিলেন না। সামান্য পরিবর্ত্তনেও হয় তো চিত্ত একটু স্থির হইবে ভাবিয়া যোগেন্দ্র পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেই প্রকোষ্ঠে একখানি টেবিল। সেই টেবিলের উপর একটি আলোক জ্বলিতেছে ও কতকগুলি পুস্তক বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। প্রকোষ্ঠের চতুর্দ্দিকে ভিত্তিসমীপে চারিটি আলমারি। তাহার একটিতে কতকগুলি ঔষধ, একটিতে কতকগুলি চিকিৎসকের অস্ত্র ও যন্ত্র, একটা বাক্স প্রভৃতি এবং অপর দুইটা নানাবিধ পুস্তক পরিপূর্ণ। টেবিলের এক দিকে একখানি ক্ষুদ্র কাষ্ঠফলকের উপর একটি মানব-কঙ্কাল দাঁড়াইয়া জগতের নশ্বরতার সাক্ষ্য দিতেছে, মৃত্যুর পরাক্রমকে উপহাস করিতেছে এবং মানবের অবস্থাকে বিদ্রূপ করিতেছে। টেবিলের উপর তিন দিকে তিনখানি চেয়ার পড়িয়া আছে। যোগেন্দ্র একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন; দুই হস্ত দিয়া মস্তকের চুলগুলা একবার আন্দোলন করিলেন; দীর্ঘ নিশ্বাস সহ বলিয়া উঠিলেন,—"ওঃ"! একে একে গৃহমধ্যে সমস্ত দ্রব্যের প্রতি চাহিতে লাগিলেন—যদি কোন দ্রব্য ক্ষণেকের নিমিত্তও তাঁহার নেত্রকে শান্তি দিতে পারে—তাঁহার মনকে ভুলাইতে পারে। কোথাও তাহা হইল না। অবশেষে তাঁহার চক্ষু সেই সংজ্ঞা-শূন্য, চৈতন্যহীন শূন্যগর্ভ মানবকঙ্কালের প্রতি স্থির-ভাবে চাহিল। তিনি তখন উন্মাদের ন্যায় বিকৃত-স্বরে কহিলেন,—"কঙ্কাল! এ জগতে তুমিই সুখী! তোমার অবস্থা এক্ষণে আমার প্রার্থনীয়। তোমার অভিজ্ঞতা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। তুমি জগতের কি না দেখিয়াছ? যে জগতে পাপ, তাপ, কপটতা বাস করে, সেই জগতে ভুগিয়া সেই সকল পদদলিত করিতে শিখিয়াছ। বলিয়া দেও, হে দেব, হে প্রভো! বলিয়া দেও, আমি কি উপায়ে কি কৌশলে এই

যাতনাসমুদ্র পার হইতে পারি। তুমি যাহাকে তোমার আত্মার আত্মা জানিয়া ভালবাসিয়াছ, সে হয় তো ধীরে ধীরে অলক্ষিতভাবে তোমার হৃদয়ে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া দিয়াছে। বল সর্ব্বজ্ঞ! তুমি কি উপায়ে সে যাতনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া এ জগতে বাস করিয়াছিলে? অথবা হে ভাগ্যবান্! হয় তো তোমার সুপ্রসন্ন অদৃষ্টে এ যমযন্ত্রণা দেখা দেয় নাই। তবে হে মহান্! বলিয়া দেও, কি করিলে এ সংসারে ঐ সকল যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। বল বন্ধো! তুমি এ জগতে রমণীর অপেক্ষা কোন অধিকতর ঘৃণিত জীব দেখিয়াছিলে কি না? হে সর্ব্বদর্শিন্! জগতে নারী অপেক্ষা অধিকতর কালকূটময় পদার্থ দেখিয়াছিলে কি? রমণী প্রেমের ন্যায় অসার ক্ষণস্থায়ী আর কোন পদার্থ এ জগতে আছে কি? হে নির্ব্বাক্! একবার তোমার চরণে ধরি, একবার এই বিপন্ন মানবের ক্লেশ-নিবারণার্থ এই একটা উপদেশ দেও। বলিয়া দেও, মরণে কি সুখ? বল, মরিলে কি হয়? যদি কিছুই না বল, হে সুহৃদ্! আমাকে তোমার সহচর কর, আমাকে তোমার অবস্থায় লইয়া যাও। হে প্রভো! হে ভয়ানক! হে অবশেষ! আমি আজি তোমার অবস্থায় উপস্থিত হইয়া সংসারকে উপেক্ষা করিতে বাসনা করি, তোমার মত রূপান্তর গ্রহণ করিয়া, মানবহৃদয়ের দুর্ব্বলতা ও কাতরতা দেখিয়া হাসিতে অভিলাষ করি, তোমার মত সম্পর্কশূন্য সামগ্রী হইয়া নিস্তব্ধভাবে, অবিলিপ্ত অবস্থায় মানবমনের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে নিতান্ত সাধ করি। হে অতীত! আমাকে তোমার অবস্থায় যাইবার উপায় বলিয়া দেও, আমাকে তোমার সঙ্গী করিয়া লও।"

বলিতে বলিতে যোগেন্দ্র চেয়ার ত্যাগ করিয়া উঠিয়া কঙ্কালসন্নিধানে গমন করিলেন। বলিলেন, —"বল নির্দ্দয়! আমাকে তোমার সঙ্গী হইবার উপায় বল। তোমার হস্ত ধারণ করিয়া অনুরোধ করি, আমাকে মরণের উপায় বলিয়া দেও।"

যোগেন্দ্র ব্যগ্রতার সহিত কঙ্কালের হস্তধারণ করিলেন, কঙ্কাল খট্ খট্ শব্দ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সেই শব্দে যোগেন্দ্রের চৈতন্য হইল। তিনি হতাশ-ভাবে পুনরায় আসিয়া চেয়ারে পড়িলেন।

সূর্য্যদেব ক্রমশঃ পূর্ব্বাকাশের নিম্নভাগে দেখা দিলেন। উষায় সম্মোহন সমীরণ জগৎকে নূতন জীবন দিতে আসিল। এমন সময় এক ব্যক্তি ব্যস্ততা সহ সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। সে ব্যক্তি সুরেশ।

যোগেন্দ্র ব্যস্ততাসহ তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন,—"ভাই! তোমার কথাই সত্য—স্ত্রী-লোকই সকল সর্ব্বনাশের মূল।"

সুরেশ যোগেন্দ্রের মূর্ত্তি দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"ওঃ !!!"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

প্রেমের পুরস্কার।

এক দিন, দুই দিন, তিন দিন করিয়া পনর দিবস অতীত হইল বিনোদিনী সেই দুঃখের পাথারে ভাসিতে-ছেন। কমলিনী আসিয়াছেন, মাধী আসিয়াছে। তাহাদের কথায় সরল-হৃদয়া বিনোদিনীর হৃদয় একবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা যেরূপ অকাট্য প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া যোগেন্দ্রনাথের চরি-ত্রের কলঙ্ক প্রতিপন্ন করিয়াছে, কাহার সাধ্য, আর তাহা না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারে। যে বিনোদিনী যোগেন্দ্রনাথকে অপ্রাকৃত মানব বলিয়া জানেন, তিনিও এখন বুঝিয়াছেন যে, তাঁহার যোগেন্দ্র আর তাঁহার নাই। ইহার অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে?

অদ্য যোগেন্দ্র বাটী আসিয়াছেন। তাহাতে বিনোদের কি? তিনি ত এখন বিনোদের কেহ নহেন —তিনি এখন পরের ধন। যোগেন্দ্র বাটী আসিয়া-ছেন, কিন্তু পুরমধ্যে প্রবেশ করেন নাই। পুরমধ্যে তাঁহার কে আছে? কাহাকে তিনি পুরমধ্যে দেখিতে যাইবেন? কেন, বিনোদ? ওঃ! যোগেন্দ্রের সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে। তাঁহার কোমল কুসুমে এখন ভুজঙ্গ বাস করিয়াছে—তাঁহার চন্দনতরু এখন বিষবৃক্ষ হইয়াছে। তবে কেন?

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বিনোদিনী মলিনবেশে ভূ-শয্যায় শুইয়া কাঁদিতেছেন। ভাবিতেছেন— 'জগতে কি বিচার নাই? কি দোষে—হে গুণধাম! কি দোষে আমায় এত শাস্তি দিতেছ? কবে কোন্ দোষে এ অভাগিনী তোমার চরণে অপরাধিনী? অপরাধ যদি হইয়া থাকে—একবার আমায় মার্জ্জনা কর—একবার আমায় বলিয়া দেও, আমি সাবধান হই। আমি জানি, হৃদয়েশ! তোমার ন্যায় ন্যায়বান্ ব্যক্তি এ জগতে আর নাই। কিন্তু নাথ! আমার পোড়াকপালের দোষে তোমার সে অতুল ন্যায়পরতা কোথায় গেল? আমি বেশ জানি যে,এ দাসী তোমার চরণধূলিরও যোগ্যা নহে। তোমার মনোরঞ্জন করা

কি এ মন্দভাগিনীর সাধ্য ? তুমি এই ক্ষুদ্র সেবিকাকে পরিত্যাগ করিয়াছ—ভালই করিয়াছ। যদিও তোমার বিচ্ছেদ সহিয়া বাঁচা আমার সম্ভব হয়, কিন্তু তোমাকে কলঙ্কিত দেখিয়া আমি কোন্ প্রাণে বাঁচিব ? তোমার কথা লোকে হাসিতে হাসিতে আন্দোলন করিবে, তাহা কেমন করিয়া সহিব ? তুমি যোগেন্দ্রনাথ। তুমি আমার হৃদয়রত্ন, তুমি স্বর্গের দেবতা, তুমি সততার আদর্শ, সেই তুমি আজ পতিত, ভ্রষ্ট, সামান্য ব্যক্তির ন্যায় ইন্দ্রিয়াসক্ত। তোমার এই কলঙ্ক—হে হৃদয়নাথ! তোমার এই ভয়ানক অধঃপতন দেখিয়াও কি অভাগিনীর বাঁচিতে হইবে ?'

তখন সেই পতিগত-প্রাণা, বিশুদ্ধ-হৃদয়া বিনোদিনী মুখ লুকাইয়া অনেকক্ষণ কাঁদিল। কাঁদিয়া বলিল,—"আমার নামও ত তোমার হৃদয়ে আর নাই, কিন্তু তুমি তো আমার হৃদয়ের দেবতা। তুমি আমার মুখ না দেখ না দেখিবে, কিন্তু তুমি একবার বাটীর ভিতরে আইস, আমি অন্তরাল হইতে তোমার হৃদয়হারী মুখখানি একবার দেখি।"

বিনোদিনী যখন ভূ-শয্যায় শয়ন করিয়া এইরূপ রোদন করিতে করিতে অশ্রুধারায় ধরণী সিক্ত করিতেছেন, সেই সময়ে সেই প্রকোষ্ঠে হরগোবিন্দ বাবু প্রবেশ করিলে। তখন রাত্রি প্রায় দশটা। হরগোবিন্দ বাবু অসিয়া বলিলেন, "বাছা! এত কাঁদিলে কি হইবে ?"

বিনোদিনী ব্যস্ততা সহ উঠিয়া বলিলেন, "কি করিলেন ?"

"এখনও কিছু হয় নাই।"

তখন বিনোদিনী বিষণ্ণভাবে বলিলেন,—"তবে আমার কাঁদা ভিন্ন কি গতি ?"

"বাছা! কাঁদিলেই তো ফল হয় না। কাঁদিবার সময় আছে—এখন পরামর্শের প্রয়োজন।"

"আমি আপনাকে কি পরামর্শ দিব ?"

"আর কাহার নিকট তবে এ গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিয়া পরামর্শ চাহিব ? তুমিই পরামর্শ দিবে। আমি যোগেন্দ্র আসার খানিক পরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি শরীর খারাপ ওজর করিয়া আমার সহিত দেখা করিলেন না। যোগেন্দ্র শরীর খারাপ বলিয়া আমার সহিত দেখা করিলেন না, ইহাতে অমি বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। আমার বোধ হয়, যোগেন্দ্র সংসারের উপর কিছু বিরক্ত হইয়াছেন, সেই জন্যই হয় তো যাহারা পরম আত্মীয়, তাহাদিগের সহিতও সাক্ষাৎ করিতেছেন না ?"

"তবে এখন কি করিবেন ?"

"কল্য যেমন করিয়া হউক, যোগেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিব ?"

"তাহার পর ?"

"তাহার পর তাহাকে কান ধরিয়া তোমার নিকট আনিয়া দিব। যোগেন্দ্র কখন মন্দ হইতে পরে না। আমি দেখিলেও তাহা বিশ্বাস করি না। তাহার মনের মধ্যে নিশ্চয় একটা গোল হইয়াছে। সেটা আমি তাহার সহিত একটা কথা কহিলেই বুঝিতে পারিব এবং তখনই সব কলহ মিটাইয়া দিব।"

আশা, আনন্দ ও যন্ত্রণা সম্মিলিত হইয়া বিনোদিনীর হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবির্ভাব করিল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে মাষ্টার মহাশয়ের পদপ্রান্তে পড়িয়া কহিলেন,—"সে আপনার গুণ! যদি তাহা হয়, তাহা হইলে আপনি আমাকে আবার জীবন দিবেন! আপনি আমায় রক্ষা করুন এ কষ্ট আমি আর সহিতে পারি না।"

হরগোবিন্দ বাবু বিনোদিনীর হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন,—"মা! এত কাতর হইও না! এ সংসারে আমার স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, কন্যা নাই। তুমি আমার সন্তানের অপেক্ষাও অধিক। বাছা! তোমার চক্ষে জল দেখিলে আমি বড়ই কষ্ট পাই। শান্ত হও। ভয় কি মা ?"

এই বলিয়া হরগোবিন্দ বাবু বিনোদিনীর বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা তাঁহার নেত্র মার্জ্জন করিয়া দিতে লাগিলেন।

যখন গৃহাভ্যন্তরে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তখন একটি মনুষ্য বাহিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া সার্সীর মধ্য দিয়া সমস্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। তিনি গৃহাভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিদ্বয়ের কার্য্য সমস্তই দেখিতেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের কথোপকথনের এক বর্ণও শুনিতে পাইতেছিলেন না। সেই ব্যক্তি যোগেন্দ্র। যোগেন্দ্র দন্তে দন্তে নিপীড়ন করিতে করিতে ভাবিলেন,—"আর কেন ? যথেষ্ট।"

হরগোবিন্দ বাবু বলিলেন,—"এখন তবে আসি মা! কালি প্রাতে অমি তোমায় সুসংবাদ আনিয়া দিব।"

হরগোবিন্দ প্রস্থান করিলেন। বিনোদিনী ধীরে ধীরে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন; বিনোদিনী যখন সিঁড়ির নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন দূর হইতে দেখিলেন, যোগেন্দ্র আসিতেছেন। আহ্লাদে হৃদয় উৎফুল্ল হইল। ভাবিলেন, "একবার উঁহার চরণ

ধরিয়া কাঁদিব।" এই ভাবিয়া বিনোদ সিঁড়ির রেল ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। যোগেন্দ্র নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন, বিনোদিনী। তাঁহার শরীর কাঁপিয়া উঠিল, হৃদয় বিচলিত হইল এবং বদনে দারুণ ক্রোধের চিহ্ন প্রকটিত হইল। বিনোদিনী তখন আহ্লাদে, শোকে, আশায় এবং নৈরাশ্যে অবসন্ন। তিনি সংজ্ঞাহীনার ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে "হৃদয়েশ" বলিয়া যোগেন্দ্রের পাদমূলে পড়িয়া গেলেন।

তখন যোগেন্দ্র সরোষে বলিলেন,—"যাও—দূর হও! তুমি আমার কেহ নও,—আমিও তোমার কেহ নহি!" বলিয়া সজোরে বিনোদিনীকে পদাঘাত করিয়া চলিয়া গেলেন। বিনোদিনী মূর্চ্ছিতা হইয়া সেই স্থানে পড়িয়া রহিলেন। যখন মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল, তখন বিনোদিনী কপালে করবিন্যাস করিয়া কহিলেন,— "এখন মরণের উপায় কি?"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সাহস।

রাত্রি ১টা বাজিয়াছে। যোগেন্দ্রনাথ শয়ন করেন নাই, নিদ্রার ইচ্ছাও হয় নাই, গৃহমধ্যে পাদচারণা করিয়া বেড়াইতেছেন। সেই গৃহমধ্যে একটি উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছে; সেই আলোক যোগেন্দ্রের ছায়া একবার গৃহের পূর্ব্বভিত্তিতে, আর একবার পশ্চিমভিত্তিতে অঙ্কিত করিতেছে। তাঁহার চিত্তের অবস্থা ভয়ানক, সঙ্কল্পশূন্য, উন্মাদের ন্যায় অব্যবস্থিত। যখন মন উত্তাল ভাবসাগরে ভাসিতে থাকে, তখন কি স্থির-সঙ্কল্পের উপকূল প্রাপ্ত হওয়া যায়? সে একটু শান্তিসাপেক্ষ। এখন সে শান্তি কোথায়? রাত্রিতে যোগেন্দ্র আহার করেন নাই। বারণ করিয়া দিয়াছেন যে, তাঁহাকে কেহ কোন কথা না বলে বা কেহই তাঁহার সহিত দেখা করিতে না আইসে। তাঁহার ভয়ে কেহই তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে সাহস করে নাই।

অন্তঃপুরমধ্যে একটি ক্ষুদ্রকায়া কামিনী একটি গৃহমধ্যে বসিয়া নীরবে রোদন করিতেছেন। সে কামিনী বিনোদিনী। সেই গৃহে একটি ক্ষীণ আলোক জ্বলিতেছে। সেই আলোক-সম্মুখে মর্ম্মপীড়িতা সরল-স্বভাবা বিনোদিনী বসিয়া বস্ত্রমধ্যে মুখ লুকাইয়া রোদন করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে এক জন ঝি ঘুরিতেছে। বিনোদ ভাবিতেছেন,—"আর কি জন্য এ প্রাণ! যাঁহার জন্য আমি, তিনি যদি আর আমাকে না চাহেন, তবে আমাতে প্রয়োজন? হে দীনবন্ধো! এই ক্ষুদ্র রমণীকে কেন এই অতুল প্রেমার্ণবে ডুবাইয়াছিলে? এত রত্ন-প্রবাল আমি দেখিলাম, কিন্তু কিছুই লইতে পারিলাম না তো। হে প্রভো! কেন আমাকে এই অতুল ভাণ্ডার দেখাইলে? যদি দেখাইলে, কেন আমাকে তাহা ভোগ করিতে দিলে না? কেন আমাকে সেখানে থাকিতে দিলে না? কেন আমাকে তখনই দূর হইয়া যাইতে আজ্ঞা দিলে?—কেন দয়াময়! আমাকে এ লোভে মজাইলে?—কেন আমার হৃদয়ে এ অগ্নি জ্বালিলে? যদি জানিতে যে, আমাকে ইহা ভোগ করিতে দিবে না—তবে কেন আমাকে ইহা দেখাইলে? আমি ক্ষণেক মাত্র—অনাথ-নাথ! এই রত্ন কণ্ঠে ধারণ করিয়াছি, এখনও তাহার উজ্জ্বল জ্যোতিতে আমার নয়ন-মন অস্থির রহিয়াছে—আমি এখনও তাহার প্রতি ভাল করিয়া চাহিতে পারি নাই, ইহার মধ্যে—হে জগদীশ! কেন আমার কণ্ঠ হইতে কাড়িয়া লইতেছ?"

তখন বিনোদিনী আবার কাঁদিতে লাগিলেন। আবার বস্ত্রে বদন আবৃত করিলেন। বহুক্ষণ পরে আবার ভাবিলেন,—"দয়াময়! যাহা ভাল বুঝিলে, তাহা তো করিলে; এক্ষণে এই কর, কালি যেন আমি নির্ব্বিঘ্নে এ পৃথিবী হইতে প্রস্থান করিতে পারি—কালি যেন এ অভাগিনীর মুখ লোকে না দেখে।"

বিনোদিনী আবার ভাবিতে লাগিলেন, "মরিবই তো স্থির, কিন্তু আর একবার—মৃত্যুর পূর্ব্বে আর একবার তাঁহাকে দেখিতে পাইব না—তাঁহার কথা শুনিতে পাইব না?"

কিয়ৎকাল পরে বিনোদিনী ধীরে ধীরে উঠিয়া দাড়াইলেন। দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে ডাকিলেন,— "গুণো! গুণো!"

গুণো তখন অকাতরে ঘুমাইতেছিল—উত্তর পাওয়া গেল না। তাহার পরে বিনোদিনী ধীরে ধীরে দ্বারের নিকট আসিয়া ধীরে ধীরে দ্বার খুলিলেন; ক্ষণেক বিহ্বলার ন্যায় দাঁড়াইয়া, কি চিন্তা করিলেন; তাহার পর স্থির করিলেন,—"ভয় কেন? তিনি তো আমায় দেখিতে পাইবেন না, তাঁহাকে আমি দেখিব বই তো না—তবে ভয় কি?"

ধীরে ধীরে বিনোদিনী গৃহের বাহিরে আসিলেন। একটি, দুইটি, তিনটি করিয়া গৃহ পার হইয়া ক্রমে প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। যে গৃহে যোগেন্দ্র অবস্থান করিতেছিলেন, তাহার আলোক বাতায়ন ভেদ করিয়া বিনোদিনীর নেত্রে আসিয়া লাগিল। তিনি কাঁপিয়া উঠিলেন। ক্ষণেক গমনের শক্তি

তিরোহিত হইয়া গেল। দুঃখিনী বিনোদিনী তখন ধূলিময় প্রাঙ্গণে বসিয়া পড়িলেন; ভাবিলেন,"হৃদয়েশ! সেই তুমি, সেই আমি; কিন্তু আজি আমরা পর হইতেও পর। যে তোমার নাম শুনিলে নাচিয়া উঠিত, আজি সে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ভয়ে অবসন্ন হইতেছে। ভয় কি অপমানের জন্য? ভয় কি অনাদরের জন্য? তাহা নহে নাথ! তোমার নিকট আমার মান নাই, অপমান নাই, অনাদর নাই—তোমার সন্তোষই আমার জীবনের ব্রত। ভয়—পাছে তুমি আমাকে দেখিতে পাও, দেখিলে তোমার সন্তোষ জন্মিবে না তো! আমি তো আর তোমার সে আনন্দ-প্রদীপ নহি। আমি এক্ষণে তোমার ক্লেশের কারণ। সেই জন্যই তো প্রাণনাথ! সঙ্কল্প করিয়াছি, এ জীবন রাখিব না। আমার জীবনের ব্রত সমাপ্ত হইয়াছে, আর কেন?"

আবার বিনোদিনী দাঁড়াইলেন; তাহার পর ধীরে ধীরে সাহসে ভর করিয়া অগ্রসর হইলেন; ক্রমে বারান্দায় উঠিলেন। আর এক পদ বাড়াইলেই বাতায়ন দিয়া যোগেন্দ্রকে দেখা যায়। ভাবিলেন, "যাঁহাকে হৃদয়ের উপর রাখিয়াও পলকে পলকে হারাইতাম, আজি তাঁহার সহিত এই সম্বন্ধ? তাঁহাকে আজি চোরের ন্যায় দেখিতে আসিতেছি।"

সাহসে ভর করিয়া বিনোদিনী আর এক পদ বাড়াইলেন; বাতায়নের ফাঁক দিয়া গৃহমধ্যে নেত্রপাত করিলেন। দেখিলেন, সেই হৃদয়হারী মূর্ত্তি—সেই যোগেন্দ্র। তখন বিনোদিনীর সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়া গেল। তিনি সেই বাতায়ন ধরিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িলেন। বসিয়া থাকাও অসম্ভব হইল—বিনোদিনী সেই ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন। বহুক্ষণ পরে মস্তিষ্ক অপেক্ষাকৃত স্থির হইলে, মনে মনে বলিলেন,—"এই দেখাই শেষ। আর তোমার সহিত ইহজন্মে সাক্ষাৎ হইবে না। মরণ এক্ষণে আমার পক্ষে দুঃখের বিষয় নহে। তবে দুঃখ এই হৃদয়নাথ! এ অন্তিমে তোমার সহিত একটা কথা কহিয়া প্রাণ জুড়াইতে পারিলাম না। তাহা তো হইবে না; যাহাতে তুমি অসুখী হও, তাহা তো করিব না। প্রাণেশ্বর! তোমার চরণে যেন জন্মজন্মান্তরে স্থান পাই।"

আবার বিনোদিনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আবার সেই বাতায়ন দিয়া প্রকোষ্ঠমধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেন; আবার দেখিলেন, সেই যোগেন্দ্র—তাঁহার সেই যোগেন্দ্র! মনে ভাবিলেন,—"ভগবান্! এ অতুলনীয় রত্ন তোমারই সৃষ্ট! কে বলিবে তুমি নির্দ্দয়? এক দিনও তো এই রত্ন আমার ছিল, ইহাই কি সামান্য সৌভাগ্য! দয়াময়! এ জীবনে দুঃখিনীর সমস্ত সাধই তো ফুরাইল। যেন জন্মজন্মান্তরে ঐ চরণে আমার স্থান হয়। অগতির গতি! তোমার চরণে মন্দভাগিনীর এই শেষ প্রার্থনা"।

এই সময়ে একবার যোগেন্দ্রনাথ চিত্তের অস্থিরতা হেতু শান্তির অন্বেষণে বাহিরের বারান্দায় আসিলেন। বিনোদিনী যে স্থানে দাঁড়াইয়া আছেন, বারান্দার প্রান্তভাগে আসিলে সে স্থান দেখা যায়। একবার বিনোদিনী ভাবিলেন, "একবার এই অন্তিমে একবার চরণে পড়ি, একটা কথা কহি।" আবার ভাবিলেন, "ও হৃদয়ে তো আমার নামও নাই, তবে কেন উঁহাকে ত্যক্ত করিব? উনি ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি; আমাকে দেখিলে উঁহার কেবল কষ্ট। এ জীবনে উঁহাকে কষ্ট দিব না।" আবার ভাবিলেন,—"যতক্ষণ জীবন আছে, ততক্ষণ কেন এইখানেই বসিয়া থাকি না, এ সুখ ছাড়ি কেন?" আবার ভাবিলেন,—"যদি উনি এ দিকে আইসেন; তবে তো আমাকে দেখিতে পাইবেন। না, লোভ ত্যাগ করাই ভাল।"

তখন বিনোদিনী করযোড়ে ঊর্দ্ধনেত্রে মনে মনে কহিলেন,—"হে অনাথনাথ! হে ইচ্ছাময়! আমার জীবনলীলা তো সাঙ্গ হইতে চলিল; আমার সুখদুঃখ তো অচিরে ফুরাইবে। কিন্তু দয়াময়! ঐ ব্যক্তি—দুঃখিনীর ঐ সর্ব্বস্বধন, অভাগিনীর ঐ জীবনসর্ব্বস্ব, উঁহার চরণে যেন কুশাঙ্কুরও না বিঁধে; উঁহাকে যেন একবার দীর্ঘ-নিশ্বাস না ফেলিতে হয়, উঁহার সুখ যেন অব্যাহত থাকে। যে দুঃখিনী এখনই তোমার শান্তিময় চরণে আশ্রয় লইবে, তাহার প্রার্থনা, হে জগদীশ! অবহেলা করিও না।"

তাহার পর যোগেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া মনে মনে কহিলেন,—"হৃদয়েশ! সুখে থাক, কখন এ অভাগীর নাম মনে করিয়া দুঃখ করিও না। আমি নিজ কর্ম্মোচিত ফল ভোগ করিতেছি, তাহাতে তোমার দোষ কি? জন্মজন্মান্তরে চরণে স্থান দিও।"

এই সময় যোগেন্দ্রনাথ আবার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে আবার দেখিয়া বিনোদিনী মনে করিলেন,—"ভ্রান্ত মন! ও মূর্ত্তি দেখিয়া কি দেখার সাধ মিটাইতে পারবি? কেন তবে? আর না।"

তখন অবিরল অশ্রুজলের স্রোতে বিনোদিনীর বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি পাগলিনীর ন্যায় বেগে সে দিক্ হইতে ফিরিলেন এবং পাগলিনীর ন্যায় অস্থিরতা সহ চলিতে লাগিলেন। আবার সেই প্রাঙ্গণের মধ্যে উপস্থিত হইলেন, তখন আবার

ফিরিয়া চাহিলেন। দেখিলেন, সেই পথ দিয়া সেই আলোক! তখন বিনোদিনী ধৈর্য্য হারাইয়া মর্ম্ম-বিদারক স্বরে বলিলেন,—"ভগবন্!"

কথাটা যোগেন্দ্রের কানে গেল। তাহা যে চির-পরিচিত বিনোদের কণ্ঠস্বর, তাহা তিনি বুঝিলেন। কি ভাবিয়া সেই দিকের জানালার নিকটস্থ হইলেন, কিন্তু তখন বিনোদিনী প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, সুতরাং যোগেন্দ্র কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি ভাবিলেন, সকলই তাঁহার অস্থির মনের উদ্ভাবনা। তিনি সে দিক্ হইতে ফিরিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

প্রত্যাখ্যান।

যোগেন্দ্রনাথ অস্থির! কি করিবেন—কি করিলে এ গুরু যাতনার উপশম হইবে, কি করিলে এ অসীম চিত্তবেগ শান্ত হয়,কি উপায়ে এ দারুণ বিশ্বাসঘাতক-তার প্রতিশোধ হয়, তাহা তাঁহাকে কে বলিয়া দিবে? কে এমন চিকিৎসক আছে যে, এই সকল দুর্দ্দমনীয় ব্যাধির ঔষধ ব্যবস্থা করিতে পারে? আমরা জানি, মৃত্যুই এ প্রকার ব্যাধির একমাত্র চিকিৎসক। যোগেন্দ্র এ যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের নিমিত্ত কি উপায় স্থির করিতেছেন, তাহা আমরা জানি না; কিন্তু ইহা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, চিতার অনল ভিন্ন অন্য কোথাও ইহার প্রকৃত শান্তি নাই। যে প্রতারণা-সাগরে তিনি ডুবিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহার উঠিবার ক্ষমতা নাই; প্রকৃত ঘটনার আলোকে হৃদয়স্থ অবিশ্বাস-অন্ধকার দূর হইবার আর সম্ভাবনা নাই; যে উচ্চে তিনি উঠিয়াছেন, তাহা হইতে আর তাঁহার নামিবার শক্তি নাই; সুতরাং যতক্ষণ তাঁহার দেহে শোণিত-প্রবাহ থাকিবে, ততক্ষণ তাঁহার যন্ত্রণার সীমা নাই। তুমি মৃত্যু ভিন্ন এরূপ দুর্ভাগ্য ব্যক্তিকে আর কি সৎপরামর্শ দিতে পার? দুইটি "বিষকুম্ভ পয়োমুখ" রমণী স্বার্থসিদ্ধির বাসনায় তাঁহার শরীরের প্রত্যেক স্থানে সুকৌশলে ও অলক্ষিতভাবে বিষ ঢালিয়া দিয়াছে; তাঁহার জীবনকে গরলধারী ভুজঙ্গ অপেক্ষাও ভয়ানক বলিয়া প্রমাণ করাইয়াছে; তাঁহার আনন্দময়ী প্রকৃতি, শান্তিময় স্বভাব ও প্রেমময় জীবন সকলই ক্রোধ, অবিশ্বাস ও ঘৃণার মাদকতায় বিকৃত করিয়াছে; তাঁহার হাস্যময় বদনে শোকের গুরুভার চাপাইয়াছে; তাঁহার প্রফুল্ল ললাটক্ষেত্রে চিন্তার অঙ্কপাত করাইয়াছে; তাঁহার প্রশান্ত নয়ন শোণিত-লিপ্সু জীবের ন্যায় উগ্র করিয়া তুলিয়াছে এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার চিরসহায় জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে দুষ্টবুদ্ধির অধীন করিয়াছে। তবে তাঁহার আছে কি? কি সুখে তাঁহার জীবন? তুমি আমাকে নিষ্ঠুর বলিলেও আমি বলিব, যোগেন্দ্রনাথের এ ভারভূত জীবন বহন করা অপেক্ষা মরণ অবশ্য শ্রেয়ঃ। কিন্তু যোগেন্দ্রনাথ হয় তো তাহা ভাবিতেছেন না। তিনি হয় তো ভাবিতেছেন, অগ্রে বিশ্বাসঘাতিনীর দণ্ড—পরে মরণ।

রাত্রি ৩টা বাজিয়া গিয়াছে, বসুন্ধরা নিস্তব্ধ; নিদ্রার শক্তি-প্রভাবে বাহ্য ও অন্তর্জগৎ স্থির। কিন্তু যোগেন্দ্রের পক্ষে অন্যরূপ। তিনি এখনও জাগরিত। যোগেন্দ্র সেই গৃহমধ্যস্থ শয্যায় পড়িয়া আছেন। শয্যার শরণাপন্ন হইয়াছেন—নিদ্রার আশায় নহে। যদি ক্ষণেকও চিত্তের শান্তি হয়। কোথায় শান্তি? শান্তি তাঁহার নিকট আসিল না। যোগেন্দ্র শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং পার্শ্বস্থ আলমারি খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে একখানি ছোরা বাহির করিলেন। যে টেবিলে আলোক জ্বলিতেছিল, তাহার পার্শ্বে একখানি চেয়ার পড়িয়া ছিল, সেই চেয়ারে সেই ছোরাহস্তে উপবেশন করিলেন। ব্যস্ততা সহ আবরণমধ্য হইতে ছোরা বাহির করিলেন। উজ্জ্বল আলোকের আভা লাগিয়া মার্জ্জিত লৌহখণ্ড ঝলসিতে লাগিল। তখন যোগেন্দ্র একবার তাহার সূক্ষ্ম অগ্রভাগ হস্ত দ্বারা পরীক্ষা করিলেন; তখনই আবার টেবিলের উপর ছোরা ফেলিয়া হস্তের উপর হস্ত, তদুপরি মস্তক রাখিয়া কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। আবার দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং দুইবার চারিবার সেই গৃহমধ্যে পরিক্রমণ করিলেন। আবার আসিয়া সেই ছোরা হস্তে লইলেন, আবার উজ্জ্বলতা ও তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করিলেন। আবার চেয়ারে বসিলেন। তাহার পর দুই হস্ত দিয়া মস্তকের কেশ-গুলা আন্দোলন করিলেন তাহার পর—তাহার পর সেই তীক্ষ্ণধার ছোরার সূক্ষ্ম অগ্রভাগ স্বীয় বক্ষে স্থাপন করিলেন। এমন সময় তাঁহার পশ্চাদ্দিকস্থ উন্মুক্ত দ্বার দিয়া বেগে এক সুন্দরী আসিয়া যোগে-ন্দ্রের উভয় হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—"এ কি! এ কি! যোগেন্দ্র! এ কি।"

সুন্দরী কম্পান্বিতা। তাঁহার নেত্র দিয়া টস্‌-টস্ করিয়া জল ঝরিতেছে। যোগেন্দ্র সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন,—কমলিনী।

যোগেন্দ্র কি জন্য ছোরা বাহির করিয়াছিলেন

এবং কেন তাহা বক্ষে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা যদিও আমরা ঠিক করিয়া বলিতে না পারি, তথাপি ইহা আমরা বেশ জানি, তাঁহার মনে আত্মহত্যার ইচ্ছা নাই। এখন প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তিই তাঁহার হৃদয়ে বলবতী। যোগেন্দ্র কমলিনীকে দেখিয়া স্থির করিলেন, তাঁহার হৃদয়ের বেগ এখন যে দিকে যাইতেছে,তাহা যদি কমলিনীকে জানিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে হয় তো বাসনা-সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিবে। তিনি হাসিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"এই রাত্রে তুমি কোথা হইতে?"

যোগেন্দ্র হাসিলেন? কি ভয়ানক! যে ব্যক্তির অবস্থা ও যাতনার পরিমাণ আলোচনা করিয়া আমরা তাহার নিমিত্ত মৃত্যুর ব্যবস্থা করিতেছিলাম, সে আবার তখনই হাসিয়া কথা কহিতেছে? হাসি-কান্নার কারণ বুঝি সকলের পক্ষে সমান না হইবে। অথবা হয় তো যোগেন্দ্র তাঁহার ক্লেশরাশির মধ্য হইতে এমন কোন সূক্ষ্ম রহস্য স্থির করিয়াছেন, যাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি ধারণা করিতে অসমর্থ। যাহা হউক,তিনি মধুর হাসির সহিত জিজ্ঞাসিলেন,—"এত রাত্রে তুমি কোথা হইতে?"

কমল ভাবিলেন, "সাধিলেই সিদ্ধি," এ কথা কখনই মিথ্যা নহে। যোগেন্দ্র যখন দারুণ মনস্তাপে পুড়িতেছেন এবং আত্মহত্যার উদ্যোগ করিতেছেন, তখনই যে আমাকে দেখিয়া ক্ষণেকের মধ্যে ভূতপূর্ব্ব সকল ভুলিয়া গেলেন, ইহা তো নিশ্চয়ই প্রেমের লক্ষণ। আবার ইহার উপর হাসি? এত দিনে—এত দিনে ভগবান্ বুঝি আমার প্রতি সদয় হইলেন। তিনি স্থির করিলেন,যখন স্রোত আপনিই ফিরিতেছে, তখন আর একটু জোর হাওয়া হইলে নৌকা শীঘ্রই ঘাটে আসিবে। অতএব আমি আর একটু চাপাইয়া চলি। যোগেন্দ্রের বদনে একবার তীক্ষ্ণ, বিলাসময়ী দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"যোগিন্! তুমি ত বালক নহ, তোমার এ কি ব্যবহার? একটা বালিকা—একটা তুচ্ছ বালিকার জন্য তুমি আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছ?"

যোগেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন,—"সে কথায় কাজ নাই। আমি একটা তুচ্ছ বালিকার জন্য কাতর, তোমায় কে বলিল? রাধাকৃষ্ণ! কেন? আমার আরও অনেক সুখ, অনেক আশা আছে। আমি কেন আত্মহত্যা করিব?"

কমলিনী বলিলেন,—"তবে তুমি ছোরা লইয়া কি করিতেছিলে?"

যোগেন্দ্র বলিলেন, "ছোরাখানা লইয়া দেখিতেছিলাম। যদি আমার মরিবার বাসনা থাকিত, তাহা হইলে অনেকক্ষণ পূর্ব্বে মরিতে পারিতাম, সে বাসনা আমার নাই। ছোরার কথা বলিতেছ? ছোরা এই লও—ছোরা ফেলিয়া দিতেছি।"

এই বলিয়া যোগেন্দ্র ছোরা লইয়া সজোরে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তখন কমলিনী বলিলেন,—"যোগেন্দ্র! বিনীর কথা আমি সব শুনিয়াছি। যাহা কেহ কখনও ভাবিতে পারে না, সে তাহা করিয়াছে। তুমি সব জানিয়াছ বলিয়াই আমি এখন তোমার নিকট এ কথা উপস্থিত করিতেছি। কিন্তু যোগেন্দ্র, তুমি সে ব্যাপার মনে করিয়া আপনার জীবনকে যাতনায় ডুবাইও না। তোমার এই নবীন বয়স, তোমার এই ভুবনমোহন রূপ, তোমার এই দেব-দুর্ল্লভ গুণ, তোমার এই সকল ব্যবহার, ইহাতে তোমার নিকট জগৎ বশ। তুমি মনে করিলে কত রমণী তোমার চরণে বিক্রীত হইবে।"

কথা সাঙ্গ করিয়াই কমলিনী স্বীয় উজ্জ্বল আরক্ত লোচনদ্বয় হইতে কতকটা উল্লাসকরী সুধা যোগেন্দ্রের নেত্রপথ দিয়া তাঁহার হৃদয়-ভাণ্ডারে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু সে সুধাসেবনে যোগেন্দ্রের হৃদয়ে সন্তোষ জন্মিল কি না, আমরা বলিতে অক্ষম। যোগেন্দ্র কমলিনীর কথায় কোন বাচনিক উত্তর দিলেন না; কেবল কমলিনীর নয়নে নয়ন মিশাইয়া একটু হাসিলেন। সে হাসি হইতে কমলিনী আরও আশা পাইলেন। তাঁহার মনে হইল, যোগেন্দ্র গলিতেছেন! আবার সেই আবেশময়ীদৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া বলিলেন,—"যোগেন্দ্র! এ সংসার সুখের জন্য। শত সহস্র দুঃখ উপস্থিত হইলেও কাতর হইবার প্রয়োজন নাই। যাহাতে দুঃখ আছে, তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া, যাহাতে সুখ আছে, তাহার নিকট যাও।"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—"তাহা আর বলিতে? আমি তোমার হস্তে আমার সুখ-দুঃখ সমস্ত সমর্পণ করিলাম। তুমি আমাকে যে পথে চলিতে বলিবে, আমি সেই পথে চলিব।"

হাসির সহিত মিশাইয়া যোগেন্দ্র ঐ কয়েকটি কথা বলিলেন। সেই হাসির সহিত ঐ কথা কমলিনীর হৃদয়ে গিয়া আঘাত করিল। তিনি কাঁপিয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, বাসনা তো সিদ্ধ—যোগেন্দ্র তো আমারই। বলিলেন—"যোগেন্দ্র! কেহ যদি কাহাকে ভালবাসে, কিন্তু সে তাহাকে ভালবাসে কি না, জানিতে না পারে, অথবা সমাজের দায়ে মনের আগুন মনেই চাপিয়া রাখে, তাহা হইলে

তাহার যে কষ্ট, তাহা তুমি অনুমান করিতে পার কি ?"

যোগেন্দ্র ভাবিলেন, কমলিনীকে যে ইদানীং কেমন কেমন মত দেখিতে পাই, এইরূপ কোন ঘটনাই তাহার কারণ হওয়া সম্ভব। যাহা এত দিন কমলিনী বলিতে সাহস করেন নাই, আজি দেখিতেছি তাহাই বলিবার অনুষ্ঠান করিতেছেন। ভালই হইতেছে। দেখি, যদি এই অসময়েও আমার দ্বারা তাঁহার কোন উপকার হয়। বলিলেন,—"ভালবাসা অনেক রকম। কমলিনি! ভালবাসা বলিলেই ভালবাসা হয় না। যে ভালবাসায় নবককে স্বর্গ করে, পাপকে পুণ্য করে, নির্ধনকে ধনী করে, শোককে সুখ করে; যে ভালবাসায় নিজের জ্ঞান যায়, বুদ্ধি যায়, বিবেচনাশক্তি যায়, সেইরূপ ভালবাসাই ভালবাসা। তুমি যে ভালবাসার কথা বলিতেছ, সে কেমন ভালবাসা ?"

কমলিনীর চক্ষু উজ্জ্বল হইল। তিনি বলিলেন,—"এ ভালবাসা তোমাকে কি বলিয়া বুঝাইব? এ ভালবাসা কেমন? জগতে তেমন ভালবাসা কোথাও নাই, তবে কিসের সঙ্গে তুলনা দিয়া বুঝাইব ?"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—"হইতে পারে, সে ভালবাসা অত্যন্ত উচ্চদরের। কিন্তু সেইরূপ দৃঢ়তা উভয় পক্ষেই আছে কি ?"

কমলিনী ক্ষণেক নীরব থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস সহ কহিলেন,—"সেই তো দুঃখ। তাহাই জানিতে পারা যায় না, এই তো যন্ত্রণা !"

সুন্দরী দারুণ উৎকণ্ঠিতভাবে মস্তক অবনত করিলেন। যোগেন্দ্র বুঝিলেন, দারুণ অবক্তব্য প্রণয়ে পড়িয়া কমলিনী যার-পর-নাই কষ্ট পাইতেছেন। একটু আশ্বস্ত করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, "হইতে পারে, অপর পক্ষেও সমান ভালবাসা আছে; কিন্তু সেও হয় তো সমাজের দায়ে বলিতে পারে না,—"

কমলিনী উৎসাহের সহিত বলিলেন, "তাহা হইতে পারে কি যোগেন্দ্র? তাহা হইতে পারে কি? তাহা হইলে, যোগেন্দ্র, তাহার তখন কি কর্ত্তব্য ?"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—"তাহার তখন প্রেমাস্পদের হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। সর্ব্বাগ্রে দেখা আবশ্যক, সে ভদ্রলোক কি না।"

কমলিনী বলিলেন,—"সে ভদ্রলোক, সে দেবতা—সে মানুষ নয়।"

তখন যোগেন্দ্র চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বেড়াইতে বেড়াইতে ক্ষণেক চিন্তা করিলেন, পরে কমলিনীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "তাহা হইলে তাঁহাকে এ কথা জানান মন্দ নয়।"

আবার যোগেন্দ্র বেড়াইতে লাগিলেন।—কমলিনী বহুক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। তাহার পর বেগে যোগেন্দ্রের চরণে পড়িয়া কহিলেন,—"যোগেন্দ্র! যোগেন্দ্র! সে প্রণয়াস্পদ তুমি! তুমিই সেই প্রণয়াস্পদ। আমি তোমার জন্য"—আর কথা কমলিনী বলিতে পারিলেন না।

তখন সেই মন্দভাগিনী, সর্ব্বনাশসাধিনী, প্রেমাভিভূতা, রূপের লতিকা কমলিনী যোগেন্দ্রের চরণ ধরিয়া পড়িয়া রহিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া যোগেন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন। সহসা দারুণ ভূমিকম্পে সেই গৃহ যদি বিচূর্ণ হইয়া যাইত, তাহা হইলেও তিনি তাদৃশ চমকিত হইতেন না। ভিত্তির উপর হস্তস্থাপন করিয়া সমস্ত ব্যাপারটা একবার আলোচনা করিলেন। কমলিনীর নেত্রনিঃসৃত তপ্ত অশ্রুবারি তখন তাঁহার চরণ সিক্ত করিতেছিল। তিনি তাহার পর গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "কমলিনি, যাও! তুমি অপাত্রে প্রণয় স্থাপন করিয়াছ। তোমার আশা কখনই সফল হইবে না। হৃদয়কে শান্ত করিতে অভ্যাস কর। আমার চরণ ছাড়িয়া দেও।"

কমলিনী চরণ ছাড়িয়া দিলেন না। তখন যোগেন্দ্র কমলিনীর হস্ত হইতে স্বীয় চরণ ছাড়াইবার প্রযত্ন করিলেন। কিন্তু কি ভয়ানক? দেখিলেন, কমলিনীর চৈতন্য নাই! তখন তিনি কষ্টে তাঁহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া, একবার ভাবিলেন, উহার ঐ মূর্চ্ছাই যদি চিরস্থায়ী হয়, তাহা হইলেই ভাল হয়। আবার ভাবিলেন, তাহা কেন? এ জীবনে উহার আরও কতই বাসনা থাকিতে পারে। তখন জলসেচনাশয়ে কমলিনীর নিকটস্থ হইলেন, দেখিলেন, আপনিই কমলিনীর চৈতন্যের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। অমনি তিনি সরিয়া আসিয়া সেই গৃহে অপর সীমায় যে একখানি কৌচ ছিল, তাহার উপর বসিয়া পড়িলেন। কমলিনীর চৈতন্য হইল। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বসিলেন। ক্ষণেক পরে ধীরে ধীরে সে প্রকোষ্ঠ হইতে বাহিরে গমন করিলেন।

বাহিরে আর একটি স্ত্রীলোক তাঁহার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছিল। সে মাধী। কমলিনী মাধীর নিকটস্থ হইয়া বলিলেন, "মাধি! আশা তো ফুরাইল! আর বাঁচিয়া কি ফল ?"

মাধী বলিল, "ভয় কি দিদি ঠাকুরাণি! আশা কি ফুরায়? মাধী যতক্ষণ আছে, আশাও ততক্ষণ আছে।"

"আর কি উপায় ?"

"উপায় আছে, এইবার শেষ উপায়। সে কথা তোমায় কালই বলিব।"

মাধী কমলিনীর হাত ধরিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

চৈতন্য।

প্রত্যূষে যোগেন্দ্র ভবন-সংলগ্ন রাজপথে ভ্রমণ করিতেছেন। সমস্ত রাত্রি তাঁহার নিদ্রা ছিল না। চক্ষু রক্তবর্ণ, উন্মত্তের ন্যায় স্থির, শরীর বলহীন ও কৃশ; বদন কালিমাযুক্ত। তিনি চিন্তা করিতেছেন—ভয়ানক! "হরগোবিন্দকে খুন করিব!" আবার ভাবিতেছেন, "হরগোবিন্দকে কেন? বিনী বিশ্বাসঘাতিনী, তাহাকেই নিপাত করিব।" আবার ভাবিতেছেন, "মানবশোণিতে যদি হস্তকে রঞ্জিত করিতে হয়, তবে উভয়কেই বধ করিব।" আবার ভাবিতেছেন, "উহারা পাপী, কিন্তু আমি উহাদের দণ্ড দিবার কে? উহাদের পাপোচিত শাস্তির অন্য ব্যবস্থা আছে, তাহাতে আমার কোনই অধিকার নাই। তবে আমি কেন কলঙ্কিত হই? আমি কেন এ সংসার ছাড়িয়া যাই না? এ সংসার আমার সুখের জন্য নহে। তবে কেন নরহত্যা করিয়া আমার নাম অনন্তকালের নিমিত্ত নরঘাতীদিগের সহিত একশ্রেণীভুক্ত করিয়া রাখি?" আবার ভাবিতেছেন, "এ যাতনা যায় কিসে? সংসার ত্যাগ করিব; এ স্মৃতি তাহাতেও যাইবে না তো। মৃত্যুই আমার নিষ্কৃতির উপায়! মরিব—না, মরিলে এ অনল নিবিবে না।" আবার ভাবিতেছেন, "মরিব বটে, কিন্তু এই যে চিন্তা—আমি যাহাকে—ওঃ—না, সে কথায় কাজ নাই—সে যে আমাকে প্রতারিত করিয়া পর—না—উঃ—উঃ—এ চিন্তা মৃত্যুর পরও আমার আত্মার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে। না, তাহা হইবে না। উহারা বর্ত্তমান থাকিলে মরণেও আমার সুখ নাই। উহাদের না মারিয়া আমি মরিব না। কি জানি, যদি বিঘ্ন ঘটে—অদ্যই। দুই জন—দুই জনকে—একসঙ্গে! বিলম্বে কাজ নাই। আজই।" ভাবিতে ভাবিতে যোগেন্দ্রনাথের রক্তবর্ণ চক্ষু আরও রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, যেন স্থান ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, শরীর কণ্টকিত হইল, কেশসকল উচ্চ হইয়া উঠিল। হত্যা, মৃত্যু, পাপ প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তি যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাঁহার চারিদিকে বেষ্টন করিয়া নাচিতে লাগিল; তাঁহার শূন্যহস্তে কে যেন তীক্ষ্ণধার অসি দিয়া গেল, কতকগুলি বীভৎস, দেহহীন আকৃতি যেন তাঁহার পার্শ্বে ঘুরিতে ঘুরিতে খল্ খল্ হাসিতে লাগিল এবং কোন উজ্জ্বল মূর্ত্তি যেন দূরে দাঁড়াইয়া বার বার বিনোদিনী ও হরগোবিন্দের নাম উচ্চারণ করিতে লাগিল।

যোগেন্দ্র যখন এইরূপ উন্মাদ, সেই সময়ে একটি লোক ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটস্থ হইয়া ডাকিল;—"যোগেন্দ্র!"

উত্তর নাই। আগন্তুক পুনরায় ডাকিল,—"যোগেন্দ্র।"

যোগেন্দ্রের জাগ্রত স্বপ্ন ভাঙ্গিল। তিনি সম্বোধনকারীর প্রতি চাহিলেন,—দেখিলেন, হরগোবিন্দবাবু! যোগেন্দ্রের মূর্ত্তি দেখিয়া হরগোবিন্দ বাবু শিহরিয়া উঠিলেন। যোগেন্দ্র নিরুত্তর। হরগোবিন্দবাবু বলিলেন,—"এ কি যোগেন্দ্র? তোমার এমন অবস্থা কেন?"

তখন যোগেন্দ্র উন্মাদের ন্যায় ক্ষণেক হরগোবিন্দের বদনের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সহসা উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"যাও, আমার নিকট হইতে সরিয়া যাও, মৃত্যুর নিমিত্ত প্রস্তুত হও, কুলটা বিনোদিনীকেও প্রস্তুত হইতে বল।"

হরগোবিন্দ শিহরিলেন। দন্তে রসনা কাটিয়া বলিলেন,—"ছিঃ! ছিঃ! যোগেন্দ্র! তুমি পাগল হইলে? তোমার মুখে এ কি কথা? বিনোদিনী—ছিঃ!"

তখন যোগেন্দ্র বজ্রগম্ভীর-স্বরে বলিলেন,—"সরিয়া যাও—মৃত্যু সম্মুখে—দূর হও!"

হরগোবিন্দ অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। ভাবিলেন, এ কি? যোগেন্দ্র তো উন্মাদ! এখন বোধ হইতেছে, বিনোদিনীর চরিত্র-সম্বন্ধে যোগেন্দ্রর সন্দেহ জন্মিয়াছে, কিন্তু আমার উপরে ক্রোধ কেন? এখন তো অধিক কথারও সময় নহে। বলিলেন,—"আমি তোমাকে একটি কথা বলিতে আসিয়াছিলাম, তাহা যদি তুমি না শুন, অন্ততঃ এই চিঠিগুলা পড়িও।"

কমলিনী বিনোদিনীকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই পত্রের তাড়াটা মাষ্টার মহাশয় যোগেন্দ্রের হস্তে দিলেন। যোগেন্দ্র পত্র লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। হরগোবিন্দ বিবেচনা করিলেন, এক্ষণে বাদানুবাদ করিতে গেলে অশুভ ভিন্ন শুভ ঘটিবে না। ইনি তো উন্মাদ। এ কথা এখনও বাটীর কেহ জানিতে পারে নাই, জানিলে কেহ না কেহ সঙ্গে

থাকিত এবং আমিও সংবাদ পাইতাম। এখন এ কথা আমিও কাহাকে জানাইব না। জানাইলে কেবল রোগের বৃদ্ধি হইবে। ইঁহাকে ছাড়িয়া যাওয়াও ভাল নয়, আবার আমি সম্মুখে থাকাও ভাল নয়। এইরূপ ভাবিয়া মাষ্টার মহাশয় যোগেন্দ্রনাথের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেলেন। যোগেন্দ্র তাঁহার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন না।

যোগেন্দ্রনাথের পশ্চাতে একটি প্রাচীর ছিল, হরগোবিন্দ বাবু সেই প্রাচীরের অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইলেন। সেই প্রাচীরের একটি গবাক্ষ ছিল, সেই পথ দিয়া যোগেন্দ্রের ভাব দেখিতে লাগিলেন।

বহুক্ষণ পরে যোগেন্দ্র পশ্চাতে চাহিলেন। দেখিলেন, পথ জনশূন্য। তখন যোগেন্দ্র মস্তকে হাত দিয়া বহুক্ষণ এদিক্ ওদিক্ করিয়া বেড়াইলেন। যেখানে চিঠিগুলা পড়িয়াছিল, তাহার পাশ দিয়া যোগেন্দ্র দশবার যাতায়াত করিলেন। ভাবিলেন,—"এগুলা কি, দেখিলাম না কেন? ইহার মধ্যে বিনোদিনীর কথা না-ও থাকিতে পারে—হয় তো আমি ইহা দেখিলে কাহারও কোন উপকার হইতে পারে। আরও দোষ, হয় তো না দেখিলে কাহারও অনিষ্ট হইতে পারে।" ধীরে ধীরে যোগেন্দ্র চিঠিসকল হাতে করিয়া পড়ি কি না পড়ি ভাবিতে লাগিলেন। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার হস্ত যেন মনের অজ্ঞাতসারে চিঠিগুলা খুলিয়া ফেলিল। তখন যোগেন্দ্র ভাবিতে ভাবিতে সেই চিঠির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। "যোগেন্দ্র" এই কথাটি তাঁহার নেত্রে পড়িল। দেখিলেন, চিঠিসকল কমলিনীর হস্তলিখিত। চিঠি না পড়িয়া থাকা অসম্ভব হইল। একখানি চিঠি পড়িতে লাগিলেন,—

"বিনোদিনি—

আমি কলিকাতায় আসিয়াই যোগেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তাঁহাকে বাসায় দেখিতে পাইলাম না। তাঁহার বাসার এক জন ঝির সহিত কথাবার্ত্তা হইল। তিনি যে এবার কেন তোমায় একখানিও পত্র লেখেন নাই, তাহা এখন বুঝিতে পারিতেছি। যাহা যাহা শুনিলাম, তাহাতে যোগেন্দ্রের চরিত্র মন্দ হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। যোগেন্দ্রের প্রতি তোমার যেরূপ মায়া, তোমার প্রতি যেন যোগেন্দ্রের আর তেমন মায়া নাই। তুমি এ জন্য চিন্তা করিও না। তুমি কাতর হইবে ভাবিয়া আমি তোমাকে এ সংবাদ জানাইব না মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু শেষে ভাবিয়া দেখিলাম যে, হয় তো তোমার দ্বারা ইহার কোন প্রতিবিধান হইতে পারে। যাহা হউক, ভয় নাই। আমি শীঘ্রই যোগেন্দ্রকে বাটী লইয়া যাইবার উপায় করিতেছি। ইতি।

কমলিনী।"

যোগেন্দ্রনাথের মস্তক ঘুরিয়া উঠিল, চিঠিসকল তাঁহার হস্ত-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়া গেল। তিনি সেই স্থানে হতাশভাবে বসিয়া পড়িলেন। আকাশের প্রতি চাহিয়া করযোড়ে কহিলেন,—"দয়াময়! তোমার সৃষ্ট অপরিসীম জগন্মধ্যে আমি একটি ক্ষুদ্র বালুকণা মাত্র। বিধাতঃ! তুমিই জান, আমার শান্তি বিধ্বংসিত করিতে কতই কাণ্ড হইতেছে। বল জগদীশ! আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র—কি উপায়ে চিত্তকে স্থির রাখিয়া এই ভীষণ সমুদ্র অতিক্রম করিয়া যাইব? কৃপাময়! আমাকে বল দেও, বুদ্ধি দেও, আমাকে এই ব্যাপারের রহস্যোদ্ভেদ করিতে ক্ষমতা দেও।"

আবার যোগেন্দ্র স্থির হইয়া আর একখানি পত্র খুলিলেন এবং পড়িলেন,—

"প্রিয়ভগ্নি—

তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যোগেন্দ্রনাথের স্বভাব মন্দ হইয়াছে। তিনি একটি কলঙ্কিনী কামিনীর কুহকে পড়িয়া সকলই ভুলিয়াছেন। পড়াশুনা নামমাত্র, কলেজে প্রায় যান না। বাসা কেবল লোক জানাইবার জন্য, সেখানে প্রায় থাকেন না। শুনিলাম, তাঁহার সেই নূতন রাণী কুৎসিতার একশেষ। তুমি এ জন্য চিন্তা করিও না—কত লোক এমন হয়, আবার শেষে ভাল হইয়া যায়। যোগেন্দ্রকে বাটী লইয়া যাওয়ার কি হয়, তাহা তোমায় পরে লিখিব। ইতি।

কমলিনী।"

তখন যোগেন্দ্র উন্মাদের ন্যায় দাঁড়াইলেন; বলিলেন,—"কে জানিত?—কে জানিত, পরের সর্ব্বনাশ সাধিতে মানব এতই করিতে পারে। কমলিনি! কলঙ্কিনী—সর্ব্বনাশিনী কমলিনি! তোমার এই কাজ? ক্ষুদ্র প্রবৃত্তির বশবর্ত্তিনী হইয়া তুমি সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছ? দুই জন—দুই জন কেন—তিন জন নিরপরাধ ব্যক্তির শান্তি, সুখ, আশা, জীবন ধ্বংস করিতেছ! ভগবন্! তোমার সৃষ্টির মর্ম্ম কে বুঝে? কমলিনীর ন্যায় সর্পীর সৃষ্টি করিয়া কি লাভ জগদীশ?"

যোগেন্দ্রনাথ আবার ভাবিলেন,—"হরগোবিন্দ—হরগোবিন্দের ব্যাপারটা কি? তাহাকে যে কল্য রাত্রে নির্জ্জনে বিনোদিনীর সহিত আলাপ করিতে স্বচক্ষে দেখিলাম, তাহার মীমাংসা কই? যে আমাকে এই ব্যাপার বুঝাইয়া দিতে পারিবে, তাহার নিকট আমার জীবনের স্বাধীনতা বিক্রয় করিতেও স্বীকার।"

আবার আর একখানি পত্র পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন,—

"বিনোদ,

কল্য বৈকালে যোগীনের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কিন্তু বড় দুঃখের বিষয়—দেখিলাম, তিনি মদ খাইতে শিখিয়াছেন।"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—"কি ভয়ানক—আমি মদ্যপ!"

আবার পড়িতে লাগিলেন,—

"আমার সহিত যখন দেখা হইল, তখন তাঁহার নেশা ছিল। তোমার পত্রের কথা মাধী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমিও জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি তোমার সমস্ত পত্রই তো পাইয়াছেন; বলিলেন, উত্তর দিতে সময় হয় নাই।"

আবার যোগেন্দ্র বলিলেন,—"ধন্য তোমার উদ্ভাবনী শক্তি। ধন্য তোমার কৌশল! বিনোদ তবে আমাকে পত্র লিখিয়াছিল; কিন্তু আমি তাহা পাই নাই কেন?—সেও কমলিনী ও মাধীর কৌশল।"

আবার পড়িতে লাগিলেন,—

"বাটী যাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলাম, তাঁহার যাইতে মন নাই। তোমার চিন্তা নাই, আমি তাঁহাকে না লইয়া বাটী যাইব না। * * * *

ইতি।

কমলিনী।"

তখন যোগেন্দ্র বুঝিলেন, বিনোদিনী তাঁহাকে নিয়মমত পত্র লিখিয়াছেন, কিন্তু তিনি তাহা পান নাই; তিনিও বিনোদিনীকে যে সকল পত্র লিখিয়াছেন, বিনোদিনীও তাহা পান নাই। কমলিনী ও মাধীই তাহার কারণ। সুতরাং কমলিনী ও মাধী যাহা বলিয়াছে, সে সমস্তই অলীক অথবা অবিশ্বাস্য। তখন আহ্লাদ, দুঃখ, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি বৃত্তি সমস্ত মিলিয়া যোগেন্দ্রনাথের হৃদয়ে তুমুল ঝটিকা উত্থাপিত করিল। তিনি পত্র সমস্ত দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তাহার বদনের তীব্র ভাব অনেক কমিয়া গেল। হরগোবিন্দ বাবু এই সকল ব্যাপার অন্তরাল হইতে দেখিলেন। তিনি ধীরে ধীরে আবার যোগেন্দ্রনাথের সমীপে আসিতে লাগিলেন। যোগেন্দ্র তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া ব্যস্ততাসহ তাঁহার নিকটস্থ হইলেন এবং বালকের ন্যায় সরলভাবে বলিলেন,—"মাষ্টার মহাশয়, আপনি শিক্ষক, আপনি প্রধান সুহৃদ, আপনি প্রবীণ, আপনি আমার পিতৃস্থানীয়।—আমি জানি না, আমি বুঝিতে পারিতেছি না, আমার বিরুদ্ধে কি ষড়্‌যন্ত্র হইয়াছে। আপনি আমায় পরামর্শ দিন। আমার সাধ্য নাই যে, আমি এই ব্যাপারের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে পারি। আপনি আমাকে বুঝাইয়া দিন, আমায় রক্ষা করুন।"

হরগোবিন্দ বাবু যোগেন্দ্রনাথের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—"কি হইয়াছে?"

তখন যোগেন্দ্র তাঁহাকে আমূল সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। কলিকাতা-গমন, বিনোদিনীর সংবাদ অভাবে দারুণ উদ্বেগ—পীড়া—কমলিনী ও মাধীর আগমন—হরগোবিন্দ ও বিনোদিনীকে রাত্রিকালে একত্র দর্শন—বিনোদিনীকে পদাঘাত—কমলিনীর প্রেমের কথা—অদ্য এই সমস্ত পত্র পাঠ, সমস্ত ব্যাপার যোগেন্দ্র বিনা-সঙ্কোচে মাষ্টার মহাশয়ের গোচর করিলেন। সমস্ত শুনিয়া মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—"যোগেন্দ্র! তুমি নির্ব্বোধ নহ; এখন আর কি বুঝিতে বাকি থাকিতে পারে? মাধী চিরকাল বিনোদিনীর পত্র ডাকে দেয় এবং তোমার পত্র ডাকঘর হইতে আনিয়া বিনোদিনীর নিকটে দিয়া থাকে। মাধী কমলিনী একযোগে, বুঝিতে পারিতেছ? সুতরাং তোমার পত্র কেন বিনোদ পায় নাই এবং বিনোদিনীর পত্র কেন তুমি পাও নাই, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। কমলিনীর অদম্য কদর্য্য স্পৃহাই সমস্ত অনিষ্টের মূল বলিয়া বুঝা যাইতেছে। তোমার চক্ষে বিনোদকে বিষ করিয়া না তুলিলে অভীষ্ট-সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া, সে মাধীর সহিত চক্রান্ত করিয়া বিনোদের সম্বন্ধে নানাবিধ ঘৃণিত সংবাদ রটনা করিয়াছে। বুঝিতেছ না যে, সে সমস্তই অলীক কথা? বিনোদ যখন তোমার সংবাদ না পাইয়া অধীরা, সেই সময় কমল তাহাকে কলিকাতা হইতে সংবাদ পাঠাইলেন যে, তোমার চরিত্র মন্দ হইয়াছে। তুমি বুঝিতেছ, এ সংবাদে বিনোদিনীর কি যন্ত্রণা জন্মিতে পারে। এই সংবাদ ক্রমাগত নানারূপে আসিতে লাগিল। সে সকল লিখিবার এমনই ভঙ্গী যে, তাহা আর বিশ্বাস না করিয়া চলে না; তখন সে ক্ষুদ্র বালিকা অন্যোপায় হইয়া আমাকে সমস্ত জানাইল এবং আমার চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। এ সকল পত্র বিনোদিনীই আমাকে দিয়াছে। আমি কোনক্রমেই পত্র সকলের সংবাদ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। যোগেন্দ্র, আমি তো তোমার ন্যায় বালক নহি যে, দুইটি প্রমাণ উপস্থিত করিয়া একটা কথা বলিলেই, সম্ভব অসম্ভব বিবেচনা না করিয়া, একবারেই তাহা বিশ্বাস করিব।"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—"আপনি আমায় তিরস্কার

করিতে পারেন, কিন্তু যেরূপে কমলিনী ও মাধী আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহাতে বিশ্বাস না করা অসম্ভব।"

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—"তাহার পর আমি বিনোদিনীকে অনেক আশ্বাস দিলাম। বলিলাম, শীঘ্রই তাহাকে প্রকৃত সংবাদ আনিয়া দিব। আজি পনের দিন হইল,—বিনোদিনী কেবল আমার কথার ভরসাতেই বাঁচিয়া আছে, নচেৎ তুমি তাহাকে এত দিন দেখিতেও পাইতে না! তাহার আহার নাই, নিদ্রা নাই, সে কেবল কাঁদিয়া দিন কাটাইতেছে।"

তখন যোগেন্দ্রের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। মাষ্টার মহাশয় বলিতে লাগিলেন,—"তাহার পর কল্য তুমি বাটী আসিয়াছ, কিন্তু তাহার সহিত সাক্ষাৎ কর নাই। ভাবিয়া দেখ যোগেন্দ্র, তাহাতে তাহার কি কষ্ট হইয়াছে। সে যখন দেখিল, রাত্রি দশটা বাজিল, তথাপি তুমি তাহার নিকট আসিলে না, তখন সে আমায় ডাকিয়া পাঠাইল। তাহার সে মূর্ত্তি, তাহার সে রোদন, পাষাণকেও দ্রব করিতে পারে।"

বলিতে বলিতে মাষ্টার মহাশয়ের চক্ষু আর্দ্র হইয়া আসিল। যোগেন্দ্রেরও নেত্র দিয়া অনর্গল জল পড়িতে লাগিল। হরগোবিন্দ বাবু বলিতে লাগিলেন,—"আমি তাহাকে অনেক ভরসা দিলাম। আজি প্রাতে তাহাকে সুসংবাদ দিব বলিয়াছি। সুসংবাদ আর কি দিব? চল যোগেন্দ্র, তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই।"

তখন যোগেন্দ্র মাষ্টার মহাশয়ের চরণ ধারণ করিয়া বলিলেন,—"আপনি আমায় ক্ষমা করুন। আমি অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছি। আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন, তাহার প্রতিশোধ হইতে পারে না। আপনি আমার বিনোদকে এত দিন বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন—নচেৎ বিনোদ এত কষ্ট সহিয়া কখনই এত দিন বাঁচিত না।"

মাষ্টার যোগেন্দ্রের হাত ধরিয়া উঠাইলেন এবং বলিলেন,—"তোমারই বা দোষ কি? তোমাকে যে যে কথা বলিয়াছে, তাহাতে কাজেই তোমার মনে সন্দেহ হইতে পারে, যাহা হউক, এখন আইস।"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—"চলুন; আমার মনে কিন্তু বড় আশঙ্কা হইতেছে। কল্য আমি বিনোদের সহিত যার-পর-নাই দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছি, তাহাতে অভিমানিনী বিনোদিনী নিশ্চয়ই অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন। কি জানি অদৃষ্টে কি আছে।"

উভয়ে দ্রুত চলিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে যোগেন্দ্র বলিলেন,—"মাষ্টার মহাশয়! আমি অদ্যকার এই শুভদিন চিরস্মরণীয় করিবার জন্য পাঁচটি জলহীন স্থানে পাঁচটি সরোবর খনন করাইব—তাহার নাম রাখিব 'বিনোদবাপী'। কলিকাতার মধ্যে সাধারণের ব্যবহারার্থ এক রম্য কানন সংস্থাপন করিব—তাহার নাম রাখিব 'আনন্দ-কানন' এবং বর্ষে বর্ষে এই দিনে এই প্রদেশের দীন-হীন দম্পতি-সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া, নববস্ত্র পরিধান করাইয়া, নানা উপচারে আহার করাইব এবং সমস্ত দিন তাহাদিগকে আনন্দে নিমগ্ন রাখিব। সেই মহোৎসবের নাম রাখিব 'মিলন-মহোৎসব'।"

মাষ্টার মহাশয় মনে মনে বলিলেন,—"এমন যোগেন্দ্রও কি মন্দ হইতে পারে?"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বিষ না অমৃত।

সেই প্রত্যূষে অন্তঃপুরের একটি প্রকোষ্ঠমধ্যে এক প্রকার কার্য্য চলিতেছে। বিনোদিনী সেই প্রত্যূষে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে বসিয়া একখানি পত্র লিখিতেছেন; এমন সময়ে তথায় মাধী আসিল। তাহাকে দেখিয়া বিনোদিনী পত্র লেখা বন্ধ করিলেন। ভাবিলেন, ভালই হইল, মাধীর দ্বারাই কার্য্যোদ্ধার করিতে হইবে। জিজ্ঞাসিলেন,—"মাধী যে এত ভোরে?"

মাধী বলিল,—"ভোরে না আসিলে সব কাজ হয় কৈ? তুকি কি ঘুমাও নাই? ও কি, তোমার চোখ অত লাল কেন?"

বিনোদিনী বলিলেন,—"ঘুম কি আছে?"

তখন মাধী বলিল,—"এখন দেখিলে দিদি, আমি তো আগেই বলেছিলাম যে, জামাই বাবু এবার আর এক বিনোদিনী জুটাইয়াছেন! কাঙ্গালের কথা বাসী হ'লে মিষ্ট লাগে।"

বিনোদিনী একটু বিষণ্ণ হাসির সহিত বলিলেন,—"তা বেশ তো।"

"কিন্তু তুমি যাই বল দিদি, স্বামীর সোহাগ-ছাড়া হওয়ার চেয়ে মেয়েমানুষের আর অধিক দুঃখ কিছু নাই। তোমাকে দিয়েই তার সাক্ষী দেখা যাচ্ছে। যারা সারাদিন দেখছে, তারা ছাড়া আর কার সাধ্য এখন তোমাকে চিনতে পারে! ও সোজা কথা কি গা? বল কি? আগা! এই দুঃখে যার চাটুয্যেদের মেজো বউটা বিষ খেয়ে মলো। আহা!

সোনার প্রতিমা! বয়স কি! এই তোমার বয়স। কেন, তুমি তো তাকে দেখেছ?"

"হাঁ—শুনেছি বটে—বিষ খেয়ে মলো,—অ্যাঁ?"

"হ্যাঁ—কাকেও বলা নেই, কহা নেই, বিষ এনে খেয়ে ব'সে আছে। তার পর যখন প'ড়ে গেল, তখন সব লোকে জানিতে পারিল। তখন আর হাত কি? তা সে ব'লে কেন, কত জন এমনি ক'রে আত্মহত্যা করেছে।"

বিনোদিনী ভাবিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্যের অনুকূল কথাটাই উঠিয়াছে। আত্ম-অভিসন্ধি গোপন করিয়া বলিলেন,—"তাদের কিন্তু ধন্য সাহস! স্বামী না হয় মন্দই হলো, তা ম'রে কি হবে?"

মাধী মনে মনে বলিল,—"তা বটেই তো! তুমি তো দুধের মেয়ে, তুমি এত চালাক!" মাধী মনে মনে জানিত যে, স্বামি-প্রেমের মহিমা যদি কেহ বুঝে, সে বিনোদিনী। তদভাবে যে বিনোদিনী এক দিনও বাঁচিতে পারে না, তাহাও সে বুঝিত। প্রকাশ্যে বলিল,—"কে জানে ভাই!"

বিনোদিনী বিস্মিতের ন্যায় বলিলেন,—"আচ্ছা, তারা এ সব বিষ-টিস পায় কোথা? সর্ব্বনাশ!"

মাধী মনে মনে ভাবিল, "আর কতক্ষণ চাতুরী। বিষ মাধী দিতে পারে।" প্রকাশ্যে বলিল,—"তা আমি কেমন করিয়া বলিব? শুনেছি, চাঁড়ালবাড়ী পয়সা দিলে পাওয়া যায়।"

"চাঁড়ালদের তো ভারী অন্যায়। বিষ বেচা নিষেধ। থানার লোক জানিতে পারিলে তাহাদের খুব সাজা দিয়ে দেয়।"

মাধী হাসিয়া বলিল,—"তাদের কি ভয় নাই দিদি? লোকে জানিতে না পারে, এমনি সাবধান হয়েই তারা কাজ করে।"

বিনোদিনী বলিলেন, "যার হাত দিয়ে লোকে বিষ আনায়, সে ক্রমে গল্প ক'রে এ কথা প্রকাশ ক'রে দিতে পারে।"

"যারা বিষ আনায়, তারা তেমনি লোকের হাতেই আনায়।"

"আমাদের যেমন মাধী।"

মাধী বলিল, "আমি তেমনি বিশ্বাসী বটি, কিন্তু ও রকম কাজে যেন আমায় থাকিতে না হয়।"

"কিন্তু মাধী, আমার একটু বিষ রাখিতে ইচ্ছা আছে।"

"ছিঃ! ও কি রাখিতে আছে?—না!"

"রাখিলে উপকার হইতে পারে। এক দিন না একদিন তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করিবেনই করিবেন। আমি তাঁহাকে সেই বিষ দেখাইয়া বলিব যে, তুমি যদি আর এমন করিয়া আমাকে জ্বালাও, তাহা হইলে আমি বিষ খাইয়া মরিব। তিনি হাজার মন্দ হউন, আমি জানি, তিনি বড় ভীতু লোক। মনে ইচ্ছা থাকিলেও, তিনি এই মন্দ স্বভাব ছেড়ে দিবেন।"

মাধী খানিকটা ভাবিয়া বলিল,—"পরামর্শ করেছ ভাল; কিন্তু ও জিনিষ রাখিতে নাই। কি জানি, মন না মতি।"

"তুই কি পাগল? আমি তেমন লোক নই। মাধী, তুই মনে করিলে আমায় একটু বিষ এনে দিতে পারিস্।"

"না ভাই, সে আমার কর্ম্ম নয়।"

"তোর কোন ভয় নাই, আমি তোকে দশখানা সোনার গহনা দিব। এমন সুযোগ কি ছাড়িতে আছে?"

তা বটে—"কিন্তু আমি গরিব মানুষ।"

বিনোদিনী বলিলেন,—"মাধী, ওজর করিস্ না। এমন সদুপায় আর কিছুই নাই। একটু বিষ আমার হস্তগত হইলে, আমার সকল দুঃখই দূর হয়। এমন কাজে ওজর করা, মাধী, তোর কি উচিত?"

"তোমার জন্য দিদি আমি সব করিতে পারি। তুমি যেরূপ বল্‌ছো, তাতে জলে ডুবতে বলিলেও আমাকে ডুবতে হয়। তা—আমি নাকি—"

বিনোদিনী বাধা দিয়া বলিলেন, "তুই যা—তুই —যা—"

এই বলিয়া বিনোদিনী মাধীর হস্তে একটি টাকা গুঁজিয়া দিলেন। মাধী "তা—দেখি তা" বলিয়া চলিয়া গেল। তখন বিনোদিনী সজলনয়নে করযোড় করিয়া কহিলেন,—"হে করুণাময়! মাধী যেন নিষ্ফল হইয়া না আসে। এ জগতে মন্দভাগিনীর সমস্ত শান্তি বিষেই আছে। দয়াময়, সে শান্তিতে যেন বঞ্চিত না হই।"

বিষ আনিতে মাধীর চাঁড়াল-বাড়ীতেও যাইতে হয় নাই, কোন চেষ্টাও করিতে হয় নাই। সে এদিক্ ওদিক্ খানিকটা ঘুরিয়া আধ ঘণ্টা পরে আসিল। তাহাকে দেখিয়া বিনোদিনী সমুৎসাহে তাহার নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন—"কই মাধি, কই?"

তখন মাধী চারিদিকে চাহিয়া, ধীরে ধীরে কাপড়ের মধ্য হইতে একটা কলার পাত-মণ্ডিত মৃৎপাত্র বিনোদিনীর হস্তে দিয়া কহিল,"কত কষ্টে যে এনেছি, তা আর কি বল্‌ব? তোমার জন্য বলেই এত করেছি,

তা না হ'লে কি এমন কাজ করি? কিন্তু দেখো দিদি,—"সাবধান, যেন আমায় মজাইও না।"

বিনোদিনী অতুল সম্পত্তি ভাবিয়া সেই পাত্র হস্তে লইলেন এবং বলিলেন,—"ভয় কি? তুই কি পাগল?"

তাহার পর বাক্স খুলিয়া তাহার মধ্যে অতি যত্নে সেই বিষপাত্র স্থাপিত করিলেন এবং সাবধানতা সহ বাক্সের চাবী বন্ধ করিয়া যত্নে সেই চাবী বস্ত্রাগ্রে বাঁধিলেন।

তখন মাধী বলিল,—"কাকেও কি দেয়? যে কষ্ট ক'রে এনেছি, তা আর কি বল্‌বো?"

বিনোদিনী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"মাধী, যত্ন করিলে রত্ন মিলে।"

এই বলিয়া বিনোদিনী আপনার অলঙ্কারের বাক্স আনিলেন এবং চাবী খুলিয়া বলিলেন,—"মাধী, কি লইবি?"

মাধী সেই সমস্ত উজ্জ্বল অলঙ্কারের শোভা দেখিয়া লোভে অস্থির হইল। বলিল,—"কি লইব?"

"যাহা ইচ্ছা!"

এই বলিয়া বিনোদিনী মাধীর সম্মুখে সেই বাক্স খুলিয়া ধরিলেন। তখন মাধীর ইচ্ছা যে, সে বাক্সটা সমেত সব লয়, কিন্তু লইয়া যায় কেমন করিয়া? ছোট-দিদি এক বাক্স গহনা দিয়াছেন বলিলে কেহ তো বিশ্বাস করিবে না। অতএব যাহা লুকাইয়া চলে, তাহাই লওয়া ভাল ভাবিয়া, মাধী বাছিয়া বাছিয়া কতকগুলি অলঙ্কার লইল। সে এক একবার বিনোদিনীর মুখের প্রতি চাহিতে লাগিল। ভাবিল, তিনি বুঝি বিরক্ত হইতেছেন। বিনোদিনী বলিলেন, —"আরও লও না।"

মাধী বলিল,—"না দিদি! আমি গরিব মানুষ, আমার আর কেন?"

তখন মাধী প্রায় দেড় সহস্র টাকার অলঙ্কার আত্মসাৎ করিয়াছে। কিন্তু লোভ এখনও সম্পূর্ণ প্রবল, লওয়াও অসম্ভব। দীর্ঘনিশ্বাস সহ কহিল,— "আর না—আমার কোন পুরুষে এত সোনা দেখে নাই।"

মাধী হাত তুলিল। বাক্সটার প্রতি একবার সতৃষ্ণনয়নে চাহিল। এক পদ পিছাইয়া গেল। চারিদিকে একবার সভয়ে চাহিয়া দেখিল। তাহার পর বলিল,—"তবে এখন আসি দিদি? বিষটুকু সাবধানে রেখ, খুব সাবধান!"

বিনোদিনী বলিলেন,—"তা আর বল্‌তে? খুব যত্নে রাখিব।"

মাধী চলিয়া গেল। সে জানিত, তাহার বিষ কি কাজে লাগিবে। সে যাহা ভাবিয়া প্রত্যুষে বিনোদিনীর ঘরে আসিয়াছিল, তাহাতে তাহার জয় হইল। যতদূর তাহাকে দেখা যায়, ততদূর তাহাকে বিনোদিনী নয়ন দ্বারা অনুসরণ করিলেন। সে অদৃশ্য হইলে বলিলেন,—"মাধী যে উপকার করিল, অলঙ্কারে তাহার কি প্রতিশোধ হয়?"

তখন বিনোদিনী বাক্স খুলিয়া সেই বিষপাত্র বাহির করিলেন, ভূতলে জানু পাতিয়া বসিলেন এবং বিষপাত্র-হস্তে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া বলিলেন,—"জগদীশ!" এ ক্ষুদ্র প্রদীপ আমি স্বেচ্ছায় নিবাইতেছি—ইহাতে কাহারও দোষ নাই। দয়াময়, তোমার দয়ার সীমা নাই। তুমি যেমন মানব-জীবন অনন্ত যাতনায় ডুবাইয়াছ—তেমনি যখন ইচ্ছা, তখনই শেষ করিবার উপায়ও মনুষ্যের হস্তেই দিয়াছ। তবে কেন মানব যন্ত্রণার সময় এই সর্ব্বসন্তাপনাশক মহৌষধ সেবন করিবে না? যোগেন্দ্র! দুঃখিনীর হৃদয়-রত্ন! তুমি কি ভাবিয়াছ, আমি তোমাতে বঞ্চিত হইয়াও জীবনধারণ করিতে পারিব? চন্দ্র-সূর্য্য নিবিয়া যাউক, পৃথিবী কক্ষভ্রষ্ট হউক, মহাসমুদ্র আসিয়া জনস্থান অধিকার করুক, তথাপি হয় তো এ প্রাণ থাকিবে! কিন্তু তোমার অদর্শনেও কি বিনোদিনী বাঁচিয়া থাকিবে? কি দায়? কেন?"

তাহার পর সেই কুন্দ-কুসুমাঙ্গী নবীনা বালা অমৃতের ন্যায় সমাদরে সেই পাত্রস্থ বিষ গলাধঃ করিলেন!!! সমস্ত পান করিয়া ভাবিলেন, "কতটুকু বিষ খাইলে মানুষ মরে, তাহা তো জানি না।" তখন আবার গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া করযোড়ে কহিলেন,— "কৃপাময় জগদীশ! এই কর, যেন অভাগিনীর উদরে গিয়া বিষেরও বিষত্ব না যায়।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

চক্রীর পরিণাম।

যখন হরগোবিন্দ বাবু ও যোগেন্দ্রনাথ খিড়কি-দ্বার দিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন সেই দ্বার দিয়া মাধী বাহিরে আসিতেছিল। এ জগতে পাপের ভার বৃদ্ধি করিতেই মাধীর ন্যায় জীবের জন্ম। যদিও পাপমাত্রই তাহার অভ্যস্ত বিদ্যা, তথাপি সে এখনই যে কার্য্য করিয়া আসিতেছে, তাহা পাপের পরাকাষ্ঠা। পাপে যদিও তাহার হৃদয় পাষাণবৎ হইয়া গিয়াছে, তথাপি যে ব্যক্তি পরের সুখ ও

ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত স্বহস্তে জানিয়া শুনিয়া অপর এক জনের জন্য বিষ আনিয়া দিতে পারে, সে না পারে কি ? মাধী এখনই বিনোদিনীর নিমিত্ত বিষ সংগ্রহ করিয়া, তাহার প্রদত্ত অলঙ্কারগুলি সাবধানে ঢাকিয়া লইয়া বাটী যাইতেছে ; সেই জন্যই তাহার মনটা একটু আশঙ্কিত হইয়াছে। তাহার গতি সেই জন্যই অনিয়মিত ; বদন সেই জন্যই বিমর্ষ, দৃষ্টি সেই জন্যই সঙ্কুচিত, সর্ব্বাবয়বের সেই জন্যই ভীতভাব। তাহাকে দর্শনমাত্র যোগেন্দ্রনাথের ক্রোধ নবীন-ভাবে জ্বলিয়া উঠিল ; তিনি তাহার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—"মাধী, তোর মৃত্যু নিকট।"

মাধী চমকিয়া উঠিল ; কোন উত্তর করিল না। যোগেন্দ্র বলিলেন,—"তুই জানিস্, কি সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্ ?"

মাধী ভাবিল, কি সর্ব্বনাশ! তবে তো সব জানিয়াছে। সাহসে ভর করিয়া বলিল,—"আমি কি করিয়াছি ?"

যোগেন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ-স্বরে বলিলেন,—"আমি কি করিয়াছি ? মিথ্যাবাদিনী, সর্ব্বনাশিনী, তুমি কি করিয়াছ ? তুমি কি করিয়াছ, তাহা তোমায় দেখাইতেছি ! তুমি স্ত্রীলোক বলিয়া তোমায় ক্ষমা করিব না।"

মাধী ভয়ে অবসন্ন হইল। বুঝিল, সমস্তই তো জানিয়াছে। যখন জানিয়াছে, তখন সবই করিতে পারে। চাপটা একটু পাতলাইয়া দিবার আশায় বলিল,—"আমার কি দোষ ? আমি কি জানি ?"

তখন যোগেন্দ্র বলিলেন,—"তোর মিথ্যা কথার আদি নাই, অন্ত নাই। তুই কিছুই জানিস্ না ? বিনোদ আমাকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, সে সকল আমি পাই নাই কেন, তুই জানিস না ? তুই জানিস্ কি না, তাহা যখন তোর হাড় গুঁড়া করিয়া বুঝাইয়া দিব, তখন বুঝিতে পারিবি।"

মাধী রুদ্ধকণ্ঠে বলিল,—"আমি কি ইচ্ছায় করিয়াছি ? বড়-দিদি—"

যোগেন্দ্র আরও ক্রোধের সহিত বলিলেন,—"আবার মিথ্যা কথা ? আরও মিথ্যা কথা ? এত দুষ্টবুদ্ধি তোমার বড়-দিদির নাই। আমি তোমার সর্ব্বনাশ করিব, তবে ছাড়িব।"

তখন মাধী কাঁদিয়া ফেলিল ; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"আমি তখনই জানি, কারো কিছু হবে না ; মারা যেতে আমি গরিব মারা যাব।"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—"তোমার মত ভয়ানক লোক এ পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। তুই—তুই আমাকে নিজ মুখে বলিয়াছিস্, বিনোদিনী অসতী, আর এই মাষ্টার মহাশয় তাঁহার প্রাণবল্লভ। তোর ঐ মুখখানি খণ্ড খণ্ড করিব ; তোকে কুকুর দিয়া খাওয়াইব।"

তখন হরগোবিন্দ বাবু বলিলেন,—"মাধী, জগতে এমন কোন শাস্তি নাই, যাহা তোর উপযুক্ত।"

তখন মাধী দেখিল, তাহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত বটে ; সকল কথাই তো উহারা জানিয়াছে। এমন কোন উপায় তখন মাধীর মনে আসিল না, যাহাতে তাহার নিষ্কৃতি হয়। তাহার হিতাহিত-বুদ্ধির লোপ হইল। বলিল,—"সকলই সত্য, কিন্তু সকলই বড়-দিদির জন্য। তোমরা আমায় ক্ষমা কর, আমার দোষ নাই। বড়-দিদি আমার জামাইবাবুর জন্য পাগল, আমি কি করিব ?"

এই বলিয়া মাধী কাঁদিতে কাঁদিতে মাষ্টার মহাশয়ের চরণে পড়িল। কাপড়ের মধ্যে যে সকল গহনা ছিল, তাহার কথা মাধীর মনে হইল না ; গহনাগুলা বাহির হইয়া পড়িল। যোগেন্দ্র দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন, এ সকল বিনোদিনীর। ব্যস্ততা সহ জিজ্ঞাসিলেন—"এ আবার কি মাধী ? এ আবার কি সর্ব্বনাশের কল ?"

তখন মাধী বুঝিল, তাহার কপাল একেবারেই পুড়িয়াছে। অলঙ্কার আমার হাতে কেন আসিল, সন্ধান করিলেই জানিবে, ছোটদিদি দিয়াছেন। ছোটদিদি কেন দিলেন, খোঁজ করিলেই জানিতে পারিবে, আমি তাঁহাকে বিষ আনিয়া দিয়াছি। তখন সে মাষ্টার মহাশয়ের পা ছাড়িয়া দিয়া উঠিল এবং বলিল,—"আমার পাপের সীমা নাই। আমার কপাল পুড়িয়াছে। তোমরা যা খুসি কর।"

এই সময় বাটীর মধ্যে একটা তুমুল ক্রন্দনধ্বনি উঠিল। সেই গোল শুনিয়া হরগোবিন্দ বাবু ও যোগেন্দ্র বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মাধী অলঙ্কারগুলা সেই স্থানে ফেলিয়া চলিয়া গেল। সেই দিন সন্ধ্যাকালে প্রতিবাসীরা দেখিল, মাধীর মৃতদেহ রায়েদের পুষ্করিণীর জলে ভাসিতেছে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অপূর্ব্ব মিলন।

মাষ্টার মহাশয় ও যোগেন্দ্র বাবু বাটীর মধ্যে প্রবেশিয়া দেখিলেন, বিনোদিনীর প্রকোষ্ঠ হইতে অতি ভীষণ ক্রন্দন-ধ্বনি উঠিতেছে ! মাষ্টার মহাশয় সভয়ে বলিলেন,—"কি সর্ব্বনাশ !"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—"বিনোদ বুঝি আমায় ফাঁকি দিয়া পলাইতেছেন? নির্ব্বোধ! কোথায় যাইবে?"

তাঁহারা সংজ্ঞাশূন্যের ন্যায় ভাবে বিনোদিনীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন,—কি সর্ব্বনাশ! বিনোদিনী ভূ-শয্যায় শয়ানা! তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া তাঁহার মাতা ও পুরনারীগণ আর্ত্তনাদ করিতেছেন! তাঁহারা তথায় প্রবেশ করায় সেই ক্রন্দনধ্বনি শতগুণে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বিনোদিনীর মাতা আছড়াইয়া পড়িয়া বলিলেন,—"যোগিন্! বাবা! বিনী আমার বিষ খাইয়াছে।"

তখন যোগেন্দ্রের চক্ষে জল-বিন্দুও নাই। তাঁহার মূর্ত্তি চৈতন্যহীন মনুষ্যের ন্যায় বিকল। তাঁহার নেত্র স্থির, উজ্জ্বল ও আয়ত। যোগেন্দ্রের নাম বিনোদিনীর কর্ণে প্রবেশ করিল। বিনোদিনী গৃহের চতুর্দ্দিকে একবার ফিরিয়া চাহিলেন। তখন যোগেন্দ্রনাথ যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় ধীরে ধীরে গিয়া বিনোদিনীর শিয়রে বসিলেন। তখন বিনোদিনীর সেই মুকুলিত নেত্রের সহিত যোগেন্দ্রনাথের সেই স্থির নেত্রের মিলন হইল। তখন বিনোদিনী হস্তদ্বয় বিস্তার করিয়া যোগেন্দ্রের পদদ্বয় ধারণ করিলেন। তখন সেই মৃত্যুপীড়িত বদনে হাস্যের জ্যোতি দেখা দিল!!

মাষ্টার মহাশয় বিনোদিনীর মাতার হস্ত ধারণ করিয়া বাহিরে আনিলেন এবং পুরনারীগণকে বাহিরে আসিতে বলিলেন। সকলকেই গোল করিতে বারণ করিলেন।

তখন বিনোদিনী বলিলেন,—"আমাকে ক্ষমা কর।"

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"পাগলিনি! এ দুর্ম্মতি কেন? আমাকে ফেলিয়া যাইবার কি যো আছে?"

বিনোদিনী নয়ন মুদিয়া বলিলেন,—"ছিঃ, তোমরা বড় প্রতারক!"

তখন যোগেন্দ্র বলিলেন,—"না, তোমার যোগেন্দ্র প্রতারক নহে।"

যোগেন্দ্রনাথ সমস্ত ঘটনা অতি সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিলেন। শুনিয়া বিনোদিনীর চক্ষে জল পড়িতে লাগিল।

যোগেন্দ্র বলিলেন,—"কাঁদিতেছ কেন?"

বিনোদিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"এক ঘণ্টা আগে কেহ যদি আমাকে এই কথা এমনি করিয়া বলিত, তাহা হইলে আমার এ রত্ন ছাড়িতে হইত না। কিন্তু এখন তো আর বাঁচিবার উপায় নাই।"

"ছাড়িবে কেন বিনোদ? যদি তোমার বাঁচিবার উপায় না থাকে, আমারও তো মরিবার উপায় আছে।"

তখন বিনোদ সজলনয়নে যোগেন্দ্রের হস্তধারণ করিয়া কহিলেন,—"ছিঃ! তাহা মনেও করিও না। তুমি বাঁচিয়া থাকিলে সংসারের অনেক উপকার।"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—"তাহাতে আমার কি?"

তখন বিনোদিনী বলিলেন,—"যোগেন্দ্র! আর তো আমার বিলম্ব নাই। আমার যোগিন্ আমারই আছেন জানিয়া মরণ এখন বড় সুখের বটে, কিন্তু আগে যদি আমি একটুও বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে, যোগিন্! আমি মরিবার কথা একবার মনেও করিতাম না জগদীশ্বর!"

সুন্দরী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে আবার কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"আমার এখন কথা কহিতে বড় কষ্ট হইতেছে। আমার যোগেন্দ্রের সহিত আমি আর কথা কহিতে পাইব না। ওঃ! যোগেন্দ্র!"

তখন যোগেন্দ্রনাথ বিনোদিনীর মস্তক আপন উরুর উপর স্থাপন করিলেন এবং তাঁহার শীতল ওষ্ঠ চুম্বন করিয়া কহিলেন,—"দুঃখ কি? জীবন কত ক্ষণের? এখন যে জীবনে প্রবেশ করিতেছ, তাহার শেষ নাই। সংসার দেখিলে তো—ইহা পাপের পুরী, এখানে আত্ম নাই, পর নাই, কেবল স্বার্থই লক্ষ্য। এবার যে রাজ্যে যাইব, তথায় হিংসা নাই, শত্রুতা নাই। তবে ভয় কি?"

তখন বিনোদিনী ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—"পরমেশ্বর! যাহাদের জন্য আমাদের এই বিচ্ছেদ, তাহাদের যেন এ পাপ না স্পর্শে।"

বিনোদিনী চুপ করিলেন। তিনি যোগেন্দ্রের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার নেত্র দিয়া জল পড়িয়া যোগেন্দ্রের উরু ভাসাইতে লাগিল। যোগেন্দ্রের চক্ষে এখনও জল নাই। সেই বিনোদিনী—তাঁহার সেই বিনোদিনী তাঁহার ক্রোড়ে পড়িয়া কাঁদিতেছেন, মৃত্যু আসিয়া সেই নবীনার নবীন জীবন প্রায় গ্রাস করিয়াছে; যোগেন্দ্র সমস্তই বুঝিতেছেন; কিন্তু কাঁদিতেছেন না বা কাতরতা প্রকাশ করিতেছেন না। ওঃ! তাঁহার মূর্ত্তি কি ভয়ানক!!! তাঁহাকে দেখিলে ভয় হয়, বোধ হয় যেন, প্রাণহীন দেহ বসিয়া আছে! তাঁহার নেত্র

শবের ন্যায় শ্বেত অথচ নিষ্প্রভ, তাঁহার বদন শবের ন্যায় কঠিন ও অবশ।"

যোগেন্দ্র দেখিলেন, বিনোদিনীর জীবনলীলা অবসান হইতে আর বিলম্ব নাই! বিনোদিনী একবার কথা কহিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ভাল করিয়া কথা মুখ দিয়া বাহিরিল না। তখন তিনি স্বীয় শক্তিশূন্য হস্ত ধীরে ধীরে উঠাইলেন। সেই হস্ত যোগেন্দ্রের কণ্ঠে পড়িল। তখন যোগেন্দ্র হস্ত দ্বারা বিনোদিনীকে বেষ্টন করিয়া তাঁহার বক্ষের উপর পড়িয়া গেলেন। তখন বিনোদিনীর বদনে মৃত্যুচিহ্ন সকল ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে বদন দিয়া একটি অস্ফুট বাক্য বাহিরিল, সে বাক্য "যোগি।"

এ জগতে সেই পতি-গত-প্রাণা, সাধ্বী বিনোদিনী আর কথা কহিতে পাইল না! মৃতার বক্ষঃস্থলস্থ ব্যক্তি একবারমাত্র স্বীয় মস্তক আন্দোলন করিয়া একটা কথা বলিতে প্রযত্ন করিলেন, কিন্তু কথা বাহিরিল না। একটা অপরিস্ফুট ধ্বনিমাত্র বুঝা গেল। এ মরজগতে সে নিষ্কলঙ্ক দেহে আর সংজ্ঞা আসিল না!

অচিরে হরগোবিন্দ বাবু সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন কি?—দেখিলেন, সেই দুই প্রেমময় পক্ষী পলাইয়া গিয়াছে! তাঁহাদের সেই নবীন দেহপিঞ্জরমাত্র পড়িয়া রহিয়াছে! সংসারের প্রবল ঝটিকায় সেই দুইটি সুকুমার কুসুম বৃন্তচ্যুত হইয়া শুকাইয়া গিয়াছে। তখন হরগোবিন্দ বাবু সেই দুই প্রেমপুত্তলির সমীপে বসিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন।

ক্ষণেক পরে তথা আলুলায়িতকুন্তলা কমলিনী উন্মাদিনীর ন্যায় বেগে প্রবেশ করিল। কিয়ৎকাল এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সেই কালামুখী আপনার কীর্ত্তি দেখিল। সহসা উচ্চরবে হাস্য করিয়া করতালি দিতে দিতে কহিল,—"বেশ! বেশ! বেশ!"

তাহার পর? তাহার পর রায়েদের এই সোনার সংসার ছাই হইয়া গেল।"

সমাপ্ত

শান্তি

দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত

হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান্ ব্যক্তিবৃন্দকে বিনোদিত করিবার অভিপ্রায়ে এই গ্রন্থ লিখিত হইল।

সনাতন হিন্দুধর্ম্মে ও সুপবিত্র আর্য্যশাস্ত্রোক্তি-সমূহে যাহাদের শ্রদ্ধা নাই, তাদৃশ বিজ্ঞজনেরা এ গ্রন্থ পাঠ না করিলেই সুখী হইব।

এই গ্রন্থের প্রথমার্দ্ধ 'প্রচার' নামক মাসিক-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎকালে শারীরিক ও মানসিক বহুবিধ অসুস্থতা হেতু আমি উহা সম্পূর্ণ করিতে সমর্থ হই নাই। তজ্জন্য অনেকের নিকট আমি এতাবৎকাল নিরতিশয় লজ্জিত ছিলাম। অধুনা ভগবৎকৃপায় আরব্ধকার্য্য সমাপ্ত হইল।

শ্রীদামোদর দেবশর্ম্মা।

"মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ, মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।
মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ, মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা।
মধুমান্ নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ, মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।"—ঋগ্বেদসংহিতা।

(স্বাস্থ্যকর বায়ু প্রবাহিত হউক, নদীসমূহ হইতে অমৃত নিঃসৃত হউক, ওষধিসমূহ সুস্বাদ হউক, রাত্রি ও ঊষা স্বাস্থ্যপ্রদ হউক, পার্থিব রজঃপুঞ্জ স্বাস্থ্যজনক হউক, আমাদের পিতৃস্বরূপ দ্যুলোক সুখময় হউক, আমাদের বনস্পতিসমূহ ফলবান্ হউক, সূর্য্য আনন্দপ্রদ কিরণ বর্ষণ করুন, আমাদের গাভীসকল পয়স্বিনী হউক।

বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশের সুবিমল শশধর, স্বদেশ-বৎসলগণের গৌরবস্থল কবি-কুল পুঙ্গব

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়ের সুপবিত্র ও সমাদৃত নামে

তদীয় একান্ত গুণপক্ষপাতী

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

আন্তরিক ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন-স্বরূপে,

এই গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হইল।

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

দিন যায়, আবার দিন আইসে ; কিন্তু যে দিনটি যায়, সেটি আর আইসে কি ? সেটি আর আইসে না ; এ কথা কে না বুঝে, কে না জানে ? কিন্তু বল দেখি, প্রতিদিন সূর্য্যদেবের অস্তগমন দেখিয়া সংসারের কয় জন ইহা মনে করে ? দিন তো যায় —আজিকার দিন চলিল ; কিন্তু বল দেখি, প্রতিদিন যাইবার সময় আমাদিগকে কি বলিয়া যায় ? সায়ংকালের বিহঙ্গম-কূজন, অস্তোন্মুখ দিবাকরের আরক্ত-লোচন, তামসী নিশার অগ্রদূতীগণের অপাঙ্গদৃষ্টি, আমাদের বলিয়া দেয় না কি,—"হে মানব ! এ ভব-রঙ্গভূমিতে তুমি যে কয়দিনের জন্য লীলা-খেলা করিতে আসিয়াছ, তাহার একটি দিন অদ্য কমিয়া গেল ?" এ চৈতন্য—এ অবশ্যম্ভাবী সহজ জ্ঞান যদি মানবের থাকিত, প্রকৃতির এই দৈনন্দিন উপদেশ যদ মানব প্রণিধান করিত, তাহা হইলে মানুষ এতদিনে দেবত্ব লাভ করিত এবং সংসার শান্তি ও পুণ্যের নিকেতন হইত।

আমরা বলিতে বসিয়াছি, দিন যায়। পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর বিশাল বক্ষোভেদ করিয়া দেশবিদেশের কতই নৌকা চলিতেছে। হেলিতে দুলিতে ছোট বড় কতই তরণী গঙ্গাবক্ষে ভাসিতেছে। সন্ধ্যা হইলে নৌকায় নৌকায় প্রদীপ জ্বলিল। সেই আলোকের প্রতিবিম্ব জলে পড়িয়া জলমধ্যে প্রকাণ্ড আলোকরেখা বিরচিত হইল। নৌকা ছুটিতেছে—জলমধ্যে সঙ্গে সঙ্গে তাহার আলোকাভাও ছুটিতেছে। জলমধ্যে অগ্নি খেলিতেছে, কাঁপিতেছে, দুলিতেছে ও ছুটিতেছে। দুই বিধর্ম্মী-জড়ের অদ্ভুত মিলন ! ঝির-ঝির করিয়া বারিকণা-সুস্নিগ্ধ নির্ম্মল বসন্ত-বায়ু বহিতেছে। অদ্য পূর্ণিমা। আকাশে তারাদল-সংবেষ্টিত-শশধর, পারিষদ ও অনুচর-পরিবৃত নরপতির ন্যায় সগৌরবে বিরাজিত। সন্নিহিত—গ্রামের দেবালয় হইতে সান্ধ্য-দেবারতির বাদ্যধ্বনি সমুত্থিত ও নিবৃত্ত হইল। এমন সময়ে সুদূরস্থিত এক নৌকা হইতে দুই জন মাঝি সমস্বরে গীত ধরিল—

> "ও যে চন্দন-কাঠের না,
> ডুবেও ডোবে না,
> ও সে হাল ধ'রে রয়েছে রে তার
> পরমা গোয়ালা।"

কি মধুর, কি অপূর্ব্ব, কি হৃদয়দ্রাবকর ! সেই অপূর্ব্ব গীতধ্বনি জাহ্নবীর পবিত্র বক্ষে নাচিতে নাচিতে, সেই সুস্নিগ্ধ-মৃদু-মন্দ, বায়ুহিল্লোলের সহিত খেলিতে খেলিতে, সেই চন্দ্রমার সুনির্ম্মল কররাশির সহিত মিশিতে মিশিতে, তথায় অভূতপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সংগঠিত করিল। সেই ক্ষেত্রে তখন সুন্দরে সুন্দরে সৌন্দর্য্য-সমষ্টির সুন্দর সম্মিলন হইল। সুন্দর শশধর, সুন্দর নাবিক-সঙ্গীত, সুন্দর জাহ্নবী-জল, সুন্দর বসন্তানিল। বিধাতা সকলকে এই সকল সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিবার সমান ক্ষমতা দেন নাই। যে ভাগ্যবান্ তাহা ভোগ করিতে সক্ষম, তিনি আপনার চিত্ত সেই মোহকর রাজ্যে ছাড়িয়া দিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন।

পণ্যভার-সমাকুলিত নৌকাসমূহ গুর্ব্বিণী নারীর ন্যায় মন্থর-গতিতে চলিতেছে। এ জগতে যাহার বোঝাই হাল্কা, তাহার চালচলনও হাল্কা। হাল্কা নৌকাসকল ফর-ফর করিয়া চলিতেছে। কিন্তু সকল নৌকার কথায় আমাদের কাজ কি ? সম্মুখে ঐ যে নৌকাখানি ধীরে ধীরে যাইতেছে, তাহাতে যে পুরুষ ও স্ত্রী বসিয়া আছেন, তাঁহাদের কথাই আমরা এক্ষণে বলিব। সেই নৌকার আরোহী রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁহার পত্নী সুকুমারী দেবী। রমাপতির বয়স ২৩।২৪ এবং সুকুমারীর বয়স অষ্টাদশ অতিক্রম করিয়াছে বোধ হয় না। কাটোয়া নামক গ্রামে রমাপতি মাসিক পঁচিশটি টাকা মাত্র বেতনে স্কুল-মষ্টারী করেন। এরূপ অবস্থায় লোকে পরিবার

লইয়া কর্ম্মস্থানে থাকে না; কিন্তু কোন দিকে আর কেহ আপনার লোক না থাকায় সুকুমারীকে ফেলিয়া রমাপতি বিদেশে যাইতে অক্ষম। এই যুগলে বিধাতার অপূর্ব্ব সম্মিলন-কৌশল অপূর্ব্বরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। পুরুষ রমাপতি পৌরুষ শোভার আদর্শ এবং নারী সুকুমারী কামিনী-কুল-কমলিনী। ক্ষুদ্র নৌকা এই দুই সৌন্দর্য্যসার বক্ষে লইয়া বুক ফুলাইলা ভাসিতেছে। সুকুমারী নিরাভরণা, তাঁহার প্রকোষ্ঠে কালো হাড়ের চুড়ি ভিন্ন অন্য ভূষণ নাই। কিন্তু কি সুন্দর! সেই সুগোল হস্তে—সেই স্বর্ণবর্ণ সুকুমারীর সুকুমার প্রকোষ্ঠে সেই কৃষ্ণভূষণ কি সুন্দরই দেখাইতেছে! আর রমাপতি? তাঁহার সেই বিশাল বক্ষে অতি শুভ্র যজ্ঞোপবীত হেলিয়া দুলিয়া কত শোভাই পাইতেছে। ভূষণ নামে বর্ত্তমানকালে যে সকল সামগ্রী ব্যবহৃত হয়, তাহাতে এমন অপার্থিব সৌন্দর্য্য বাড়ায় কি কমায়, তাহা বিশেষ বিচার্য্য কথা। ভূষণ শোভা ও সৌন্দর্য্যের সহায়তা করে। যাহার যাহা নাই, তাহারই তাহা পাইবার জন্য সহায়তার আবশ্যক হয়। যাহাদের রূপ নাই, অথবা রূপের অভাব আছে বলিয়া যাহারা জানে, অলঙ্কার তাহাদের সহায়। কিন্তু এ স্থলে—যেখানে রূপ পূর্ণিমার চাঁদের মত পূর্ণমাত্রায় প্রস্ফুটিত, সেখানে ছার ভূষণের প্রয়োজন?

রমাপতি দরিদ্র; তাঁহার সাত রাজার ধন সুকুমারীকে লইয়া তিনি আনন্দে আপনার জন্মভূমি পিতৃপিতামহাদির নিবাসস্থান হুগলীতে ফিরিতেছেন। নৌকামধ্যে একটি কাঠের বাক্স, দুইটি কাপড়ের মোট, কয়েকখানি লেপ ও তোষক, দুইটি বালিস এবং কিছু পিত্তল ও কাংস্যপাত্র রমাপতি ও সুকুমারীর বিষয়-বিভবের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

সুকুমারী জিজ্ঞাসিলেন,—"উপর হইতে যে আরতির বাজনা শুনিতেছি, ও কোন্ গ্রাম?"

রমাপতি উত্তর দিলেন,—"শান্তিপুরের নাম কখন শুনিয়াছ কি? মেয়েমানুষ শান্তিপুরের বড় ভক্ত; কারণ, শান্তিপুর তাহাদের জন্য পুরুষ ভুলাইবার ফাঁদ তৈয়ারী করিয়া দেয়। শান্তিপুরের উলঙ্গিনী শাড়ী নামেও যা, কাজেও তা। যাহারা কাপড় পরিয়াও উলঙ্গ থাকিতে চাহে, তাহারা এখানকার তাঁতিদের আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে উলঙ্গিনী শাড়ী পরিয়া রূপের বাঁধন খুলিয়া দেয়। এই সেই শান্তিপুর। এখন তোমার জন্য সেই হাবুডুবু-খাওয়ান, মন-মজান শাড়ী একখানি সংগ্রহ করিতে হইবে কি?"

সুকুমারী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"এ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া, আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা কর। যদি তোমার হাবুডুবু খাওয়ার এখনও বাকী থাকে, যদি তোমার মন এখনও পুরাপুরি না মজিয়া থাকে, তাহা হইলে কাজেই সে জন্য কলকৌশল সন্ধান করিতে হইবে। কিন্তু কাপড়ে তাহার কি করিবে? কাপড়, অলঙ্কার প্রভৃতি সামগ্রী বাহিরের শোভা বাড়ায়। কেবল বাহিরের শোভাতে কেবল বাহিরই মজে। সে মজা, সে হাবুডুবু কেবল নেশাখোরের নেশা। দুদিনেই তাহার শেষ হয়।"

রমাপতি জিজ্ঞাসিলেন,—"তবে তুমি চাও কি?"

সুকুমারী সগর্ব্বে উত্তর দিলেন,—"আমি যাহা পাইয়াছি।"

রমাপতি প্রীতিপূর্ণ হাসির সহিত বলিলেন,—"তুমি পাইয়াছ কি? আমি তো দেখি, তুমি কেবল সংসারের ক্লেশ ভুগিতে আসিয়াছ, মনের সাধে তাহাই ভোগ করিতেছ। আর আমার ভালবাসা? সত্য কথা বলিব না কি? তুমি ছাড়া আর সকলকেই আমি খুব ভালবাসি।"

সুকুমারী বলিলেন,—"আমার উপরে জন্মজন্মান্তরেও যেন তোমার এমনই নিগ্রহ থাকে। আমি জানি, তোমার যে ভালবাসার আমি অধিকারিণী, জগতে নারীজন্ম লাভ করিয়া আর কখনই কেহ তেমন প্রেম ভোগ করিতে পায় নই। কত শত রাজরাণীর দশা দেখিয়া আমি হাসিয়া মরি। তাহারা সংসারে আসিয়া কতকগুলা সোনার ঢেলা গায়ে জড়াইয়া হাসিয়া বেড়ায়; কিন্তু যে অমূল্য সোনার শিকলে ইহলোক ও পরলোক বাঁধা আছে, তাহা তাহারা দেখিতেও পায় না। আমার কষ্টের কথা বলিতেছ? হে মধুসূদন! তোমার পাদপদ্মে দাসীর এই প্রার্থনা যে, যতবার আমাকে এই মর্ত্ত্যলোকে আসিতে হইবে, ততবারই যেন আমি এইরূপ কষ্ট পাই।"

সুকুমারীর চক্ষু জলভারাকুল হইল। রমাপতি মনে মনে বলিলেন,—"হে ভগবান্! আমি কি তপস্যার বলে,—কোন্ সুকৃতির ফলে এই দেবীকে পত্নীরূপে লাভ করিয়াছি! সার্থক আমার জন্ম। আমি তো ঐ দেবীর দাস।"

সুকুমারী আবার বলিলেন,—"আর তোমার ভালবাসার কথা তুমি নিজে কি বুঝিবে? যে যাহা ভোগ করে, সেই তাহা বুঝে। তোমার ভালবাসা বুঝাইবার, বলিবার নয়। আমার রক্ত, মাংস,

মন, প্রাণ তোমার ভালবাসায় ডুবিয়া রহিয়াছে। হে নারায়ণ! কি পুণ্যে আমার এ সুখ? এ অধম নারীর প্রতি তোমার এ কি অতুল কৃপা!"

নৌকা চলিতে লাগিল। মাঝিরা চাকদহের নীচে রাত্রের মত নৌকা লাগাইয়া রাখিবে স্থির করিয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সহসা পশ্চিম-গগনে একটু কালো মেঘ দেখা দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটু ঝড়ও উঠিল। রমাপতি মাঝিদিগকে নৌকা না চালাইয়া বাঁধিয়া রাখিতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু তাহারা সামান্য ঝড় বুঝিয়া, নৌকা লাগাইয়া রাখিবার কোনই দরকার মনে করিল না। চাকদহের এ দিকে নৌকা লাগাইতে তাহাদের ইচ্ছাও ছিল না। সুতরাং তাহারা রমাপতির কথা না শুনিয়া, নৌকা চালাইতে লাগিল।

সুকুমারী বলিলেন,—"ঝড়ও উঠিয়াছে, মেঘও হইয়াছে। চাকদহ পর্য্যন্ত যাইতে যাইতে যদি ঝড় খুব বাড়িয়া উঠে. তাহা হইলে কি হইবে?"

রমাপতি বলিলেন,—"তাহা হইলে নৌকা ডুবিয়া যাইবে, সেটা বড় ভয়ের কথা না কি?"

সুকুমারী বলিলেন,—"ভয়ের কথা নহে সত্য। কারণ, তোমার সাক্ষাতে তোমাকে ভাবিতে ভাবিতে মরিব, তাহার অপেক্ষা ভাগ্য আর কি আছে? কিন্তু মরণের পর তোমার কাছে তো আর থাকিতে পাইব না।"

রমাপতি কহিলেন,—"তোমার যদি মরণ হয়, তাহা হইলে আমারই কি জীবন থাকিবে পাগলিনি? আজিকার ঝড়ে যদি নৌকা ডুবিয়া যায়, তাহা হইলে তোমারও যে গতি, আমারও সেই গতি। আমরা জীবনে ও মরণে একই থাকিব। আজি যদি দেবতা আমাদের নৌকা ডুবাইয়া দিয়া সন্তুষ্ট হন, তাহাতে আমাদের কোনই আপত্তি করিবার অধিকার নাই। কিন্তু এইটুকু তুমি স্থির জানিও যে, আমরা উভয়ে একসঙ্গে ডুবিব, একসঙ্গে যাতনা ভোগ করিব, একসঙ্গে এই ধূলার দেহ ছাড়িব, উভয়ে একসঙ্গে ইহার অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ দেহ ধরিব, তাহার পর উভয়ে একসঙ্গে এই যন্ত্রণারাজ্য ছাড়িয়া পরম আনন্দরাজ্যে বেড়াইব ও সকল আনন্দের মূল এবং সকল প্রেমের যিনি নিদান, উভয়ে একসঙ্গে সেই সর্ব্বফলদাতার গুণগান করিব। অতএব মরণে আমাদের দুঃখের কথা কি আছে?"

সুকুমারী কোন উত্তর দিলেন না, কিন্তু রমাপতির নিকটে আর একটু সরিয়া আসিলেন। ক্রমে ঝড় আরও উগ্র-মূর্ত্তি ধারণ করিল; মেঘে সমস্ত গগন ছাইয়া গেল; সেই শোভাময় চন্দ্রতারা কোথায় লুকাইল এবং প্রকৃতি অতি বিকটবেশে সাজিয়া দাঁড়াইল। রণরঙ্গিণী প্রকৃতি ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ ছড়াইয়া অট্টহাসি হাসিতে লাগিল। প্রবল বাতাসে শাঁ শাঁ শব্দে এবং মেঘের তীব্র গর্জ্জনে সেই রণোন্মাদিনী হুঙ্কারিতে লাগিল। মাঝিরা নৌকা স্থির রাখিবার জন্য প্রণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু বিফল সে চেষ্টা। নদীবক্ষে বড় বড় ঢেউ উঠিল; সেই সকল তরঙ্গের জল নৌকার উপরেও উঠিতে লাগিল। মাঝিরা আগে কথা শুনে নাই, এখন নৌকা তীরে আনিবার জন্য কত চেষ্টাই করিতে লাগিল। কিন্তু নৌকাচালনা তাহাদের পক্ষে অনায়ত্ত হইয়া উঠিল। রমাপতি সকলই জানিতেছেন ও বুঝিতেছেন। তিনি মাঝিদের জিজ্ঞাসিলেন,—"গতিক কি?"

প্রধান মাঝি বলিল,—"ঠাকুর, গতিক বড় মন্দ। এখন যা হয় কর।" সুকুমারীর চক্ষু বহিয়া তখন ঝর-ঝর করিয়া জল পড়িতেছে। তিনি তখন দুই কর উর্দ্ধদিকে তুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "হে অনাথনাথ! হে দীনবন্ধো! আমি মরি, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু দয়াময়, এই কর, যেন আমার ঐ দেবতা, ঐ গুরুর গুরুর কোন বিপদ না ঘটে। আমার মত একটা ক্ষুদ্র পিপীলিকার মরা-বাঁচায় সংসারের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হইবে না; কিন্তু ভক্তবৎসল দয়াময়! আমার ঐ দেবতা অসময়ে সংসার ত্যাগ করিলে তোমার রাজ্যের অনেক ক্ষতি হইবে। হে মধুসূদন! প্রেমে যাঁহার হৃদয় পূর্ণ, তিনি যদি সংসারে থাকিতে না পান, তবে আর থাকিবে কে? হে বিপন্ন-বান্ধব! এ অধম-নারী তোমার চরণে আর কখনও ভিক্ষা চাহে নাই। তুমি কাতরের সহায়, আজি তুমি এ অধম নারীকে এ ভিক্ষা দিবে না দয়াময়? দিবে, দিবে, দিবে, অবশ্যই দিবে।"

তাহার পর রমাপতির দিকে ফিরিয়া সুকুমারী তাঁহার চরণরেণু মস্তকে গ্রহণ করিয়া বলিলেন,— "আমার সর্ব্বস্ব! তুমি তো মরিতে পাইবে না। যিনি এই ভবনদীর প্রধান কর্ণধার, আমি সেই হরির চরণ ধরিয়া কাঁদিয়াছি। তিনি তোমাকে রাখিবেনই রাখিবেন! আমাকে তুমি যত ভাল-বাস, তাহা স্মরণ করিয়া দেখ। আমার কোন্

প্রার্থনা তুমি কবে না শুনিয়াছ? এই অন্তিমকালে হে স্বামিদেব! তোমার চরণে আমার এক প্রার্থনা আছে! তুমি তাহা রক্ষা করিবে জানিলে আমি হাসিতে হাসিতে মরি! আমি মরিয়া যাওয়ার পর তোমাকে আবার বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে হইবে।"

রমাপতি তখন সুকুমারীকে সস্নেহে আদর করিয়া আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—"চল সুকুমারি! ছাদের উপর গিয়া যাহা বলিতে হয় বলিব, শুনিও।"

তাহার পর উভয়ে আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া বাহিরে আসিলেন। তখন রমাপতি বলিলেন,—"শুন দেবি! তোমাকে চিরদিন দেবী জানিয়া কায়মনোবাক্যে তোমার উপাসনা করিয়াছি। আজি যদি তোমারই মরণ হয়, তাহা হইলে আমি তোমাকে ছাড়িয়া বাঁচিতে পারিব কেন? এই তোমাকে ধরিয়া দাড়াইয়া রহিলাম। যদি এখন নৌকা ডুবে, তাহা হইলে জানিও, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার দেহে নিশ্বাস বহিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমাকে বাঁচাইতে যত্ন করিব। কিন্তু তাহাতেও যদি তোমাকে বাঁচাইয়া উঠিতে না পারি, তাহা হইলে জানিবে, তোমারও যেই গতি, আমারও সেই গতি।"

সুকুমারী একটা উত্তর দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তখনই একটা অতি ভয়ানক বাত্যা আসিয়া নৌকা ডুবাইয়া দিল। সুকুমারীর মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল।

নৌকা তো ডুবিয়া গেল, কিন্তু কোথায় রমাপতি?—কোথায় সুকুমারী? ঐ যে—ঐ যে রমাপতি সেই তরঙ্গায়িত-জাহ্নবীবক্ষে সুকুমারীকে পৃষ্ঠে লইয়া সাঁতার দিতেছেন। কখন জল তাঁহাদের উপর দিয়া চলিতেছে, কখন তাঁহারা জলের উপর দিয়া চলিতেছেন। নিবিড় অন্ধকারে চারিদিক ছাইয়া ফেলিয়াছে। কোথায় কোন্ দিকে যাইতেছেন, তাহা রমাপতি জানেন না। প্রবল ঝড়ে ও খরস্রোতে কখন বা ডুবাইয়া দিতেছে, কখন বা ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। অনবরত জলোচ্ছ্বাস তাঁহাদের মুখে আসিয়া লাগিতেছে ও উদরস্থ হইতেছে। তথাপি রমাপতি পূর্ণ উদ্যমে, সকল বিঘ্নের সহিত ঘোর যুদ্ধ করিতেছেন। তাঁহার পৃষ্ঠে যে ভার রহিয়াছে, তাহার কল্যাণ-কামনায় তিনি কোন বিপদকেই বিপদ বলিয়া মনে করিতেছেন না। কিন্তু সকল বিষয়েরই সীমা আছে। মানবদেহের ক্ষমতাদিরও একটা সীমা আছে সন্দেহ নাই। বহুক্ষণ এইরূপ বিজাতীয় শ্রমে রমাপতি নিরতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। সুকুমারী তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,—"আমাকে ছাড়িয়া দেও, হয় ত আমিও সাঁতার দিতে পারিব।"

হাঁপাইতে হাপাইতে কাতর স্বরে রমাপতি বলিলেন—"কাহাকে ছাড়িয়া দিব?—তোমার ঐ শরীর? মরণের পর।"

কিন্তু ক্রমশই রমাপতি অধিকতর ক্লান্ত ও অক্ষম হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তখন সুকুমারী অন্য উপায়াভাবে কৌশল করিয়া রমাপতির পৃষ্ঠাশ্রয় ত্যাগ করিলেন এবং তখনই ডুবিয়া গেলেন। তৎক্ষণাৎ রুদ্ধশ্বাস রমাপতি "সুকুমারি, সুকুমারি!" শব্দে চীৎকার করিয়া সেই স্থলে ডুবিয়া গেলেন। অচিরকালমধ্যে সুকুমারীকে লইয়া রমাপতি পুনরায় ভাসিয়া উঠিলেন, এবং পাছে সুকুমারী আবার ফাঁকি দেন, এই আশঙ্কায় তাঁহার প্রকোষ্ঠ আপনার দন্তমধ্যে কঠিনরূপে ধারণ করিলেন। কোমলাঙ্গীর হস্ত দন্তাঘাতে কাটিয়া গেল, এবং সেই ক্ষতমুখ হইতে অবিরলধারায় রুধির প্রবাহিত হইয়া ভাগীরথীর নীরে মিশিতে লাগিল। সুকুমারী রমাপতির পৃষ্ঠ ত্যাগ করিবার জন্য কোন প্রকার বলপ্রয়োগ করিলেন না। তিনি বুঝিলেন, এ সময় জোর করিলে, রমাপতির জীবনের এখনও যদি কোন আশা থাকে, তাহাও আর থাকিবে না। রমাপতি ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন এবং সময়ে সময়ে সুকুমারীর সহিত ডুবিয়া পড়িতে লাগিলেন। শরীর আর বহে না, হাত আর উঠে না, পা আর নড়ে না, নিশ্বাস আর চলে না। তিনি বুঝিলেন, আর রক্ষা নাই। তখন তিনি বলিলেন,—"সুকুমারি! আর বাঁচাইতে পারিব না। তোমারও যে গতি, আমারও—" তিনি যেই কথা কহিতে গেলেন, সেই তাঁহার দন্তমধ্য হইতে সুকুমারীর হস্ত খুলিয়া গেল। তখনই সুকুমারী আবার জলে ডুবিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে রমাপতি এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া জলে ডুব দিলেন।

এ দিকে ঝড় একটু থামিল; ক্রমে ক্রমে মেঘ উড়িয়া যাওয়ায় আকাশমণ্ডল আবার পরিষ্কৃত হইতে লাগিল। ক্রমে চন্দ্র ও তারা উঁকি দিতে দিতে বাহির হইয়া পড়িলেন, এবং জাহ্নবীবক্ষ আবার চন্দ্রকরোজ্জ্বল হইয়া হাসিতে লাগিল। পরিবর্ত্তনশীলা প্রকৃতি আরও শোভাময়ী সুন্দরীর বেশ ধারণ করিলেন। আকাশ বেশ খোলসা হইয়াছে এবং আর কোন বিপদের আশঙ্কা নাই

দেখিয়া দুই একখানি নৌকাও লগী ঠেলিয়া কাছি খুলিয়া গা ভাসাইয়া দিল।

রমাপতি ভাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু কোথায় সুকুমারী? রমাপতি সাধ্যমত উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন,—"সুকুমারি! সুকুমারি!"

কিন্তু কোথায় সুকুমারী?

আবার রমাপতি ডুবিলেন এবং আবার উঠিয়া ডাকিলেন,—"সুকুমারি! সুকুমারি!"

কিন্তু কোথায় সুকুমারী?

তখন শ্রান্ত, ক্লান্ত, মর্ম্মাহত, রুদ্ধশ্বাস রমাপতির চৈতন্য তিরোহিত হইল, এবং তাঁহার শেষ নিশ্বাস শ্বাসনলী ত্যাগ করিল।

কিছু দূরে একখানি নৌকা আসিতেছিল; তদুপরিস্থিত লোকেরা রমাপতির শব্দ শুনিয়া স্থির করিল, এই ঝড়ে যাহাদের নৌকা ডুবিয়াছে, তাহার মধ্যে তিনিও এক জন। তাহারা দ্রুত আসিয়া তাঁহাকে আপনাদের নৌকায় তুলিল, এবং বহু কৌশলে তাঁহাকে আবার চেতন করিল। চৈতন্য-লাভের সঙ্গে সঙ্গে রমাপতি চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"সুকুমারি! সুকুমারি!"

কিন্তু কোথায় সুকুমারী?

তখন রমাপতি একে একে নৌকার তাবৎ লোকের মুখের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, তাহাদের মধ্যে সুকুমারী নাই। তখন কেহ তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিবার পূর্ব্বেই তিনি গঙ্গা-বক্ষে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে দুই জন নাবিকও জলে পড়িল এবং শীঘ্র তাঁহাকে উঠাইয়া আনিল। এবার নৌকার লোকেরা তাঁহাকে ধরিয়া রহিল। তিনি চীৎকার করিতে লাগিলেন,—"সুকুমারি! সুকুমারি!"

কিন্তু কোথায় সুকুমারী?

সুকুমারীকে হারাইয়া রমাপতির মরা হইল না। তাঁহার যে অবস্থা, তাহাতে বাঁচিয়া থাকা কেবল বিড়ম্বনা এবং মৃত্যু তাহার তুলনায় পরম সুখ। অনেক শত্রু মিলিয়া তাঁহাকে সে সুখ ভোগ করিতে দিল না। যেখানে মৃত্যু নামে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, মৃত্যু সে স্থলে অগ্রেই উপস্থিত। যেখানে মৃত্যু দেখা দিলে আত্মীয়বর্গ শোকে আকুল হইবে, রোদনে ও আর্ত্তনাদে বসুধা প্লাবিত হইবে, জীবিত স্বজনগণ যাতনায় অবসন্ন হইবে, সেখানে মৃত্যু তস্করের ন্যায় অলক্ষিতভাবে সমাগত হইয়া সর্ব্বনাশ-সাধনে তৎপর। আর যেখানে মানব মৃত্যুকে শান্তিনিকেতন বলিয়া জ্ঞান করে, মৃত্যুর নিমিত্ত লালায়িত হয়, সেখানে শত সাধনাতেও মৃত্যুর দেখা নাই। মৃত্যুর নিমিত্ত লালায়িত রমাপতি মরিতে পারিলেন না। সুকুমারীকে হারাইয়াও তাঁহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইল। অনেক শত্রু আত্মীয়তা করিয়া যাতনাক্লিষ্ট রমাপতিকে মরিতে দিল না।

যে নৌকা আসিয়া রমাপতিকে আসন্ন মৃত্যু-হস্ত হইতে উদ্ধার করিল, তাহাতে রাধানাথ চট্টোপাধ্যায় নামে এক ধনসম্পন্ন অতি অমায়িক-স্বভাব ব্যক্তি আপনার দলবল সহ আরোহী ছিলেন। সেই রাধানাথ বাবু ও তাঁহার অনুগত জনেরা রমাপতিকে দুঃসহ যাতনার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে দিলেন না। তাঁহারা অতি যত্নে রমাপতিকে সঙ্গে লইয়া হালিসহরে আসিলেন। সেখানে রাধানাথের অতি প্রকাণ্ড বাসভবনে রমাপতি অধিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ ও বিনোদিত করিবার নিমিত্ত রাধানাথ নানা সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাঁহার স্বভাবের কোমলতা, অবস্থার নিতান্ত হীনতা, বিপদের যৎপরোনাস্তি প্রগাঢ়তা, সংসারে স্বজন-বিহীনতা প্রভৃতি তাঁহার প্রতি রাধানাথের অমিত স্নেহ আকর্ষণ করিল। রাধানাথ তাঁহাকে পুত্রবাৎসল্যে পালন করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার অপরিসীম শোক কথঞ্চিৎ মন্দীভূত ও প্রশমিত হইলে, তাঁহাকে পুনরায় বিবাহিত করিয়া সংসারী করিয়া দিবেন সঙ্কল্প করিলেন। নিয়ত তাঁহার সঙ্গে সমবয়স্ক সদালাপী লোক এবং শরীররক্ষার্থ দ্বারবান্ ফিরিতে লাগিল; রাধানাথ ও তাঁহার ব্রাহ্মণী, রমাপতি না খাইলে আপনারা অন্নজল ত্যাগ করিবেন ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে যথাসময়ে আহার করাইতে লাগিলেন। অধ্যয়নে তাঁহার অনুরাগ ছিল জানিয়া রাশি রাশি নূতন পুস্তক তাঁহার জন্য সমানীত হইতে লাগিল; সঙ্গীতে মানব-মন মুগ্ধ হয় বিশ্বাসে, তাহারও বিশেষ ব্যবস্থা করা হইল; সংক্ষেপতঃ এক দিনে একবারে মরিতে না দিয়া, তাঁহার নিত্যমৃত্যুর বিশেষ আয়োজন করা হইল। সুকুমারী-হারা হইয়াও রমাপতি বাঁচিয়া রহিলেন।

কিন্তু তোমরা যাহাই বল, সকল কাণ্ডেই বিধাতার অতি আশ্চর্য্য বিধি আছে। শোক যতই কেন কঠোর হউক না, তাহার নিবারণ-সম্বন্ধে সময় অমোঘ মহৌষধ। তীব্র শোক—অপরিসীম প্রেমাস্পদের বিয়োগজনিত-দুঃসহ-জ্বালা হৃদয়ে যে অনপনেয়-অঙ্কপাত করে, তাহার বিলোপ করিতে কালের সাধ্য নাই। কিন্তু শোকের পরুষতা দিনে না

হউক মাসে, মাসে না হউক বৎসরে, অবশ্যই মন্দীভূত হইয়া আইসে। উপদেশ বা শিক্ষা সর্ব্বত্র শোকের প্রখরতা নষ্ট করিতে সক্ষম নহে। তাহা হইলে,—

"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥*"

স্বয়ং ভগবানের এই মহদুপদেশ বিদ্যমান থাকিতে, লোকে শোকে বিহ্বল হয় কেন?

দেখিতে দেখিতে বৎসর অতীত হইল। রমাপতি সুকুমারী-হারা হইয়াও এই সুদীর্ঘ কাল অবিচ্ছেদে মৃত্যু-যাতনা সহিতে সহিতে জীবন বহিয়া আসিতেছেন।

তাঁহার ব্যবহার, তাঁহার সততা, তাঁহার বিদ্যা, তাঁহার শোক, তাঁহার রূপ, সকলই তাঁহাকে তাঁহার আশ্রয়দাতার পরিবারমধ্যে আত্মীয় হইতেও আত্মীয় করিয়া তুলিল। ক্রমে ক্রমে রমাপতি যেন সেই পরিবারের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। তাঁহার স্নেহবন্ধনে সামান্য ভৃত্য হইতে গৃহস্বামী পর্য্যন্ত এবং সামান্য দাসী হইতে গৃহিণী ঠাকুরাণী পর্য্যন্ত সকলেই বদ্ধ হইয়া পড়িলেন। সেই বিশাল-পুরীর সর্ব্ব-ভাগই তাঁহার নিমিত্ত উন্মুক্ত; সেই বিপুল-বিভব তাঁহার সুখসংবিধানে নিয়োজিত; সেই অগণ্য-দাসদাসী তাঁহার প্রীতি-সমুৎপাদনে সচেষ্ট এবং সেই গৃহস্বামী তাঁহার সন্তোষসংসাধনে ব্যতিব্যস্ত। দীনহীন রমাপতির এ কি অত্যদ্ভুত দশা-বিপর্য্যয়! বিশ্ববিধাতা মঙ্গলময় নারায়ণের বাসনায় কি না হইয়া থাকে; পরমপুরুষের কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হয়। হে অনাথনাথ, ইচ্ছাময় হরি! তোমার এ কি কৌশলময় ব্যবস্থা! তুমি এক দিকে মারিতেছ, আর এক দিকে রাখিতেছ এবং এক দিকে ভাঙ্গিতেছ, আর এক দিকে গড়িতেছ। হে নারায়ণ! তুমি রাখিলে তাহাকে মারে কে? হে সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তম! এ সংসারে তুমিই সার এবং সত্য। কবে সে দিন হইবে, যখন আমরা অমেয় শোকে বা বিপদে, অসীম সুখে বা আনন্দে তোমার নাম স্মরণ করিতে ভুলিব না? বিশ্বেশ্বরের বাসনায় সুকুমারীকে হারাইয়াও রমাপতিকে বাঁচিয়া থাকিতে হইল।

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সাংখ্যযোগ, ২৭ শ্লোক

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"পোড়ারমুখো পাখী! পড়িতে পারেন না কিছু না, কেবল ক্যাঁ—ক্যাঁ—ক্যাঁ। ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিস্ তো ভাল, নহিলে তোকে আজি আর ছোলা দিব না।"

একটি ইন্দীবরাননা, দ্বাদশবর্ষীয়া, পরমাসুন্দরী বালিকা আপনার সুবৃহৎ সমুজ্জ্বল কাকাতুয়া পক্ষীর দাঁড় হাতে লইয়া পাখীকে এরূপে তিরস্কার করিতেছিলেন। পাখী এ তিরস্কারের মর্ম্ম বুঝিল কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না; কিন্তু সে আবার চীৎকার করিয়া উঠিল,—"ক্যাঁ—ক্যাঁ—ক্যাঁ।"

"মা গো, কান ঝালাপালা করিয়া দিল। থাক তুই। আমি চলিলাম।"

এই বলিয়া সে সুন্দরী কাকাতুয়ার দাঁড় তাহার শিকে ঝুলাইয়া দিয়া সে দিক্ হইতে যেমন ফিরিলেন, অমনি এক দেব-কান্তি যুবক-মূর্ত্তি তাঁহার নয়নে পড়িল। যুবককে দর্শনমাত্র বালিকা আনন্দে উৎফুল্লা হইয়া তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিলেন। সুন্দরী বালিকাকে যুবক জিজ্ঞাসিলেন,—"সুরবালা! আজি আর তবে আমার সঙ্গে ঝগড়া হবে না বোধ হয়। আজিকার ঝগড়া কেবল পাখীর সঙ্গে—কেমন?"

সুরবালা উত্তর দিলেন,—"তা বই কি! রমাপতি বাবু! আজি আপনার সঙ্গে ভারী ঝগড়া করিব ঠিক করিয়া আছি।"

এই বলিয়া বালিকা অতি আদরের সহিত রমাপতি বাবুর হাত ধরিয়া, তত্রত্য একখানি সুন্দর কৌচে বসাইলেন এবং আপনিও তাহারই একদিকে বসিলেন।

এই স্থানে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, এই সুন্দরী বালিকা রাধানাথ বাবুর একমাত্র সন্তান, তাঁহার বিপুল বিভব এবং নানা সুখৈশ্বর্য্যের একমাত্র অধিকারিণী। সুরবালা অবিবাহিতা। রাধানাথ ও তাঁহার ব্রাহ্মণী যেরূপ পাত্র পাইলে কন্যার বিবাহ দিবেন স্থির করিয়া আছেন, তাহা সহজে মিলে না। পাত্র অতি রূপবান্, সুশীল, শান্ত ও বিদ্বান্ হওয়া চাই; নিঃস্ব, নিরাশ্রয় ও নিরবলম্বন হওয়া চাই; তাহার আর কেহ আপনার লোক না থাকে এবং সুরবালাকে কখন পিতৃগৃহ হইতে আর কোথাও লইয়া যাইতে না চাহে, এমন পাত্র চাই। এইরূপ অষ্টবজ্র-সম্মিলন সহজ নহে। সুতরাং বিবাহযোগ্য বয়স উত্তীর্ণ হইতেছে, তথাপি সুরবালার বিবাহ হইতেছে না।

আসনে উপবেশন করিয়া রমাপতি বাবু বলিলেন,—"আজি আমার এমন কি দোষ হইয়াছে যে, ভারী ঝগড়া না করিলে চলিবে না ?"

সুরবালা বলিলেন,—"দোষ আজি একটা না কি ? সারাদিন পরে বিকালে একবার দেখা দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এমন কি দোষ হইয়াছে ? আজি এত দোষ হইয়াছে যে, উপরি উপরি তিন দিন ঝগড়া না করিলে চলিবে না।"

রমাপতি বলিলেন,—"আরম্ভ কর। তবে—দেরী কেন ? যখন ঝগড়া না করিলে চলিবে না ঠিক করিয়াছ, তখন আর দেরী করিয়া কাজ কি ? আমি প্রস্তুত।"

বালিকা বলিলেন,—"এমন করিয়া ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না—হুঁ।"

রমাপতি বলিলেন,—"তা কি চলে ? তুমি আরম্ভ কর, আমি বাঁধন দিতেছি।"

বালিকা ঝগড়া করিতে পারিল না। এমন করিয়া কখন কি ঝগড়া করা যায় গা ? ঝগড়াশাস্ত্রে সুরবালা সুপণ্ডিতা হইলে, যাহার সহিত ঝগড়া করিতে হইবে, তাহার সহিত এমন করিয়া পরামর্শ করিতে আসিতেন না। তখন সুরবালা অতি চেষ্টায় মুখের সমস্ত হাসি লুকাইয়া যতদূর সাধ্য গম্ভীর হইয়া এবং কণ্ঠস্বর বিশেষ ভারী করিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা—আচ্ছা—আজি হইতে আপনার সঙ্গে আমার আড়ি।"

বালিকা আড়ির প্রগাঢ়তা বুঝাইবার জন্য দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ আপনার চিবুকে স্পর্শ করাইয়া মুখ ফিরাইলেন ; সুতরাং শাস্ত্রানুসারে আড়ি সাব্যস্ত হইয়া গেল।

পাকাপাকি রকম আড়ি হইল দেখিয়া, রমাপতি বলিলেন,—"আমি বাঁচিলাম। অনেক দিন না কাঁদিয়া আমার প্রাণ বড় অস্থির হইয়াছে। এখন তুমি যদি দুই তিন দিন কিছু না বল, তাহা হইলে আমি একটু কাঁদিয়া বাঁচি।"

সুরবালা ফিরিয়া বসিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার বদন হইতে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য তিরোহিত হইল। তখন প্রকৃত গাম্ভীর্য্যের রেখাসমূহ বালিকার বদনমণ্ডলে প্রকটিত হইল। ক্রমে তাঁহার চক্ষু ঈষৎ জলভারাকুল হইল। তখন তিনি বলিলেন,—"রমাপতি বাবু ! চিরকালই কি কাঁদিতে হইবে ? এ কাঁদার কি শেষ নাই ? আপনার যতই কষ্ট হউক, আপনাকে আমি আর কখনও কাঁদিতে দিব না। আপনি যদি আর কাঁদেন দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমি এবার জলে ডুবিয়া মরিব।"

রমাপতি সস্নেহে বলিলেন,—"ছি সুরো ! ও কথা কি বলিতে আছে ? তোমার কথায় আমি তো কান্না ছাড়িয়া দিয়াছি। আর আমি কখনই কাঁদিব না সুরো।"

সুরবালা বলিলেন,—"কাঁদিবে না কেন, কিন্তু আমি দেখিতে পাই, সারাদিনই আপনি বড়ই কাতর থাকেন। আপনি খান কেবল আমাদের দায়ে ; শয়ন করেন কেবল আমাদের জ্বালায় ; কথাবার্ত্তা কন, কেবল আমাদের দৌরাত্ম্যে ; আমাকে পড়া বলিয়া দেন ছাড়ি না বলিয়া। আমি সারাদিন দেখি, আর ভাবি, দুঃখে আপনার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে। আপনার সেই অবস্থা দেখিয়া আমি কত দিন লুকাইয়া লুকাইয়া কাঁদি।"

কথা-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বালিকার উজ্জ্বল আয়ত লোচনদ্বয় হইতে স্থূল অশ্রুবিন্দুসমূহ ঝরিতে লাগিল। সুরবালা অঞ্চলের কাপড় দিয়া বদন আবৃত করিলেন। ধন্য সে মানব, যে শোকে এরূপ সহানুভূতি পায় !

তখন অতি কোমলতার সহিত রমাপতি সুরবালার মুখের কাপড় খুলিয়া, তাঁহার মুখ মুছিয়া দিলেন এবং অতি প্রীতিময় স্বরে বলিলেন,—"না সুরো, না—আমি আগে যেমন ছিলাম, এখন তো আর তেমন নাই। তোমার স্নেহ, তোমার দয়া এখন আমাকে সকল দুঃখ ভুলাইয়া দিতেছে। আমার এখন কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা কি তুমি দেখিতে পাও না ? তোমার হাসি-কান্না এখন আমাকে হাসাইতে কাঁদাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তোমার ভালবাসা ক্রমে আমাকে সকলই ভুলাইয়া দিতেছে।"

সুরবালার মুখে হাসি আসিল। তিনি অন্য কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই সেই সুবিস্তৃত প্রকোষ্ঠমধ্যে আর দুই ব্যক্তি প্রবেশ করিলেন। সেই দুই জনের মধ্যে যিনি পুরুষ, তিনিই রাধানাথ। উজ্জ্বল ও উন্নত ললাট, পরিপুষ্ট দেহ, আয়ত লোচন, গৌরবর্ণ তাঁহার সুপরিণত কলেবরে শ্রী প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার বয়স চাল্লিশ ; কিন্তু মাথায় রজতসূত্রবৎ পক্ক-কেশের ঘটাটা খুব বেশী। সঙ্গে তাঁহার অন্ধের যষ্টি, অন্ধকারের আলো, ভবনদীর ভেলা, বুড়োবয়সের সম্বল ভুবনেশ্বরী—রাধানাথের ব্রাহ্মণী। এই প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া-দম্পতির সমাগমে ঘরের শ্রী ফিরিয়া গেল। যাঁহারা নবীন-নবীনার শোভায় বিমোহিত, তাঁহারা হয় ত এ মন্দভাগ্য গ্রন্থকারকে নিতান্ত বৃদ্ধ বলিয়াই মনে করিবেন এবং যৎপরোনাস্তি

অরসিক বলিয়া গালি দিবেন। কিন্তু যাহা হউক, আমি আবার বলিতেছি, সেই প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ার পূর্ণাঙ্গসমূহের যে সুপরিণত শোভা, তাহার তুলনার স্থল অতি বিরল। রাধানাথ আসিয়াই জিজ্ঞাসিলেন—"এ কি সুরো, তুমি কাঁদিতেছিলে না কি?"

সুরবালা দৌড়িয়া পিতার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—"দেখ দেখি বাবা, রমাপতি বাবু আজিও কাঁদিতে চাহিতেছেন। মা! তুমি ত আর কিছুই বল না। কেবল তোমার কথাই উনি শুনেন।"

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—"তুই যেমন পাগ্‌লী, তোকে তেমনি ক্ষেপায়। রমাপতি কাঁদিবে কি দুঃখে? কেন বাবা! তুমি আবার কাঁদার কথা বল?"

রমাপতি বলিলেন,—"না মা! আপনি সুরোর কথা শুনিবেন না।"

ভুবনেশ্বরী আবার বলিলেন—"আজি সারাদিনটি তোমাকে একবারও দেখিতে পাই নাই। কালি বৈকালে বড় মাথা ধরিয়াছিল বলিয়াছিলে; আজ কেমন আছ? তুমি এ দিকে আসিয়াছ শুনিয়া তোমাকে দেখিতে আসিলাম।"

রাধানাথ বলিলেন,—"আর আমি আসিলাম, সুরোকে এক খবর দিতে। সুরো যদি সন্দেশ খাওয়ায়, তবে বলি।"

সুরো ব্যস্ত হইয়া বলিল,—"কি বাবা, কি বাবা?"

রাধানাথ বলিলেন,—"রমাপতি! সম্প্রতি তোমার, আমার, সুরোর এবং গৃহিণীর যে ছবি প্রস্তুত করিতে দিয়াছিলাম, তাহা আজি আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তোমরা দেখিবে চল।"

সুরবালা তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসিলেন,—"কোথায় আছে বাবা?"

পিতা উত্তর দিলেন,—"তোমার জন্যই আসিয়াছে, তোমারই ঘরে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।"

সুরবালা মহাহ্লাদে রমাপতির হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন।

ভুবনেশ্বরী দেবী একটু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"রমাপতি যদি আমাদের ছেলে হইত?" রাধানাথ বলিলেন,—"কেন, রমাপতি কি এখনও আমাদের ছেলে হইতে পারে না?"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আরও এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কার্ত্তিক মাস, বেলা সার্দ্ধদ্বিপ্রহর। হালিসহরের রাধানাথ বাবুর রাজ-প্রাসাদসদৃশ সুবিস্তৃত-ভবনের একতম প্রকোষ্ঠে রমাপতি একাকী উপবিষ্ট। প্রকোষ্ঠ সুসজ্জিত। তলে সুন্দর গা'লচা বিস্তৃত, তদুপরি সাটিনাবৃত নানাবিধ কোচ ও চেয়ার এবং মর্ম্মরপ্রস্তর ও কাষ্ঠনির্ম্মিত টেবিল,আলমায়রা ইত্যাদি। আলমায়রা সকল স্বর্ণবর্ণাবরণাবৃত গ্রন্থভারে প্রপীড়িত, যেন রত্নব্যবসায়ীর বিপণি! ভিত্তিগাত্রে মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্যসমূহের সুরঞ্জিত চিত্রাবলী। ভবনের যে ভাগে এই বহ্বায়ত প্রকোষ্ঠ সংস্থিত, ইচ্ছা করিলে বা আবশ্যক হইলে পুরমহিলারাও অপর লোকের অলক্ষিতভাবে তাহাতে যাতায়াত করিতে পারেন। এই প্রকোষ্ঠ রমাপতি বাবুর পঠনালয়।

প্রকোষ্ঠমধ্যস্থ একতম কোচে রমাপতি বাবু অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় উপবিষ্ট। তাঁহার হস্তে একখানি স্বর্ণসীমাবদ্ধ ফটোগ্রাফ। সেই চিত্র এক নারীমূর্ত্তির প্রতিকৃতি। রমাপতি এক একবার সেই আলেখ্য দর্শন করিতেছেন, আবার তাহা নয়ন হইতে অন্তরিত করিতেছেন। কাহার এ চিত্র? কোন্ নারীর প্রতিকৃতি আজি রমাপতির নয়ন-মন আকর্ষণ করিয়া বিরাজ করিতেছে? অবশ্যই সুকুমারীর জন্য রমাপতি আত্মজীবন অতি-আকিঞ্চিৎকর বলিয়া জ্ঞান করেন, যে সুকুমারীর কল্যাণার্থ রমাপতি ঘোর বিপদ্‌কেও বিপদ্ বলিয়া মনে করেন না, যে সুকুমারীর অভাবে রমাপতি মৃতকল্প হইয়া দুঃসহ যম-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, এবং যে সুকুমারীকে রমাপতি দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতেন, রমাপতির হস্তে অধুনা যে নারীমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে, তাহা সেই সুকুমারীর প্রতিকৃতি ভিন্ন আর কি হইতে পারে? কিন্তু হায়! কি বলিয়া বলিব? কেমন করিয়া মানব-মনের এতাদৃশ অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তনের কথা বুঝাইব? মানবহৃদয়ের এরূপ অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তনের কথা কেই বা সহজে বিশ্বাস করিবে? রমাপতির হস্তে সুকুমারীর ফটোগ্রাফ নহে! সুকুমারী সর্ব্বসমক্ষে বিপুল নীররাশির মধ্যে সমাহিত হইয়াছেন। তিনি যে সময়ে রমাপতির হৃদয়ের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী ছিলেন, রমাপতির তদানীন্তন অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এরূপ ব্যয়সাধ্য বিলাস তাঁহার সাধ্যায়ত্ত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তবে এ চিত্র

কাহার? তাহাও কি ছাই আবার না বলিলে চলিবে না? এ চিত্র—এ চিত্র সুন্দরী-শিরোমণি রাধানাথ-তনয়া—সুরবালার প্রতিকৃতি।

সুকুমারি! আজি তুমি কোথায়? আইস, যদি সম্ভব হয়, তোমার সেই সলিল-সমাধি হইতে সমুত্থিত হইয়া আজি একবার আইস। দেখ, তোমার যিনি গুরুর গুরু, তোমার যিনি দেবতা, তিনি আজি তোমার কে? আর দেখ, যিনি তোমার মর্ম্মভেদী অনুরোধেও তোমা-ছাড়া হইয়া জীবনের অন্যগতি পরিগ্রহ করিতে সম্মত হন নাই, সেই তিনি আজি বিরলে বসিয়া আর এক সুন্দরীর প্রতিকৃতি পর্য্যালোচনা করিতেছেন। ধন্য কাল! ধন্য তোমার সর্ব্বস্মৃতিবিলোপকারী মহৌষধ!

রমাপতি চিত্র দেখিতেছেন ও আবার তাহা নয়ন-সম্মুখ হইতে অপসারিত করিতেছেন। কিন্তু তিনি নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ও কাতর। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। চিত্র সেই কৌচেই পড়িয়া রহিল। নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে সেই গৃহমধ্যে দুই তিনবার পরিভ্রমণ করিয়া তিনি আবার সেই কৌচের সমীপস্থ হইলেন এবং সেই চিত্র আবার হস্তে তুলিয়া লইলেন। তাঁহার মনে না জানি তখন কি প্রবল ঝটিকা বহিতেছিল। মনের ভাব মনে মনে পোষণ করা যেন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইল। তিনি তখন অতি অস্ফুট-স্বরে বলিতে লাগিলেন,—"সুরবালা! এ দুরাশা আমার হৃদয়ে কেন স্থান পাইল? আমি অভাগা, আমি দীনহীন! আমার হৃদয় কখনই তোমার উপযুক্ত আসন নহে। তাহা জানিয়াও কেন আমি এ দুরাশায় ঝাঁপ দিয়াছি? কেন আমি অন্তরে ও বাহিরে কেবল তোমাকেই দেখিতেছি?"

সেই চিত্র হস্তে করিয়াই রমাপতি একবার সেই প্রকোষ্ঠমধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া আসিলেন। আবার সেই কৌচের সমীপস্থ হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"কিন্তু না। তোমাকে পাওয়া যদি আমার পক্ষে কখন সম্ভব হয়, তাহা হইলেও আমি তোমাকে কখনই গ্রহণ করিব না। আমার হৃদয় বহ্নিচর্ব্বিত, আমার হৃদয় মরুভূমি। তুমি যে আদরের—যে সোহাগের সামগ্রী, তাহা আমি কোথায় পাইব? তোমাকে তাহা কেমন করিয়া দিব? তুমি দেবী। স্বর্গীয় সুখে তোমার অধিকার। এ অভাগা সে সুখের কণিকাও তোমাকে দিতে পারিবে না। তবে কেন সুরবালা, আমি তোমাকে দুঃখসাগরে ভাসাইব? না দেবি! তোমার, আমার হইয়া কাজ নাই।"

রমাপতি চিত্র-ত্যাগ করিয়া আর একবার গৃহমধ্যে পরিক্রমণ করিলেন এবং আবার সেই কৌচের সমীপস্থ হইয়া চিত্র-গ্রহণ করিলেন! তাহার পর আবার বলিতে লগিলেন,—"কিন্তু সুরবালা, আমি চিরদিনই এমন ছিলাম না। এক দিন জগতে আমার মত ভাগ্যবান্ ছিল কি না সন্দেহ। আমার এই হৃদয় তখন নন্দনকাননের ন্যায় আনন্দধাম ছিল। সুখ ও শান্তি তখন এ হৃদয়ে বাসা বাঁধিয়া থাকিত, সন্তোষ ও সৌভাগ্য তখন এ হৃদয় ছাড়িত না। তখন এ হৃদয় এক দেবীর রাজ-সিংহাসন ছিল, কিন্তু সে দেবী আজি কোথায়? সুকুমারি! সুকুমারি! তুমি আজ কোথায়? তোমার জন্য, তোমার অভাবে আজি আমার জীবন শুষ্ক; আজি আমি অভাগা। আইস, আমার দেবী আইস, করুণাময়ি! আমাকে দেখা দিয়ে বাঁচাও—আমাকে আবার ভাগ্যবান্ কর। দুই বৎসর—দুই সুদীর্ঘ বৎসর আমি তোমা-ছাড়া হইয়া রহিয়াছি। যদি নিতান্তই দেখা না দাও, যদি তুমি এমনই নিষ্ঠুর হইয়া থাক, যদি নিতান্তই আর না আইস, তবে আমাকে তোমার সঙ্গী করিয়া লও।"

রমাপতি সেই কৌচের উপর বসিয়া পড়িলেন, এবং বসনে বদনাবৃত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন ধীরে ধীরে সেই প্রকোষ্ঠের পার্শ্বস্থ একটি দ্বার খুলিয়া গেল। তখন সেই উন্মুক্ত দ্বার দিয়া নানা রত্নালঙ্কারবিভূষিতা, সমুজ্জ্বল স্বর্ণসূত্রবিনির্ম্মিত-বসনাবৃতা, পরম-শোভাময়ী সুরবালা সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার অলঙ্কার-শিঞ্জিত শ্রবণ করিয়া রমাপতি ব্যস্ততা সহ সেই প্রতিকৃতি প্রচ্ছন্ন করিলেন। সুরবালা তাহা জানিতে বা বুঝিতে পারিলেন না। রমাপতির সমীপস্থ হইয়া বলিলেন,—"এ কি? এ কি রমাপতি বাবু! তুমি কাঁদিতেছ না কি?"

তখন রমাপতি মুখের বসন অপসারিত করিয়া বলিলেন,—"যাও দেবি! যাও সুরবালা! আমার নিকট তুমি আর আসিও না। আমি অধম, আমি অভাগা, আমি দীনহীন। আমার হৃদয় শুষ্ক, নীরস মরুভূমি। তুমি দেবী, আমার নিকটে তোমার স্থান হইবে না।"

সুরবালা রমাপতির কথা ধীরভাবে শ্রবণ করিয়া অনেকক্ষণ অধোমুখে বসিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিয়া উঠিলেন—"তোমার নিকট যদি আমার স্থান না হয়, রমাপতি! তবে ইহ-জগতে আমার আর স্থান নাই। তুমিই আমার দেবতা, তুমিই আমার

সুখ, তুমিই আমার সন্তোষ; যদি তোমার হৃদয় শুষ্ক-মরুভূমি হয়, তাহা হইলে তাহাই আমার স্বর্গ। তোমাকে ছাড়িয়া আমি অন্য স্বর্গে যাইব না।"

এই বলিয়া বালিকা লজ্জায় অধোবদন হইল। তখন রমাপতি বলিলেন,—"কিন্তু দেবি! তোমাকে আমি কি দিব? তোমার এ অনুগ্রহের প্রতিশোধ আমি কি দিতে পারি? আমার কি আছে?"

সুরবালা তাঁহাকে আর কথা বলিতে না দিয়া স্বয়ং বলিয়া উঠিলেন,—"তুমি আমাকে আর কি দিবে, তাহা জানি না। তোমার কিছু আছে কি না, তাহা আমার জানিবার কোন আবশ্যক নাই। আমি এইমাত্র জানি, তুমি আমাকে যাহা দিয়াছ, মনুষ্য মনুষ্যকে তাহা দিতে পারে না। তোমার মত স্নেহ, তোমার মত ভালবাসা, তোমার মত গুণ কোন্ মানুষের আছে? তুমি মানুষের মধ্যে দেবতা। আমি ক্ষুদ্র বালিকা, তোমার মত দেবতার কেমন করিয়া পূজা করিতে হয়, তাহা আমি জানি না। কিন্তু তোমার দাসী হইয়া থাকিতে পাওয়া যে কত সুখ, তাহা আমি বেশ জানি। আমি তোমার দাসী; দাসীকে তুমি পায়ে ঠেলিবে কেমন করিয়া? কিন্তু তুমি কাঁদিতেছ কেন?"

"কাঁদিতেছি যে কেন, তাহা তোমাকে কেমন করিয়া বলিব? কিন্তু তাহা না বলিলেও আর থাকা যায় না। শুন সুরবালা, তুমি আমার আপন হইতেও আপন, তুমি আমার প্রাণের প্রাণ। এই দেখ সুরবালা, আমি এই নির্জ্জনে তোমারই ছবি বুকে ধরিয়া বসিয়া আছি।"

রমাপতি ফটোগ্রাফ বাহির করিয়া দেখাইলেন। সুরবালার বদন আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। রমাপতি বলিতে লাগিলেন,—"সুরবালা! তুমি আমার অন্তরে ও বাহিরে, তুমিই আমার ধ্যান ও জ্ঞান। কিন্তু সুরবালা! তোমাকে আমি সকল কথাই জানাইব, কোন কথাই লুকাইব না। আমি বড়ই অভাগা, কিন্তু আমি চিরদিন এমন অভাগা ছিলাম না। আমার এই হৃদয়ে এক রাণী ছিলেন। সে দেবী আজ নাই। আজ দুই বৎসর হইল, আমার সেই দেবী আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। আমি সেই অবধি অভাগা ও দীন-হীন হইয়াছি। সত্য কথা তোমায় বলিব। সেই দেবীর স্মৃতিতে আমার হৃদয় পূর্ণ। আমার হৃদয় সেই দেবীর অভাবে মরুভূমি হইয়াছে। সুরবালা! তুমি স্বর্গের দেবতা, আমি তোমাকে কোথায় রাখিব? আমার এ পোড়া হৃদয়ে আর তোমার আসন পাতিব না। তাই বলিতেছি, দেবি! আমার নিকট তোমার স্থান হইবে না।"

রমাপতি নীরব হইলেন। সুরবালা অনেকক্ষণ কোন উত্তর দিলেন না। তাহার পর সহসা রমাপতির চরণদ্বয় উভয়-বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া সেই চরণেই মুখ রাখিয়া বলিলেন,—"তোমার এই গুণে, তোমার এই দেবত্ব দেখিয়া আমি তোমার দাসী হইয়াছি। তোমার এই যে সরলতা, তোমার এই যে ভালবাসার স্থায়িত্ব, বল দেবতা, তুমিই কি আর কোথায় এমন দেখিয়াছ? তোমার এই গুণে জগৎ তোমার বশ, আমি তো কোন্ ছার কীট। তোমার চরণ আমি ছাড়িব না। দাসীকে তোমার চরণে স্থান দিতেই হইবে।"

রমাপতি অতি যত্নে সুরবালাকে উঠাইলেন, এবং বলিলেন,—"আমি যে আজিও বাঁচিয়া আছি সুরবালা, সে কেবল তোমারই কৃপায়। তোমার স্নেহ, তোমার মমতা, তোমার রূপ এবং তোমার গুণ আমাকে বড় দুরাশা-সাগরে ভাসাইয়াছে। এখন যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে তোমাকে না পাইলে আর বাঁচিতে পারিব না। এ জীবন রাখিয়াছ তুমি—ইহা তোমারই সম্পত্তি। তুমিই আমার সুখের কেন্দ্র। তোমার সন্তোষের জন্যই এখন আমার জীবনের মায়া। তোমাকে পাইলে আমার দগ্ধজীবন পুনর্জ্জীবিত হইবে; কিন্তু বল সুরবালা, আমাকে লইয়া তোমার কি হইবে?"

সুরবালা উত্তর দিলেন,—"আমার যে কি হইবে, তাহা তোমাকে কেমন করিয়া বুঝাইব? তোমাকে যদি আমি সুখী করিতে পারি, তোমাকে যদি আমি হাসাইতে পারি, তোমাকে যদি আমি আনন্দিত করিতে পারি, তাহা হইলে আমার আশার পূর্ণ তৃপ্তি হইবে, আমার সুখের সীমা থাকিবে না। তোমার সুখেই আমার সুখ, তদ্ভিন্ন অন্য সুখের কামনা এ দাসীর নাই।"

তখন সস্নেহে রমাপতি সুরবালাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—"ধন্য এ জীবন! সুরবালা! যে অভাগা ছিল, সে এখন তোমার কৃপায় পরম ভাগ্যবান্। এ অধম আজি হইতে তোমারই দাস।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বড়ই সমারোহে রমাপতি ও সুরবালার বিবাহ হইল। এমন সমারোহ, এই ধূমধাম ইহার পূর্ব্বে সে অঞ্চলের লোকেরা আর কখন দেখে নাই। নানাবিধ বাদ্য, নৃত্য, গীত, ভোজ, আলোক, দানাদি উৎসব-ব্যাপারে কয়দিন নগর মহোচ্ছ্বাসময় হইল। প্রায় লক্ষ-মুদ্রা এই বিবাহকাণ্ডে ব্যয়িত হইল, এবং সমস্ত নগর এক পক্ষকাল মহানন্দে মগ্ন রহিল।

অদ্য ফুলশয্যা। যে প্রকোষ্ঠে নব-দম্পতির পুষ্প-বাসর হইবে, তাহার শোভার সীমা নাই। তথায় নানাবিধ সুরম্য-স্ফটিকাধারে আলোকমালা জ্বলিতেছে। সর্ব্ববিধ-গন্ধময়-পুষ্পরাশিতে সে গৃহ সুন্দর-রূপে সমাচ্ছন্ন। ভিত্তিগাত্রে মনোহর ফুলমালা-সমূহ সুচারুরূপে সুসজ্জিত। দ্বার ও বাতায়ন-সমূহে পুষ্পের যবনিকা-সমূহ বিলম্বিত। প্রকোষ্ঠের স্থানে স্থানে অপূর্ব্ব-পাত্রে সুদৃশ্য-পুষ্পগুচ্ছসমূহ সংস্থাপিত। প্রকোষ্ঠমধ্যে এক অতি শোভাময় পর্য্যঙ্ক। তাহার উপর স্বর্ণ-সূত্র-সমন্বিত-শয্যা, তাহার আস্তরণ-প্রান্তে মুক্তামালার ঝালর। সেই পর্য্যঙ্কে সর্ব্বভূষণ-সমাচ্ছন্ন-কায়া সুরবালা, এবং রমাপতি সমাসীন।

বিধাতঃ! তোমার অচিন্ত্য-লীলার রহস্যোদ্ভেদ করিবার ক্ষমতা ক্ষুদ্র মানবের নাই। তোমারই কৃপায়, যে রমাপতি নিতান্ত দীনহীন ছিল, সে আজি এই বিপুল-বিভবের সর্ব্বেশ্বর। যে ব্যক্তি কিছু দিন পূর্ব্বে আপনাকে দীনহীন বলিয়া মনে করিত, সে আজি আপনাকে পরম ভাগ্যবান্ বলিয়া জ্ঞান করিতেছে। কিছু দিন পূর্ব্বে অতি সামান্য দাসত্ব যাহার জীবিকা ছিল, আজি শত জন তাহার আজ্ঞার অপেক্ষা করিতেছে। সে আজি অচিন্ত্যপূর্ব্ব সুখ-সৌভাগ্যে সংবেষ্টিত। বিজ্ঞান আমাদিগকে শিখাইতেছে, যে স্থানে একদা সুবিস্তৃত সাগর-সলিল লহরী-লীলা বিকাশ করিত, তথায় এক্ষণে সমুন্নত সুকঠিন শুষ্ককায় গিরিরাজ দণ্ডায়মান। যে স্থান এক-কালে মকর-কুম্ভীরাদি জীবের লীলাক্ষেত্র ছিল, তাহা এক্ষণে সিংহ-তরক্ষু-ব্যাঘ্রাদি-শ্বাপদ-সঙ্কুল হইয়াছে। হে বিধাতঃ! এরূপ অচিন্তনীয় বিপর্য্যয় যদি তুমি ঘটাইয়া থাক, তাহা হইলে তোমার হস্তে মানবের এতাদৃশ দশা-পরিবর্ত্তনে বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই। ভাগ্যবান্ রমাপতি আজি সর্ব্বসৌভাগ্যের সম্পূর্ণ অধীশ্বর। আজি হইতে রাধানাথের বিপুল বিভব তাঁহার বাসনার অধীন। সর্ব্বোপরি আজি হইতে সুন্দরী-কুলকমলিনী, সাক্ষাৎ প্রেমস্বরূপা, রমাপতির প্রেমের কেন্দ্র, আনন্দের আধার, সুরবালা তাঁহার আপনার।

কিন্তু এ সময়ে সুকুমারি! কোথায় তুমি? দেখ, তোমার সেই রমাপতির আজ কি বিস্ময়াবহ পরিবর্ত্তন। দেখ, তোমার সেই চিরাধিকৃত স্থানে আজি আর এক নবীনা বিরাজ করিতেছেন।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল, কিন্তু নবদম্পতি এখনও নিদ্রার অধীনতা স্বীকার করেন নাই। এরূপ দিনে কে কোথায় তাহা করিয়াছে? যদি কেহ তাহা করিয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তাহাদের বিবাহই অসিদ্ধ। দম্পতি নিদ্রাগত হন নাই বটে, কিন্তু অলসিত ও অবসিত হইয়াছেন। প্রেমের অনর্থক বাক্য, এক কথার শত পুনরুক্তি, আশার আশ্বাস, আনন্দের অসীমতা, হৃদয়ের পূর্ণতা প্রভৃতি প্রেমারম্ভকালের যেমন যেমন বিধান আছে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহার কোনই ত্রুটি হয় নাই। তবে এতক্ষণ কথাবার্ত্তা যেরূপ খরস্রোতে ও সমুৎসাহে চলিতেছিল, তাহা এখন মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। শেষ রাত্রিকালে পক্ষিকূজনের যেমন এক নূতনবিধ ধ্বনি হয়, এখন তাহাই হইতেছে। গৃহমধ্যস্থ আলোকসমূহ কেমন সাদা সাদা হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ সময়ে সুরবালার একটু নিদ্রাবেশ হইল। তখন রমাপতি ভাবিতে লাগিলেন,—"হায়! কি করিলাম? ইচ্ছা করিয়া এই সাধের শিকল কেন পায়ে পরিলাম? আজ আমি কাহার জিনিস কাহাকে দিলাম? ইহাতে কি আমি সুখী হইব?" ক্ষণেক চিন্তা করিয়া আবার মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"সুখী হইব যে, তাহার আর সন্দেহ কি? আজি আমার যে সুখ, জগতে এমন সুখ আর কাহার আছে? আমি তো আজ ধন্য হইলাম! সুরবালা যাহার স্ত্রী হইল, ইহজগতে সে তো স্বর্গসুখ ভোগ করিবে। এত রূপ, এত গুণ, এত ভালবাসা আর কোথায় কেহ দেখিয়াছে কি? সেই সুরবালা আজি হইতে আমার!" আবার কিছুকাল চিন্তা করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"কিন্তু আমার যে ছিল, সে আজি কোথায়? আমার সুকুমারী কোথায় গেল? আমি তো তাহাকে ভিন্ন জানিতাম না, তাহাকেই তো প্রাণ লুটাইয়া ভালবাসিয়াছিলাম। এ দেহ, এ প্রাণ তো তাহারই। তাহার সে ভালবাসার আদি নাই, অন্ত নাই।" তখন একে একে আমূল পূর্ব্বকথা মনে পড়িতে লাগিল। সুকুমারীর সহিত বিবাহ, বিবাহের পর ফুলবাসরে সুকুমারীর সহিত প্রথম পরিচয়, তাঁহার হৃদয়ের অপার্থিব

উদারতা, তাঁহার প্রেমের অমেয় গভীরতা, তাঁহার পরম রমণীয় সৌন্দর্য্য, সকল কথাই ক্রমে ক্রমে মনে পড়িল। আর মনে পড়িল, তাঁহার সেই দুরবস্থার কথা। ছিন্নকন্থা-বিস্তৃত তৈলাক্ত মলিন উপধানযুক্ত শয্যায় তাঁহারা শয়ন করিতেন; সুকুমারী রন্ধন করিতেন, ঘর ঝাঁইট দিতেন, বাসন মাজিতেন, কূয়া হইতে কলসী করিয়া জল তুলিতেন, পরিতে হইবে বলিয়া ছিন্ন বস্ত্র সেলাই করিতেন না; করিতেন কি? স্বর্ণ ও রৌপ্য-ভূষণ কখন সুকুমারীর অঙ্গে উঠে নাই, ছিন্নভিন্ন কার্পাসবস্ত্র কথঞ্চিৎরূপে তাঁহার দেহাবরণ করিত মাত্র, আর আজি? আজি যে নবীনা সুকুমারীর স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাঁহার দেহের সর্ব্বত্র মণিমুক্তা-খচিত অলঙ্কার; গৃহকর্ম্ম স্বহস্তে সম্পন্ন করা দূরে থাকুক, কিরূপ প্রণালীতে তাহা নিষ্পন্ন হয়, তাহাও তিনি জানেন না। সুকুমারীর শতবস্ত্রের মূল্য একত্রিত হইলে যত হয়, তদপেক্ষাও তাঁহার পরিধানবস্ত্র অধিক মূল্যবান্। দশ জন দাসী তাঁহার আজ্ঞাপালনে ব্যস্ত, অতুল ঐশ্বর্য্য তাঁহার সুখসংবিধানে নিযুক্ত। তখন রমাপতি ভাবিতে লাগিলেন,—"আমার সেই সুকুমারী —আমার সেই দুঃখিনী সুকুমারী আর নাই। এত কাঁদিয়া, এত দেহপাত করিয়াও আর তাহার দেখা পাইলাম না। সে আর ইহজগতে নাই। ইহজগতে নাই, কিন্তু আর কোথাও সে নাই কি? আত্মার তো ধ্বংস নাই। তাহার দেহ-লয়ের সহিত তাহার আত্মার লয় কখন হয় নাই। তবে সুকুমারী দেবি! তুমি দেখিতেছ কি, তোমার সেই বাসস্থান ঐ স্বর্গধাম হইতে দেখিতেছ কি, রমাপতি—তোমার সেই রমাপতি কেমন শঠ, কেমন প্রবঞ্চক, কেমন বিশ্বাসঘাতক?"

সহসা সেই প্রকোষ্ঠমধ্যস্থ-নিষ্প্রভ-আলোকে রমাপতি দেখিলেন, যেন গৃহের ভিত্তিতে একটি অস্পষ্ট মনুষ্য-মূর্ত্তির ছায়া পড়িল। সেই সুরক্ষিত পুরীর রুদ্ধদ্বার প্রকোষ্ঠে অপর মনুষ্যের ছায়া! রমাপতি মনে করিলেন, হয় ত কোন দাসী, যাহারা পরিহাস করিতে পারে, এমন কোন পরিচারিকা গৃহমধ্যে আসিয়া থাকিবে। তিনি উঠিয়া বসিলেন, এবং চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"কে ও? কে ওখানে?"

কেহ উত্তর দিল না; তাঁহার নেত্র-সম্মুখস্থ ছায়া সরিয়া গেল না, কেবল একটু নড়িলমাত্র। সুরবালার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। বলিয়া উঠিলেন, "কি কি? ভয় পাইয়াছ না কি?"

রমাপতি বলিলেন,—"ভয় নহে, ঐ দেখ কাহার ছায়া!"

সুরবালা বলিলেন,—"কই, কই?"

ছায়া একবার সরিতে লাগিল। যে ছায়া ভিত্তি-গাত্রে লাগিয়াছিল, তাহা ক্রমে হর্ম্ম্যতলসংলগ্ন হইল।

রমাপতি বলিলেন,—"এই যে! ঐ যায়!"

কথা-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রমাপতি শয্যাত্যাগ করিলেন এবং যে দিকে লোক থাকিলে সেরূপ ছায়া-পাত হইতে পারে, সেই দিকে চলিলেন। এই প্রকোষ্ঠের পার্শ্বে আর একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ ছিল। সেই প্রকোষ্ঠে একটি সুবৃহৎ সমুজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছিল। উভয় প্রকোষ্ঠের মধ্যবর্ত্তী দ্বার উন্মুক্ত ছিল, সেই দিকেই মনুষ্য থাকা সম্ভব মনে করিয়া রমাপতি সেই দিকেই আসিলেন। কিন্তু কিয়দ্দূর মাত্র অগ্রসর না হইতে হইতেই সংজ্ঞা তিরোহিত হইয়া গেল। তিনি "সুকুমারী, সুকুমারী" শব্দে চীৎকার করিয়া সেই হর্ম্ম্যতলে পতিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুরবালাও আসিয়াছিলেন। তিনি কিন্তু কিছুই দেখিতে বা বুঝিতে পারিলেন না। তখন অতি যত্নে তিনি রমাপতির শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন।

অচিরে রমাপতি সংজ্ঞালাভ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"সুকুমারি, সুকুমারি! এত দিন পরে আমার কথা তোমার মনে পড়িল? না না, তুমি সুরবালা। সুরবালা, সুরবালা, সুরবালা, আমার সুকুমারী কোথায় গেল?"

সুরবালা বলিলেন,—"তুমি কি বলিতেছ? সুকুমারী তো আমার দিদির নাম। তুমি তাঁহাকে দেখিয়াছ, এ কথা কি সম্ভব?"

রমাপতি বলিলেন, "তাহা আর বলিতে? তুমি আমার সম্মুখে রহিয়াছ, তাহা যেমন সত্য, আমার সুকুমারীকে দেখাও তেমনই সত্য। কিন্তু কোথায় সুকুমারী? সুরবালা! সন্ধান কর, বিলম্বে বিঘ্ন ঘটিবে, দেখ কোথায় সুকুমারী?"

সেই রাত্রিশেষে সেই সুবিস্তৃত ভবনের সর্ব্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা হইল। যাহা হইবার নহে, তাহা হইল না, সুকুমারীর কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না। কেবল দেখা গেল, সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের একটি দ্বার উন্মুক্ত আছে। সে পথ দিয়া কেহ আসিয়াছিল বলিয়া কেহই মনে করিল না, সকলেই রমাপতির মনের বিকার বলিয়া স্থিরীকৃত হইল।

তখন সুরবালা রমাপতিকে বলিলেন,—"তুমি সারাদিন সারারাত দিদির কথাই ভাব। রাত্রে

শুইয়া শুইয়াও হয় তো তাই ভাবিতেছিলে, তাহাতেই হয় তো এ ভ্রম হইয়া থাকিবে।"

রমাপতি এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু প্রাতে সকলে দেখিল, রমাপতি বাবুর মূর্ত্তির ভয়ানক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাধানাথ বাবুর সুবিস্তৃত সৌধমালার অনতিদূরে একটি পুষ্করিণী ছিল। সেই সরোবরে কোন সময়ে দুইটি বালক-বালিকা ডুবিয়া মরিয়াছিল। সেই শোকাবহ ঘটনার পর হইতে লোকে ইহার মরার পুকুর নাম দিয়াছে। নাম যাহাই হউক, এই দুর্ঘটনার পর হইতে সন্নিহিত জনসাধারণের মনে একটা বড় ভীতি সঞ্চারিত হইয়াছিল, এবং পরম্পরাগত স্ত্রীরসনাসৃষ্ট বিবিধ ভয়াবহ কাহিনী সেই ভীতি আরও সংবর্দ্ধিত করিয়াছিল। এ জন্য সে পুষ্করিণীতে মনুষ্য যাতায়াত করিত না। কাজেই একদা যাহা পরম শোভাময় ও নয়নরঞ্জন ছিল, তাহা এক্ষণে পরিত্যক্ত; সুতরাং শ্রীভ্রষ্ট ও বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছে। পুষ্করিণীর সোপানাবলী এক্ষণে ভগ্ন, তাহার চারিদিক্ নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ তরুগুল্মে পরিপূর্ণ। সেই সকল বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত হইয়া পুষ্করিণীর ভূরিভাগ আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। তীরের কোন কোন লতা মুখ বাড়াইতে বাড়াইতে ক্রমে ক্রমে জলের উপর অনেক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বকালে যাহাই থাকুক, বর্ত্তমান কালে যে এই পুষ্করিণীর অবস্থা বিশেষ ভীতিজনক, তৎপক্ষে কোনই সন্দেহ নাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই পুষ্করিণীতে লোকজন আসিত না। কিন্তু আজি এই সন্ধ্যার প্রাক্কালে এই জনহীন ও ভয়সমাকুল সরোবরের মধ্যভাগে অবগাহন করিয়া এক শ্যামাঙ্গী যুবতী গাত্র ধৌত করিতেছে। যুবতীর বয়স ২৪।২৫ হইতে পারে। তাহার বদনে উৎসাহ ও দৃঢ়তার রেখাসমূহ সুস্পষ্টরূপে প্রকটিত। তাহার দেহ মাংসল, কিন্তু কোমলতা-বর্জ্জিত। তাহার নেত্রদ্বয় উজ্জ্বল ও পাপবাসনাব্যঞ্জক। যুবতী নানা ভঙ্গীতে অঙ্গমার্জ্জনী লইয়া দেহের সর্ব্বস্থান সযত্নে সজ্জর্ষণ করিতেছে। অবিশ্রান্তঘর্ষণেও সে দেহের কৃষ্ণত্ব বিদূরিত হইবার নহে, এ কথা হয় তো যুবতী বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে না। আশ্চর্য্য! ভীতিহীনতার সহিত যুবতী বহুক্ষণ বিবিধ বিধানে আপনার শ্যামকায় ও পরিধান-বস্ত্র তত্রত্য সলিলে বিধৌত করিল। তাহার পর তীর-সন্নিধানে আসিয়া তথায় যে পিত্তল-কলসী পড়িয়াছিল, তাহা উত্তমরূপে মার্জ্জিত করিল। পরে আবার জলে অবতরণ করিয়া তাহা জলপূর্ণ করিল। তাহার পর বাম কক্ষে কলসগ্রহণ করিয়া আপনার পরিধানের নিম্নভাগ সুবিন্যস্ত করিয়া দিয়া যুবতী ধীরে ধীরে সেই ভগ্ন সোপানে অতি সাবধানতার সহিত আরোহণ করিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার পর কিয়ৎকাল যেরূপ গাঢ় মলিন অন্ধকার দেখা দেয়, এখন তাহা দেখা দিয়াছে। সর্ব্বশঙ্কাবিরহিতা যুবতী অন্ধকার, জনহীনতা, বন, ভয়জনক কিংবদন্তী, সকলই উপেক্ষা করিয়া কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে এক মনুষ্যমূর্ত্তির সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং বলিল,—"কে ও, রামলাল? কতক্ষণ?"

পুরুষ বলিল,—"আধ ঘণ্টারও উপর। বাপ রে, এমন গা ধোয়ার ঘটা কখনো দেখি নাই; তোমার যে রূপের নেশায় এ গোলাম পাগল, তা আর অমন করিয়া ঘষিয়া মাজিয়া বাড়াইও না ভাই; তোমার পায়ে পড়ি।"

যুবতী বলিল,—"পাগল এখনও হও নাই বলিয়া আমার এমন ঘষা-মাজা করিতে হইতেছে। ছিঃ, তোমার কেবল কথা।"

রামলাল বলিল,—"কালি! এততেও তোমার মন পাইলাম না! হয় তো তোমার পায়ে প্রাণ না দিলে তুমি বুঝিবে না, আমি তোমার জন্য কেমন পাগল। ভাল, এবার তাহাই করিয়া দেখাইব।"

যুবতীর নাম, "কালীমতি" কি "কালীতারা", কি "কালীদাসী", কি অমনই একটা কিছু হইবে। আমরা তাহার নিগূঢ় সংবাদ জানি না।

কালী বলিল,—"কেমন করিয়া তোমার কথা শুনিব? যে কাজটা চোখ-কান বুজিয়া একবার সারিয়া ফেলিতে পারিলে আমাদের সুখের পথে আর কাঁটা থাকে না, আমাদের আর এমন করিয়া অন্ধকার বনে প্রাণ হাতে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না, তাহার জন্য তোমাকে এত দিন বলিতেছি, কিন্তু তুমি আজিও তাহার উপায় করিয়া উঠিতে পারিলে না। কেমন করিয়া বলিব, তুমি আমার জন্য পাগল? পাগল অনেক দূরের কথা, তুমি যদি আমাকে একটুও ভালবাসিতে, তাহা হইলে কোন্ দিন সে কাজ শেষ করিয়া ফেলিতে।"

"তুমি বুঝিতেছ না, কালি, কাজটা বড় শক্ত। একটা মানুষ নিকাশ করা আজিকার দিনে সোজা

কথা নয়। ঐ শত্রুটিকে সরাইয়া না দিলে যে আমাদের মঙ্গল নাই, তা আমি বেশ জানি, কিন্তু করি কি বল ?"

কালী নিতান্ত রাগান্বিত-স্বরে বলিল,—"করিবে তোমার মাথা আর আমার মুণ্ড। আমি বুঝিয়াছি, তুমি কোন কর্ম্মের নও। আমি যদি তোমার মত পুরুষমানুষ হইতাম, তাহা হইলে কোন্ কালে সকল কাজ শেষ করিয়া দিতাম। কি বলিব, আমি মেয়েমানুষ, তাতেই তোমাকে এত সাধাসাধি। বুঝিয়াছি, তোমাকে দিয়া কোন কাজ হইবে না; এখন তোমাকে আমি দেখাইব, তোমার মত পুরুষের চেয়ে মেয়েমানুষও ঢের ভাল। এ জ্বালা আমার আর সহে না। আমি আজই এদিক ওদিক যা হয় করিয়া ফেলিব স্থির করিয়াছি। সকল কাজই আমি করিব, কেবল সময়কালে তুমি একটু সাহায্য করিবে কি না, তাই আমি জানিতে চাই। তাও বোধ করি, তোমাকে দিয়া হইয়া উঠিবে না—কেমন ?"

রামলাল একটু থতমত খাইয়া বলিল,—"তা—তা—আর পারিব না ? আমাকে যা করিতে বলিবে, আমি তাই করিব। বালাইটাকে যেমন করিয়া হউক, দূর করিতে পারিলেই বাঁচা যায়। কিন্তু আমি বলিতেছিলাম কি—বলি, এত তাড়াতাড়ি না করিয়া একটু দেরী করিলে চলে না কি ?"

কালী অতিশয় বিরক্তির সহিত বলিল,—"না, তা চলে না। তুমি ভেড়াকান্ত, তাই এখনও এ কথা বলিতেছ। দেরী—এ কাজে আবার দেরী ? এখনই যদি সুযোগ হয়, তা হ'লে আমি এখনই কাজ সারিতে রাজি আছি। কিছু দেরী নয়; আজি রাত্রেই আমি যেমন করিয়া পারি, কাজ ফর্সা করিব। আমি নিজে সব করিব, তোমাকে কেবল কাজ শেষ হওয়ার পর আমার একটু সাহায্য করিতে হইবে। তাও কি ছাই তোমাকে দিয়া হবে না ? তোমার যদি এতটুকু ভরসা নাই, তবে তুমি এ কাজে নামিয়াছিলে কেন ? আর আমাকেই বা এমন করিয়া মজাইলে কেন ?"

রামলাল বলিল,—"তা তুমি যা বলিবে, তাই আমি শুনিব; তুমি আমাকে যে দিকে চালাইবে, আমি সেই দিকেই চলিব; তাতে আমার অদৃষ্টে যা হয় হউক। তা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম কি, বলি, বিষটিষ খাওয়াইয়া কাজ শেষ করা হবে তো ?"

কালী অতি ক্রোধের সহিত বলিল,—"তোমার মাথা, আহাম্মক, ভেড়াকান্ত! সে ভাবনা তোমায় ভাবিতে হইবে না। এখন যা যা বলি, শুন। ঠিক সেই রকম কাজ চাই। না যদি পার, ভাই, তা হ'লে তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে এই পর্য্যন্ত।"

রামলাল বলিল,—"কেন ভাই, এত শক্ত কথা বলিতেছ ? বল কি বলিবে ? যা বলিবে, তাই আমি করিব।"

তখন কালী ও রামলাল খুব কাছাকাছি হইয়া ফুস্‌ফুস্ করিয়া অনেক কথা কহিল। তাহার পর রামলাল বলিল,—"তোমার ভিজে কাপড় গায়ে শুকাইয়া গেল, এখন বাড়ী যাও। আমি ঠিক সময়ে হাজির হইব।"

কালী বলিল,—"দেখিও, সাবধান। একটু এদিক্ ওদিক্ হয় না যেন।"

রামলাল বলিল,—"সে জন্য ভয় নাই, আমি ঠিক সময়ে আসিব।"

তাহার পর এক দিকে রামলাল ও অপর দিকে কালী প্রস্থান করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শশী ভট্টাচার্য্য যাজক ব্রাহ্মণ। লোকটির বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। দেখিতে কৃষ্ণকায়, উচ্চদন্ত, ক্ষুদ্রনেত্র; সুতরাং সুপুরুষ নহেন। ব্রাহ্মণের শাস্ত্রাদি কিছু দেখা-শুনা আছে; বিশেষতঃ দশকর্ম্মে তিনি বিশেষ নিপুণ। তাঁহার অবস্থা বড় মন্দ। বাসগৃহ একখানি সামান্য খড়ের ঘর, ঘরের সম্মুখে একটু ছোট উঠান, সেই উঠানের এ দিকে ও দিকে কয়েকটি লাউ কুমড়ার গাছ, তাহার চারিদিকে কঞ্চির বেড়া। অবস্থা মন্দ হইলেও, গ্রামের লোকেরা ব্রাহ্মণকে বড় শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে। তাহার স্বভাব-চরিত্র বড় ভাল। তাঁহার দোষের কথা কেহ কখনও শুনে নাই ও বলে নাই। কালী-নাম্নী যে যুবতী স্ত্রীলোকের কথা এখনই হইতেছিল, সে এই ব্রাহ্মণের স্ত্রী। ব্রাহ্মণের ফাটা পা, গুম্ফহীন বদন, শিখা-শোভিত শির, নস্য-পূর্ণ নাসা, পুণ্ড্র যুক্ত ললাট ইত্যাদি কুলক্ষণে কালী বড় নারাজ ছিল। এ সকল কুলক্ষণ ছাড়া তাঁহার আরও কিছু মহৎ দোষ ছিল। তিনি বড় ধার্ম্মিক এবং নিয়ত ধর্ম্মকর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। এ মহৎ দোষ কালী মোটেই পছন্দ করিত না। কাজেই সতত ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর মনান্তর চলিত। ব্রাহ্মণ বড়

ধর্ম্মনিষ্ঠ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ; এ জন্য তিনি আপনার পত্নীকেও ধর্ম্মনিষ্ঠ ও কর্ত্তব্যপরায়ণা দেখিতে ইচ্ছা করিতেন। কালী এরূপ ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যের কোন ধার ধারিত না; সুতরাং সময়ে সময়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয় কালীর উপর নিতান্ত বিরক্ত না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। কালীরও বড় বাড়াবাড়ি ছিল। কালী বেলা ৪টার সময় ঘাটে যাইত, রাত্রি নয়টা বাজাইয়া বাটী ফিরিত। কালী সময় নাই, অসময় নাই, ঘরকন্নার কাজ নাই, অকাজ নাই, যখন তখন বাহিরে যাইত, এবং দুই তিন ঘণ্টা কাটাইয়া আসিত। ব্রাহ্মণ এ সকল কারণে সদাই খিট্‌খিট্ করিতেন। কালী তাহাতে বড় জ্বালাতন হইত, এবং কখন মাথা কুটিয়া, কখন বা কাঁদিয়া জিতিত।

আজি কালী সন্ধ্যার অনেক আগে গা ধুইবার ওজরে বাহির হইয়াছে, এত রাত্রি হইল, এখনও বাটী ফিরিল না। ভট্টাচার্য্য চটিয়া লাল হইয়া বসিয়া ঘন ঘন নস্য লইতেছেন। তিনি মনে মনে ঠিক করিয়াছেন যে, আজি কালীরই এক দিন কি তাঁহারই এক দিন। আজি ব্রাহ্মণ কালীকে বিলক্ষণ শিক্ষা না দিয়া ছাড়িবেন না। কপালে যাই থাকুক, তিনি আজি কালীর খাতির রাখিবেন না। কিন্তু এ স্থলে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক, কালী যতই অন্যায় কাজ করুক, এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয় কালীর উপর যতই রাগ করুন, তিনি কালীকে বেজায় ভালবাসিতেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। সেটা কালী মোটেই গণনায় আনিত না; ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজেও অনেক সময়ে তাহা বুঝিতে পারিতেন না। কিসে কালী সুখে থাকিবে, কিসে কালীর খাওয়া পরার কষ্ট হইবে না, কিসে কালীর গায়ে দুই একখানি সোনা-রূপার অলঙ্কার উঠিবে, কিসে নিজের পাতের মাছখানা না খাইয়া কালীর জন্য রাখিয়া যাইবেন, কিসে যজমানের বাড়ী ফলাহারে না বসিয়া নিজে না খাইয়াও বিলক্ষণ এক পাত্র কালীর জন্য আনিতে পারিবেন ইত্যাদি ভাবনা তিনি সর্ব্বদাই ভাবিতেন। তিনি জানিতেন, এরূপ ব্যবহার না করিয়া তিনি থাকিতে পারেন না বলিয়াই করেন, ইহার মূলে যে বিলক্ষণ ভালবাসা আছে, তাহা তিনি বড় একটা মনে করিতেন না। কালী ভাবিত, "হতভাগা, মড়িপোড়া, পোড়ারমুখো বামুন, ওর আবার ভালবাসা! আমার পোড়া কপাল, তাই ওর হাতে পড়েছি।"

রাত্রি ঢের হইয়া গিয়াছে। তখন হেলিতে দুলিতে, ঘড়ার জল থকাস্ থকাস্ করিয়া নাচাইতে নাচাইতে ভট্টাচার্য্য-সীমন্তিনী গৃহাগতা হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শশী ঠাকুরের আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। তিনি বলিলেন,—

"বেরো কালামুখী, বেরো আমার বাড়ী থেকে!"

অন্য দিন হইলে কালী বিলক্ষণ মাত্রা চড়াইয়া কাপ্তিনী মহাজনদের হিসাবে সুদ ও কমিসন সমেত হিসাব করিয়া জবাব দিয়া তবে ছাড়িত। কিন্তু আজি ভট্টাচার্য্যের কোন অজ্ঞাত পুণ্যফলে কালী বিলক্ষণ দয়া করিয়া উত্তর দিল,—"এত রাগ করা কেন? সারাদিন ঘরের কাজকর্ম্ম করিয়া একবার বাহিরে যাই; দুটা মেয়েছেলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়, কাজেই দুটা কথা কহিতে দেরী হইয়া যায়।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় অবাক্ হইলেন। কালীর মুখে এমন উত্তর! তিনি রাগভরে শাসন করিবার জন্য খড়ম দেখাইলে যে কালী সত্য সত্যই খেংরা বাহির করে, দুটা তিরস্কার করিলে যে কালী তাঁহার সটীক-শিরে লাথি মারিতে আইসে, সেই কালীর মুখে আজি এই উত্তর শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় একেবারে অবাক্ হইলেন। ভাবিলেন, এত দিনে মধুসূদন আমার পানে মুখ তুলিয়া চাহিলেন, এত দিনে দীন-বন্ধু আমার এই দুঃখের সংসার সুখের করিয়া দিলেন। ভগবানের ইচ্ছা না হইলে কালীর মতিগতি এমন ফিরিবে কেন? তিনি না পারেন কি? কালীর উত্তর সত্য ও সম্ভব কি না, ব্রাহ্মণ আহ্লাদে সে বিচার করিতে ভুলিয়া গেলেন। তিনি স্নেহস্বরে কহিলেন,—"ব্রাহ্মণি! তা তো হইতেই পারে। সারাদিন সংসারের কাজ-কর্ম্ম বন্ধ করাইয়া যদি তোমাকে কখন সুখী করিতে পারি, তবেই আমার জীবন সার্থক। তোমার উপর রাগ করিয়া কি আমি সুখ পাই? তোমাকে দু'টো রাগের কথা বলিলে আমার যে কষ্ট হয়, তাহা আমি কি বলিয়া বুঝাইব? তবে মানুষের নাকি শত্রু অনেক, এই জন্যই সকল কাজে সাবধান হওয়া আবশ্যক। তুমি ছেলেমানুষ; পাছে সকল কথা সকল সময়ে বুঝিতে না পার, এই জন্য দুই একটা সাবধানের কথা সময়ে সময়ে তোমাকে বলিয়া দিতে হয়। তা তুমি এখন কাপড় ছাড়। দেখ দেখি, সন্ধ্যার আগে তুমি গা ধুইয়াছ, সেই ভিজে কাপড় এখনও তোমার গায়ে রহিয়াছে; এতে অসুখ হবারই কথা। এ কথা যদি তোমাকে আমি না বুঝাই, তবে কে বুঝাইবে বল?"

কালী তখন দড়ী দ্বারা লম্বিত এক বাঁশের আলনা

হইতে একখানি কাপড় হাতে লইয়া একটু অভিমানের হাসি হাসিয়া বলিল,—"আমি কি তোমার মত পণ্ডিত যে, তুমি যেমন বুঝাইবে, আমি ও তেমনি বুঝিব? তোমার মত পণ্ডিত আর এ দেশে কেহ নাই। আমি যেখানে যাই, সেখানেই আমাকে ভট্টাচার্য্য ঠাক্‌রুণ বলিয়া লোকে কত মান্য করে। তোমার মত পণ্ডিতের হাতে পড়িয়া কোন কথা বুঝিতে হইলে আমাকে কি রামা হাড়ির কাছে যাইতে হইবে?"

ভট্টাচার্য্য ভাবিলেন, কি সৌভাগ্য! আমার কালীর এমনই দেবপ্রকৃতি বটে; তবে ছেলেমানুষ, এত দিন সকল কথা বুঝিতে পারে নাই। ভগবান্‌ কৃপা করিয়া এত দিনে আমার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন, ইহা আমার অশেষ ভাগ্য। বলিলেন,—"লোকে আমাকে মান্য করে সত্য, কিন্তু লোকে আপন আপন পরিবারকে যেমন করিয়া খাওয়ায় পরায়, যেমন করিয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে রাখে, আমি যে তোমাকে কিছুই করিতে পারি না, এ দুঃখ আমার মরিলেও যাইবে না।"

সত্যই ব্রাহ্মণের চক্ষু ছল-ছল করিতে লাগিল। তখন কালী বলিল,—

"ছিঃ ছিঃ! এ জন্য তুমি কেন মনে দুঃখ করিতেছ? তোমার স্ত্রী হইতে পাওয়ায় আমার যে সুখ, বোধ করি, রাজরাণীরও তাহা নাই। দেশের মধ্যে তোমার মত ধার্ম্মিক, তোমার মত মানী আর কে আছে? অনেক সুকৃতিফলে এ জন্মে তোমাকে পাইয়াছি; নারায়ণ করুন, যেন জন্মে জন্মে তোমাকেই পাই।"

এবার ব্রাহ্মণ সত্য-সত্যই কাঁদিয়া ফেলিল। সুখের আশায় কালীর সহিত ঘর পাতিয়া অবধি ভট্টাচার্য্যের কপালে এমন সুখ এক দিনও ঘটে নাই। তাহার চক্ষে জল দেখিয়া কালী ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিল এবং বস্ত্রাঞ্চল দিয়া অতি যত্নে তাঁহার মুখ মুছাইয়া দিয়া বলিল,—"রাত্রি অনেক হইল, খাওয়া-দাওয়া কর। আজি মল্লিকদের বাড়ী থেকে ফলারের জন্য দই-চিঁড়া সন্দেশ দিয়া গিয়াছে। তুমি খাবে বলিয়া তুলিয়া রাখিয়াছি। উঠ এখন, বেশী রাত্রে খাওয়া তোমার অভ্যাস নয়, আর দেরী করিলে অসুখ হইবে।"

কালী উঠিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আহারের উদ্যোগ করিতে গেল। উদ্যোগ ঠিক হইলে কালী ভট্টাচার্য্যকে উঠিয়া আসিবার জন্য সাদরে ডাকিল। ভট্টাচার্য্য পিঁড়িতে বসিয়া আহারে নিযুক্ত হইলেন। চিরদিনই ত তিনি দধি-চিপিটক আহার করিয়া থাকেন, কিন্তু আজ কি মিষ্ট! আজি তাঁহার ঘরের ক্ষীণ প্রদীপ কি উজ্জ্বল, আজি তাঁহার পর্ণকুটীর কিরূপ সর্ব্বসুখময়, আজি তাঁহার গৃহসজ্জা কি চমৎকার, আজি তিনি নিজে কি আনন্দময় এবং সর্ব্বোপরি আজি তাঁহার ব্রাহ্মণী কি সুন্দরী, মধুরভাষিণী, এবং গৃহলক্ষ্মীস্বরূপা। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, "যাহার গৃহে এমন ধন, সে আবার দরিদ্র কিসে?"

আহারাদি শেষ হইলে তাঁহার সাধের ব্রাহ্মণী তাঁহাকে একটা পাণ দিলেন। তিনি কালীকে আহার করিতে অনুরোধ করিয়া শয্যায় আসিয়া শয়ন করিলেন। কালী স্বামীর পাত্রাবশিষ্ট ভোজন করিয়া ও আবশ্যক কর্ম্মসমস্ত শেষ করিয়া তাঁহার শয্যাপার্শ্বে শয়ন করিল। সে রাত্রে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যেমন নিদ্রা হইল, তেমন সুখে তেমন সুনিদ্রা তাঁহার জীবনে আর কখন হয় নাই!

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বড় ভয়ানক কাণ্ড! শশী ভট্টাচার্য্য রাত্রে কাটা পড়িয়াছেন। প্রাতে তাঁহার কুটীরের চারিদিকে লোকে লোকারণ্য! পুলিসের ইনস্পেক্টর, হেড্‌ কন্‌ষ্টেবল ও কন্‌ষ্টেবল গস্‌-গস্‌ করিতেছে। কুটীর-প্রাঙ্গণের অদূরে একটা বনের অন্তরালে লাস পড়িয়া আছে। লাস একখানি কাপড় দিয়া ঢাকা। ক্ষুদ্র ঘরের মধ্যে রক্তের ঢেউ খেলিতেছে। ঘর হইতে আরম্ভ করিয়া যেখানে লাস পড়িয়া আছে, সে পর্য্যন্ত রক্তের ধারা রহিয়াছে। লাসের দুই দিকে দুই জন কন্‌ষ্টেবল দাঁড়াইয়া আছে।

দূরে এক স্থানে পাঁচ জন কন্‌ষ্টেবল-বেষ্টিত হইয়া কালী ও রামলাল বসিয়া আছে। তাহাদের উভয়েরই হাতে হাতকড়ি। কালীর ললাট কুঞ্চিত, ভ্রূযুগল স্ফীত, চক্ষু রক্তবর্ণ, এবং তাহার ভাব নিতান্ত ভীতিশূন্য। রামলাল নিতান্ত কাতর ও অবসন্ন। বহু ক্রন্দনহেতু তাহার চক্ষু লাল। সে অধোমুখ। উভয়েরই পরিধান-বস্ত্র রক্তাক্ত। রামলালের বস্ত্র অপেক্ষা কালীর বস্ত্র অধিক রক্তাক্ত।

অদূরে একটি বৃক্ষতলে ইন্‌স্পেক্টর বাবু এক জন প্রতিবাসিপ্রদত্ত একটি মোড়ায় বসিয়া হাসিতে হাসিতে হুঁকায় পাতার নল লাগাইয়া তামাকু খাইতেছেন। তাঁহার সম্মুখে রক্তরঞ্জিত এক দা। তাঁহার নিকটে কয়েকজন কন্‌ষ্টেবল দণ্ডায়মান।

সকল স্থানেই লোক—ছেলে, বুড়ো, মেয়ে, পুরুষ—লোকের আর সীমা নাই। স্ত্রীলোকেরা ভিড়ের বড় নিকটে যাইতে পারিতেছে না; দূরে দাড়াইয়া দেখিতেছে ও শুনিতেছে। তাহাদের দেখিলে পোড়ারমুখো পুরুষগুলার মন ঠিক থাকিবে না বলিয়া যে সকল যুবতী ও অৰ্দ্ধবয়সী নারীর বিশ্বাস আছে, তাহারা গাছের আড়ালে ও অবগুণ্ঠনের অন্তরালে থাকিয়া নিতান্ত ঔৎসুক্যের সহিত চাহিয়া আছে। প্রাচীনারা লোকদের জিজ্ঞাসা করিয়া অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিতেছে, এবং তাহাই আবার দশগুণ বাড়াইয়া হাত-মুখ নাড়িতে নাড়িতে নবীনাদের নিকট আসিয়া গল্প করিতেছে; তাহাদের মা বা পিসী বা মাসী তাড়া দিয়া, যাইতে বারণ করিতেছে। দুই একটা দুষ্ট ছেলে, তাড়া ও চোকরাঙ্গানীতে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া, লোকের পায়ের ফাঁক দিয়া গুড়ি গুড়ি আসিয়া যাহা দেখিবার, তাহা দেখিতেছে। দুই এক জন বৃদ্ধ আপনার যুবক পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র বা ভাগিনেয়কে সাক্ষী দিতে হইবে ভয় দেখাইয়া গোলের নিকটে যাইতে নিষেধ করিতেছে; কিন্তু যুবকেরা সে উপদেশে বড় একটা কর্ণপাত করিতেছে না। ভট্টাচার্য্যের কুটীরের দ্বার হইতে উঁকি দিয়া যাহারা ভিতরে দৃষ্টিপাত করিতেছে, তাহারা সেখানকার রক্তগঙ্গা ও কাণ্ড দেখিয়া চমকিত হইতেছে। তক্তাপোষের উপর হইতে রক্ত গড়াইয়া পড়িয়া ঘর ভাসিয়া গিয়াছে। সুতরাং তক্তাপোষের উপরে ভট্টাচার্য্য মহাশয় যখন নিদ্রিত ছিলেন, তখনই যে তাঁহাকে কাটিয়াছে, তাহার আর ভুল নাই। তাহার পর সেই রক্তের উপর পায়ের দাগ, এবং মৃত-ব্যক্তিকে ছেঁচড়াইয়া আনার দাগ স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

যেখানে লাস, সেখানে লোক কেবল হায় হায় করিতেছে। দুই এক জনের চক্ষু ছল-ছল করিতেছে। দুই এক জন সত্য সত্যই কাঁদিয়া ফেলিয়াছে। শশী ভট্টাচার্য্য নিতান্তই নিরীহ ও শান্ত ব্যক্তি। গ্রামের তাবৎলোকেই তাঁহাকে ভালবাসে ও আত্মীয় জ্ঞান করে। তাঁহার এইরূপ অপমৃত্যুতে সকলেই অত্যন্ত ব্যথিত। কিরূপে কাটিয়াছে, কোথায় কিরূপে আঘাত করিয়াছে, তাহা দেখিবার জন্য অনেকে বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে। লাল কাপড় ঢাকা থাকায় তাহাদের সে ইচ্ছা সফল হওয়ার কোনই সুযোগ হইতেছে না। তাহারা কৌতূহল-নিবৃত্তির অন্য উপায় না দেখিয়া কখন বা কনষ্টেবলদের পীড়াপীড়ি করিতেছে, কখন বা তাহাদিগকে মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিতেছে। কনষ্টেবল মহাশয়েরা কৃপা করিয়া দুই একটা কথা বলিতেছেন। যাহা বলিতেছেন, তাহাতে বুঝা যাইতেছে, লাসের সর্ব্বাঙ্গে পঁচিশ ত্রিশ স্থানে সাংঘাতিক আঘাত আছে; তাহার মধ্যে ঠিক গলার নিকট হইতে বুকের উপর পর্য্যন্ত এক প্রকাণ্ড আঘাত, তাহা যেমন ভয়ানক, তেমনই গুরুতর।

যেখানে কালী ও রামলাল প্রহরি-বেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছে, সেখানে অনেক লোক। তাহাদের দেখিয়া অনেকেই নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নানা কথা বলিতেছে। এক জন ইয়ার যুবা বলিয়া ফেলিল—"ফাঁসীর কাঠে ঝুলিতে ঝুলিতে ইয়ারকির চূড়ান্ত হইবে বাবা!"

কালী এ কথায় একটুকুও বিচলিত হইল না। কিন্তু রামলাল কাঁদিয়া ফেলিল। আর এক উদ্ধত ব্যক্তি নিতান্ত ঘৃণার সহিত বলিল,—"ডালকুত্তা দিয়া ইহাদের খাওয়ায় না?"

এবার কালী কুপিত-ব্যাঘ্রের ন্যায় দৃষ্টিতে বক্তার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। এক বৃদ্ধা কোন প্রকারে ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। সে কালীর মুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"কালা-মুখী, ধিক্‌জীবনী, তোর গলায় দড়ি।"

কালী এবারেও ভ্রূকুটি করিয়া তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল। আর এক প্রবীণ লোক বৃদ্ধার কথার উত্তরে বলিল,—"সে কথা আর তোমায় বলিয়া দুঃখ পাইতে হইবে না। আর বড় জোর মাস-খানেকের মধ্যে গলায় দড়িই হইবে।"

যেখানে শ্রীল শ্রীযুক্ত ইন্‌স্পেক্টর বাবু বসিয়া আছেন, সেখানে তাঁহার শ্রী-বদনারবিন্দ-বিনির্গত বাক্য-সুধালালসায় অনেকে নিতান্ত উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করিতেছে; তিনি কিন্তু বাক্য-বিতরণে নিতান্ত কৃপণ। তাঁহার তদারক-সংক্রান্ত লেখাপড়া ও অন্যান্য সমুদয় কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। তিনি লাস চালান দিবার জন্য একখানি গরুর গাড়ী আনিতে কনষ্টেবল পাঠাইয়া অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। তিনি বড়লোক জ্ঞানে লোকে তাঁহাকে সাহস করিয়া সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছে না। দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে। তিনি দিন-দুনিয়ার মালিকভাবে প্রশ্নের সিকিখানা, কদাচিৎ আধখানা উত্তর দিয়া কাজ সারিতেছেন!

কিন্তু কিরূপে এ কাণ্ড পুলিসের গোচর হইল, তাহা এখনও বলা হয় নাই। ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর

অনতিদূরে সদানন্দ দাস নামে এক কৈবর্ত্তের কুটীর। সদানন্দ কোন কার্য্য উপলক্ষে গ্রামান্তর যাইবে বলিয়া সে রাত্রি ভাল করিয়া ঘুমায় নাই। রাত্রি যখন একটা, তখন সদানন্দ হাত-মুখ ধুইবার জন্য ঘটী হাতে করিয়া বাহিরে আইসে। বাহির হইয়াই সে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ঘর হইতে 'ধপাস্' করিয়া এক শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে এক বিকট 'মা গো' শব্দ তাহার কানে যায়। সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক ছট্‌ফট্, গোঁ গোঁ, ধপাস্ ধপাস্, দুম্-দাম্ শব্দ সে শুনিতে পায়। ভট্টাচার্য্য-পত্নীর স্বভাব-চরিত্রের কথা এবং ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর মনান্তরের কথা পাড়া প্রতিবাসী সকলেই জানিত। ভট্টাচার্য্যের ঘরের মধ্যে তখন আলো জ্বলিতেছিল। সদানন্দ ঘরের আরও নিকটে আসিয়া শুনিতে পাইল, ঘরের মধ্যে দুই জন লোক ফুস্‌ফুস্ করিয়া কথা কহিতেছে। গত-বর্ষায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ঘরের এক দিকের দেয়াল পড়িয়া গিয়াছিল। সে দিকে এখনও নূতন দেয়াল দেওয়া ঘটে নাই, দরমার বেড়া দেওয়া আছে মাত্র। সদানন্দ অতি সাবধানে সেই বেড়ার নিকটে আসিয়া একটা ছিদ্র দিয়া ভিতরকার ব্যাপার দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। যতদূর সে দেখিতে পাইল, তাহাতে তাহার পেটের পীলে চম্‌কাইয়া গেল। সে কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া এবং আপনার প্রয়োজন সকল ভুলিয়া গিয়া, ঘটী হাতে থানায় উপস্থিত হইল। সে যাহা দেখিয়াছে, শুনিয়াছে ও বুঝিয়াছে, সমস্তই সে সেখানে অকপটে ব্যক্ত করিল। তখনই পুলিসের লোকেরা তাহার সঙ্গে আসিল। রাত্রি তখন প্রায় ৪টা। এই পর্য্যন্ত কথা সদানন্দ দাসের জবানবন্দীতে ব্যক্ত হইয়া ইন্‌স্পেক্টর-বাবুর কলমের গুণে কাগজজাত হইয়াছে। তাহার পর যাহা হইয়াছিল, তাহা পুলিস স্বচক্ষে দেখিয়াছে।

পুলিস আসিয়া দেখিল, কালী ও রামলাল শশী ভট্টাচার্য্যের মৃতদেহ টানাটানি করিয়া বনের দিকে লইয়া যাইতেছে। সে সময়টা জ্যোৎস্না থাকায় তাহাদের দেখার বিশেষ অসুবিধা হইল না। তাহারা নিকটস্থ হইয়া কালী ও রামলালকে ধরিয়া ফেলিল। রামলাল প্রথমে পলাইবার, পরে আত্মহত্যা করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। সে তখন অকপটে সমস্ত অপরাধ কাঁদিতে কাঁদিতে স্বীকার করিল; কালীর বিশেষ উত্তেজনায় এবং আপনার সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় সে এ কাজে লিপ্ত হইয়াছিল, কালীর সহায়তা ভিন্ন সে আর কিছুই করে নাই, এবং ভট্টাচার্য্যের শরীরে সে স্বহস্তে একটিও অস্ত্রাঘাত করে নাই, এ কথা সে বিশেষ করিয়া বলিল। কালীও অকাতরে সমস্ত পাপ ব্যক্ত করিল। ভট্টাচার্য্য তাহার সুখের পথে কণ্টক; সুতরাং তাঁহাকে মারিয়া ফেলা আবশ্যক মনে করিয়া সে স্বহস্তে দা দিয়া বারম্বার আঘাত করিয়া তাঁহার প্রাণনাশ করিয়াছে, এ কথা সে নির্ভীকভাবে স্বীকার করিল। রামলাল স্বেচ্ছায় কোন কাজ করে নাই; কালীর বিশেষ অনুরোধে পড়িয়া সে সামান্য সাহায্য করিয়াছে মাত্র এবং সে না থাকিলেও কালী একাই সব কাজ শেষ করিত, এমন কথা পর্য্যন্ত কালী বলিল।

বেলা যখন ১০টা, তখন গাড়ী আসিল। ইন্‌স্পেক্টর বাবু গাড়ীতে লাস উঠাইয়া, সঙ্গে সঙ্গে হাতকড়ি-বদ্ধ কালী ও রামলালকে চালান দিয়া, এবং অন্যান্য বিষয়ের আবশ্যকমত ব্যবস্থা করিয়া প্রস্থান করিলেন।

ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়িল। ক্রমে ক্রমে সেখানকার লোকের ভিড় কমিতে লাগিল, এবং কেহ বা কালীকে গালি দিতে দিতে, কেহ বা শশী ভট্টাচার্য্যের জন্য আক্ষেপ করিতে করিতে, কেহ বা নিতান্ত দার্শনিকভাবে মানব-চরিত্রের এতাদৃশ দুর্জ্ঞেয়তার কথা আলোচনা করিতে করিতে, এবং কেহ কেহ বা কালী ও রামলালের কাহার কিরূপ সাজা হইবে, তাহার বিচার করিতে করিতে বাটী ফিরিল। কিন্তু কয়েক দিন প্রতিবাসী নরনারীগণ নিরন্তর বিবিধ সঙ্গীতে এই কাণ্ডের আলোচনা করিতে ভুলিল না।

নবম পরিচ্ছেদ

যে রাত্রে শশী ভট্টাচার্য্য হত হন, তাহার মাসাধিক কাল পরে, এক দিন সন্ধ্যার অনতিকাল পূর্ব্বে রাধানাথ রায়ের বহ্বায়তভবনের অন্তঃপুর-মধ্যস্থ সুবৃহৎ ছাদের উপর রমাপতি পরিভ্রমণ করিতেছেন। রমাপতি একাকী নহেন। তাঁহার বামকরের মধ্যাঙ্গুলী ধারণ করিয়া এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বালিকা সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেছে। স্তবকে স্তবকে ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি বালিকার কপালে, গ্রীবায়, কর্ণমূলে ও অংসে আসিয়া নিপতিত হইয়াছে। বালিকার বয়স চারি বৎসর। তাহার আকর্ণ-বিস্তৃত, স্থূল-কৃষ্ণ-ভ্রূযুগলতলস্থ আয়ত সমুজ্জ্বল লোচন, তাহার

দেহের অপূর্ব্ব গৌরকান্তি ও লাবণ্য-জ্যোতিঃ, তাহার কোমল-রক্তাভ-বিম্বোষ্ঠের হসিত ভাব, এবং তাহার অস্ফুট ও ভঙ্গ, মৃদু ও মধুর, আনন্দ ও হাস্যময় বাক্যাবলী যে দেখিয়াছে ও শুনিয়াছে, সে তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিবার জন্য ব্যাকুল না হইয়া কখনই থাকিতে পারে নাই। এই বালিকার নাম "মাধুরী।" পাঁচ বৎসর হইল, রমাপতি ও সুরবালা বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইয়াছেন। বিধাতা তাঁহাদের প্রগাঢ় প্রণয়-বন্ধন দৃঢ়তর করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমে এই কন্যা-সন্তান, এবং তাহার দুই বসৎর পরে একটি সুকুমার পুত্রসন্তান প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি কৃপার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। জগতে যে যে পদার্থ মানবের সুখ-সংবিধানে সমর্থ, তাহার সকলই তাঁহাদের আয়ত্ত। ধনই অনেক স্থলে ভোগ-বিলাসানুরত বা পরোপকার-প্রবণ-হৃদয় মানবের আশা-নিবৃত্তির অনন্যসাধন, এবং তৃপ্তির সর্ব্বপ্রধান উপাদান। সে ধন প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রমাণে তাঁহাদের করায়ত্ত। দাম্পত্য-প্রণয়, সৎ-স্বভাব-সম্পন্ন যুবক-যুবতীর পক্ষে সর্ব্বসুখ-বিধায়ক সামগ্রী। ভগবৎ-কৃপায় এই সৌভাগ্যবান্ যুগল তাদৃশ-প্রণয়ের আদর্শ-স্থলাভিষিক্ত হইবার উপযোগী, এই সকল দুর্ল্লভ-সুখও শিশু-কণ্ঠোত্থিত অস্ফুট আধ আধ স্বরের সহিত বিজড়িত না থাকিলে, মধ্যমণিহীনা রত্নহারের ন্যায়, সতীত্ব-সম্পত্তিশূন্যা সুন্দরীর ন্যায়, কপর্দ্দকমাত্রবিহীন দাতার ন্যায়, এবং সুরভি-কুসুম-পরিশূন্য কণ্টকাকীর্ণ উদ্যানের ন্যায় নিতান্ত নিষ্ফল বলিয়া অনেকে বোধ করেন; কিন্তু অনুকূল বিধাতৃ-অনুকম্পায় তাঁহাদের সে অভাবও নাই; সুতরাং তাঁহারা সৌভাগ্যশালি-গণের শীর্ষস্থানীয়। কিন্তু জগতে অব্যাহত সুখ-সম্ভোগ প্রায় কাহারও অদৃষ্টে সংঘটিত হয় না। তাঁহাবা বড় দাগা পাইয়াছেন—বড় ঝড় তাঁহাদের মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। রাধানাথ ও তাঁহার ব্রাহ্মণী উভয়েই ইহলোক হইতে পলায়ন করিয়াছেন। রমাপতির পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ার অনতি-কাল পরে, রাধানাথ রায় লীলাসংবরণ করেন। সেই দারুণ দুর্ঘটনার তিন মাস পরে সেই দুর্দ্দমনীয় শোক কথঞ্চিৎ মন্দীভূত হইবার পূর্ব্বেই সুরবালার জননী পতিপরিগৃহীত পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা যে দুই সুমহৎ তরুর সুশীতল ছায়াতলে নিরুদ্বেগে উপবিষ্ট ছিলেন, তাহা আর তাঁহাদের নাই। যে দুই জীবন সংসারের কঠোর-সংঘর্ষণ হইতে অন্তরিত থাকিয়া আনন্দ ও সৌভাগ্য-সম্ভোগমাত্র লক্ষ্য করিয়া সুখে অতিবাহিত হইতেছিল, তাঁহাদের অতঃপর সংসারের সম্মুখে বুক পাতিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে। যে পর্ব্বতের অন্তরালে তাঁহারা অবস্থিত ছিলেন, তাহা চূর্ণীকৃত হইয়াছে। তাঁহাদের সুখ ও সন্তোষ, আনন্দ ও প্রীতি, ভোগ ও বিলাসবিধায়ক ব্যবস্থা করা যাঁহাদের জীবনের ব্রত ছিল, তাঁহারা আর নাই। রাধানাথ ভবরঙ্গভূমি হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে এক উইলপত্র দ্বারা স্বীয় বিপুল বিভবাদির বিহিত-ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই উইল অনুসারে তাঁহার জামাতা রমাপতি সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিত্ব ও সর্ব্বময়-কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছেন।

রমাপতি মাধুরীর সঙ্গে বেড়াইতেছেন। মাধুরী তাঁহাকে চালাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে বলিলেই হয়। কারণ, সে কখন জোরে চলিয়া পিতার হাত ধরিয়া টানিয়া যাইতেছে, কখন বা পশ্চাতের, পার্শ্বের পদার্থবিশেষে লক্ষ্য বদ্ধ করিয়া পা ফেলিতে ভুলিয়া যাইতেছে। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে রমাপতি বাবুও থামিতেছেন। আর যে তাহার গজর-গজর বকুনি, তাহার কথা আর কি বলিব। বেদ-কোরাণের বহির্ভূত অনেক গল্প সে করিতেছে। ভাষার উচ্চারণ-বিধির মস্তকে পদাঘাত করিয়া, পদস্থাপনের রীতি ও পদ্ধতি উপেক্ষা করিয়া এবং প্রসঙ্গের মধ্যে নিঃসঙ্কোচে প্রসঙ্গান্তর অবতারিত করিয়া, মাধুরী ব্যাকরণ ও ন্যায়শাস্ত্রের যৎপরোনাস্তি অবমাননা করিতেছে। কিন্তু তাহার সেই অসংবদ্ধ ও অযথাব্যক্ত বাক্যাবলী তাহার পিতার কর্ণে অজস্র-ধারায় মধুবর্ষণ করিতেছে। স্বভাব-সঞ্জাত অপত্যস্নেহ তনয়ার তাদৃশ অপরিস্ফুট বচন-বিন্যাস মধুময় করিবার প্রধানতম হেতু হইলেও, মাধুরীর সুস্বরবিজড়িত ভঙ্গ ভাষা নিতান্ত-নির্লিপ্ত শ্রোতৃবৃন্দের অন্তরকেও মোহিত করিতে সমর্থ।

পিতা ও পুত্রী যখন এইরূপ আলাপে নিযুক্ত, সেই সময়ে সুন্দরী-শিরোমণিস্বরূপা সুরবালা সেই স্থানে সমাগত হইলেন। তাঁহার অঙ্কে এক নির্ম্মলকান্তি নিরুপম-নয়নানন্দ নন্দন। সেই ভুবনমোহন পুত্র দূর হইতে রমাপতি ও মাধুরীকে দেখিয়া হাত নাড়িতে নাড়িতে মধুরস্বরে মধুময় হাস্যের সহিত, 'ধু—ধু—বা—বা' শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। শিশুর নিতান্ত নবীন বাগ্‌যন্ত্র 'মাধুরী' নাম উচ্চারণ করিতে পারিত না। সে সেই জন্য স্বকৃত অত্যদ্ভুত ব্যাকরণের সহায়তায় সেই কঠোর শব্দের ভূরিভাগ 'ইৎ' করিয়া, কেবল ধুটুকু বজায় রাখিয়াছিল। শিশুর সেই অমৃতময় বাক্য কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র

রমাপতি ও মাধুরী ব্যস্ততাসহ সেই দিকে ফিরিলেন। রমাপতি দেখিলেন, অপূর্ব্বদর্শন! সেই রবিকর-পরিশূন্য, স্নিগ্ধচ্ছায়ারাশিপরিবৃত, সমুচ্চ সৌধ-শিরে সেই নীড়গামী, নানাদিক্‌বিহারী, বহুভাষী, বিবিধ-জাতীয়-বিহঙ্গ-বেষ্টিত দৃশ্যমধ্যে—সেই প্রীতিপ্রদ, প্রবহমান, সুস্নিগ্ধ, সুশীতল, বসন্তানিল-সাগরে, রমাপতি দেখিলেন, সুরবালা তাঁহার সুরনায়কতুল্য সুকুমার শিশু সন্তানকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া। মৃদু-মন্দ-বায়ুহিল্লোলে শিশুর কেশের গুচ্ছ নাচিয়া নাচিয়া উড়িতেছে, এবং সুরবালার প্রলম্বিত অঞ্চল কেতনবৎ উড্ডীয়মান হইতেছে। বালিকা এখন যুবতী হইয়াছেন, যৌবন-সমাগমে এখন সেই অপার্থিব সৌন্দর্য্য পূর্ণোজ্জ্বল ও প্রদীপ্ত হইয়াছে। রমাপতি অতৃপ্ত-নয়নে সেই লাবণ্যময়ীর স্বর্ণকান্তি সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন মাধুরী "বাবা! ডেক ডেক ঐ মা" বলিয়া সেই দিকে প্রধাবিত হইল। তখন রাজরাজমোহিনী সুরবালা মাধুরীর হস্ত ধারণ করিয়া অগ্রসর হইলেন। রমাপতিও কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া মধ্যপথে সুরবালার সমীপাগত হইলেন, এবং বলিলেন,—"এই বুঝি তোমার শীঘ্র আসা? আঠারো মাসে তোমার বৎসর?"

সুরবালা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"তা আমি জানি। এতক্ষণ তোমার হুকুম তামিল করিতে না পারায় অবশ্যই দাসীর অপরাধ হইয়াছে। আমি আসিতেছি, এমন সময়ে পুঁটের মা ছেলের জন্য জ্বরের ঔষধ চাহিতে আসিল। তাহার ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিতে দেরী হইল। তা যাই হউক, দাসী গলায় কাপড় দিয়া হাতযোড় করিয়া মানভিক্ষা করিতেছে। যদি নিতান্তই হুজুর তাহাকে ক্ষমা না করেন, তাহা হইলে দাসী শেষে এমন কল খাটাইবে যে, হুজুরের তখন নাকালের সীমা থাকিবে না।"

কিন্তু রমাপতি তখন উত্তর দিবেন কি? সেই রূপসীর মধুর বাক্য, মধুর ভাব, এবং মধুর ভাষা তাঁহাকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে। কথায় কি ছাই তখন প্রাণের কথা বাহির হয়? কটা কথা লইয়াই বা ভাষা, কটা ভাবই বা তাহাতে ব্যক্ত হয়! রমাপতি সে কথার উত্তর দিবার কোন প্রয়াস না করিয়া, খোকাকে কোলে লইবার জন্য হাত পাতিলেন। খোকা সানন্দে লাফাইয়া আসিয়া তাঁহার কোলে পড়িল। রমাপতি বারংবার তাহার বদন চুম্বন করিলেন। তখনই কয়েক জন ঝি তাঁহাদের কোন আদেশ আছে কি না, জানিবার নিমিত্ত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। রমাপতি মাধুরী ও খোকাকে লইয়া ছাদে ছাদে বেড়াইতে আদেশ করিলেন। তখন সুরবালা আবার হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"মানিনীর মান কি ভাঙ্গিয়াছে? না শেষে মানের দায়ে নিজে নাকে কাঁদিতে সাধ আছে?"

রমাপতি বলিলেন,—"সাধ যা আছে, তাহা দেখিতে পাইবে এখনই। 'অতি দর্পে হতা লঙ্কা' জান তো? দোষ করিলে নিজে, নাকে কাঁদাইতে চাও আমাকে। তোমার মত লোক বিচারক হইলে দেশে সুবিচারের স্রোত বহিয়া যাইবে।"

সুরবালা রমাপতির হাত ধরিয়া অন্য দিকে ছাদে বেড়াইতে বেড়াইতে বলিতে লাগিলেন,—"আমি বিচারক হইলে এই কপট পুরুষ-গুলাকে বিলক্ষণ জব্দ করিয়া তবে ছাড়ি।"

রমাপতি জিজ্ঞাসিলেন,—"সকলের প্রতিই কি তাহা হইলে ধর্ম্মাবতার সমান বিচার করিবেন? কেহই কি আপনার ন্যায়-দণ্ডের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবে না?"

সুরবালা মুখের হাসি অঞ্চলে চাপিয়া বলিলেন,—"কেহ না। যাহাদের মধ্যে সকলেই কপট, তাহাদের আবার ছাড়াছাড়ি কি? সকলেরই সাজা।"

রমাপতি বলিলেন,—"পুরুষ যে অত্যন্ত কপট, তাহার আর সন্দেহ কি? তাহা যদি না হইবে, তাহা হইলে শশী ভট্টাচার্য্য কখন কি কালীকে এত ভালবাসিত?"

সুরবালা কালীর নামোচ্চারিত হইবামাত্র শিহরিয়া উঠিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, 'তোমরা—তোমরা দেবতা—আমরা সামান্য মেয়েমানুষ, আমরা তোমাদের মহিমা কি বুঝিব? তোমরা আমাদের মত ক্ষুদ্র-কীটকে পদে দলিত করিয়া হৃদয়ে স্থান দেও, এ তোমাদের আশ্চর্য্য দেবত্ব।' বলিলেন,—"জানি না, কোন্ স্বর্গে শশী ভট্টাচার্য্যের স্থান হইবে। স্বর্গ যদি থাকে, এবং স্বর্গে যদি শ্রেণী থাকে, তাহা হইলে শশী ভট্টাচার্য্য অবশ্যই সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে স্থান পাইবেন। আর কালী? নরকেও কি নরক নাই? সে কেন মানবদেহ পাইয়াছিল? বিধাতঃ! তোমার রাজ্যে তাহার জন্য কি শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছ?"

রমাপতি দেখিলেন, ক্রোধে ও হৃদয়ের যাতনায় সুন্দরীর বদন অপূর্ব্ব শ্রী-ধারণ করিয়াছে। লোচন-যুগল উজ্জ্বল হইয়াছে। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 'ভগবন্! যে হস্ত হইতে কালীর ন্যায় পিশাচীর সৃষ্টি, এই দেবীও কি সেই হস্তেরই ফল?'

সুরবালা আবার বলিতে লাগিলেন,—"কিন্তু মানব-রাজ্যে কালীর ঘোর-দুষ্কৃতির কি শাস্তি হইল, তাহা আমি জানিতে পাই নাই। তাহার পাপ-আত্মা আজিও কি সেই দেহে আছে?"

রমাপতি বলিলেন,—"বিচারে কালীর ফাঁসী ও রামলালের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হুকুম হইয়াছে। বোধ হয়, আর পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই কালীর ফাঁসী হইয়া যাইবে।"

সুরবালা চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"ফাঁসী হইবে! ফাঁসীই কি তাহার যথেষ্ট শাস্তি? কিন্তু সে কথায় আমাদের কাজ কি? যাহা হইবার, তাহাই হউক।"

অনেকক্ষণ আর কেহই কোন কথা কহিলেন না। তাহার পর সুরবালা বলিলেন,—"তোমার সহিত আমার এবার ভারি ঝগড়া হইবে।"

রমাপতি বলিলেন,—"অপরাধ?"

সুরবালা মুখ ভার করিয়া বলিলেন,—"মোকদ্দমার জন্য তুমি কলিকাতায় যাইবে বলিতেছ, সেখানে দশ পনর দিন দেরী হইবে, তাহাও বলিতেছ; কিন্তু একবারও আমাকে সঙ্গে লইয়া যাওয়ার কথাটি বলিতেছ না। বেশ, যাও তুমি, আমি ইহার এমন শোধ তুলিব যে, তোমাকে ত্রিভুবন অন্ধকার দেখিতে হইবে।"

রমাপতি বলিলেন,—"কেন তোমাকে লইয়া যাইব? আমার কি আর কেহ নাই? মনে কর, আমার সুকুমারীর সহিত দেখা হইবে।"

সুরবালা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"এমন দিন কি হইবে? ভগবান্ যেন তাহাই করেন?"

রমাপতি বলিলেন,—"এমন দিন হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, জান বলিয়া এ কথা বলিতেছ। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তোমরা যাহাই মনে কর, সুকুমারী বাঁচিয়া আছে। মনে কর, যদিই কলিকাতায় গিয়া সুকুমারীকে পাই, তাহা হইলে তুমি কি কর?"

সুরবালা নীরব। তাঁহার মুখমণ্ডল গম্ভীর। তাঁহার হৃদয় ভাবে পূর্ণ। অনেকক্ষণ পরে তিনি উত্তর দিলেন,—"কি যে করি, তাহা কেমন করিয়া বলিব? সেই দেবী, সেই প্রেমময়ী, সেই শক্তিময়ীকে আমার মন প্রতিদিন অবনত-মস্তকে বার বার প্রণাম করিয়া থাকে। সেই দেবীকে যদি সম্মুখে দেখিতে পাই—আহা বিধাতঃ! তুমি সকলই ঘটাইতে পার, এ অধীনীর এ প্রার্থনা কি তুমি পূরণ করিতে পার না?—সেই দেবীকে যদি সম্মুখে দেখিতে পাই, যাঁহাকে প্রতিদিন ধ্যান করি—কল্পনায় যাঁহার মূর্ত্তি গঠিত করিয়া প্রতিদিন পূজা করি—আমার সেই দিদিকে যদি সম্মুখে দেখিতে পাই, তাহা হইলে অভীষ্ট-দেবীকে সম্মুখে দেখিলে ভক্ত যাহা করে, আমিও তাহাই করি। তাহা হইলে স্বর্ণ-সিংহাসন পাতিয়া তাঁহাকে আমার এই দেবতার পার্শ্বে বসাই, স্বহস্তে এই দেবযুগলের চরণ ধৌত করিয়া এই কেশরাজির দ্বারা তাহা মার্জ্জিত করি, এবং ভক্তিগদ্গদ-হৃদয়ে দূরে দাঁড়াইয়া সেই দেবযুগলের অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করি। কিন্তু সে সৌভাগ্য কি কখন আমার কপালে ঘটিবে?"

রমাপতি মুগ্ধভাবে সুরবালার কথা শুনিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, 'সত্যই কি সুরবালা মানবী? অস্থি-মাংস-বসা-চর্ম্মধারী মানবশরীর কখনই এবংবিধ মহোচ্চ-মনোবৃত্তির আধার হইতে পারে না। এই দেবীর বদনের ভাব, কথার প্রণালী, বাক্যের শক্তি আলোচনা করিয়া কে বলিবে যে, এ সকল উক্তিতে বিন্দুমাত্র কপটতা আছে? কে বলিবে, এই ভাব এই দেবীর অন্তরের অন্তর হইতে সমুদ্ভূত নহে।' তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—"তোমার এই যে এই দেবভাব, সুরবালা! মনুষ্যলোকে ইহার আর তুলনা নাই। মনুষ্য-শরীর লইয়া তোমার এরূপ ভাব কেন হইল, বহু আলোচনাতেও তাহা হৃদয়ে ধারণা করিতে পারি না।"

সুরবালা বলিলেন,—"হৃদয়দেব! আমার এ ভাবে আমি বিস্ময়ের কারণ কিছুই দেখি না। দেবভাব কাহাকে বলে, তাহা এ অধম নারী বুঝিতেও অক্ষম। আমার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একই দিকে প্রধাবিত। যখন হইতে তুমি আমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতিফলে আমার চক্ষে পড়িয়াছ, যখন তোমার পত্নীবিয়োগে বিজাতীয় কাতরতা আমি দেখিয়াছি, যখন তোমার সেই দারুণ দুর্ব্বিপাক-সময়ের কাহিনী সমস্ত তোমার মুখে শ্রবণ করিয়াছি, তখনই তোমাকে দেবতা বলিয়া আমার ভক্তি জন্মিয়াছে। সেই ভক্তি তোমার দয়া, সরলতা, কোমলতা, বিদ্যা ও রূপ দেখিয়া উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া এমন ভাবে উপনীত হইয়াছে যে, আমার হৃদয়ে তাহার আর স্থান হয় না। তখন হইতে কিসে তোমাকে সুখী করিতে পারিব, কিসে তোমার কাতর হৃদয়কে প্রফুল্ল করিতে পারিব, কিসে তোমার হৃদয়কে আনন্দময় করিতে পারিব, ইহাই আমার জীবনের চেষ্টা, লক্ষ্য, বাসনা, এবং প্রতিজ্ঞা

হইয়াছে। অন্য সাধ আমার জীবনে নাই। তোমার সুখ ভিন্ন, তোমার আনন্দ ভিন্ন, আমার প্রাণের আর কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। তুমি দেবতা; আমি দেবসেবায় আমার দেহ, মন, প্রাণ সমর্পণ করিয়া আছি। আমার আর স্বতন্ত্রতা নাই। সার্থক আমার জীবন, সার্থক আমার জন্ম। আমার দেবতা আমার পূজায় পরিতুষ্ট হইয়াছেন। আমার প্রাণের প্রাণের বিরস বদনে এখন হাস্যের জ্যোতিঃ দেখা যায়, আনন্দ তথায় এখন খেলা করে এবং সুখ তথায় এখন বিচরণ করে।"

তখন সুরবালা সেই নিশানাথ-বিরাজিত হৈম-করোজ্জ্বল গগনতলে অশ্রুময়-নয়নে সেই স্থানে উপবেশন করিয়া, উভয় বাহুতে রমাপতির পদদ্বয় ধারণ করিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—"আমার ভক্তি ও মুক্তি, সুখ ও স্বর্গ, আশা ও সম্পদ্ সকলই তুমি। আমি তোমারই দয়ায়, তোমারই চরণ-প্রসাদে ধন্য হইয়াছি। আমার দ্বারা—তোমার এই সামান্য দাসীর সামান্য সেবায় তোমার প্রাণে আবার আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে। এ অধম দাসীর পক্ষে ইহার অপেক্ষা আর কিছু প্রার্থনীয় আছে কি? তাই বলিতেছি, তোমারই চরণাশীর্ব্বাদে তোমার এ দাসী ধন্য হইয়াছে।"

তখন রমাপতি সেই স্থানে সুরবালার পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার লোচন দিয়া অবিরল-ধারায় অশ্রু ঝরিতেছে। কোথায় এমন লোক আছে যে, এমন অপার্থিব প্রেমের অধিকারী? এমন প্রেম স্বর্গে আছে কি? এ সংসারে, রমাপতি, তুমিই ভাগ্যবান্। সুরবালা আবার বলিতে লাগিলেন,—"আমার যাহা ব্রত, তাহার শেষ নাই—সীমা নাই। তোমাকে সুখী করাই আমার যোগ ও সাধনা। কিন্তু সুখের তো সীমা নাই। তোমাকে সুখী করিতেছি বটে, কিন্তু সুখের সর্ব্বোচ্চ সোপানে না উঠিতে পারিলে, তোমার এই সেবিকার পরিতৃপ্তি নাই। যদি কখন দিদির সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব হইত, তাহা হইলে তোমাকে আরও সুখী করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা তো হইবার নহে। যদি নিজ প্রাণের বিনিময়েও সেই ভাগ্যবতীর সাক্ষাৎ-লাভ ঘটিত, তাহা হইলে তোমার দাসী এখনই তাহা সম্পন্ন করিত।"

তখন রমাপতি বলিলেন,—"সুরবালা! তোমার কামনা অতুলনীয়। জগতে এমন প্রেমের তুলনা নাই। তোমারই কৃপায়, যে অভাগা ছিল, সে এখন পরম ভাগ্যবান্। একদা এ হৃদয় সুকুমারীময় ছিল সন্দেহ নাই, এখনও হৃদয় যে সুকুমারীর স্মৃতি বিসর্জ্জন দিয়াছে, এমন নহে, এবং কখন স্মৃতি হইতে যে সে মূর্ত্তি বিলুপ্ত হইবে, এমনও বোধ হয় না। কিন্তু সুরবালা, এখন তুমিই আমার জীবন ও মরণ, আশা ও নিরাশা, সম্পদ ও বিপদ্ সকলই। এ জীবন তোমারই চেষ্টায়, তোমারই কৃপায়, তোমারই জন্য রক্ষিত। সুরবালা! যদি তুমি আমার শুষ্কহৃদয়ে অজস্রধারে শান্তিসুধা না সেচন করিতে, যদি তুমি এ দগ্ধ-তরুতে প্রেমের কুসুম না ফুটাইতে, যদি তুমি এ অন্তর-প্রান্তরে আনন্দের নদী না বহাইতে, তাহা হইলে এত দিন আমার কি দুর্গতি হইত? যে দেবী আমার ন্যায় হীনজনের প্রতি কৃপা করিয়া তাহাকে সুখ-সাগরে ভাসাইয়াছেন, তিনিই তাহাতে সকল প্রবৃত্তি সজীব রাখিয়াছেন। সুকুমারী মৃত্যুকবলিত হইলেও আমার হৃদয়ে তিনি যে এখনও বাঁচিয়া আছেন, সে কেবল তোমারই যত্নে, এবং তোমারই বাসনায়। আমি এখন যে প্রেমের অধিকারী, আমার সৌভাগ্য-ক্রমে যে আনন্দ-সাগরে আমি এখন ভাসিতেছি, মানবজন্ম লাভ করিয়া কেহ কখন কোথায়ও তাহা পায় নাই। এমন প্রেমে যে মত্ত, এমন সুখে যে ভাসমান, আর কোন স্মৃতিই তাহার থাকা সম্ভব নহে। তথাপি তাহা তোমারই চেষ্টায় এখনও আমার হৃদয় ত্যাগ করে নাই। কিন্তু সুরবালা, তুমি ভিন্ন এখন আমার গতি নাই। আমার হৃদয়ে যে সুকুমারীমূর্ত্তি আছে, তাহা তোমার দ্বারাই অনুপ্রাণিত, তোমার তেজে তাহা তেজোময়, তোমার প্রেমে তাহা প্রেমময়। এখন আমার সুকুমারী স্বতন্ত্র সুকুমারী নহে। এখন আমার সুরবালা ও সুকুমারী অভিন্ন ও এক। এখন সুরবালা যদি সুকুমারী না হয়, তাহা লইয়া আমার এক দিনও চলিবে না, এবং যদি আমার সুকুমারী সুরবালাময়ী না হয়, তাহা হইলে তাহা লইয়াও আমি এক দিনও থাকিব না। অতএব দেবি! তোমার কৃপায় আমি আমার হারা-ধন-সুকুমারীকে অনেক দিন পাইয়াছি। যাহার স্বতন্ত্রতা নাই, তাহা স্বতন্ত্ররূপে পাইবার বাসনা কখন এ ভাগ্যবান্ মানবের মনেও হয় না।"

সে দিন আর যে সকল কথা হইল, তাহা লিপি-বদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই। এই স্বর্গীয় প্রেমের আদর্শ-দম্পতি বহুক্ষণ প্রাণে প্রাণে মিশাইয়া সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

অদ্য কালীর ফাঁসী। পূর্ব্বদিবসেই আলিপুর জেল-খানার প্রাঙ্গণে এই ভয়ানক ব্যাপার-সংসাধনোপযোগী সমুদয় আয়োজন হইয়াছে। সেই জীবনান্তক, প্রকাশ্যরূপে মানব-প্রাণবিনাশক ভয়ানক যন্ত্র সদর্পে আপনার বিকট বাহু উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সর্ব্বলোক-সমক্ষে মনুষ্যঘাতক, অধম-জীবিকাবলম্বিত, হৃদয়হীন জল্লাদ বুক ফুলাইয়া বেড়াইতেছে, স্বয়ং জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরেরা সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত। আর উপস্থিত পুলিসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ইন্স্পেক্টার, সবইন্স্পেক্টার, কয়েক-জন হেড কনষ্টেবল, এবং অনেক কনষ্টেবল। লোকের জীবনরক্ষার জন্য চিকিৎসকের প্রয়োজন, কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে দণ্ডিত ব্যক্তির জীবনান্ত সংঘটিত হইয়াছে কি না, তাহারই সমর্থন করিবার নিমিত্ত স্বয়ং ডাক্তার সাহেব উপস্থিত। সুতরাং ফাঁসীর ঘটা খুব। চারিদিকে অনেক লোক। লোকে প্রায় তাবৎ প্রাঙ্গণ ছাইয়া গিয়াছে। অনেক লোক এই ঘটনাস্থলে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে না পাইয়া বাহিরে গাছের উপর ও অট্টালিকার চূড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের আগ্রহই বা কত। যেন আজি এখানে কি উৎসবই হইবে এবং তাহা দেখিতে না পাইলে তাহাদের জীবন ও জন্মই বিফলে যাইবে। ধন্য মানবের অদম্য কৌতূহল! যে ব্যাপার-স্মরণে শরীর শিহরে, যে লোমহর্ষণ কাণ্ড মনে করিলে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে, এবং যাহার আলোচনা করিলে প্রাণ ব্যাকুল হয়, সেই বিকট দৃশ্য দেখিবার জন্য এত লোক-সমারোহ হইয়াছে। এক জন মানব—সজীব, সচল, এবং সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত মানব রাজকীয় শক্তির বিরোধে প্রতিকূলচেষ্টা নিতান্ত নিষ্ফল হইবে জানিয়া, যৎপরো-নাস্তি অনিচ্ছা সত্ত্বেও অবনতমস্তকে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিবে; এই অচিন্তনীয় দৃশ্য দেখিবার জন্য তথায় লোকে লোকারণ্য। এরূপ বিসদৃশ দৃশ্য দর্শনে হৃদয়ের কোমলতা বিধ্বংসিত, এবং পরুষতা সংবর্দ্ধিত হয়, তাহার কোনই সন্দেহ নাই। তবে জগতের কিছুই নিরবচ্ছিন্ন অকল্যাণকর নহে। নিপাতকারী হলাহলেরও রোগাপনোদনের শক্তি আছে। তাদৃশ চক্ষে এ কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে অনুমিত হইতে পারে যে, এতাদৃশ ব্যাপার সম্বন্ধে কৌতূহল নিবারণ করিলে দর্শকের হৃদয়ে উপস্থিত দৃশ্য নিতান্ত বদ্ধমূল হইয়া স্থায়ী অঙ্কপাত করে, এবং তাহাতে সমাজের প্রভূত হিত সংসাধিত হয়। কিন্তু যাহারা এই জন্য প্রস্তুত হইয়া, যাতায়াত-ক্লেশ স্বীকার করিয়া, হয় তো কিঞ্চিৎ অর্থব্যয়, সময়নাশ ও কার্য্যক্ষতি করিয়া এই কাণ্ড দেখিতে যায়, তাহাদের কেহই ইহার ফল-স্বরূপে পরিণামে সমাজের হিত সাধিত হইবে, বা হৃদয়ে স্থায়ী অঙ্কপাত হওয়া আবশ্যক ভাবিয়া কখনই যায় না। সুতরাং নিতান্ত জঘন্য-কৌতূহল-নিবৃত্তি ভিন্ন ইহার অন্য কোন কারণ নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। মনুষ্য যে পশুরই রূপান্তর, এবং মানব-হৃদয় যে এখনও পাশব-প্রবৃত্তির নিতান্ত বশীভূত, এইরূপ নিষ্ঠুরতায় উৎসাহ তাহার এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

আর অল্পকাল পরেই কালীকে ঐ সম্মুখস্থ মরণ-যন্ত্রে লম্বিত হইয়া জীবন ত্যাগ করিতে হইবে। রোগ বা কোন নৈসর্গিক নিয়মানুসার তাহার দেহ ও আত্মার চিরবিচ্ছেদ ঘটিবে না। মানব আত্মকৃত ব্যবস্থাবলে প্রকাশ্যরূপে বলপূর্ব্বক তাহাকে হত্যা করিবে। যে অত্যুৎকট অচিন্তনীয় পাপে তাহার হস্ত কলঙ্কিত হইয়াছে, যে নৃশংস কার্য্য সমাধা করিয়া সে সমাজের বিরুদ্ধে ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছে, মানব-সমাজ তাহার শাস্তিস্বরূপে এই দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, সমাজ-সংস্থিতির জন্য পাপীর শাস্তি-বিধান নিতান্তই আবশ্যক। সংসারের পাপস্রোত মন্দীভূত করিবার জন্য পাপাসক্তের বিহিত দণ্ড সতত ও সর্ব্বত্র প্রয়োজনীয়। কালীর পাপানুরূপ শাস্তি-প্রয়োগের অভিপ্রায়েই আজি তাহাকে বিগতজীব করিবার আয়োজন করা হইয়াছে। মানবকৃত বিধিব্যবস্থায় ইহাই তাদৃশ মহাপাপীর চূড়ান্ত শাস্তি বলিয়া স্থিরী-কৃত হইয়া আছে।

কেহ কেহ এ স্থলে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, এইরূপে প্রাণনাশ করিলেই কি এতাদৃশ ঘোর পাপীর পাপোচিত শাস্তি হইয়া থাকে? তাঁহারা বলেন, ভোগের পরিমাণানুসারে শাস্তির গুরুতা ও লঘুতা স্থিরীকৃত হওয়া উচিত। কালীর ন্যায় পাপীয়সীর বহুকাল ধরিয়া শাস্তিভোগ করা আবশ্যক, এবং সে শাস্তির জ্বালা তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে ও হাড়ে হাড়ে মিশিয়া যাওয়া বিধেয়। যত দিন সে বাঁচিবে, তত দিন কদাচ যাহাতে এ শাস্তির কথা, এ যন্ত্রণার স্মৃতি সে একবারও ভুলিতে না পারে, এমন কোনও সাজা তাহার ন্যায় পাতকীর জন্য নির্দ্ধারিত ও অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। অধুনা তাহার নিমিত্ত যে শাস্তির ব্যবস্থা হইতেছে, বলিতে গেলে তাহা কেবল দুই মিনিটের শাস্তি। কয়েক দিন —সত্যই কয়েকটি দিনমাত্র দণ্ডিত ব্যক্তি একটা

দুরন্ত বিভীষিকায় উৎপীড়িত হয় বটে; কিন্তু তাহার পর দুই মিনিটে—কেবল ক্ষুদ্র দুই মিনিটের মধ্যে তাহার সকল বিভীষিকা ও শাস্তির অবসান হইয়া যায়। এত বড় অপরাধী, কেবল দুই মিনিটের শাস্তিভোগের পর সকল যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিস্তার-লাভ করে, এবং তখন সে মানব-সমাজের তিরস্কার ও পুরস্কার, আনন্দ ও বিষাদ, সম্পদ্ ও বিপদ্, সুখ ও দুঃখ, জ্বালা ও শান্তি, হাস্য ও রোদন সকল ব্যাপারেরই হাত ছাড়াইয়া যায়। এরূপ দুষ্কৃতির সহিত তুলনা করিলে তস্কর, দস্যু, প্রবঞ্চক প্রভৃতির অপরাধ নিতান্তই লঘু বলিয়া মনে হয়; কিন্তু তাহাদেরও বহুকাল ধরিয়া অতি কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হয়; অথচ এমন ভয়ানক পাপী কয়েক দিনের ভয় ও দুই মিনিটের যাতনা ভোগ করিয়া আমাদের হাত হইতে পার পাইয়া যায়, ইহা বস্তুতই নিতান্ত হাস্যজনক অব্যবস্থা।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, কালী যে পাপ করিয়াছে, তাহার জন্য তাহাকে দুই মিনিটের বেশী শাস্তি ভোগ করিতে হইল না সত্য, কিন্তু সে মানব-হৃদয়ে যে ভয়ের সঞ্চার করিয়া রাখিয়া গেল, লোক-সমূহকে যে শিক্ষা দিয়া গেল, তাহার জন্য চিরদিনই সমাজের প্রভূত কল্যাণ হইবে। কথাটা অবশ্যই স্বীকার্য্য; কারণ, মরণের অপেক্ষা মরণের ভয়টা বড়ই ভয়ানক। কালী মরিয়া নিজে যত যাতনা ভোগ করুক বা না করুক, তাহার এইরূপ মৃত্যু বলিয়া লোকের মনে এইরূপ কার্য্যের এই ফল দেখিয়া যে এক ভয় ও সাবধানতা জন্মিবে, সমাজের পক্ষে তাহা বড়ই কল্যাণকর। কিন্তু তাহাতে কালীর কি? তোমার কল্যাণ বা অকল্যাণ কালী তো আর দেখিতে আসিবে না; তাহার এত বড় পাপে তোমরা যে দুই মিনিটের শাস্তি দিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতেছ, তাহার যুক্তি কোথায়? কেন, তাহার অপরাধের অনুরূপ সাজা কি তোমরা দিতে জান না? একটা বেগুণ চুরি করিলে তোমরা তাহার নাকে দড়ি দিয়া ঘানিতে ঘুরাইতে পার, আর এইরূপ পতিহন্ত্রীকে দুই মিনিটের বেশী সাজা দিতে পার না? পরকালে কি হইবে, তাহা ভাবিয়া সাজার হ্রাসবৃদ্ধি করিতে তোমার কোন অধিকার নাই; কারণ, পরকালে কি হইবে, তাহা জানিতে তোমার হাইকোর্টের জজদেরও কোন ক্ষমতা নাই। যাহা কেহ জানে না ও বুঝে না, তাহা হিসাবে ধরা যায় না। সুতরাং পরকালের কথা ছাড়িয়া দিয়া, আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি, ফাঁসীর পূর্ব্বে কয়দিনের ভয়ই ইহকালে কালীর দণ্ডের প্রধান অংশ। কিন্তু এই কি সাজার চূড়ান্ত? ইহার চেয়ে কঠিন সাজা কি আর হইতে পারে না? অবশ্যই কঠিনতর সাজা উদ্ভাবিত হইতে না পারে, এমন নহে। যেমন অপরাধ, তাহার তেমনই দণ্ড হইলে লোকশিক্ষারও ব্যাঘাত হইবে না, এবং ন্যায়েরও সম্মান রক্ষিত হইবে।

কেহ কেহ ইহার অপেক্ষা আরও এক শক্ত কথা বলেন। তাঁহারা বলেন, যাহা তুমি দিতে পার না, তাহা লইবার তুমি কে বাপু? তোমার শত শত জজ, শত শত আদালত, শত শত পার্লেমেণ্ট, এবং শত শত রাজারাণী মিলিয়া, শত শত বৎসর ভাবিলেও, একটা মানুষ তৈয়ার করিবার আইন করিতে পারেন কি? তাহা পারেন না। যাহা গড়িবার তোমাদের ক্ষমতা নাই, তাহা ভাঙ্গিতে তোমরা এমন তৎপর কেন? এমন করিয়া আইনের দোহাই দিয়া, নিয়ত মানুষ খুন করিতে তোমাদের অধিকার কি?

কেহ কেহ আরও একটা গুরুতর কথা উত্থাপন করেন। তাঁহারা বলেন, যাহারা একবার পাপ করিয়াছে, তাহারা কি আর কখন ভাল হইতে পারে না? একবার যাহার পদস্খলন হইয়াছে, আবার কি সে সাবধান হইয়া চলিতে পারে না? যদি তাহা সম্ভব হয়, তাহা হইলে ভাবিয়া দেখ, এরূপ অন্যায় নরহত্যায় জগতের যে কত সর্ব্বনাশই ঘটিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। হয় তো সেই মহাপাপী বাঁচিয়া থাকিলে হৃদয়ের এমন উন্নতি করিতে পারিত, হয় তো সে সংসারের জ্ঞান ও সৌভাগ্যবৃদ্ধির এমন সহায় হইত যে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তুমি তাহার অপরাধানুরূপ ভাল শাস্তি দিতে পারিলে না, অথচ তাহার আত্মোন্নতি-সাধনের কোন সুযোগ করিতে দিলে না, তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে তাহাকে অবসর দিলে না, এবং তাহা দ্বারা জগতের কোন হিত সংঘটিত হইতে পারিত, তাহাও হইতে দিলে না। ইহার নাম বিচার না বিচারের ব্যভিচার?

কিন্তু আমরা অপ্রাসঙ্গিক কথায় বহুস্থান ব্যয় করিয়াছি। ফাঁসী বিধেয় হউক না হউক, কালীর আজি ফাঁসী। সব প্রস্তুত, নির্দ্ধারিত সময়ও প্রায় উপস্থিত। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর একবার পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিলেন; তাহার পর জেলখানার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, কারাগারের সেই লৌহদ্বারের মধ্য হইতে বহু কনষ্টেবল এক অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোককে বেষ্টন করিয়া লইয়া আসিতেছে। সকলের দৃষ্টি সেই দিকে সঞ্চালিত

হইল। চারিদিক্ হইতে 'আসিতেছে, ঐ আসিতেছে', শব্দ উঠিল। ক্রমে পশ্চাদ্দিকে হাতকড়ি দ্বারা নিবদ্ধহস্ত আসামী কনষ্টেবল-বেষ্টিত হইয়া বধ্যভূমির নিকটস্থ হইল। অতি নির্ভীক পাদবিক্ষেপে সেই লোক-সমুদ্রমধ্যে অবগুণ্ঠনবতী অগ্রসর হইতে লাগিল, সে যথাস্থানে উপস্থিত হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"আইন অনুসারে এখনই তোমার ফাঁসী হইবে, তাহা তুমি জান। এখন তুমি কিছু বলিতে চাহ কি?"

কনষ্টেবলগণ চারিদিকের কোলাহল নিবারণের জন্য 'চুপ চুপ' শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। সমাগত লোকসকল রুদ্ধনিঃশ্বাসে হত্যাকারিণী কালীর উত্তর শুনিবার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল। তখন কালী অতি মধুর, কোমল ও ভীতিশূন্য স্বরে উত্তর দিল,—

"আমার অঙ্গে করস্পর্শ না হয়, এইরূপ ভাবে একবার আমার মুখের কাপড় খুলিয়া দিতে আজ্ঞা করুন।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসামীর বাসনানুযায়ী আদেশ করিলে, এক জন কনষ্টেবল সাবধানতা সহকারে তাহার মুখের কাপড় খুলিয়া দিল। কিন্তু এ কি! সাক্ষাৎ স্বর্গকন্যা! ম্যাজিষ্ট্রেট সেই কামিনীর মূর্ত্তি দেখিয়া চমকিত হইলেন। রমণী সুন্দরীর শিরোমণি। সুন্দরী ধীরে ধীরে চারিদিকে মুখ ফিরাইলেন। তাঁহার নিষ্পাপ বদন-শ্রী, অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও অপার্থিব সৌকুমার্য্য দেখিয়া দর্শকগণ অবাক্ হইল। সেই সৌন্দর্য্যের উজ্জ্বলতায় সেই ঘৃণিত বধ্যভূমিও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সকলেই ঘোর বিস্ময়াকুল! তখন জজ সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কানে কানে বলিলেন,—

"এ কি এ? আমি যে আসামীর উপর ফাঁসীর হুকুম দিয়াছি, এ কখনই সে নহে!"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন,—

"তাই তো, আমি যে আসামীকে দায়রা সোপরদ্দ করিয়াছি, এ কখনই সে নহে!"

পুলিস-সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলিলেন,—

"আমি যে আসামীকে দুই তিন দিন হাজতে দেখিয়াছি, এ কখনই সে নহে!"

ইন্স্পেক্টর বলিলেন,—

"আমি যে আসামীর জবানবন্দী লইয়া গ্রেপ্তার করিয়াছি, এবং বার বার যাহাকে দেখিয়াছি, এ কখনই সে নহে!"

ম্যাজিষ্ট্রেট নিতান্ত উৎকণ্ঠিতভাবে বলিলেন,—

"তাহা হইলে নিশ্চয়ই একটা বিষম ব্যাপার ঘটিয়াছে, এখন উপায়?"

জজ সাহেব বলিলেন,—

"আপাততঃ ফাঁসী বন্ধ রাখিয়া, তদারক করা আবশ্যক।"

তখন সুন্দরী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসিলেন,—

"আমি এখন ফাঁসীকাষ্ঠে উঠিব কি?"

"ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন,—"না, তোমাকে ফাঁসীতে উঠিতে হইবে না। তুমি যে এ মোকদ্দমার আসামী কালী নহ, তাহা স্থির। কালী কোথায়, এবং তাহার কি হইয়াছে, তাহা তুমি অবশ্যই জান। তুমি কালীকে বাঁচাইবার জন্য যে পথ অবলম্বন করিয়াছ, তাহাতে আইনের চক্ষে তোমার অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ ঘটিয়াছে। এখনই তোমার অপরাধের যথাবিহিত তদারক হইবে। তাহার পর তোমার বিচার হইয়া শাস্তি হইবে। আপাততঃ কনষ্টেবলেরা, তুমি যেখানে ছিলে, সেইখানেই তোমাকে রাখিয়া আসুক।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এইরূপ আদেশ দিলে কনষ্টেবলগণ আবার সেই সুন্দরীকে সঙ্গে লইয়া জেলে ফিরিল, তাহার সঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, পুলিস-সাহেব এবং ইন্স্পেক্টার বাবুও চলিলেন।

ফাঁসী বন্ধ হইয়া গেল। যাহারা বড় সাধ করিয়া ফাঁসী দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা বড় দুঃখিত হইয়া বাড়ী ফিরিল। বাটী ফিরিবার সময় লোকে নানারূপ কল্পনা করিতে লাগিল। কেহ বলিল,—"কালী অনেক তন্ত্র-মন্ত্র জানিত। সে মন্ত্রের জোরে চেহারা বদ্লাইয়া ফাঁসী হইতে বাঁচিয়া গেল।" কেহ মহাবিজ্ঞের মত বলিল,—"আরে না হে না, তাকে ফাঁসী দেওয়া ইংরাজ কোম্পানীর ক্ষমতা নয়। দেখিলে, এক নজরায় সকলের মুণ্ডু ঘুরাইয়া দিল।" আর এক জন বলিল,—"এ সকলই দেবতার কৃপা। দেবতা নহিলে এমন করিয়া বাঁচাইতে পারে কে? দেখিলে না, মেয়েটার চেহারা? মানুষের কি কখন এমন চেহারা হয়!" কেহ বলিল,—"দাদা, ঐ যে পুলিস, ওদের পায়ে নমস্কার! এ সকলই জানিবে পুলিসের খেলা। পুলিস টাকা খাইয়া এই বিভ্রাট বাধাইয়াছে। তাহা না হইলে যেখানে মাছিটি পর্য্যন্তও যাইবার যো নাই, সেই জেলখানার ভিতরে এমন কাণ্ড ঘটায় কে?" মীমাংসা নানারূপ।

একাদশ পরিচ্ছেদ

যে দিন কালীর ফাঁসী হইবার কথা, তাহার চারি দিন পূর্ব্ব হইতে একটা গুরুতর বৈষয়িক মোকদ্দমা উপলক্ষে রমাপতি বাবু কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছেন। চৌরঙ্গীতে তাঁহাদের এক প্রকাণ্ড বাড়ী আছে; তিনি বহু লোকজন সঙ্গে লইয়া সেই বাটীতে বাস করিতেছেন। আলিপুর ও কলিকাতার উচ্চপদস্থ বিস্তর সাহেব ও বড়লোকের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। বিশেষতঃ আলিপুরের তখনকার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত তাঁহার সম্প্রীতি ছিল। কালীর ফাঁসী হইবার দিন সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব রমাপতি বাবুর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রমাপতি তাঁহাকে বিশিষ্ট সমাদর সহকারে অভ্যর্থনা করিয়া স্বাস্থ্যাদি-বিষয়ক শিষ্টাচার-সূচক জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সমুচিত শিষ্টাচার প্রকাশ করিয়া, যে উদ্দেশে তিনি আসিয়াছেন, তাহা ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন,—

"আপনার দেশের কালীর ফাঁসী উপলক্ষে যে অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়াছে, তাহা আপনি শুনিয়াছেন বোধ হয়।"

রমাপতি বাবু সে সকল ব্যাপারের কিছুই জ্ঞাত ছিলেন না। তিনি সাহেবকে সেইরূপ বলিলে, সাহেব সমস্ত ব্যাপার পরিষ্কাররূপে বর্ণনা করিলেন। সমস্ত কথা শুনিয়া রমাপতি বাবু নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, এবং সেই স্ত্রীলোককে দেখিবার নিমিত্ত অত্যন্ত কৌতূহল প্রকাশ করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন,—

"আমি তাহাই আপনাকে বলিতে আসিয়াছি, এই অল্পসময়ের মধ্যে যতদূর সম্ভব, তদারকের কোন ত্রুটি করা হয় নাই। আমি স্বয়ং এবং পুলিস নিয়ত ইহার তদন্তে নিযুক্ত রহিয়াছি। কিন্তু কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না—আমার বোধ হয়, আপনার দেশের কোন লোক ইহাতে লিপ্ত আছে; এজন্য আপনি একবার দেখিলে হয় তো সহজেই সকল কথা বাহির হইয়া পড়িবে; নিতান্তপক্ষে তদন্তের সুবিধা-জনক অনেক কথা ব্যক্ত হইবে বলিয়াই আমার ভরসা আছে।"

রমাপতি বলিলেন,—

"বেশ কথা। একবার কেন, আবশ্যক হইলে, আমি বহুবার তথায় যাইতে প্রস্তুত আছি। আমি জেলখানায় যাইলে যাহাতে সেই স্ত্রীলোকের কামরায় যাইতে পারি, এবং তাহার সহিত আবশ্যকমত কথাবার্ত্তা কহিতে পারি, আপনি দয়া করিয়া জেলর সাহেবকে তাহার বিহিত উপদেশ দিবেন। আমি কল্য প্রাতেই সেখানে যাইব।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন,—

"আপনি এ জেলার এক জন অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, এবং সর্ব্ববিধ রাজকীয় অনুষ্ঠানের ও সাধারণ-হিতকর কার্য্যের প্রধান উদ্যোগী। সুতরাং আবশ্যক ও ইচ্ছা হইলে, জেল পরিদর্শন করিতে আপনার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তথাপি এ সম্বন্ধে অদ্য রাত্রেই জেলরকে এক বিশেষ পত্র দ্বারা আমি উপদেশ প্রদান করিব।

তা ছাড়া আপনি আমার এই কার্ডখানি রাখিয়া দিউন। ইহার পৃষ্ঠে আমি স্বতন্ত্ররূপ আদেশ লিখিয়া দিতেছি। ইহা আপনার নিকটেই থাকিবে। আবশ্যক হইলে এই কার্ড হাতে দিয়া, আপনি অপর কোন ব্যক্তিকেও সেখানে পাঠাইতে পারিবেন।"

কথা-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব পেন্‌সিল দ্বারা কার্ড-পৃষ্ঠে স্বীয় আদেশ লিখিয়া তাহা রমাপতি বাবুর হস্তে প্রদান করিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন,—

"আপনার অনুসন্ধানের ফল জানিবার নিমিত্ত আমি উৎসুক থাকিব। হয় তো কালি প্রাতে আমিও জেলখানায় যাইতে পারি।"

রমাপতি বাবু বলিলেন,—

"আপনার যাওয়া হয় তো ভালই; না হইলে আমি জেলখানা হইতে ফিরিবার সময় আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিব।"

তাহার পর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বিহিত-বিধানে বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

পরদিন প্রাতে বেলা আটটার সময়, রমাপতির অশ্বদ্বয়-বাহিত ব্রুহাম আসিয়া জেলখানার দ্বারে উপস্থিত হইল। তিনি গাড়ী হইতে নামিবার পূর্ব্বেই জেলর সাহেব ছুটিয়া আসিয়া, তাঁহার সমীপস্থ হইলেন, এবং বিশেষ সম্মান সহকারে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। রমাপতি বাবু পকেট হইতে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব-প্রদত্ত কার্ডখানি বাহির করিয়া, জেলরের হস্তে দিবার পূর্ব্বেই তিনি বলিয়া উঠিলেন,—

"থাকিতে দিন—উহা আপনার নিকটেই থাকিতে দিন। যদি মহাশয় অন্য কোন লোক পাঠান, তাহা হইলে তাহার হস্তে ঐ কার্ডখানি থাকা আবশ্যক হইবে। এ সম্বন্ধে কল্য রাত্রে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব পত্র দ্বারা আমাকে তাঁহার আদেশ জানাইয়াছেন।

এক্ষণে আমি মহাশয়ের আজ্ঞার অধীন। আপনি একাকী কি অপর লোক সঙ্গে লইয়া আসামীর ঘরে যাইবেন, আজ্ঞা করুন।"

রমাপতি বাবু বলিলেন,—

"আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বে আমার অনেক কথা জিজ্ঞাস্য আছে। আপনি প্রথমে আমাকে বলুন, সে স্ত্রীলোক সারাদিন কি করে?"

জেলর বলিলেন,—

"তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না। কারণ, সে যেরূপ লজ্জাশীলা ও কোমলস্বভাবা, তাহাতে তাহাকে কোন ভাল ঘরের মেয়ে বলিয়াই আমার বোধ হইয়াছে। এজন্য সারাদিন তাহার ঘরে উঁকি দিয়া দেখা আমার নিষেধ আছে। বোধ হয়, সে সারাদিন চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।"

রমাপতি বলিলেন,—

"ভাল, দুই চারি দিনের মধ্যে জেলখানার নিকটে কোন নূতন লোক দেখা গিয়াছে কি?"

জেলর একটু চিন্তার পর বলিলেন,—

"আজি চারি পাঁচ দিন হইতে এক জন সন্ন্যাসী জেলখানার বাহিরে বটগাছতলায় বাসা করিয়া আছে দেখিতেছি। আর কোন বিশেষ লোক আমরা লক্ষ্য করি নাই।"

রমাপতি আবার জিজ্ঞাসিলেন,—

"সন্ন্যাসী এ কয় দিন এখানে বাসা করিয়া আছে, আপনি তাহার সহিত কোন দিন কোন কথা কহিয়াছেন কি?"

জেলর বলিলেন,—

"না। আমি তাহার সহিত এ কয় দিন কোন কথা কহিবার আবশ্যকতা অনুভব করি নাই; অন্তও কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না। কারণ, সে ব্যক্তির সহিত এ ব্যাপারের কোন সম্পর্ক থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব।"

রমাপতি বলিলেন,—

"তাহা তো আমিও বুঝিতেছি, ; তথাপি আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি, সে সন্ন্যাসী এত দিন কোথায় থাকিত, তাহা আপনি জানেন কি?"

জেলর বলিলেন,—

"আমি রামদীন নামে পাহারাওয়ালার নিকটে তাহার অনেক সন্ধান লইয়াছি। শুনিয়াছি, সে সন্ন্যাসী নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। সে কোন স্থানে স্থির হইয়া থাকে না। হয় তো সে আবার আজিই এখান হইতে চলিয়া যাইতে পারে।"

রমাপতি আবার জিজ্ঞাসিলেন,—

"তা যায় যাউক; কিন্তু এত দেশ থাকিতে সে এই জেলখানার নিকটেই আড্ডা গাড়িয়া বসিল কেন, তাহার কোন সন্ধান আপনি বলিতে পারেন?"

"তাহা ঠিক জানি না। বোধ হয়, এ স্থানটা অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন বলিয়া সে এখানেই বাসা করিয়াছে।"

"সে সারাদিন কি করে, জানেন কি?"

সারাদিন তাহার কাছে বিস্তর লোক থাকে দেখি, শুনিয়াছি, সে অনেক আশ্চর্য্য ঔষধ জানে, সে লোকদের দেয়।"

"তাহাই যদি তাহার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে লোকালয়ের আরও নিকটে তাহার থাকা উচিত ছিল। এরূপ এক প্রান্তে থাকিয়া ঔষধ-বিতরণ বিশেষ সুবিধাজনক বোধ হয় না। সে যাহা হউক, আসামী কালী যখন জেলে ছিল, তখন কেহ কোন দিন তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল কি?"

"হাঁ, এক দিন তাহার খুড়া একা, আর এক দিন সে তাহার এক কন্যাকে সঙ্গে লইয়া কালীকে দেখিতে আসিয়াছিল।"

আবার রমাপতি বাবু জিজ্ঞাসিলেন,—

"সেই খুড়া ও তাহার কন্যা যখন কালীর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল, তখন আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন কি?"

"আমি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলাম।"

"সেই কন্যা ঘোমটা দিয়া আসিয়াছিল, কি তাহার মুখ খোলা ছিল?"

"ঘোমটা দেওয়াই ছিল।"

"আপনি একবারও তাহার মুখ দেখিতে পান নাই?"

"না, বরাবরই তাহার মুখ ঢাকা ছিল।"

"তবে সে কি জন্য দেখা করিতে আসিয়াছিল? সে যদি একবারও মুখ না খুলিল, তবে তাহার আসিবার কি দরকার ছিল? সে কথা যাউক, কালী কি সারাদিন মুখ ঢাকিয়া থাকিত, না মুখ খুলিয়া থাকিত?"

"প্রায়ই মুখ ঢাকিয়া থাকিত।"

"ফাঁসীর কয় দিন পূর্ব্বে খুড়া ও তাহার কন্যা কালীর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল?"

"আগের দিন।"

"তাহারা কখন্ আসিয়াছিল?"

"সন্ধ্যার একটু আগে।"

"ঠিক ঠিক।"

"কেন, আপনি ইহা হইতে কি মীমাংসা করিতেছেন?"

"কেন আপনি দেখিতেছেন না, আপনাদের চক্ষের উপরই মানুষ বদল হইয়াছে? তাহা হউক। কিন্তু ইহার মধ্যে আশ্চর্য্য কথা এই যে, যে স্ত্রীলোক কালীর বদলে এখন জেলে আছে, সে যদিই কালীর আপনার খুড়তুতো ভগ্নী হয়, তাহা হইলেও এক জনের জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রাণ দিতে যাওয়া সোজা কথা নয়। অতএব হয় সে দেবতা, না হয় পাগল।"

জেলর বলিলেন,—

"এরূপ ঘটনা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু আপনি যেরূপ ভাবে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলেন, আমরা সেরূপ সম্ভাবনা একবারও মনে করি নাই। হয় তো আপনিই কৃতকার্য্য হইবেন।"

রমাপতি বাবু বলিলেন,—

"আপনি বিশেষ সাবধান হইয়া, জেলখানার বাহিরে গাছতলায় যে সন্ন্যাসী বাসা করিয়াছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই এ কাণ্ডের মধ্যে লিপ্ত আছে। সাবধান! সে যেন পলাইতে না পারে।"

"বলেন কি? সে নেংটা সন্ন্যাসীর সহিত এ কাণ্ডের কোনই সম্পর্ক থাকা সম্ভব বলিয়া আমার ত বোধ হয় না।"

"কোন সম্পর্ক থাকা সম্ভব কি না, তাহা আপনি পরে বুঝিতে পারিবেন। আপাততঃ আমি স্বয়ং আসামীর ঘরের চাবী খুলিয়া একাকী তাহার মধ্যে প্রবেশ করিব। আর কেহ আমার সঙ্গে যাইবার বা থাকিবার দরকার নাই। আপনি আমাকে নিঃশব্দে দূর হইতে সেই ঘরটি দেখাইয়া দিলে বাধিত হইব।"

রমাপতি গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া জেলরের সঙ্গে সঙ্গে জেলখানায় প্রবেশ করিলেন। সেই পাপীর নিকেতন, অধম ও পতিতগণের বাসভূমি, এবং দণ্ডবিধির লীলাক্ষেত্রের মধ্যে রমাপতি কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া চলিতে লাগিলেন। নারীবিভাগে উপনীত হওয়ার পর জেলর সাহেব, রমাপতি বাবুর হস্তে একটি চাবি দিয়া, দূর হইতে একটি প্রকোষ্ঠ দেখাইয়া দিলেন। রমাপতি ধীরে ধীরে সে প্রকোষ্ঠসমীপস্থ হইয়া ধীরে ধীরে সেই চাবি খুলিলেন। ধীরে ধীরে সেই প্রকাণ্ড কবাট খুলিয়া গেল! তখন রমাপতি দেখিলেন—অপূর্ব্ব দর্শন!

দেখিলেন, সেই দ্বারের দিকে সম্মুখ করিয়া, আগুল্‌ফলম্বিত-জটাভার-সমন্বিত, বিভূতিবিলেপিতকায়া, আয়ত-প্রদীপ্ত-লোচন-শালিনী, শান্তিসৌন্দর্য্য-সৌকুমার্য্য-জ্যোতির্ম্ময়ী, ত্রিশূল-ধারিণী এক ভুবনমোহিনী ভৈরবী। কোথায় কালী? কোথায় ম্যাজিষ্ট্রেটবর্ণিত সেই সুন্দরী? রমাপতিকে সম্মুখে দেখিবামাত্র ভৈরবী চমকিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার বদন হইতে একটি অপরিস্ফুট মৃদুধ্বনি বাহির হইয়া পড়িল।

সেই সুকুমার-কায়া সুন্দরী সন্ন্যাসিনী সন্দর্শনে রমাপতিও নিতান্ত বিচলিত-চিত্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিলেন বটে, কিন্তু কি করিতে সেখানে আসিয়াছেন, তাহা তিনি ভুলিয়া গেলেন। কে এ নবীনা সন্ন্যাসিনী? রমাপতির মনে হইতে লাগিল, হয় তো কোথায় যেন তিনি এই ভৈরবীকে দেখিয়াছেন। যেন এই জটাজুটধারিণী সন্ন্যাসিনীর সহিত তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই আলাপ ছিল। যেন এই বিভূতি-সমাবৃত-বদনা সন্ন্যাসিনীর মুখমণ্ডল তাঁহার চির-পরিচিত। কিন্তু কে এ নবীনা সন্ন্যাসিনী? এইরূপ ভৈরবীর সহিত পূর্ব্বপরিচয় নিতান্ত অসম্ভব বোধে রমাপতি ধীরে ধীরে আপনার জ্ঞান ও বুদ্ধিকে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ করিয়া অতি সঙ্কোচসহকারে জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি—আপনি—কালীকে জানেন কি?"

সংক্রুদ্ধস্বরে সন্ন্যাসিনী উত্তর দিলেন,—

"তাঁহার নাম শুনিয়াছি, কিন্তু আলাপ নাই।"

কিন্তু তাঁহার উত্তরের মর্ম্ম তখন কে প্রণিধান করিবে? তাঁহার সেই কণ্ঠস্বর রমাপতিকে নিতান্ত ব্যাকুল করিয়া তুলিল। এ কি কণ্ঠস্বর! এইরূপ স্বর—প্রায় এইরূপ কোমল বীণা-ধ্বনিবৎ মধুর স্বর, রমাপতির প্রাণের নিভৃত কোণে এখনও থাকিয়া থাকিয়া বাজিয়া থাকে। তবে কে এ সন্ন্যাসিনী? আবার রমাপতি নিজের উপর প্রভুতা হারাইয়া কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলেন। আবার কিয়ৎকাল পরে সযত্নে চিত্তকে কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়া তিনি আবার জিজ্ঞাসিলেন—

"আপনি কি আমাকে কখন দেখিয়াছেন?"

যুবতী কথার কোন উত্তর দিলেন না। তিনি অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রমাপতির ব্যাকুল চিত্ত নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিল। তখন তিনি উন্মত্তবৎ নিতান্ত অধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিন্তু বল, তুমি ভৈরবী হও, আর যেই হও, বল, বল; তুমি আমার কে?"

রমাপতি প্রশ্নের কোন উত্তর পাইলেন না, কিন্তু তিনি দেখিলেন, লোচন-প্রবাহিত জলে সেই সন্ন্যাসিনীর সুগোল গৌর গণ্ডের বিভূতি বিধৌত হইতেছে। তখন তাঁহার প্রাণ মাতিয়া উঠিল। তখন নিতান্ত

উন্মাদের ন্যায় উভয় বাহু প্রসারণ করিয়া, 'সুকুমারি, সুকুমারি' শব্দে চীৎকার করিতে করিতে তিনি সেই সন্ন্যাসিনীকে আলিঙ্গন করিবার অভিপ্রায়ে প্রধাবিত হইলেন। তখন সেই নবীনা কয়েক পদ পশ্চাতে সরিয়া আসিয়া, সহসা ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলেন, এবং উভয় হস্তে রমাপতির চরণদ্বয় স্পর্শ করিয়া, রোদন-বিজড়িত-স্বরে বলিতে লাগিলেন,—"আপনি আমার দেবতা, আপনি আমার শ্রেষ্ঠ গুরু। আমি আপনার দাসীর দাসী। কিন্তু প্রেমাবতার প্রভো! আমার এ দেহে এখন আর আমার বা আপনার কোনই অধিকার নাই। অতএব আমাকে আর স্পর্শ করিবেন না।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বেলা সার্দ্ধ দ্বিপ্রহরকালে রমাপতি বাবুর ব্রুহাম সবেগে আসিয়া তাঁহার চৌরঙ্গীস্থ ভবনের গাড়ী-বারান্দায় উপনীত হইতে না হইতে, তিনি বালকের ন্যায় অস্থিরভাবে শকট হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, এবং দৌড়িতে দৌড়িতে পুরমধ্যে সুরবালার সমীপস্থ হইয়া ব্যস্ততাসহ বলিলেন,—"সুরবালা, সুরবালা! যাহা হইবার নহে, তাহাও হইয়াছে। এত দিনে সুকুমারীর সাক্ষাৎ পাইয়াছি। এবার স্বপ্ন বলিতে পারিবে না; ঘুমের ঘোর বলিতে পারিবে না। সুকুমারী এবার সশরীরে দেখা দিয়াছেন।"

সুরবালা সবিস্ময়ে বলিলেন,—"এবার বুঝি তুমি জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিয়াছ; নয় তো তোমার মাথার ঠিক নাই।"

রমাপতি বলিলেন,—"না না সুরবালা, আমি দিব্যজ্ঞানে সম্পূর্ণরূপ জাগ্রত থাকিয়া তোমার সহিত কথা কহিতেছি, অসম্ভব হইলেও আমার কথা মিথ্যা নহে। আমি এখনই সুকুমারীকে দেখিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিয়া আসিতেছি।"

এই বলিয়া রমাপতি বাবু কালীর ফাঁসীর উপলক্ষে এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সমস্তই সুরবালাকে জানাইলেন। তাহার পর পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন, "এই দেখ সুরবালা, আমার হাতে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের পরোয়ানা। আমি সুকুমারীকে কয়েদ হইতে খালাস করিবার জন্য জামিননামায় নাম সহি করিয়াছি। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এই পরোয়ানা দিয়াছেন, ইহা দেখাইলেই জেলের সাহেব সুকুমারীকে ছাড়িয়া দিবেন। আমি এই পরোয়ানা লইয়া জেলখানা হইতে সুকুমারীকে আনিতে যাইতেছি, তুমি আর এক ঘণ্টা অপেক্ষা কর; এখনই সুকুমারীকে তোমার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দিব।"

"বল কি? এবার যেন তোমার কথা অনেকটা সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে। এরূপ সম্ভাবনার অতীত শুভাদৃষ্ট যখন ঘটিয়াছে, তখন দয়াময়! তোমার এ দাসী তোমার চরণে একটি ভিক্ষা না চাহিয়া থাকিতে পারিতেছে না; তুমি তাহাকে তাহা দিবে না কি? এমন শুভদিনে যাচকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না করিলে কর্ম্মের গৌরব হইবে কিসে?"

তখন রমাপতি সাদরে সুরবালার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—"পাগলিনি! তোমাকে দেওয়া হয় নাই, এমন বস্তু আমার আর কি আছে? এখন বল, তোমার কি হুকুম?"

সুরবালা বলিলেন,—"রাগ করিও না—দিদিকে আনিবার জন্য আমি নিজে জেলখানায় যাইব। সেই অতি কদর্য্য স্থানে আমাকে যাইতে হইলে কাজেই বহুলোকের সমক্ষে পড়িতে হইবে। কিন্তু যাহাই কেন হউক না, আমি সেই জেলখানায় না গিয়া ছাড়িব না। যখন সেই পুণ্যবতীর পদরজ সেইখানে পতিত হইয়াছে, তখন সে স্থানের আর অপবিত্রতা নাই। আর লোকের চক্ষে পড়িলে যদি কোন ক্ষতি হয়, আমার তাহাতে কি? সে ক্ষতি লোকের হইবে, তবে কেন আমাকে যাইতে দিবে না?"

রমাপতি বলিলেন,—"কে বলিয়াছে, তোমায় যাইতে দিব না? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যখন আর এক ঘণ্টার মধ্যে ঘরে বসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইবে, তখন নানা অসুবিধার মধ্যে সেখানে তোমার নিজে যাওয়ার প্রয়োজন কি?"

সুরবালা বলিলেন,—"প্রয়োজন যে কি, তাহা কেবল আমার প্রাণ জানে, আমি তাহা বলিয়া বুঝাইতে অক্ষম। রাজভক্তি যে কি, তাহা জান তো?"

রাজার সহিত প্রজার কোন জ্ঞাতিত্ব, কুটুম্বিতা থাকে কি? তাহা থাকে না। তথাপি সেই প্রজারা আবশ্যক হইলে রাজার জন্য অকাতরে প্রাণ পর্য্যন্ত দেয় কেন? কেবল ভক্তিই তাহার কারণ। যে দেবী এখন কারাগারে, তিনি আমার কে? লোকে বলিবে, তিনি আমার কোন আপনার লোক হওয়া দূরে থাকুক, বরং আমার শত্রু। কিন্তু এ সকল লোকের কথা, আমার প্রাণ আমাকে অন্যরূপ উপদেশ দিয়াছে। আমার প্রাণ জানে ও বুঝে, তিনি আমার রাজার রাজা। যিনি আমার রাজা, এ

দাসীর জীবন-মরণ যাহার ইচ্ছার অধীন, যাহার চরণে এ প্রাণ দিবারাত্রি লুঠিয়া বেড়ায়, তাঁহার হৃদয়রাজ্যে যাঁহার রাজত্ব, আমার সেই রাজার রাজ্য, সুদীর্ঘ বন-বাসের পর আবার তাঁহার রাজ্যে ফিরিয়া আসিবেন। তবে বল দেবতা, এমন শুভদিনে আমি রাজরাজেশ্বরীকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া না আনিয়া থাকিতে পারি কি? অতএব আমি আজি এ বিষয়ে কোন আপত্তি শুনিব না। তুমি কোচম্যানকে আর একখানি গাড়ী জুতিতে বল, আমি আবশ্যকমত লোকজন সঙ্গে লইয়া শীঘ্রই বাহিরে যাইতেছি। দেখিও, এক তিলও বিলম্ব হয় না যেন।"

সুরবালা আর কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া প্রকোষ্ঠান্তরে গমন করিলেন। তখন রমাপতি সেই স্থানে দাঁড়াইয়া, বহুদিন যাহা বারবার ভাবিয়াছিলেন, আজি আর একবার তাহাই ভাবিলেন,—'সুরবালা দেবী না মানবী?'

সুরবালার বাসনানুযায়ী আয়োজন সমস্ত প্রস্তুত হইলে, তিনি মাধুরী ও খোকা বাবুকে সঙ্গে লইয়া রমাপতি বাবুর সহিত ব্রুহামে উঠিলেন। দুই জন ঝি ও কয়েক জন দ্বারবান্ স্বতন্ত্র গাড়ীতে উঠিল। তখন রমাপতি বলিলেন,—

"মাধুরী ও খোকাকে রাখিয়া গেলে হইত না?"

সুরবালা বলিলেন,—"কাহার জিনিস আমি রাখিয়া যাইব? উহারা তাঁহারই। যদি তাঁহাকে ঘরে আনিতে পারা যায়, তোমার আমার যত্নে তাহা হইবে না। ভগবানের কৃপায় যদি আমার মনের সাধ পূর্ণ হয়, সে জানিবে, মাধু ও খোকার দ্বারাই হইবে।"

সুরবালা আজি নিরলঙ্কৃতা। তাঁহার পরিধানে একখানি সামান্য বস্ত্র, এবং অঙ্গ ভূষণ-বর্জ্জিত। কেবল বাম হস্তে সধবা-নারীর সকল ভূষণের সার ভূষণ এক 'নোয়া' শোভা পাইতেছে। রমাপতির হৃদয়ে আজি দুর্ব্বিসহ ঝড় বহিতেছে; যাহা কখন মানব-অদৃষ্টে ঘটে নাই, তাহাই আজ ঘটিতেছে; তাঁহার ভাগ্যগুণে মরা মানুষ আজি আবার দেখা দিয়াছে, তাই রমাপতি আজি উন্মাদ। তাই তিনি এতক্ষণ সুরবালার বেশভূষার প্রতি লক্ষ্য করেন নাই। এক্ষণে সহসা সেই মণিমাণিক্যালঙ্কার-বিভূষিত-কায়ার এই বেশ দেখিয়া বলিলেন,—"এ কি সুরবালা, তোমার আজি এ ভিখারিণীর ন্যায় সাজ কেন?"

সুরবালা বলিলেন,—"আমি যাঁহার দাসী, তিনি আজি ভিখারিণী। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার না পরাইলে তাঁহার দাসীর দেহে অলঙ্কার সাজিবে কেন?"

"সুকুমারি! আমি হীন ও অধম বলিয়া যদি আমার প্রতি তোমার কৃপা না হয়, কিন্তু এই সুরবালার মায়া তুমি কেমন করিয়া কাটাইবে?"

গাড়ী ত্বরিত চলিয়া জেলখানার দ্বারে উপনীত হইলে, রমাপতি বাবু তাহা হইতে সত্বর নামিয়া পড়িলেন। জেলর সাহেব তৎক্ষণাৎ সমীপাগত হইলে, রমাপতি বাবু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব-প্রদত্ত পরোয়ানা তাঁহার হস্তে দিয়া বলিলেন,—"পাঠ করুন।"

জেলর সাহেব আজ্ঞাপাঠ করিয়া বলিলেন,—"এ জন্য আপনার এত কষ্ট করিয়া না আসিলেও চলিত। এই পরোয়ানা পাঠাইয়া দিলেই আমি স্বয়ং অথবা উপযুক্ত লোক সঙ্গে দিয়া আসামীকে আজ্ঞামত স্থানে পাঠাইয়া দিতাম।"

"তাহা আমি জানি; তথাপি সে কেন আসিয়াছি, তাহা আপনি ক্রমশঃ জানিতে পারিবেন। আমি একা আসি নাই। এই গাড়ীতে আমার স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা আছেন। তাঁহারা সকলেই আসামীকে জেলখানা হইতে মুক্ত করিয়া সঙ্গে লইয়া আসিতে চাহেন। অন্য কোন লোকজন সে দিকে না থাকে। আমার স্ত্রী, দুই জন দাসী, আমি স্বয়ং আর আপনি থাকিলেই হইবে।"

জেলর বলিলেন,—"যদি বলেন, তাহা হইলে আমিও সঙ্গে না থাকিতে পারি।"

রমাপতি বাবু বলিলেন,—"আপনি সঙ্গে থাকায় আমার বা আমার স্ত্রীর কোন আপত্তি নাই। আপনি এ ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকা বিশেষ আবশ্যক।"

জেলর বলিলেন,—"তাহাই হউক। আমি সে দিক্ হইতে অন্য লোকজন সরাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া আসি।"

তিনি এক জন ওয়ার্ডারকে ডাকিয়া শীঘ্র নির্দ্দিষ্ট কামরার চাবী আনিয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন, এবং এক জন কনষ্টেবলকে ডাকিয়া, সে দিকে যাহাতে কোন লোক না থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিতে বলিয়া দিলেন। উভয়েই সাহেবকে সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল। কনষ্টেবল তখনই ফিরিয়া আসিয়া আজ্ঞামত ব্যবস্থা করা হইয়াছে জানাইয়া গেল। কিন্তু ওয়ার্ডার এখনও ফিরিল না। রমাপতি নিতান্ত ব্যস্ততা প্রকাশ করায়, জেলর সাহেব স্বয়ং চাবীর জন্য ধাবিত হইলেন, কিন্তু অবিলম্বে বিমর্ষ-বদনে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—"সর্ব্বনাশ হইয়াছে! চাবীর ঘরে হুকে ঝুলান সারি সারি চাবী রহিয়াছে, কিন্তু ঐ নম্বরের চাবীটি নাই।"

রমাপতি বাবু চমকিয়া বলিলেন,—"বলেন কি? চাবী নাই? কি হইল? নিশ্চয়ই ওয়ার্ডার কোন ভুল করিয়াছে—নিশ্চয়ই আর কোথাও চাবী রাখিয়াছে।"

জেলর বলিলেন,—"এ আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক; কারণ, ওয়ার্ডার পচিশ বৎসর এই কর্ম্ম করিতেছে, কখন তাহার কোন ভুল দেখা যায় নাই।"

রমাপতি বলিলেন,—"কখন কোন ভুল হয় নাই বলিয়া কখন যে কোন ভুল হইবে না, তাহা স্থির নহে। আপনি আবার দেখুন।"

জেলর আবার গমন করিলেন এবং ত্বরায় ফিরিয়া আসিয়া নিতান্ত হতাশভাবে বলিলেন,—"কোন আশা নাই—নিশ্চয়ই চাবী চুরি গিয়াছে। চাবী চুরি যাউক, কিন্তু খবর পাইলাম, সে ঘর এখনও খোলা হয় নাই। দরজা এখনও চাবী-বন্ধই রহিয়াছে। অতএব চাবী ভাঙ্গিয়া আসামীকে এখনই বাহির করা যাইতে পারে।"

"তাহাই হউক। জেলখানার যে মিস্ত্রী আছে, তাহাকে শীঘ্র ডাকিয়া লউন, সেও সঙ্গে থাকুক।"

সাহেব শীঘ্র মিস্ত্রীকে তালা ভাঙ্গিবার যন্ত্র লইয়া আসিতে আদেশ করিলেন। তখন রমাপতির মুখের ভাব উন্মাদের ন্যায়। তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—"সে সন্ন্যাসীর সংবাদ কি?"

"তাহার আর কি সংবাদ? সে বোধ হয়, সেই গাছতলাতেই পড়িয়া আছে।"

"বোধ হয় বলিলে চলিবে না, আপনি শীঘ্র তাহার সংবাদ আনিতে লোক পাঠান।"

জেলর সাহেব এক জন কন্‌ষ্টেবলকে সন্ন্যাসীর সংবাদ আনিতে বলিলে, সে বলিল,—

"এখনই আমি বাহির হইতে আসিতেছি, দেখিলাম, সে গাছতলা ফাঁকা; সেখানে সন্ন্যাসীও নাই, লোকজনও নাই। সন্ন্যাসী কখন্ চলিয়া গিয়াছেন, কেহ জানে না; বোধ হয়, বেলা ১টা হইতে তিনি অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন। তিনি যে ফিরিয়া আসিবেন, এমন বোধ হয় না। কারণ, তিনি তাঁহার হাঁড়িকুড়ি ও উনান ভাঙ্গিয়া গিয়াছেন।"

এ দিকে দরজা ভাঙ্গিবার জন্য মিস্ত্রী আসিয়াছে দেখিয়া সাহেব বলিলেন,—"মহাশয়, মিস্ত্রী উপস্থিত। চলুন তবে।" রমাপতি বাবু হতাশভাবে বলিলেন, "চলুন; কিন্তু দরজাই ভাঙ্গুন, আর যাই করুন, দেখিবেন, ঘরে আসামী নাই!"

"সে কি মহাশয়! তাহা কি কখন হইতে পারে? আপনি সন্ন্যাসীকে এ সঙ্গে জড়াইতেছেন কেন? সন্ন্যাসীই হউক, ভোজবিদ্যাশালীই হউক, আর দেবতাই হউক, দিনমানে দ্বিপ্রহরকালে চারিদিকে প্রহরিবেষ্টিত এই জেলের মাঝখান হইতে আসামী লইয়া যাওয়া সম্পূর্ণই অসম্ভব। এও কি কথা! আপনি আসুন।"

রমাপতি বাবু দীর্ঘনিশ্বাস সহ বলিলেন,—"চলুন।"

তিনি সুরবালার হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে নামাইলেন, ঝি'রা মাধুরী ও খোকাকে কোলে লইল। প্রথমে মিস্ত্রী, তাহার পশ্চাতে জেলর সাহেব, তাঁহার পশ্চাতে রমাপতি ও সুরবালা, তৎপশ্চাতে ঝি'রা এবং সর্ব্বশেষে দুই জন দ্বারবান্ সারি বাঁধিয়া জেলখানায় প্রবেশ করিলেন। নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠের নিকটস্থ হইয়া জেলর সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"দেখুন দেখি, ঘর যেমন, তেমনই বন্ধ রহিয়াছে, ইহার মধ্য হইতে আসামী পলাইবে কোথায়? বাবু, আপনাদের দেশে পূর্ব্বে যেরূপ মন্ত্র-তন্ত্র চলিত, এখন আর তাহা চলে না। আসামী তো মানুষ—এখান হইতে বাহির হওয়া দেবতারও সাধ্য নহে।"

রমাপতি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, —"আপনাদের আসামী আর ঘরে নাই। হায়! কি ভুলই হইয়াছে! আমি যদি চলিয়া না যাইতাম! কিন্তু এখন আর উপায় নাই। ভাঙ্গ মিস্ত্রী, দরজা ভাঙ্গ; সাহেবকে দেখাও, তাঁহার বিশ্বাস সম্পূর্ণ অমূলক। সেই সন্ন্যাসী—কোথায় তিনি? হায়! হায়! আপনি কেন সেখানে পাহারা রাখেন নাই?"

অতি সহজেই মিস্ত্রী চাবী খুলিয়া ফেলিল। সাহেব দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত করিলেন; কিন্তু এ কি, ঘর যে ফাঁক! তখন তিনি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে রমাপতি, সুরবালা ও ঝি'রাও প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু হায়! যাহার সন্ধানের জন্য সকলের এত উদ্বেগ, সে কোথায়? ঘরে তাহার চিহ্নও নাই! জেলর সাহেব অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার বিপদের সীমা নাই। তিনি স্থির বুঝিলেন, অদ্যই তাঁহার চাকুরীর শেষ দিন। রমাপতি তখন সংজ্ঞাশূন্য। তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া মাধুরী সভয়ে ডাকিল,—"বাবা! বাবা!"

তিনি চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"চল সকলে।"

রমাপতি সুরবালার হাত ধরিয়া বেগে গাড়ীতে উঠিলেন। ঝি খোকাকে কোলে দিতে গেলে রমাপতি তাহাকে 'আঃ' বলিয়া তাড়া দিলেন।

অবশেষে ঝি খোকাকে সুরবালার কোলে ফেলিয়া দিল। মাধুরীকে আর এক ঝি কোল হইতে নামাইয়া দিলে, এক জন দ্বারবান্ তাহার হাত ধরিয়া সাবধানতার সহিত গাড়ীতে উঠাইবা যত্ন করিতে লাগিল। মাধুরীর গাড়ীতে উঠা শেষ হইবার পূর্ব্বেই রমাপতি বাবু কেন কোচম্যান দেরী করিতেছে বলিয়া এমন কদর্য্য গালি দিলেন যে, তাঁহার মুখ হইতে তেমন কটূক্তি আর কেহ কখন শুনে নাই। সে বলিল,—"হুজুর, দিদি বাবু এখনও গাড়ীতে উঠেন নাই।"

তখন রমাপতি বাবু অত্যন্ত বিরক্তির সহিত এমন জোরে মাধুরীর হাত ধরিয়া গাড়ীতে টানিয়া লইলেন যে, বোধ হয়, তাহার বড়ই আঘাত লাগিল। সে কিন্তু ভাবগতিক দেখিয়া কাঁদিতে সাহস করিল না। জেলর সাহেব বিনীতভাবে রমাপতি বাবুকে সেলাম করিয়া বলিলেন, "আমি শীঘ্রই মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিব। আমাকে রক্ষা করিবেন। আমার বিপদের সীমা নাই।"

রমাপতি বাবু তাঁহার সম্মানের কোন প্রত্যুত্তরও দিলেন না। তাহাতে তখন তিনি নাই।

সুরবালা এতক্ষণ মুখে অঞ্চল চাপিয়া ছিলেন। গাড়ী বেগে চলিতে আরম্ভ হইলে, তিনি মুখের কাপড় খুলিয়া ফেলিলেন। রমাপতি দেখিলেন,—বহু রোদন হেতু সুরবালার চক্ষু রক্তবর্ণ, নয়নজলে তাঁহার মুখ ভাসিতেছে।

পিতার এই ভাব ও মাতার এই অবস্থা দেখিয়া মাধুরী কিছু না বুঝিয়াও কাঁদিতে লাগিল। তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া খোকা বাবু সুর চড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল। বালক-বালিকার ক্রন্দনে পিতামাতা কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন রমাপতি দীর্ঘ-নিশ্বাস সহ ঊর্দ্ধদিকে হস্ত বিস্তার করিয়া বলিলেন,—"সুরবালা! ঐ স্বর্গ,—ঐ স্বর্গ ভিন্ন আমরা আর কোথাও হয় তো তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব না।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

চৌরঙ্গীর সেই প্রকাণ্ড ভবনের একতম বৈঠকখানায় রমাপতি বাবু নিতান্ত কাতরভাবে অধোমুখে এক শয্যায় পড়িয়া আছেন। প্রকোষ্ঠ নানাবিধ সুরম্য ও বহুমূল্য শোভনসামগ্রীসমূহে পূর্ণ। বাহির হইতে এক জন ভৃত্য গৃহমধ্যস্থ টানা-পাখা ধীরে ধীরে টানিতেছে। নিতান্ত আবশ্যক না হইলে কোন লোকজন নিকটে না আইসে, ইহাই রমাপতি বাবুর বিশেষ আদেশ ছিল। এ জন্য তাঁহার নিকটে তখন একটিও লোক নাই। কিন্তু তাঁহার প্রকোষ্ঠের বাহিরে দুই জন ভৃত্য উৎকর্ণভাবে তাঁহার আজ্ঞার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। আর এক সুন্দরী পার্শ্বের এক প্রকোষ্ঠে যবনিকার অন্তরালে রুদ্ধনিশ্বাসে উপবিষ্টা। সেই সুন্দরী সুরবালা। কোথায় মাধুরী? কোথায় খোকা বাবু? তাহা সুরবালার মনেও নাই। যে ব্যক্তির সুখের জন্য তাঁহার জীবন, তাঁহার চরণের নখাগ্র হইতে মস্তকের কেশাগ্র পর্য্যন্ত সকলই তন্ময়। সুতরাং সেই ভাবনা ব্যতীত সে দেহ ও সে মনে অন্য ভাবনার আর স্থান নাই। সুরবালার অঙ্গ আভরণশূন্য; কেশরাশি অবেণীসংবদ্ধ ও ধূসরিত; পরিচ্ছদ মলিন ও পারিপাট্যপরিশূন্য; দেহ শীর্ণ ও কাতর; লোচনদ্বয় বিষণ্ণ ও রক্তাভ, এবং বদনমণ্ডল অবসন্ন ও শঙ্কাকুল। সুরবালার আহার নাই, নিদ্রা নাই, সাংসারিক কোন বিষয়েই মনঃসংযোগ নাই। যে দেবতার পদাশ্রয় সুরবালার একমাত্র অবলম্বন, তাঁহার চিন্তা ভিন্ন সুরবালার অন্তরে অন্য কোন চিন্তার অবসর নাই।

সেই নিরাশায় আশা-প্রতিষ্ঠা করিয়া হতাশ হওয়ার পর, সেই দিন বিগত অতুল্যনিধি করতলগত হইয়া হস্তভ্রষ্ট হওয়ার পর, সংক্ষেপতঃ সেই দিন কারাগারে সজীব সুকুমারীকে সন্দর্শন করিয়াও তল্লাভে বঞ্চিত হওয়ার পর হইতে রমাপতি নিতান্ত বিকলিত-চিত্ত হইয়াছেন। সুকুমারী হারা হইয়া তিনি যাহা যাহা লইয়া অধুনা সুখসন্তোষময় সংসার সংগঠন করিয়াছেন, তাহার কোন পদার্থেরই অভাব ঘটে নাই তো। সেই সুন্দরী-শিরোমণি পুণ্যময়ী সুরবালা তাঁহার অবিশ্রান্ত সহচরী; সেই প্রেমপুত্তলি সারল্য-প্রতিমা মাধুরী ও খোকার মধুর কণ্ঠস্বরে তাঁহার গৃহদ্বার পরিপূরিত; সেই প্রয়োজনাতিরিক্ত দাসদাসী নিয়ত তাঁহার সেবা ও আদেশ পালনে নিযুক্ত; সেই অতুল-সম্পত্তিরাশি ও সুখসংসাধক সামগ্রীসমূহ তাঁহার পদানত; তথাপি রমাপতি কাতর ও মর্ম্মাহত। অপ্রাপ্য পদার্থের প্রাপ্তিসম্ভাবনা বড়ই উন্মাদকরী। এবার রমাপতির হৃদয়ে বড়ই কঠিন আঘাত লাগিয়াছে। তাঁহার প্রাণমন নিতান্ত উদাস হইয়াছে, সুখ-সন্তোষে তাঁহার আর স্পৃহা নাই, তিনি অনন্যমনে নিরন্তর হৃদয়গত নবীভূত যাতনার সেবায় নিযুক্ত আছেন। কেহ তাঁহার সম্মুখে আইসে না, কর্ম্মচারিগণ বিষয়কর্ম্মের কোন সংবাদ তাঁহার গোচর করিতে পায় না; কোন বিষয়েই তিনি আদেশ ও

অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন না। প্রেমময়ী সুরবালার কোন সংবাদ লন না; হৃদয়ানন্দ সন্তানের বার্ত্তা তাঁহার মনে নাই; তিনি কদাচিৎ সামান্যমাত্র আহার করেন, নিদ্রা প্রায় তাঁহার নিকটস্থ হয় না, তিনি উন্মাদের ন্যায় বিকলিত-চিত্ত। সুরবালা নিকটে আসিলে তিনি বিরক্ত হন; মাধুরী ও খোকা তাঁহাকে দেখিলে ভয় পায়।

কি করিলে স্বামীর এই দুরন্ত মনস্তাপ নিবারিত হইবে, কি উপায়ে রমাপতি বাবু আবার প্রকৃতিস্থ হইবেন, সুরবালা নিরন্তর সেই চিন্তায় নিমগ্না। এ ব্যাধির যে ঔষধ, এ ঘোর মানসিক অবসাদের যাহা একমাত্র প্রতিষেধক, তাহা তাঁহার অবিজ্ঞাত নাই। কিন্তু সে সুকুমারীকে কোথায় পাওয়া যাইবে? কে সে সন্ধান বলিয়া দিবে? যদি আত্মজীবনের বিনিময়ে, যদি সর্ব্বস্ব সম্প্রদান করিলেও সুকুমারীকে পুনরায় পাওয়া যাইতে পারে, সুরবালা এখনই তাহাতে সম্মত। কিন্তু সে আশা ক্রমেই ক্ষীণ ও ক্ষীণতর হইতেছে, পুলিস সুকুমারীর সন্ধানের জন্য প্রাণপণ করিতেছে, সুরবালাও বহু অর্থব্যয়ে ও নানাবিধ উপায়ে সন্ধানের কোন ত্রুটি করেন নাই। কেবল আশাভঙ্গজনিত ক্লেশের বৃদ্ধিই হইতেছে।

কিন্তু কারাগারে রমাপতি বাবু যে ভৈরবীকে দর্শন করিয়াছেন, তিনিই যে সুকুমারী, এ কথা কে বলিল? তাঁহাকে আর কেহই দেখেন নাই, আর কেহ তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করেন নাই, তিনি যে কে, তাহা স্থির করিবার রমাপতি বাবু ভিন্ন অন্য উপায় নাই। জেলখানায় কালীর পরিবর্ত্তে অন্য এক স্ত্রীলোক আসিয়াছে, এ কথা অনেকেই জানেন, এবং সে স্ত্রীলোককে বহু লোকেই দেখিয়াছেন; কিন্তু রমাপতি বাবু কারাগারে যে ভৈরবী দর্শন করিয়াছেন, তাহার বৃত্তান্ত আর কেহই জানে না। জেলর, ম্যাজিষ্ট্রেট, ওয়ার্ডার, পাহারাওয়ালা, ডাক্তার বা অন্য কেহই জেলখানায় কোন ভৈরবী দেখেন নাই—সকলেই এক জন নিরাভরণা গৃহস্থ-সুন্দরী মাত্র দেখিয়াছেন। কেবল রমাপতি বাবুই ভৈরবীকে সুকুমারী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। হইতে পারে, রমাপতি বাবুর সম্পূর্ণ ভ্রম ঘটিয়াছে। হইতে পারে, সেই সুন্দরীর সহিত কিঞ্চিন্মাত্র আকৃতিগত সাদৃশ্য দেখিয়া রমাপতি উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সবিশেষ বিচার ও আলোচনার শক্তি তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। সুকুমারীর মৃত্যুসম্বন্ধে কোন সন্দেহের কারণ নাই। তিনি সন্তরণে অক্ষম ছিলেন। ঘোর ক্লান্ত ও শ্রান্ত অবস্থায় রমাপতি বাবুর সমক্ষেই তিনি অগাধ জলে নিমজ্জিত হইয়াছেন। সেরূপ অবস্থা হইতে তাঁহার জীবনলাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। এ কথা অন্যেও যেমন বুঝেন, রমাপতি বাবুও তেমনই বুঝেন; তবে দৈবাৎ এক ভৈরবী দেখিয়া তিনি সুকুমারী ভ্রমে এতাদৃশ উন্মত্ত হইলেন কেন? বিশেষতঃ যদিই সুকুমারী কোন অলৌকিক উপায়ে জীবনলাভ করিয়াছেন স্বীকার করা যায়, তথাপি তিনি এরূপ কাণ্ডের মধ্যে কি প্রকারে লিপ্ত হইয়া এতাদৃশ অসমসাহসিক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন, তাহারও কোন সঙ্গত মীমাংসা স্থির করা যায় না। সুকুমারীর পূর্ব্বপ্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে এরূপ ব্যাপার তাঁহার পক্ষে সর্ব্বথা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার ন্যায় লজ্জাশীলা, কোমলস্বভাবা, সঙ্কুচিতা নারীর পক্ষে এতাদৃশ কঠোর ও লোমহর্ষণ কাণ্ডের নায়িকারূপে অবতীর্ণ হইয়া দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দকে ভয়ে চমকিত, এবং বিস্ময়ে পরিপ্লুত করা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক কথা। যুক্তি ও তর্কের পথানুসরণ করিলে রমাপতি বাবুর সুকুমারী-সন্দর্শন যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক কথা, তৎপক্ষে কোনই সন্দেহ থাকে না। কিন্তু সে কথা অন্যে বুঝিলেও তিনি বুঝেন নাই। আর তিনি যদি তাহা না বুঝিলেন, তাহা হইলে ফল কি হইল? সেই ভৈরবী যে সুকুমারী, তৎপক্ষে রমাপতি বাবুর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ন্যায় ও তর্কশাস্ত্রের সমস্ত ব্যবস্থাই তাঁহার প্রতিকূলে মস্তক উত্তোলন করিলেও তিনি কোন দিকে দৃক্‌পাত বা কিছুতেই কর্ণপাত করিবেন না। অতএব তাঁহাকে বুঝাইবে কে?

এখন উপায় কি? তাহা সুরবালা নিরন্তর চিন্তা করিয়াও স্থির করিতে পারিলেন না। তবে কি ধীরে ধীরে চিন্তাচর্ব্বিত রমাপতির প্রাণান্ত হইবে? এরূপ দুঃসহ যন্ত্রণা আর কিছু কাল থাকিলে মানবপ্রাণ অবশ্যই অপগত হইবে। তাহাই কি রমাপতির এ অবস্থার শেষ পরিণাম? যখন যাতনা খর্ব্বীকৃত করিবার কোনই পন্থা নাই, তখন ধীরভাবে অবশ্যম্ভাবী চরমকালের নিমিত্ত প্রতীক্ষা করা ভিন্ন আর কি ব্যবস্থা আছে?

সারল্য-প্রতিমা সুরবালা বিরলে বসিয়া সকল কথাই বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়াছেন। তিনি স্থির করিয়াছেন, যখন রমাপতি বাবুর জীবন রক্ষা করিবার অন্য কোন উপায় নাই, তখন অতঃপর আত্মজীবন রাখিবার আর কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। সেই নিদারুণ দুর্ঘটনার সম্ভাবনামাত্র স্মরণ ও মনন করিলে যখন হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন তাহার

আগমন দর্শন করিবার জন্য অপেক্ষা করিবে কে? সুরবালা তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে পারেন কি? আত্মহত্যা দ্বারা জীবন বিধ্বংসিত করা ভিন্ন সুরবালার বাসনাসিদ্ধির উপায়ান্তর নাই। তিনি তাহাতেই কৃতসঙ্কল্প। আত্মহত্যা মহাপাপ, এ জ্ঞান তাঁহার এক্ষণে নাই; আত্মহত্যা পরম সুখের সোপান বলিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছে।

বহুক্ষণ যবনিকার অন্তরালে অবস্থিতি করিয়া ধীরে ধীরে সুরবালা তাহা অপসারিত করিলেন, এবং ধীরে ধীরে রমাপতি বাবুর গৃহে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার শয্যা-প্রান্তে উপবেশন করিলেন। রমাপতি তাঁহার আগমন বুঝিতে পারিলেন বটে, কিন্তু কোনই কথা কহিলেন না—একবার ঘাড়টি তুলিয়া ফিরিয়াও চাহিলেন না। সুরবালা বহুক্ষণ সেই স্থানে অধোমুখে বসিয়া রহিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন—"আমি তোমাকে কোন প্রকার প্রবোধ দিয়া বিরক্ত করিতে আসি নাই। দুইটা কথা বলিব মনে করিয়াছি, শুনিবে কি?"

রমাপতি একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন—"সুকুমারী নাই, আমার ভ্রম হইয়াছে, এরূপ কাণ্ড সম্পূর্ণ অসম্ভব, এ সকল কথা তোমার মুখে দশ হাজারবার শুনিয়াছি; তাহাই কোন রূপান্তর করিয়া এখন আবার বলিবে বোধ হয়। আমি সেরূপ কথা কর্ণে ঠাই দিব না জান, তথাপি এ প্রকারে আমাকে কষ্ট দেওয়া নিতান্ত নিষ্ঠুরতা।"

সুরবালা নিতান্ত বিনীতভাবে বলিলেন,—"তোমার মনের এখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তোমার সহিত এ সময়ে কোন কথা কহিয়া তোমাকে ত্যক্ত করাই নিষ্ঠুরতা। কিন্তু আমি তোমাকে দিদির সম্বন্ধে আজ কোন কথাই বলিব না। আজি আমি তোমাকে নিজের দুইটা কথা বলিব, কৃপা করিয়া শুন।"

রমাপতি বলিলেন,—"তোমার নিজের কথা? তোমার এমন কি কথা আছে যে, এখনই না শুনিলে চলিবে না? কৃপা করিয়া আজ আমাকে ক্ষমা কর, যাহা বলিবে, দুদিন পরে বলিও।"

সুরবালা নীরব। এ কথার পর তিনি কি বলিবেন? যে দেবচরণে তিনি প্রাণ উৎসর্গীকৃত করিয়াছেন, সেই দেবতার আজি এই ভাব।

তাঁহার চক্ষে জল আসে আসে হইল, কিন্তু আসল না। কণ্ঠস্বর কিছু বিকৃত হইয়া উঠিল। তিনি সেই স্থল স্বরে আবার বলিলেন,—"দুই দিন পরে আমার আর তোমার সহিত সাক্ষাতের সময় হইতে না পারে।"

সুরবালার কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই রমাপতি মুখ ফিরাইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। বোধ করি, সুরবালার কণ্ঠস্বর তাঁহার হৃদয়ে আঘাত করিল। তিনি বলিলেন,—"সময় হইবে না, সে কি কথা সুরবালা?"

এতক্ষণে সুরবালার চক্ষু হইতে অজস্রধারে অশ্রু-বর্ষণ হইতে লাগিল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে উভয় বাহু দ্বারা রমাপতির পদদ্বয় বেষ্টন করিয়া ধরিলেন এবং বলিলেন,—"অদ্যকার সাক্ষাৎই আমাদের ইহজীবনের শেষ সাক্ষাৎ। তোমার প্রেমময় হৃদয়ের এ অসহনীয় যাতনা তোমার এ দাসী আর এক দিনও দেখিবে না। তোমার দাসী হইয়াও যখন তোমাকে সুখী করিতে পারিলাম না, তোমার তীব্র শোকের কোন প্রতিবিধান করিতে পারিলাম না, তখন বাঁচিয়া থাকিয়া কি লাভ? দয়াময়! তোমার দাসী তাই আজি এত আগ্রহ সহকারে তোমার চরণে চির-বিদায় প্রার্থনা করিতেছে।"

কথাটা রমাপতি বাবুর হৃদয়ে বাজিল বুঝি। তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। সুরবালা তখনও তাঁহার চরণে পতিতা। তিনি সাবধানে সুরবালাকে উঠাইলেন। তিনি জানিতেন, সুরবালা কখন মিথ্যা কথা কহেন না, এবং তাঁহার হৃদয় কপটতার বার্ত্তা জানে না। তখন রমাপতি বলিলেন, "সুরবালা! তুমি সত্যই কি প্রাণত্যাগের কল্পনা করিয়াছ?"

সুরবালা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"বল দেবতা, আমার আর কি উপায় আছে? তোমার প্রসাদ-সম্ভোগ, তোমার আনন্দ-দর্শন, তোমার সুখ ও সন্তৃপ্তি আমার জীবনের মূল্য। তাহা আর তোমাতে নাই। অতএব আমার জীবনের আর কোনই মূল্য নাই। যাহাতে তোমাকে আনন্দময়, সুখময় ও প্রসাদময় করা যাইবে বুঝিতেছি, তাহা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। অনেক সন্ধান করিলাম, অনেক যত্ন করিলাম, দিদির সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। অতএব তোমার চিত্তে শান্তিসঞ্চারের আর উপায় নাই। এইরূপ কাতর-ভাবে, এইরূপ অনাহারে ও অনিদ্রায় কালাতিপাত করিতে হইলে তোমার জীবন যে আর সপ্তাহকালও টিকিবে না, তাহা আমি স্থির-সিদ্ধান্ত করিয়াছি। তুমিও কি তাহা বুঝিতে পারিতেছ না? তবে বল দেবতা, বল সর্ব্বস্বধন, আমি জীবন রাখি কোন্ সাহসে? তুমি আমাকে বড় ভালবাস জানি। তুমিই বল, তোমার সেই নিশ্চিত বিষাদময় পরিণামের পূর্ব্বে আমার চির-পলায়ন নিতান্তই আবশ্যক নয় কি?"

রমাপতি বহুক্ষণ অধোমুখে চিন্তা করিলেন, তাহার পর বলিলেন,—"সুরবালা, আমার জীবন যদি থাকে, সে তোমারই জন্য থাকিবে, আর যদি যায়, সে তোমারই জন্য যাইবে। মনে করিয়া দেখ সুরবালা, এ জীবন রাখিয়াছে কে? তুমি মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র জান; সেই মন্ত্রবলে তোমার এই মন্ত্রমুগ্ধ অনুগত মরিলেও আবার বাঁচিয়া উঠিবে। তুমি আমাকে বাঁচাইয়া দেও, দেবি!—এ যাতনা আমি আর সহিতে পারি না।"

এই বলিয়া রমাপতি উভয় বাহু দ্বারা সুরবালাকে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন। সুরবালা মনে মনে বলিলেন,—"আমার প্রাণের প্রাণ! তোমার দাসী তোমার জন্য প্রাণপাত করিয়াও যে সুখ পায়, তাহারই কি তুলনা আছে? হায়! আজি যদি প্রাণ দিলেও দিদিকে দেখিতে পাইতাম।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

উত্তরোত্তর রমাপতি বাবুর অবস্থা মন্দ হইতে মন্দতর হইতে থাকিল। সংসারে মন নাই, বিষয়কর্ম্মে আস্থা নাই, হৃদয়ে উৎসাহ নাই, শরীরে বল নাই। দেহ অবসন্ন, কাতর ও বহুবিধ ব্যাধিগ্রস্ত। প্রথমতঃ মস্তিষ্কের কাতরতা, তাহা হইতে অবসাদ, তদনন্তর অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ, তদনন্তর অত্যধিক দুর্ব্বলতা ও রক্তহীনতা জন্মিয়াছে। অন্তরে অণুমাত্র প্রসন্নতা নাই, কোন কারণেই আনন্দ নাই, কিছুতেই যত্ন নাই।

তবে আছে কি? আছে কেবল কর্ত্তব্যজ্ঞান। সেই কর্ত্তব্য-জ্ঞানের প্রবল শাসন তাঁহাকে এখনও অধীন করিয়া রাখিয়াছে। সেই কর্ত্তব্যজ্ঞানের প্রভাবে তিনি বুঝিয়াছেন যে, তাঁহার জীবনে তাঁহার কোন প্রয়োজন না থাকিলেও তাহাতে সুরবালার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। তিনি বুঝিয়াছেন, সুকুমারী তাঁহার অতীতের স্মৃতি, মেঘাচ্ছন্ন নভোমণ্ডলের বিদ্যুৎক্রীড়া, মরুভূমির মরীচিকা, মোহকর স্বপ্ন-বিকাশ, কিন্তু সুরবালা তাঁহার বর্ত্তমানের আনন্দোৎসব, সুনির্ম্মল আকাশের স্নিগ্ধোজ্জ্বল ধ্রুবতারা, প্রতপ্ত জ্বালাজনক-বালুকাপুঞ্জপূর্ণ ক্ষেত্রমধ্যস্থ শীতলাশ্রয়, এবং জাগ্রতকালের প্রত্যক্ষ সুখ। সুকুমারীর স্মৃতি অপরিহার্য্য। তদীয় পুনর্দ্দর্শনলাভ অবিচ্ছেদ্য কামনার বিষয় হইলেও, তজ্জন্য দারুণ দুশ্চিন্তায় দেহপাত করিয়া সুরবালার সর্ব্বপ্রকার সুখ-বিধ্বংস ও সর্ব্বনাশ সাধন করা একান্ত অবৈধ অব্যবস্থা। তিনি সুকুমারীর সাক্ষাৎ পাইয়াছেন, তিনি তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়াছেন, তিনি তাঁহার চরণ ধরিয়া রোদন করিয়াছেন, তথাপি সুকুমারী আর তাঁহার সঙ্গিনী হইতে সম্মত হন নাই। আর সুরবালা, রোদন দূরে থাকুক, তাঁহাকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে দেখিলে প্রাণ ফাটিয়া মরে; সঙ্গিনী হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার সেবিকা হইতে পাইলেই চরিতার্থ হয়। সেই সুকুমারীর জন্য এই সুরবালার মর্ম্মপীড়া উৎপাদন করিতে রমাপতি অশক্ত। তিনি বুঝিয়াছেন, সুকুমারী আর তাঁহার কেহ নহেন—সুরবালাই সর্ব্বস্ব। জীবিতা বা মৃতা সুকুমারী উভয়ই তাঁহার কাছে এখন তুলা-মূল্য।

কিন্তু এত বুঝিয়াও রমাপতি মনকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিতেছেন না; এ ভয়ানক দুর্ব্বলতা তিনি পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। সুরবালা সতত তাঁহার সমীপে থাকিয়া এবং প্রতিনিয়ত কায়মনোবাক্যে তাঁহাকে বিনোদিত করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিয়াও তাঁহার কোনরূপ দৈহিক উন্নতি সাধিত করিতে পারিতেছেন না। আয়ুর্ব্বেদ, এলোপ্যাথিক এবং হোমিওপ্যাথিক-সম্মত রাশি রাশি ঔষধ সুরবালা তাঁহাকে গিলাইতেছেন, কিন্তু সকলই ভস্মাহুতি হইতেছে। কবিরাজ ও ডাক্তার প্রতিদিন রাশি রাশি টাকা দর্শনী লইয়া বিদায় হইতেছে, কিন্তু ফল কিছুই হইতেছে না। ক্রমে ব্যাপার বড় ভয়ানক হইয়া উঠিল। চিকিৎসকেরা রমাপতি বাবুর জীবন সম্বন্ধে হতাশ হইলেন। আত্মীয়জনেরা মুখ ভার করিয়া চুপি চুপি কথা কহিতে আরম্ভ করিল। অধীনস্থ লোকেরা বিষণ্ণ-বদন হইল। সকলেই বুঝিল যে, এ যাত্রা রমাপতি বাবু যেন রক্ষা পাইবেন না। কেবল বুঝিল না এক জন। সুরবালার মনে এ দুশ্চিন্তা এক দিনও হইল না। তিনি আশায় বুক বাঁধিয়া অনন্যমনে পতিসেবায় নিযুক্ত রহিলেন।

প্রাণের মাধুরী আর খোকার কথা তখন আর সুরবালার মনে নাই। তাহারা ঝিদের কাছেই থাকে। জননী তাহাদের কথা ভাবেন কি না সন্দেহ। তাহারা মাতৃস্নেহের অভাবে ম্রিয়মাণ ও বিশুষ্ক হইতে থাকিল। সুরবালার স্নান নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই, তিনি নিরন্তর স্বামিসেবায় নিবিষ্টচিত্ত। সুরবালার সে মূর্ত্তি নাই, সে শোভা নাই। এখন সুরবালাকে দেখিলে, বলিয়া দিলেও চেনা ভার।

শয্যাগত রমাপতি সকলই বুঝিতেছেন। এরূপ ব্যাধির হস্ত হইতে আরোগ্য লাভ করা নিতান্ত অসম্ভব, তাহা তিনি স্পষ্ট বুঝিয়াছেন। সুরবালার

এইরূপ পরিবর্ত্তনও তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। এই ব্যাপারের পরিণাম চিন্তা করিয়া প্রেম-প্রবণ-প্রাণ রমাপতি নিতান্ত ব্যাকুল-চিত্ত হইয়া রহিলেন। ব্যাধিজনিত যাতনা তাঁহার চিত্তকে অভিভূত করিতে সমর্থ হইল না। কিন্তু সুরবালার কি হইবে—তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তদ্গতপ্রাণা সুরবালার কি হইবে, ইহাই তাঁহার যাতনার প্রধান কারণ। যে সুরবালার তিনি সর্ব্বস্ব, যে সুরবালা তাঁহাকে হৃদয়ের হৃদয় হইতে ভালবাসেন, তাঁহার প্রাণান্ত ঘটিলে, সেই সুরবালার কি দশা হইবে, ইহা চিন্তা করিয়া সেই ব্যাধিক্লিষ্ট রমাপতি সততই যার-পর-নাই যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন। অবশেষে রমাপতি এ সকল কথা সুরবালাকে ভাল করিয়া বুঝাইতে সঙ্কল্প করিলেন।

এইরূপ অভিপ্রায় স্থির করিয়া এক দিন মধ্যাহ্ন-কালে রমাপতি, ক্রমশই অবস্থা নিতান্ত মন্দ হইয়া আসিতেছে জানিয়া সুরবালাকে বলিলেন,—"মনুষ্যের শরীর কখনই চিরস্থায়ী নয়। আজি হউক বা দশ দিন পরে হউক, সকলকেই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে হইবে। আমাদের পিতা মাতা ছিলেন; তাঁহারা এখন নাই। তোমার এই অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের আধারস্বরূপ শরীরও কোন সময়ে ধ্বংস হইবে। সুরবালা! আমার সেই অপরিহার্য্য মৃত্যুকাল সম্প্রতি প্রায় উপস্থিত হইয়াছে। আমি মরিয়া গেলে, সুরবালা, তুমি কি করিবে, তাহা কখন ভাবিয়াছ কি?"

সুরবালা বলিলেন,—"তাহা আমি বলিব না। মৃত্যু যে ধীরে ধীরে তোমাকে গ্রাস করিতে আসিয়াছে, তাহা আমি জানি। কিন্তু সে জন্যে আমার কোন ভয় বা ভাবনা নাই। তোমাকে বাঁচাইতে পারা আমার প্রধান কামনা। যদি তাহাতে আমি কৃতকার্য্য না হই, তাহা হইলেও ভাবনার কারণ কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।"

সুরবালার চক্ষে জল নাই। হৃদয়ে কি আছে, ভগবান্ জানেন, কিন্তু বাহ্যতঃ সেই মলিনা ও কৃশকায়া সুন্দরীর বদনে বিশেষ উদ্বেগের কোন লক্ষণ নাই। এইরূপ ভাব দেখিয়া রমাপতি বাবু কিছু আশ্বস্ত হইলেন কি? না। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"সুরবালা, তোমার সর্ব্বদা মনে রাখা আবশ্যক যে, মনুষ্য বহুবিধ কর্ত্তব্যের অধীন হইয়া সংসারে থাকে। তোমার স্কন্ধেও নানাবিধ গুরুভার অর্পিত আছে। আমার অবর্ত্তমানে তোমাকে একাকিনী জীবন-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সেই সকল কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে হইবে। কর্ত্তব্য সম্বন্ধে দৃষ্টিশূন্য হওয়া নিতান্ত অব্যবস্থা; অতএব সে সম্বন্ধে তুমি কি স্থির করিয়াছ?"

সুরবালা বলিলেন,—"আমার যাহা সাধ্য, তাহা আমি অবশ্যই করিব। যাহা আমার অসাধ্য, তাহা আমি করিব কি করিয়া?"

রমাপতি বলিলেন,—"তুমি স্বীকার না করিলেও আমি বুঝিয়াছি, আমার প্রাণান্ত হইলে তোমারও প্রাণান্ত হইবে। কিন্তু মনে করিয়া দেখ, অন্য সকল কর্ত্তব্য উপেক্ষা করিলেও, মাধুরী ও খোকার ভাবনা ভাবিতে তুমি অবশ্যই বাধ্য। ভাবিয়া দেখ, তাহাদের কে রক্ষা করিবে?"

"ঈশ্বর।"

রমাপতি আর কিছুই বলিলেন না। কিন্তু সুরবালা আবার বলিলেন,—"কিন্তু তোমাকে বাঁচাইতে পারা আমার নিতান্তই আবশ্যক। এখনও তোমার সেবা করিয়া আমায় হৃদয় একটুও তৃপ্ত হয় নাই। হায়! এ সময়ে দিদিকে যদি একবার ধরিতে পারিতাম।"

"তোমার দিদিকে ধরিতে পারিলেই যে আমাকে আর বাঁচাইতে পারিবে, এমন আমার বোধ হয় না। তোমার দিদির অভাবজনিত যে যাতনা, অনেক দিন হইতেই তাহা আমার ছিল না; সে অভাব তোমার কৃপায় আবশ্যকের অধিক সম্পূরণ হইয়াছে। কিন্তু যাহার জীবন নাই বলিয়া মনে বিশ্বাস করিয়াছিলাম, ইহজীবনে যাহার সহিত আর কখন সাক্ষাৎ ঘটিবে না বলিয়া জানিতাম, সেই সুকুমারীকে সহসা অসম্ভব স্থানে, সম্পূর্ণ অচিন্তিতপূর্ণ মূর্ত্তিতে দর্শন করিয়া আমার হৃদয় নিতান্ত আলোড়িত ও বিচলিত হইয়াছে। তাহার পর সুকুমারীর তৎসময়ের কার্য্যাদি বিবেচনা করিয়া আমার মনে হয়, নিশ্চয়ই তিনি অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। তৎকাল হইতে আমার চিত্ত অতিশয় অভিভূত হয়। সেই সকল চিন্তা হইতে আমার বর্ত্তমান পীড়ার উৎপত্তি হইলেও, ক্রমশঃ নানাপ্রকার পীড়া আমাকে আক্রমণ করিয়াছে, এবং অধুনা আমি সম্পূর্ণরূপে সুকুমারীর চিন্তা পরিত্যাগ করিতে পারিলেও, অন্যান্য পীড়ার জন্য হইতে আমার নিস্তারের কোনই সম্ভাবনা নাই। কিন্তু মরণের পূর্ব্বে একবার সেই ভৈরবীকে দেখিতে পাইলে, আমার বড়ই আনন্দোদয় হইত এবং আমি আরোগ্যলাভ না করিলেও আমার যে বিশেষ সন্তোষ জন্মিত, তাহার কোনই সন্দেহ নাই।"

তখন সুরবালা বলিলেন,—"হায়! কি করিলে

সেই দেবীর সাক্ষাৎ পাই? যদি সর্ব্বস্ব দিলে সেই দেবীকে একবার এই স্থানে আনিতে পারিতাম! তিনি যদি অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়া থাকেন—যদি তাঁহার দেবত্বই হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি এই দুঃখিনীর মর্ম্মপীড়ার কথা বুঝিতে পারিতেছেন না কি? এই অন্তিম শয্যাশায়ী ব্যক্তির বাসনার কথা জানিতে পারিতেছেন না কি? হায়! কোথায় তিনি!"

সঙ্গে সঙ্গে বীণাবিনিন্দিত সুকোমল স্বরে প্রকোষ্ঠের প্রান্তদেশ হইতে শব্দ হইল,—"এই যে!"

রমাপতি ও সুরবালা চমকিত হইয়া সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন কি?

দেখিলেন, সেই সুবিস্তৃত কক্ষের ভিত্তিতে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া এক ঈষদ্ধাস্যমুখী ভুবনমোহিনী সুন্দরী দণ্ডায়মানা। রমাপতি চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"সুকুমারি, আসিয়াছ? এই অন্তিম-সময়ে দয়া করিয়া আমাকে দেখা দিতে আসিয়াছ? সুরবালা, ঐ সেই সুকুমারী। যখন আমাদের নৌকা ডুবিয়াছিল, তখন তোমার যে বেশ ছিল, আজি, সুকুমারি, তুমি সেই বেশে এ অধীনকে দেখা দিয়া ভালই করিয়াছ।"

তখন সুরবালা "দিদি! দিদি!" শব্দে চীৎকার করিতে করিতে সেই সুন্দরীর নিকটস্থা হইলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

মেদিনীপুর হইতে ময়ূরভঞ্জ যাইবার পথের পাশে বড়ই বন। সহর হইতে পশ্চিমদিকে কয়েক ক্রোশ মাত্র গমন করিলেই বনের আরম্ভ দেখা যায়; ক্রমশঃ সেই বন নিবিড় হইতে নিবিড়তর হইয়াছে। অধুনা যে ক্ষুদ্রপল্লী ও বাধ গোপ নামে পরিচিত, শুনা যায়, পূর্ব্বকালে তাহা বিরাটের গো গৃহ ছিল। সেই গোপ-পল্লী অতিক্রম করিয়া আরও কয়েক ক্রোশ পশ্চিমাভিমুখ হইলে বনের সূত্রপাত দেখা যায়। মেদিনীপুরের কাছারী হইতে, এবং অট্টালিকাদির উপর হইতে এই সুদূরব্যাপী ঘনারণ্যের দূরাগত শোভা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই বনকে বিভিন্ন করিয়া ময়ূরভঞ্জাভিমুখে মনোহর রাজবর্ত্ম চলিয়া গিয়াছে। পথের উভয় পার্শ্বে দুর্ভেদ্য অরণ্য।

সেই অরণ্যের এক ঘনতম প্রদেশে প্রস্তর বিনির্ম্মিত এক সুবিস্তৃত অট্টালিকা পরিস্থাপিত আছে। রাজপথ হইতে সেই সুবৃহৎ ভবনের কোন অংশই পরিদৃষ্ট হয় না, এবং তাহার বিদ্যমানতাও কেহ অনুমান করিতে পারে না। তথায় গমনাগমনের কোন পথ দেখা যায় না; সুতরাং লোকে কখন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহও করে না।

কিন্তু সেই সুরম্য অট্টালিকা জনহীন নহে। তাহা বহুতর নরনারীর আবাসস্থল। তত্রত্য অধিবাসিবৃন্দ সেই নিবিড় অরণ্যমধ্যে কেন থাকে, সেই বাঘ-ভালুক-বেষ্টিত বনে তাহারা কেন বাস করে, সেখানে তাহারা কি খায় ইত্যাদি বিবরণ নিরতিশয় কৌতূহলজনক। আসুন পাঠক, আমরা সাহসে ভর করিয়া সেই বনমধ্যস্থ পুরীর অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করি।

রজনী গভীরা। দিবাভাগেও যে বনভূমি দারুণ তমসাচ্ছন্ন, এই ঘোর নিশাকালে তথায় অন্ধকার যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিরাজ করিতেছে বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু সেই বিশাল ভবনের কোন কক্ষ হইতে আলোকজ্যোতিঃ দেখা যাইতেছে। পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া, যে কক্ষে সমুজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছে, তথায় উপস্থিত হইলে দেখা যায় যে, তাহা একটি দেবালয়। আহা, কি মনোহর! কি ভুবনমোহন! কক্ষমধ্যে রজতমঞ্চে শিখিপুচ্ছচূড়াধারী, বংশীবদন, হাস্যমুখ, স্নেহোৎফুল্ললোচন, অপরূপ বঙ্কিমরূপ শ্যামসুন্দর-মূর্ত্তি বিরাজিত; বামে অতসীকুসুমসঙ্কাশা, বিকসিতাননা, প্রেমপ্রদীপ্তলোচনা, প্রেমময়ীর মোহিনী মূর্ত্তি শোভা পাইতেছে। বিগ্রহদ্বয়ের যেখানে যে অলঙ্কার সাজে, সেখানে তাহাই রহিয়াছে। মস্তকোপরি স্বর্ণ-সূত্র-বিনির্ম্মিত এবং মুক্তাঝালর-সমন্বিত এক চমৎকার ঝালর। হরি হরি! কি শোভা! সর্ব্বরূপের কেন্দ্র ও সর্ব্বশোভার উৎপাদক, নহিলে এত শোভা আর কাহাতে সম্ভবে? হায় হায়! বিগ্রহ যেন সজীব ও বাঙ্ময়। যিনি সর্ব্বব্যাপী, ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার লোমকূপে, তিনি যে এখানেও আছেন, তাহার সন্দেহ কি? এরূপ যুক্তি ভক্তের বড়ই কর্ণজ্বালাকর। ঐ মূর্ত্তিই তিনি, ঐ মূর্ত্তিই সাক্ষাৎ

ভগবান্, এ কথাই ভক্ত ভাল-বাসে এবং ইহাই জানে।

সেই কক্ষে এক কৃষ্ণকায়া, কৃষ্ণকেশা, ধর্ম্মতেজো-দীপ্তা, আলৌকিক-শ্রীসম্পন্না নারী বসিয়া ফুলের মালা গাঁথিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে মুখ তুলিয়া হাস্যমুখে সেই মঞ্চাসীন নারায়ণ-মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। এইরূপে বহুবার দেবদর্শন করার পর সেই পুণ্যতেজঃপ্রদীপ্তা সুন্দরী বিগ্রহের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"আজি তুমি বড়ই দুষ্ট হইয়াছ। আমার কথা তুমি আজি শুনিতেছ না। আমি সন্ধ্যা হইতে আহার করিবার জন্য তোমাকে সাধাসাধি করিতেছি, তুমি তাহা শুনিতেছ না। দেখ দেখি, রাত্রি কত হইল, এখনও তোমার খাওয়া হইল না, আচ্ছা, থাক তুমি। আসুন আগে শান্তি দেবী। তাহার পর তোমাকে মজা দেখাইব এখন!"

কিয়ৎকাল পরে আবার বলিলেন,—"দুষ্ট! কথা না শুনিয়া আবার হাসি! তোমার বড়ই নষ্টামী হইয়াছে।"

পরে শ্রীরাধিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"আর তুমিই বা কেমন মেয়ে গা? দুষ্ট ছেলে না খায় খাবে, তুমিই বা কেন খাও না বাছা?"

এইরূপ সময়ে এক অপার্থিব-রূপ-প্রভাসম্পন্না মূর্ত্তিমতী পুণ্যস্বরূপা, শোভাময়ী সুন্দরী সেই স্থানে সমাগতা হইলেন। তাঁহার আগমনে সমস্ত গৃহ যেন অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি আসিয়াই সেই কৃষ্ণকায়া সুন্দরীকে জিজ্ঞাসিলেন,—"কি হই-তেছে সুরমে? ছেলে-মেয়ের সহিত ঝগড়া বুঝি?"

সুরমা বলিলেন,—"শান্তি আসিয়াছ? দেখ দেখি মা, এত রাত্রি হইল, এখনও ছেলে-মেয়ে খাইতে চাহে না। আমি যত বলিতেছি, ততই আমার কথা কেবল হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছে। বড়ই দুষ্ট হইয়াছে। তুমি আসিলেই উহারা জব্দ হইবে বলিয়াছি। এখন তুমি আসিয়াছ মা, উহাদের যা বলিতে হয়, বল।"

শান্তি বলিলেন,—"তোমার ছেলে-মেয়ে আজি নূতন করিয়া দুষ্ট হয় নাই; চিরদিনই এইরূপ দুষ্ট। খাওয়ার কথা আমি বলিতে পারি না, কিন্তু দুষ্টামীর আমি এখনই প্রতীকার করিতে পারি। কেমন প্রভো! আবারও জব্দ হইবার সাধ আছে কি?"

তাহার পর সুরমার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—"আর তোমার ছেলে দুষ্টামী করিবে না। আমি এখন আসি। হরি! আমাকে যে কাজে নিযুক্ত করিয়াছ, আমি এখনও তাহা শেষ করিয়া উঠিতে পারি নাই। তোমার কৃপা নহিলে তাহা শেষ হইবে না। তুমিই জান, কত দিনে তাহা শেষ করাইবে। সুরমে! আমি এখন গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি। তোমার ছেলে-মেয়ে ঘুমাইলে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও; তোমার সহিত আমার অনেক কথা আছে।"

এই বলিয়া সেই সুকুমারকায়া সুরসুন্দরী হাস্যমুখে সেই দেবচরণে প্রণাম করিলেন, এবং ঈষদ্ধাস্য সহকারে দেব-দম্পতিকে একটি ছোট কিল দেখাইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। সেই সুবৃহৎ ভবনের পার্শ্বে চতুর্দ্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত স্বতন্ত্র ও ক্ষুদ্র একটি যোগমঠ ছিল। তথায় নিবিড় অন্ধকারমধ্যে এক ধ্যানমগ্ন পুরুষ উপবিষ্ট। তাঁহার সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে। সেই অগ্নির জ্যোতিঃ তাঁহার তেজঃপুঞ্জ কলেবরে ও শ্মশ্রু-সমাবৃত বদনে নিপতিত হইতেছে। তিনি কৌপীনধারী। তাঁহার বয়স কত, তাহা দেহ দেখিয়া অনুমান করা অসাধ্য। পঞ্চাশের অধিক হইবে না বলিয়া বোধ হয়। চুল একটিও পাকে নাই। শরীর শীর্ণ, অথচ উজ্জ্বল এবং পেশল। দেহ দীর্ঘাকার।

বহুক্ষণ ধ্যানস্থ থাকার পর সেই যোগীর ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিবামাত্র আমাদের পূর্ব্ব-দৃষ্টা শান্তি-নাম্নী সেই সুন্দরী তাঁহার চরণে প্রণতা হইলেন। সন্ন্যাসী তাঁহার প্রতি নেত্রপাত করিয়া কহিলেন,—"শান্তি! কতক্ষণ আসিয়াছ? কোন বিঘ্ন ঘটে নাই তো?"

"প্রভো! কিয়ৎকাল পূর্ব্বেই আসিয়াছি। প্রথমে হরিমন্দিরে গিয়া শ্যামসুন্দরকে সমস্ত সংবাদ জানাই-য়াছি, তাহার পরই প্রভুর নিকট আসিয়াছি। বিঘ্ন কাহাকে বলে, তাহা তো জানি না প্রভু! জানি কেবল ঐ শ্যামসুন্দর ঠাকুর, আর এই জ্ঞানানন্দ ঠাকুর। যেখানেই যাই, আর যাহাই করি, সততই বুঝিতে পারি, ঐ শ্যামসুন্দর আর এই জ্ঞানানন্দ আমার সঙ্গেই আছেন। তবে আর বিঘ্ন করিবে কে? হৃদয় যদি বা কখন একটু দুর্ব্বল বোধ হয়, তাহা হইলে যেই একবার চক্ষু মুদিয়া প্রভুকে ভাবি, অমনই সকল সাহস ও বল পাই, অমনই দেখি,

এক পার্শ্বে শ্যামসুন্দর আর এক পার্শ্বে জ্ঞানানন্দ। তবে প্রভো! আমার বিঘ্নের আশঙ্কা করিতেছেন কেন?"

জ্ঞানানন্দ বলিলেন,—"বৎসে! শ্যামসুন্দর যাহাকে আপনার বলিয়া জানেন, এবং যে শ্যাম-সুন্দরকে আপন বলিয়া জানে, তাহার কদাপি কোন আশঙ্কা থাকে না। এ পাপ-ধরায় তোমার ন্যায় জীবের আবির্ভাব ভগবানের লীলাপ্রকাশের উপায়-মাত্র। পীড়িত সুস্থ হইয়াছেন?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"কি কি উপায় অবলম্বন করিলে?"

"আমাকে দর্শনমাত্র পীড়িত বিশেষ উৎসাহিত হইলেন, এবং তাঁহার দেবীর ন্যায় পত্নী আন্তরিক উৎসাহ সহকারে আমার নিকটস্থ হইয়া আমার হস্ত-ধারণ করিলেন। আমাকে তিনি তাঁহার স্বামীর শয্যা-সমীপে লইয়া গেলেন। তথায় উভয়ের নানাপ্রকার প্রীতি ও অনুরাগের কথা বলিয়া, আমাকে বিমোহিত করিবার চেষ্টা করিতে থাকিলেন। কারাগারে তাঁহার কথা শুনিয়া, আমি একবার সহসা জ্ঞানশূন্যা হইয়া কিয়ৎকালের জন্য বিমোহিত হইয়াছিলাম, এবং সে ত্রুটির কথা প্রভুর চরণে নিবেদন করিয়াছিলাম। এবার পাছে সেইরূপ কোন মতিভ্রম ঘটে, এই আশঙ্কায়, তাঁহারা যখন কথা কহিতে থাকিলেন, তখন আমি নিরন্তর প্রভুর চরণ ধ্যান করিতে থাকিলাম। ভাগ্যবলে এবার আর কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটিল না।"

"তার পর?"

"তার পর প্রভুর উপদেশানুসারে, কায়-মনোবাক্যে প্রভুকে স্মরণ করিয়া, পীড়িত ব্যক্তির শরীরে বলসঞ্চারের প্রার্থনা করিলাম। শ্যামসুন্দর দাসীর প্রার্থনা পূরণ করিলেন, পীড়িত বলিলেন —'তাঁহার আর কোন দুর্ব্বলতা নাই।' তদনন্তর তিনি আহারে অপ্রবৃত্তি জানাইলে, আমি তাঁহার জন্য খাদ্য আনিতে বলিলাম। তিনি স্বচ্ছন্দে প্রচুর-প্রমাণ খাদ্য উদরস্থ করিলেন। তাহার পর স্বামি-স্ত্রীতে আমাকে তাঁহাদের গৃহবাসী করিবার নিমিত্ত বহুতর প্রযত্ন করিলেন; কিন্তু আমি স্বীকৃত হইলাম না। ভাল মন্দ জানি না, কিন্তু আমি মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের দেখা দিতে স্বীকার করিয়া আসিয়াছি। আর প্রভুর অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহাদিগকে তীর্থযাত্রার পরামর্শ দিয়াছি।"

"বেশ করিয়াছ। যেরূপ হউক, এই সাধু-যুগ-লকে আমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত করিতে হইবে, সে জন্য তোমার মধ্যে মধ্যে যাতায়াত রাখা আবশ্যক হইবে। আবার কবে যাইবে স্থির করিয়াছ?"

"প্রভু যে দিন আজ্ঞা করিবেন। সপ্তাহমধ্যে দর্শন দিব বলিয়াছি। এক্ষণে প্রভুর ইচ্ছা।"

"তাহাই হইবে। তোমার অনুপস্থিতিকালে তোমার এই শান্তিনিকেতনে আর দুইটি নিতান্ত উগ্রস্বভাব ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। তাহাদের সহিত তোমার পরিচয় হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। নচেৎ তাহাদের উন্নতির উপায়ান্তর নাই।"

অবনত-মস্তকে শান্তি বলিলেন,—"তাহাদের স্বভাব কি নিতান্ত কলুষিত? তাহারা কি নিতান্তই উচ্ছৃঙ্খল?"

"যৎপরোনাস্তি। সে জন্য তাহাদের সহিত পরিচয় করিতে তুমি কি ভয় পাইতেছ?"

"কিসের ভয় প্রভো! প্রভুর উপদেশ যদি শুনিয়া থাকি, তাহা হইলে ভয়ের সম্ভাবনা ইহজগতের কোথাও নাই। সুখ-দুঃখ, মানাপমান, কার্য্যাকার্য্য, আত্মপর সকল বোধই বর্জ্জন করিতে প্রভুর নিকট উপদেশ পাইয়াছি। কার্য্য করি প্রভুর আজ্ঞায়, কার্য্য করি না প্রভুর আজ্ঞায়। ফলাফল প্রভুর চরণে নিবেদন করি। সে কার্য্যে লাভালাভ কি, তাহা প্রভুই জানেন। কখনই তাহা জানিতে কামনা নাই। সে দুই ব্যক্তি কোথায় আছে?"

"অদীক্ষিতগণ প্রথমে যেখানে থাকে, তাহারা এখন সেই অংশেই আছে।"

"প্রভুর এক্ষণে আর কোন আজ্ঞা নাই?"

"না মা।"

"তবে এখন আসি দয়াময়?"

"এস বাছা।"

শান্তি পশ্চাদাবর্ত্তন করিলে, জ্ঞানানন্দ মনে মনে বলিলেন,—"ইহসংসারে যদি কেহ কখন নিষ্কাম ধর্ম্ম শিখিয়া থাকে, সে তুমি। সার্থক আমার যোগ-চর্চ্চা ও সার্থক আমার সাধনা। শ্যামসুন্দর জীবের প্রতি নিতান্ত করুণা-পরবশ হইয়াই তোমার ন্যায় দেবীকে সময়ে সময়ে ধরাধামে প্রেরণ করেন। তুমি আমার শিষ্যা হইলেও আমি তোমার শিষ্য হইবারও যোগ্য নহি। তোমার সাহস, তোমার ধীরতা, তোমার সদ্বিবেচনা, তোমার পবিত্রতা, তোমার ধর্ম্মময়তা সকল সদ্‌গুণেরই প্রচুর পরীক্ষা হইয়াছে। বৎসে! আজি তোমাকে যে ভার দিয়াছি, তাহাতেই তোমার তেজের পরীক্ষা হইবে। যোগপথে এত দিন পর্য্যটন

করিয়া যদি কিছুমাত্র ঐশ্বর্য্য * সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়া থাকি, সে উন্নতি আমার কামাবসায়িতা হেতু তোমারই দেহকে আশ্রয় করিয়াছে। অতএব বৎসে! তোমার পরীক্ষায় আমার আত্মপরীক্ষা হইবে।"

শান্তি গুরুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া কিয়দ্দূর আগমন করিতে না করিতে হরিমন্দিরে মঙ্গলারতিসূচক বাদ্যধ্বনি উঠিল। সেই বাদ্যধ্বনি শ্রবণ করিয়া শান্তি সর্ব্বাগ্রে হরিমন্দিরে গমন করিলেন।

তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সেই বিগ্রহযুগলের পুরোভাগে গল-লগ্নীকৃতবাসে এবং কৃতাঞ্জলিপুটে অনেক নর-নারী দণ্ডায়মান। সকলেই সমান বেশধর ও প্রশান্তমূর্ত্তি। নর-নারী তাবতেরই দেহ সমস্থূল, গৈরিক-রাগ-রঞ্জিত বসনাবৃত। সম্মুখে এক বিপ্র রজত-পঞ্চ-প্রদীপ লইয়া দেবারতি করিতেছেন। শান্তি সেই জনতার পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান হইলেন। তৎকালে সকলেই আরতি দর্শনে নিবিষ্টচিত্ত; সুতরাং তাঁহাকে কেহই লক্ষ্য করিল না। আরতি সমাপ্ত হইল। সমবেত নর-নারীগণ ভক্তিভাবে ভূ-লুণ্ঠিত হইয়া দেবচরণে প্রণাম করিতে থাকিল। সেই সময়ে সমুচ্চ ও অপ্সরোবিনিন্দিত সুমিষ্ট-স্বরে অপূর্ব্ব সঙ্গীতধ্বনি সমুত্থিত হইয়া সমবেত সকলের হৃদয়-মন অপার্থিব আনন্দরসে পরিপ্লুত করিয়া তুলিল। শান্তি গায়িতেছেন,—

"দিনমণিমণ্ডলমণ্ডন ভবখণ্ডন
মুনিজনমানসহংস।
কালিয়বিষধরগঞ্জন জনরঞ্জন
যদুকুলনলিনদিনেশ॥
মধুমুরনরকবিনাশন গরুড়াসন
সুরকুলকেলিনিধান।
অমলকমলদললোচন ভবমোচন
ত্রিভুবনভবননিদান॥
জনকসুতাকৃতভূষণ জিতদূষণ
সমরশমিতদশকণ্ঠ।
অভিনবজলধরসুন্দর ধৃতমন্দর
শ্রীমুখচন্দ্রচকোর॥"

সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণ করিবামাত্র সকলেই বুঝিল যে, গায়িকা শান্তি ভিন্ন আর কেহই নহেন। তখন তাবতেই সসম্ভ্রমে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। সঙ্গীত ক্ষান্ত হইলে সকলে ভক্তিসহকারে শান্তিদেবীকে প্রণাম করিল। 'শ্যামসুন্দর তোমাদিগের সকলকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্টচিত্ত করুন' বলিয়া শান্তি আশীর্ব্বাদ করিলেন। প্রণামকারিগণের মধ্যে শান্তির অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা নরনারী অনেকেই ছিলেন। তাঁহারা সকলে যখন শান্তিদেবীকে প্রণাম করিতেন, তখন তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে গুরুদেবকে স্মরণ করিতেন এবং প্রণামকারিগণকে উল্লিখিতরূপ আশীর্ব্বাদ করিতেন।

উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দ একে একে শান্তির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। শান্তি সকলের সহিতই ধর্ম্মোন্নতি-বিষয়ক বাক্যালাপ করিয়া প্রীতি-বিকসিতাননে প্রত্যেককে বিদায় দিলেন। সেই দেবী তখন পুণ্যশীলা সুরমার সমীপস্থ হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সেই শান্তি-নিকেতনে উষার সঞ্চার হইল। সেই নিবিড়ারণ্যমধ্যে সম্মোহন বালারুণদ্যুতি বিভাসিত হইল। পাদপাশ্রিত বিহঙ্গমকুল মধুর কূজনে উষা-সমাগম সংঘোষিত করিল। দলে দলে শিখি-শিখিনী শান্তি-নিকেতনে আহারান্বেষণ-কামনায় প্রবেশ করিল, এবং ভয়চকিত হরিণগণও সেই হিংসা-দ্বেষ-বিরহিত পুণ্যপুরীর সমীপদেশে উপস্থিত হইল। সেই পুরবাসী দেবদেবীগণ সূর্য্যোদয়ের বহুপূর্ব্বেই ভক্তিসহকারে হরিনামোচ্চারণ করিতে করিতে স্ব স্ব অজিনশয্যা পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন, এবং ললিতবিভাষরাগে মধুর-স্বরে শ্যামসুন্দরের স্তোত্র পাঠ করিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্যপালনে মনোনিবেশ করিলেন।

এই সুবিশাল পুরীর অধিবাসিবৃন্দ কেহই ক্রিয়া-হীন ও অলস নহেন। আশ্চর্য্য নিয়মাধীনতা

---

* যোগবলে অষ্টৈশ্বর্য্যের অধিকারী হওয়া যায়। সেই অষ্টৈশ্বর্য্যের কথা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে পরিস্ফুট আছে,—
"অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমেশিতা।
বশিকামাবসায়িত্বে ঐশ্বর্য্যমষ্টধা স্মৃতম্।"
অর্থাৎ অণিমা (আবশ্যকানুসারে দেহকে সঙ্কুচিত করিবার ও সূক্ষ্ম করিবার শক্তি), লঘিমা (দেহ লঘু করিবার শক্তি), ব্যাপ্তি (সর্ব্বস্থানে বিদ্যমান থাকিবার শক্তি), প্রাকাম্য (ভোগবাসনাপূরণশক্তি), মহিমা (দেহ সংবর্দ্ধিত করিবার শক্তি), ঈশিতা (শাসন করিবার শক্তি), বশী (বশীভূত করিবার শক্তি), কামাবসায়িত্ব (কামনাপূরণশক্তি) এই আট প্রকার ঐশ্বর্য্য।
ইহারই নাম অষ্টসিদ্ধি। সকল যোগীই যে উল্লিখিত অষ্টসিদ্ধি লাভ করেন, এমন নহে। কদাচিৎ সাধুবিশেষ একাধিক ঐশ্বর্য্যের অধিকার লাভ করিয়া থাকেন। ঐশ্বর্য্য-বিশেষে তাদৃশ সাধু, মহাপুরুষ নামে সমাজমধ্যে সম্পূজিত হইয়া থাকেন।

সহকারে তত্রত্য ভাবতেই সমস্ত দিন নিরন্তর ক্রিয়া-নিরত। অপূর্ব্ব সুব্যবস্থার বশবর্ত্তী হইয়া কেহ বা হরিণ ও পক্ষিগণকে আহার প্রদান করিতেছেন, কেহ বা পুষ্পচয়ন করিতেছেন, কেহ বা হবিষ্যের আয়োজন করিতেছেন, কেহ বা কাষ্ঠাহরণ করিতেছেন, কেহ বা পাকের আয়োজন করিতেছেন, কেহ বা পূজার আয়োজন করিতেছেন, ইত্যাকার ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন লোক নিযুক্ত। কার্য্যের গুরুতাবিবেচনায় কোন কোন কার্য্যের দায়িত্ব একাধিক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত। কাহারও কার্য্যের সহিত কাহারও সংঘর্ষণ নাই, কাহারও কথান্তর নাই, সকলেরই বদনে প্রীতিপূর্ণ মনোহর হাস্যচ্ছটা। শান্তি ও আনন্দ সকলেরই সর্ব্বাঙ্গে মাখা। পুরুষ ও স্ত্রী সমভাবে ও স্বনিষ্ঠরূপে নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যপালনে নিযুক্ত। কিন্তু কাহারও হৃদয়ে বিন্দুমাত্র দুষ্প্রবৃত্তি নাই, কাহারও বদনে বিন্দুমাত্র অপবিত্রতা নাই, এবং কাহারও নয়নে তিলমাত্র লালসা নাই। সকলেই পরদুঃখ-প্রবণ-হৃদয়, হরিভক্তিপরায়ণ, এবং অসচ্চিন্তাবিবর্জ্জিত। অহো! কে বসুন্ধরায় এ স্বর্গধাম প্রতিষ্ঠা করিল? স্বর্গে ইহার অপেক্ষা অধিকতর সুখকর আর কিছু আছে কি না জানি না।

সেই পুণ্যধামের সর্ব্বত্র এতাদৃশ বিমলানন্দ বিদ্যমান নাই। তত্রত্য যে নিভৃত অংশ আমরা অধুনা দর্শন করিবার বাসনা করিতেছি, তাহা সম্প্রতি দুঃখ ও অসততার আলয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তথায় দুইটি অতি পরুষমূর্ত্তি পুরুষ বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছে। দেহের গঠন-বিবেচনায় তাহাদিগকে বিশেষ বলশালী বলিয়াই বোধ হয়। তাহারা কৃষ্ণকায়, আরক্তলোচন, এবং তাহাদের বাক্যালাপ শুনিয়া অনুমান হয় যে, তাহারা যৎপরোনাস্তি মূর্খ, অসভ্য এবং কলুষিত-স্বভাব। তাহাদের কথাবার্ত্তার কিয়দংশ পাঠককে শুনাইতে ইচ্ছা আছে। এক জন বলিতেছে,—"মাইরি রামা, এ ত বড় জ্বালার জ্বালা হলো।"

রামা বলিল,—"কি করা যায় বল্ দেখি ভাই?"

"দূর শালা! তাই যদি বল্‌তে পার্‌ব, তা হ'লে এত ভাবনাই কিসের?"

"বড় মুস্কিলেই পড়া গেল যেদো। খাসা ঘর, সম্মুখে ঢের জায়গা, কিন্তু বাবা, চারিদিকে উঁচু দেওয়াল। হেঁচড়ে মেচড়ে যে পালাব, তাহারও যো নেই, কোন দিকে অন্ধি-সন্ধি নেই। এক দিকে একটা দরজা আছে বটে, তাহাও লোহার, আবার আর এক দিক্ থেকে বন্ধ। হাজার ধাক্কা মার, ভাঙ্গিবে না বাবা। এমন দায়ে তো কখন ঠেকিনি রামা।"

রামা বলিল,—"কে আন্‌লে, কেন আন্‌লে, কোথা দিয়ে আন্‌লে, তা কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লেম না। দাদা! শেষটা কি ভূতে ধর্‌লে? কি জানি বাবা, কিন্তু যাই বল দাদা, এর আশে-পাশে আরও বাড়ী-ঘর আছে, আর মেয়েমানুষও ঢের আছে। দেখ্‌তে পাস্‌নে, এক একবার মিঠে গলায় উড়ো আওয়াজ এসে কানে লাগে? বাবা, নির্ঘাত মেয়েমানুষ আছে।"

যেদো বলিল,—"ভাল, তারও যদি একটা আধটা ছট্‌কে আসে, তা হলেও যে দিনটা কাটে যা হোক ক'রে। এ বাবা, মদটুকু নাই, গাঁজাটুকু নাই, মেয়েমানুষটুকু নাই, কি ক'রে থাকি বল দেখি?"

এইরূপ সময়ে সেই লৌহদ্বার নিঃশব্দে উন্মুক্ত হইল, এবং ধীরে ধীরে শান্তিদেবী সেই পথমধ্য হইতে দেখা দিলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র রামা যেদোর গা টিপিয়া বলিল,—"ঐ রে! মা সরস্বতী আমাদের দুঃখু জান্‌তে পেরেছেন। কেয়াবাত—কেয়াবাত, দেখেছিস্ একবার চেহারা-খানা। এখন এক বোতল পেলেই বস্ আছে।"

যেদো বলিল,—"মা যখন দয়া ক'রে মেয়েমানুষ যুটিয়ে দিয়েছেন, তখন অবিশ্যি মদও দেবেনই দেবেন। ছিঃ ভাই মেয়েমানুষ, ওখানে থম্‌কে দাঁড়ালে কেন বাবা? এলে যদি ভাই দয়া ক'রে তো এ দিকে এগিয়ে এস।"

শান্তিদেবী নির্ভীকভাবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রেমো অস্ফুট স্বরে যেদোর কানে কানে বলিল,—"না রে, কিছু বলিস্‌নে, দেখ্‌ছিস্ না, কেমন ঠাকুর-দেবতার মত রকম-সকম? কি জানি ভাই, কি কর্‌তে কি হবে! দেখ না চেহারা! মানুষের কি কখন অমন চেহারা হয়?"

যেদো ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল,—"তুই যেমন মুখ্যু, তেম্‌নি তোর কথা। দেবতা ব'সে আছে তোর জন্যে। দেখ্ না, হুঁশো ইয়ারকি দেবে এখন।"

পরে সেই দেবীর দিকে লক্ষ্য করিয়া পুনরায় বলিল,—"এস প্রাণ, এগিয়ে এস। ভয় কি ভাই, তোম'কে অযতন কর্‌তে আমার বাবারও সাধ্যি নাই।"

শান্তিদেবী ক্রমশঃ বর্ব্বরদ্বয়ের অতি নিকটাগতা হইলেন। তখন রামা ও যেদো কথা ভুলিয়া গেল, কামনা ভুলিয়া গেল, এবং অভিসন্ধি ভুলিয়া গেল। তাহারা নির্নিমেষলোচনে সেই অপার্থিব শ্রী, সেই

অলৌকিক শোভা, সেই ভুবন-দুর্ল্ভ তেজঃপ্রভা সন্দর্শন করিতে লাগিল। শান্তিদেবী আরও নিকটস্থ হইলেন, এবং যেদোর মস্তকে আপনার নিষ্পাপ কর-কমল প্রদান করিয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসিলেন,—"এরূপে থাকিতে বড়ই কষ্ট হইতেছে কি বাছা?"

হায় হায়! এমন আওয়াজ কি মানুষের হয়? আনন্দ-সহকৃত করুণা সেই দেবীর সর্ব্বাঙ্গে মাখা। হরি হরি! যেদো অবাক্। রামা হাঁ করিয়া বহুক্ষণ সেই বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিল। তাহার পর গল-বস্ত্র হইয়া দেবীর চরণে প্রণাম করিয়া বলিল,—"মা! তোমার ছেলের অপরাধ মাপ কর মা।"

শান্তিদেবী পরমাদরে তাহার হস্তধারণ করিয়া বলিলেন,—"ভয় কি বাবা, শ্যামসুন্দর অবশ্যই তোমাকে ক্ষমা করিবেন।"

কিন্তু যেদো এখনও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। সে এখনও নির্নিমেষলোচনে সেই কলুষশূন্য অপরূপ শ্রী সন্দর্শন করিতেছে। রামা তাহাকে ধাক্কা মারিয়া বলিল—"দেখ্‌ছিস্ না যেদো, সগ্‌গে থেকে মা ভগবতী নেমে এসেছেন।"

তখন শান্তি বলিলেন,—"না বাবা, আমি ভগবতী নহি। আমি তোমাদেরই মত মানুষ।"

এতক্ষণে যেদোর কথা কহিবার ক্ষমতা হইল। সে বলিল,—"আমার মাথায় একটু পায়ের ধূলো দিয়ে আমাকে উদ্ধার কর মা।"

এই বলিয়া সে দেবীর পদস্পর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি তাহাকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন,—"না বাবা, আমার পদধূলি লইয়া কোন ফল নাই। স্বয়ং শ্যামসুন্দর তোমাকে এখনই উদ্ধার করিবেন।"

তখন যেদো বলিল,—"কিন্তু মা, আমি যে বড় পাপী। আমি যে কত মানুষের বুকে ছুরি মারিয়াছি, কত সতী-সাবিত্রীর ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছি, কত চুরি করিয়াছি। মা, আমার পাপের তো সীমা নাই; আমার উপর কি তোমার দয়া হবে?"

শান্তিদেবী কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই রামা বলিল,—"তা হউক মা, আমি যেদোর চেয়েও পাপী। আমার কোনই উপায় নাই। আমি লোভে সহোদর ভাইকেও মারিয়া ফেলিয়াছি। আমার হিসাবে যেদো দেবতা। মা গো, আমার কি উপায় হবে?"

তখন শান্তিদেবী বলিলেন,—"ভয় কি বাবা, শ্যামসুন্দর তোমাদের দুই জনের উপরই দয়া করিবেন। তোমাদের কোন ভয় নাই। তিনি দয়া করিয়াছেন বলিয়াই তোমরা আপন আপন পাপের কথা বুঝিতে পারিয়াছ। আর তোমাদের ভয় নাই। এখন তোমাদের ভাল হবে।"

যেদো জিজ্ঞাসিল,—"আমরা কি করিব? কোন্ উপায়ে আমাদের মঙ্গল হবে?"

শান্তি জিজ্ঞাসিলেন,—"তোমরা কখন শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ দেখিয়াছ?"

উভয়েই উত্তর দিল,—"ঢের—ঢের।"

শান্তি বলিলেন,—"বেশ! সেই মূর্ত্তি তোমরা এখন ভাবনা করিতে থাক। শিখিপুচ্ছ-চূড়াধারী ত্রিভঙ্গিমঠাম শ্রীকৃষ্ণের রূপ তোমরা চিন্তা কর। যে যত অনন্যমনে সেই মূর্ত্তির চিন্তা করিতে পারিবে, তাহাকে ভগবান্ তত শীঘ্র উদ্ধার করিবেন। তোমরা তিন ঘণ্টাকাল এইরূপে চিন্তা কর। তাহার পর আবার আমি তোমাদের সহিত দেখা করিতে আসিব। তোমাদের যাহা যাহা আবশ্যক, তাহা তোমরা তখন পাইবে।"

রামা বলিল,—"যে আজ্ঞা।"

যেদো বলিল,—"কিন্তু মা, তুমি যদি আসিতে ভুলিয়া যাও। আমরা যে বড় অভাগা।"

শান্তি বলিল,—"না বাছা, তোমাদের কাছ-ছাড়া হইলেও আমি কেবল তোমাদেরই কথা ভাবিব। তোমাদের কোন ভয় নাই; কোন ভাবনা নাই।"

যেদো বলিল, "তবে একটু পায়ের ধুলো দিয়ে যাও মা"

শান্তি বলিলেন,—"যদি তাহাতেই তোমাদের তৃপ্তি হয়, তাহা হইলে লইতে পার।"

রামা বলিল,—"খুব তৃপ্তি; মা, আমরা আর কিছু চাই না!"

তখন শান্তিদেবী উভয় হস্ত বক্ষে স্থাপন করিয়া বলিলেন,—"শ্যামসুন্দর তোমাদের মতি ভাল করুন।"

তাহারা ভক্তিসহকারে দেবীর পদরজ লইয়া মস্তকে, ললাটে ও রসনায় সংলগ্ন করিল। ধীরে ধীরে শান্তিদেবী প্রস্থান করিলেন, সেই লৌহদ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। তখন রামা বলিল,—"ভাই, কি এ?"

যেদো বলিল,—"দেবতা আর কি? দেখছিস্ না, জায়গাটা যেন জ্ব'লে উঠেছিল, আর এখন একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল।"

তাহারা সবিস্ময়ে উভয়ে এই কাণ্ডের অনেক আলোচনা করিল, কিন্তু কোন মীমাংসা হইল না। তাহার পর রামা বলিল,—"যাই হোক বাবা, শেষ পর্য্যন্ত দেখা চাই।"

যেদো বলিল,—"তবে যে রকম ভাবিতে বলিল, তাই ভাবিতে আরম্ভ কর।"

উভয়ে নয়ন মুদ্রিত করিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিল। অল্পকাল পরেই যেদো কি করিতেছে দেখিবার জন্য রামা চক্ষু মেলিল। যেদোও সেই সময়ে রামা কি করিতেছে দেখিবার জন্য চক্ষু মেলিয়া আছে। তখন যেদো বলিল,—"দূর শালা, তুই বুঝি এই রকম ক'রে ভাবছিস্?"

আবার উভয়ে পরামর্শ করিয়া অধিকতর আগ্রহের সহিত ধ্যান করিতে বসিল। আবারও অনতিকালমধ্যে তাহাদের ধ্যানভঙ্গ হইল। এইরূপ বারংবার চেষ্টার পর তাহারা অপেক্ষাকৃত কৃত-কার্য্য হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিকালে শান্তিধামের অপূর্ব্ব ভাব। তত্রত্য দেবদেবীগণ তখন পূর্ণানন্দিত-মনে ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন। সেই সুবিশাল পুরীর কোন স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইতেছে। পুণ্যতেজঃপ্রদীপ্ত পাঠক বেদীর উপর উপবেশন করিয়া 'অনন্যমনে গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন; বহুতর দেব-দেবী তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া তদ্গতচিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেছেন; কোথায় বা গীতার ব্যাখ্যা হইতেছে; কোথায় বা শ্যামসুন্দরের সেবার জন্য নানাবিধ আয়োজন হইতেছে; কোথায় বা ধর্ম্মসঙ্গীত হইতেছে; কোথায় বা মীমাংসাকারী ব্যক্তিবিশেষের নিকট যাহার যে সন্দেহ আছে, তিনি তাহা বুঝিয়া লইতেছেন। সর্ব্বত্র আনন্দ, পবিত্রতা, সরলতা ও শান্তি বিরাজ করিতেছে। এই পাপ-তাপ-পূর্ণ ধরাধামে এতাদৃশ শান্তি-নিকেতনের আবির্ভাব বস্তুতই বিধাতার বিশেষ করুণার পরিচায়ক।

সেই শান্তিধামের অপর এক দিকে এক সুবিস্তৃত পুষ্পকানন ছিল। তথায় অগণ্য ফুলের গাছে অগণ্য ফুল ফুটিয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। দেব-দেবীগণ ইচ্ছা হইলে তথায় বিচরণ করেন, শ্যামসুন্দরের জন্য পুষ্পচয়ন করেন এবং তথায় কুঞ্জবিশেষে বা বেদীবিশেষে উপবিষ্ট হইয়া ধ্যান ও চিন্তা করেন। সেই বহুদূরব্যাপী উদ্যানমধ্যে স্থানে স্থানে বৃক্ষ-লতা-গুল্মাদির সংমিশ্রণে ঘনারণ্য রচিত হইয়াছে। সেই অরণ্যাভ্যন্তরে স্থানে স্থানে অতি সুপরিষ্কৃত ও সুরম্য স্থান আছে। আবশ্যক হইলে তথায় সমুপবিষ্ট হইয়া দেবদেবীগণ একান্তমনে অভীষ্টদেবতার ধ্যান করিতে পারেন।

শান্তিকাননের একতম নিভৃত-কুঞ্জে সম্প্রতি জ্ঞানানন্দ যোগী উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার তেজঃ-প্রভাশালী সুদীর্ঘ কলেবর ও প্রশান্ত-নয়নশ্রী সন্দর্শন করিলে স্বতঃই হৃদয় হইতে তাঁহার প্রতি ভক্তিস্রোত প্রবাহিত হইয়া তদীয় চরণ ধৌত করিতে প্রবৃত্ত হয়, এবং তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়াই বিশ্বাস হয়।

ধীরে ধীরে তেজঃ ও জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতে করিতে শান্তিদেবী সেই স্থানে সমাগত হইলেন, এবং আন্তরিক ভক্তি সহকারে সেই দেবচরণে প্রণাম করিয়া অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র জ্ঞানানন্দ মনে মনে বলিলেন,—"প্রণাম করিলে, কর। তোমার প্রণাম গ্রহণ করিবার যোগ্য ব্যক্তি আমি নহি। তোমার তেজেরও যথেষ্ট পরীক্ষা হইয়াছে। কিন্তু আরও পরীক্ষা বাকী আছে। ক্রমশঃ তাহার ব্যবস্থা হইবে। আপাততঃ তোমাকে কি আশীর্ব্বাদ করিব? তোমার কি নাই?" প্রকাশ্যে বলিলেন, "শ্যামসুন্দর তোমার মঙ্গল করুন। বৎসে! আমাকে সত্বর ভিক্ষায় যাত্রা করিতে হইবে। তোমাকেও আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।"

শান্তি বলিলেন,—"প্রভুর ইচ্ছা।"

"তবে এখানে যদি তোমার কোন অসমাপিত কার্য্য থাকে, তাহা শেষ করিয়া রাখ।"

শান্তি হাসিয়া বলিলেন,—"প্রভো! এ সংসারে আমার কার্য্য কিছুই নাই। যাহা কিছু আমাকে আপনি করান, তাহাই আমি করি। সকলই প্রভুর কার্য্য। আর কার্য্য সমাপিত কিসে হয়, তাহাও তো জানি না প্রভু। কার্য্য অনন্ত—সীমারহিত, তাহার আরম্ভ বা শেষ কোথায়? তবে ভগবন্! কার্য্য শেষ করিতে আদেশ করিতেছ কেন?"

জ্ঞানানন্দ মনে মনে বলিলেন,—'কোন্ ভাগ্যবলে —পূর্ব্বজন্মের কোন্ অসাধারণ সুকৃতিফলে এরূপ শিষ্যাকে উপদেশ দিবার ভার আমার হস্তে অর্পিত হইয়াছিল? সার্থক আমার সাধনা।' প্রকাশ্যে বলিলেন,—"যে দুই কলুষিত পুরুষের সহিত তোমাকে সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছিলাম, তাহা করিয়াছ কি?"

শান্তি বলিলেন,—"আজ্ঞে হাঁ।"

"তাহারা বোধ করি, তোমার প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিয়াছিল?"

শান্তি আবার হাসিয়া বলিলেন,—"প্রভো! আমি কে যে, তাহারা আমার উপর অত্যাচার করিবে? প্রভুর পাদপদ্ম চিন্তা করিতে যদি কখন

আমার অক্ষমতা হয়, তখন হয় তো আমি কীটের অপেক্ষা হেয় ও সর্ব্বলোকের পাদ-পেষণোপযোগী হইব। কিন্তু যতক্ষণ আমি অনন্যমনে প্রভুর ঐ চরণ-যুগলের ধ্যান করিতে সমর্থ, ততক্ষণ আমার স্বতন্ত্রতা আমি অনুভব করি না, সুতরাং আমি থাকি না। তখন অত্যাচার ও শিষ্টাচার, তিরস্কার ও পুরস্কার, পাপ ও পুণ্য, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, জ্ঞান ও অজ্ঞান, প্রেম ও হিংসা কিছুই আমি বুঝিতে পারি না। প্রভু, আপনি দেবতা ও ভগবান্, সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বব্যাপী। যে ব্যক্তি ভাগ্যবলে আপনার শিষ্যত্ব লাভ করিয়া পুনর্জ্জন্ম ও নবজীবন প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার হৃদযভাব ও অবস্থার কথা প্রভুর অপরিজ্ঞাত থাকা কদাপি সম্ভবপর নহে। তবে প্রভো! এরূপ আদেশ কেন করিতেছেন?"

জ্ঞানানন্দ বলিলেন,—"তবে তাহারা কোন অত্যাচার করে নাই? ভাল, ভাল। তাহাদের কোন হিত-পরিবর্ত্তনের সূচনা হইয়াছে?"

শান্তি বলিলেন,—"প্রভুর আজ্ঞা পাইলে তাহা-দিগকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করি।"

"এখনই?"

"যদি প্রভুর ইচ্ছা হয়।"

"আজি তোমার ইচ্ছায় তোমার গুরুর ইচ্ছা।"

শান্তি আবার হাসিয়া বলিলেন,—"কিন্তু আমার ইচ্ছা করায় কে?"

শান্তি চলিয়া গেলেন। জ্ঞানানন্দ মনে মনে বলিলেন,—'ধরা পবিত্র হইল। এ দেবী যখন বসুন্ধরা-বিচরণশীলা, তখন ইহা পুণ্যভূমি। ঐ দেবীর প্রতি পাদবিক্ষেপে ধরণীর কলেবর পুলকিত হইতেছে।'

জ্ঞানানন্দ প্রেমাবেশে ধ্যানে মগ্ন হইলেন। তাঁহার দেহ তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ হইল; অপার্থিব শোভা সমস্ত কলেবর সমাচ্ছন্ন করিল, তাঁহার দেহ হইতে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতে লাগিল।

এইরূপ সময়ে রামা ও যেদোকে সঙ্গে লইয়া শান্তিদেবী পুনরায় সেই কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু এ কি ব্যাপার! রামা ও যেদো উভয়েরই নয়ন হইতে প্রেমবারি বিগলিত হইতেছে; উভয়েই আনন্দে পুলকিত। এইরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদ্বয় সেই ধ্যানমগ্ন মহাপুরুষের সম্মুখীন হইয়া, এবং তদীয় অলৌকিক শ্রী দেখিয়া অবাক্ হইল। শান্তিদেবী তাহাদিগকে সাষ্টাঙ্গে সেই মহাপুরুষকে প্রণাম করিতে উপদেশ দিলেন। তাহারা উভয়ে ভূপতিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। প্রণামান্তে যখন তাহারা গাত্রোত্থান করিল, তখন তাহাদের আর এক ভাব হইল। তখন তাহাদের নয়নজল নিবারিত হইল, অভাব-বোধ বিদূরিত হইল, সন্তোষে দেহ-মন পরিপূর্ণ হইল, এবং তাহারা আনন্দে মগ্ন হইল।

সেই সময়ে সেই ধ্যান-নিরত সাধু নয়ন উন্মীলন করিলেন, এবং সেই সর্ব্বদর্শি-নয়নের প্রশান্ত দৃষ্টি সেই দুই ব্যক্তির উপর পতিত হইল। তখনই তাহাদের প্রাণের পূর্ণ তৃপ্তি হইল এবং তাহারা আপনাদিগকে ধন্য মনে করিয়া কৃতার্থ হইল। তখন মহাপুরুষ বলিলেন,—"শুনিয়াছি, তোমরা এই স্থানে আসিয়া নিতান্ত কাতর হইয়াছ, এবং এখানে থাকা তোমরা অতিশয় কষ্টকর বলিয়া মনে করিয়াছ।"

ভাষা আর তখন তাহাদের ভাব প্রকাশের ব্যাঘাত করে না। রামা বলিল,—"দেবতা, অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আমরা যতক্ষণ স্বর্গসুখ জানিতে পারি নাই, ততক্ষণ ব্যাকুল ছিলাম।"

যেদো বলিল,—"দয়াময়! আমাদের আর কোন কষ্ট নাই। আমরা এ স্বর্গ হইতে আর কোথাও যাইব না। আমরা এত দিন নরকে ছিলাম। এই মা আমাদের স্বর্গে আনিয়াছেন। ঐ চরণ হইতে আমরা আর কোথাও যাইব না।"

যেদো ক্ষান্ত হইলে, রামা শান্তির দিকে চাহিয়া বলিল,—"মা! এ অধম ছেলেদের তুমি কি কাছে থাকিতে দিবে না? তোমার আশীর্ব্বাদবলে আমরা ধ্যান করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাইয়াছি। ওঃ! শোভার কথা কি বলিব? এখান হইতে যদি তুমি আমাদের তাড়াইয়া দেও, তবে আর আমরা তোমাকে দেখিতে পাইব না। তোমাকে না দেখিলে শ্রীকৃষ্ণও দেখা দিবেন না। তাহা হইলে আমাদের মরণ হইবে। আমরা তোমার কাছছাড়া হইয়া কোথাও যাইব না।"

যেদো বলিল,—"মা, ইনি কি নারায়ণ? আমরা যে দেবতাকে দেখিয়াছি, তাঁহার রূপ স্বতন্ত্র, কিন্তু শ্রী এমনই। মা, ইনি তো দয়াময়! তবে আমরা তোমার কাছে থাকিতে পাইব না কেন?"

তখন মহাপুরুষ বলিলেন,—"বৎস! তোমাদের যিনি মা, উনি তোমাদেরও মা, আমারও মা; উনিই এ স্বর্গধামের অধিষ্ঠাত্রী। উঁহাকে শান্তি দেবী বলে। এই জন্য এই স্থানের নাম শান্তি-নিকেতন। তোমরা কায়মনোবাক্যে ঐ দেবীর চরণে মনস্থাপন করিয়া, উঁহার আজ্ঞার বশবর্ত্তী থাকিও, তাহা হইলেই তোমাদের সকল কামনা পূরণ হইবে। মার ছেলে কি মাব কাছছাড়া হয়? এখন হইতে তোমাদের নূতন নাম হইবে।"

যতক্ষণ মহাপুরুষ এই সকল কথা বলিতেছিলেন, ততক্ষণ শান্তিদেবী নয়ন মুদিয়া কেবল প্রভুরই পাদপদ্ম ধ্যান করিতেছিলেন।

তদনন্তর মহাপুরুষ রামার হস্তধারণ করিয়া, এবং তত্রত্য একটু মৃত্তিকা উত্তোলন করিয়া তাহার কপালে তিলক করিয়া দিলেন, এবং বলিলেন,—"আজি হইতে তোমার নাম হইল 'অভিরাম'।"

অনন্তর যেদোর হস্তধারণ করিয়া সেইরূপ অনুষ্ঠানান্তে বলিলেন,—"আজি হইতে তোমার নাম হইল 'নারায়ণ'।"

মহাপুরুষের করস্পর্শ হওয়ায় অভিরাম ও নারায়ণের শরীর দিয়া অলৌকিক ও অজ্ঞাতপূর্ব্ব তাড়িত-প্রবাহ প্রবাহিত হইতে থাকিল। তাহারা চলচ্ছক্তিহীন, বাক্‌শক্তিহীন ও বাহ্য-জ্ঞানশূন্য হইল। মহাপুরুষ বলিলেন,—"মা, তোমার নতন সন্তানদের লইয়া যাও। ইহাদের আশ্রম নির্দ্দেশ করিয়া দেও। অদ্য ভগবানের সহিত ইহাদের পরিচয় করাইয়া দেও।"

শান্তিদেবী উভয় হস্তে উভয় সন্তানের হস্তধারণ করিয়া ভক্তিসহকারে মহাপুরুষকে প্রণাম করিলেন। মহাপুরুষ হাসিয়া বলিলেন,—"শান্তি-নিকেতনে মাও কখন কখন ছেলেকে প্রণাম করেন।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যাসময়ে শান্তি-নিকেতনের আর এক ভাব। তত্রত্য দেবদেবীগণ তখন শ্যামসুন্দরের আরতির জন্য বড়ই ব্যস্ত। কেহ মালা গাঁথিতেছেন, কেহ পুষ্প সাজাইতেছেন, কেহ ভোগের আয়োজন করিতেছেন, কেহ চন্দন প্রস্তুত করিতেছেন, কেহ দেব-ব্যবহার্য্য রজত ও স্বর্ণপাত্রসমূহ পরিষ্কার করিতেছেন, কেহ নিকেতনের নির্দ্দিষ্ট স্থানসমূহে আলোক-প্রদানের ব্যবস্থা করিতেছেন, কেহ দেবালয় মার্জ্জনা করিতেছেন ইত্যাদি নানাবিধ কার্য্যে সকলেই ব্যস্ত।

ক্রমে সায়ংকাল সমুপস্থিত হইল এবং আরতির সমস্ত আয়োজন হইল। তখন মধুর মৃদঙ্গ, দামামা ও করতালাদির বাদ্যারম্ভ হইল। সে বাদ্যধ্বনি ও তাহার প্রতিধ্বনিতে সেই সুপ্রশস্ত হর্ম্ম্য ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অরণ্য আমোদিত হইয়া উঠিল। আশ্রমবাসী নর-নারীগণ যিনি যেখানে ছিলেন, সকলে আসিয়া দেবালয়ে সমবেত হইতে লাগিলেন।

তখন অগ্রে মহাপুরুষ জ্ঞানানন্দ, পশ্চাতে অভিরাম ও নারায়ণ, এবং সর্ব্বশেষে শান্তিদেবী সেই দেবালয়ে আগমন করিলেন। মহাপুরুষকে দর্শনমাত্র তাবতেই ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া, তাঁহার চরণরজঃ মস্তকে ধারণ করিতে থাকিলেন। মহাপুরুষ নয়ন মুদ্রিত করিয়া করযোড় করিয়া রহিলেন। মহাপুরুষের সমাগমে সকলের হৃদয় দিয়া আনন্দলহরী প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাঁহার প্রশান্ত সহাস্য বদন, তেজঃপ্রদীপ্ত কলেবর ও অপরূপ শ্রীদর্শনে সকলেই পরম পুলকিত হইলেন।

শান্তি দেবীকেও সকলে আন্তরিক ভক্তির সহিত প্রণাম করিতে থাকিলেন। তিনি মহাপুরুষের ন্যায় নয়ন মুদ্রিত করিয়া প্রভুর পাদপদ্ম ধ্যান করিতে লাগিলেন। আনন্দ ও শোভা বিলাইতে বিলাইতে তিনি মহাপুরুষের পশ্চাতে চলিলেন। আর অভিরাম ও নারায়ণ কি করিলেন? তাঁহারা প্রথমে অবাক্ হইলেন, এত দেব-দেবীর সুললিত পুণ্যপ্রদীপ্ত কলেবর দর্শন করিয়া, সুরভি কুসুম ও চন্দনাদির গন্ধ উপভোগ করিয়া, বাদ্যধ্বনির গাম্ভীর্য্য অনুভব করিয়া, ভক্তি ও আনন্দের অদ্ভুত বিকাশ দেখিয়া, পবিত্রতা ও পুণ্যের সমীরণ সম্ভোগ করিয়া, তাঁহাদের মনে হইল, তাঁহারা সশরীরে স্বর্গে আগমন করিয়াছেন। তখন তাঁহারা কিয়ৎকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় থাকার পর উন্মত্তভাবে সেই সকল দেব-দেবীর চরণমূলে নিপতিত হইতে লাগিলেন, এবং তত্রত্য পবিত্র-রজঃ স্ব স্ব কলেবরে সম্পৃক্ত করিতে থাকিলেন।

আরতি আরম্ভ হইল, মহাপুরুষ স্বয়ং সেই সুবৃহৎ পঞ্চপ্রদীপ হস্তে লইয়া দেবারতি করিতে আরম্ভ করিলেন। হুলুধ্বনি, আনন্দধ্বনি ও বাদ্যধ্বনিতে দিগ্‌বলয় সম্পূরিত হইয়া উঠিল। আরতি সমাপ্ত হইলে সেই দেব-দেবীগণ বিগ্রহ-মঞ্চ বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। অহো! কি অপূর্ব্ব, কি সুললিত, কি অলৌকিক! আহা! সে নৃত্য—সে প্রেমোন্মাদপূর্ণ অপূর্ব্ব পদবিক্ষেপ—সে সুপবিত্র অঙ্গভঙ্গী—তাহার কি বর্ণনা সম্ভবে? হরি হে! হে পুরুষোত্তম! কত দিনে বসুন্ধরার তাবতে এরূপ স্বর্গসুখসম্ভোগের অধিকারী হইবে? কত দিনে মানব ভক্তি-মাহাত্ম্যে বিমোহিত হইয়া তোমার জন্য এইরূপ উন্মত্ত হইবে? কত দিনে, হে জগন্নাথ! তোমার মহিমা হৃদ্‌গত করিয়া জীব ধন্য হইবে?

সেই নৃত্যামোদ ক্ষান্ত হইলে দেব-দেবীগণ সমস্বরে সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। সেই সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণ করিয়া স্থাবর-জঙ্গম সর্ব্বভূত ধন্য হইতে লাগিল।

তাঁহারা গান করিতেছেন,—

"প্রলয়-পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্
কেশব ধৃতমীনশরীর
জয় জগদীশ হরে !

ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে
ধরণিধারণকিণচক্রগরিষ্ঠে
কেশব ধৃতকূর্ম্মশরীর
জয় জগদীশ হরে !

বসতি দশন-শিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না
কেশব ধৃতনরসিংহরূপ
জয় জগদীশ হরে !

তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গম
দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্
কেশব ধৃতনরসিংহরূপ
জয় জগদীশ হরে !

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন
পদনখনীরজনিতজনপাবন
কেশব ধৃতবামনরূপ
জয় জগদীশ হরে !

ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপম্
স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপম্
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ
জয় জগদীশ হরে !

বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতিকমনীয়ম্
দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ম্
কেশব ধৃতরামশরীর
জয় জগদীশ হরে !

বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভম্
হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভম্
কেশব ধৃতহলধররূপ
জয় জগদীশ হরে !

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্
সদয়হৃদয় দর্শিতপশুঘাতম্
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর
জয় জগদীশ হরে !

ম্লেচ্ছ-নিবহ-নিধনে কলয়সি করবালম্
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্
কেশব ধৃতকল্কিশরীর
জয় জগদীশ হরে !

সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে মহাপুরুষ প্রস্থান করিলেন। অন্যান্য দেব-দেবী প্রথমতঃ সাষ্টাঙ্গে বিগ্রহ যুগলকে প্রণাম করিয়া, তদনন্তর শান্তি দেবীকে প্রণাম করিয়া একে একে প্রস্থান করিলেন। কেবল শান্তি, অভিরাম ও নারায়ণ হরিমন্দিরে অপেক্ষা করিয়া থাকিলেন।

অদ্য মহাপুরুষের আজ্ঞানুসারে শান্তিদেবী অভিরাম ও নারায়ণকে শ্যামসুন্দরের সহিত পরিচিত করাইবেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রমাপতি বাবু তীর্থযাত্রা করিলেন। আয়োজনের সীমা নাই। লোকজন, দাস-দাসী অনেকেই যাইবে। আর যাইবেন—তাঁহার দেওয়ান বিহারীলাল মিত্র। দ্রব্যসামগ্রী প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণে সঙ্গে যাইবে। বিহারীলাল বাবু অতি বাল্যকাল হইতেই পিতৃ-মাতৃহীন, এবং দয়াবান্ রাধানাথ বাবুর সংসারে প্রতিপালিত। প্রথমে তিনি রাধানাথ বাবুর জমীদারীসংক্রান্ত সামান্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, এবং ক্রমশঃ বিদ্যাবুদ্ধির আতিশয্য হেতু জমীদারীর এক জন অতি প্রয়োজনীয় কর্ম্মচারী হইয়া উঠেন। নৌকাডুবির পর রমাপতি বাবু রাধানাথের আশ্রয়ে আসিলে, যে সকল ব্যক্তির সহিত তাঁহার আত্মীয়তা হয়, তন্মধ্যে এই বিহারীলাল বাবু সর্ব্বপ্রধান। বিহারী সেই অবধি রমাপতি বাবুর অভিন্নহৃদয় বান্ধব। এই বিপুল সম্পত্তি রমাপতি বাবুর হস্তগত হওয়ার পর হইতে তিনি বিহারীর মন্ত্রণা ব্যতিরেকে কোন কর্ম্ম করেন না। পরিশেষে দেওয়ানের পদ শূন্য হইলে, তিনি বিহারী বাবুকে সেই পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বিহারীর কার্য্যদক্ষতা অসাধারণ। অতি যোগ্যতার সহিত তিনি কর্ত্তব্যপালন করিয়া আসিতেছেন।

বিহারী বাবু দাসদাসী-সকাশে প্রভু-পরিবারভুক্ত ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে সম্মানিত ও সমাদৃত। শিশুকাল হইতেই এই পরিবারমধ্যে অবস্থান করায় সকলেই তাঁহাকে আপনার লোক বলিয়া বিশ্বাস করে। সুরবালা তাঁহাকে দাদা বলিয়া থাকেন। মাধুরী ও খোকা তাঁহাকে মামা বলিয়া ডাকে, এবং রমাপতি তাঁহাকে ভাই বলেন। পুরমধ্যে কোন স্থানেই বিহারী বাবুর গমনাগমনের বাধা নাই। তাঁহার আজ্ঞা সর্ব্বত্র সম্মানিত। বিহারী বাবু বলিয়াছেন শুনিলে, কোন বিষয়ে সুরবালা আর প্রতিবাদ করেন না, এবং রমাপতি বাবুও তাহাই মানিয়া লন।

কিন্তু মনুষ্যের মন বড়ই দুর্জ্জেয়। বহিরাবরণ দেখিয়া মনুষ্যের হৃদয়ের বিচার হয় না। কাজ

দেখিয়া প্রাণের ভাব অনুমান করা যায় না। রমাপতির এই পরমাত্মীয় ও প্রাণের বন্ধু অন্তরে তাঁহার প্রবল শত্রু। রমাপতি সম্প্রতি মরণাপন্ন হইয়াছিলেন, এবং চিকিৎসকেরাও তাঁহার জীবন-সম্বন্ধে হতাশ হইয়াছিলেন। তখন বাহ্যতঃ বিহারী বাবুর উদ্যোগের সীমা ছিল না সত্য; কিন্তু যদি কেহ তৎকালে তাঁহার অন্তর অনুসন্ধান করিতে পারিত, তাহা হইলে জানিতে পারিত যে, তাঁহার অন্তরে তৎসময়ে আনন্দের সীমা ছিল না। তিনি কায়মনোবাক্যে তৎকালে রমাপতির মৃত্যুকামনা করিতেছিলেন। কেন তাঁহার চিত্ত এরূপ ভাবনাপন্ন, তাহা ক্রমশঃ পরীক্ষিতব্য।

আপাততঃ রমাপতি, সুরবালা, মাধুরী, খোকা, বিহারী বাবু ও আবশ্যকমত দাস-দাসী মিলিত হইয়া তীর্থপর্য্যটনে যাত্রা করিবেন। আয়োজন সমস্তই ঠিক হইয়াছে। হাবড়া ষ্টেশনে গাড়ীও রিজার্ভ করা হইয়াছে।

রমাপতি বাবু আর পূর্ব্বের মত অপ্রফুল্ল ও কাতর নহেন। তিনি তিন চারিবার সুকুমারীর সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। সুকুমারীর সহিত তাঁহার অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছে। সেই দেবী আবারও তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ দর্শন দিবেন স্বীকার করিয়াছেন; সুতরাং রমাপতি ও সুরবালা সম্পূর্ণরূপে সুখী হইয়াছেন। যে দারুণ দুঃখভার তাঁহাদিগকে পেষিত করিতেছিল, তাহা অন্তরিত হইয়াছে। সুকুমারী যাহাতে তাঁহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া আর কোথাও যাইতে না পারেন, তজ্জন্য রমাপতি ও সুরবালা বিশেষ প্রযত্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের সে যত্ন সফল হয় নাই। সুকুমারী কোনক্রমেই তাহাতে সম্মত হন নাই। তিনি মিনতি করিয়া রমাপতি ও সুরবালাকে তৎসম্বন্ধে তাঁহার অক্ষমতার কথা জানাইয়াছেন। অতঃপর তিনি সতত তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন আশ্বাস দেওয়ায় অগত্যা তাঁহাদিগকে নিরস্ত হইতে হইয়াছে।

সুকুমারীর বর্ত্তমান নিবাস কোথায়, তাঁহার উপজীবিকা কি, তাঁহার রক্ষক কে ইত্যাদি বিষয়ে সুরবালা ও রমাপতি বিশেষ কোন সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। এতাদৃশ প্রশ্নের উত্তরে সুকুমারী কেবল ভগবানেরই নাম করিয়াছেন। সুরবালা স্থির করিয়াছেন, তাঁহার সেই সপত্নী জলমগ্ন হওয়ার পর হইতে কোন অনৈসর্গিক উপায়ে দেবত্ব লাভ করিয়াছেন, নহিলে এত রূপ, এমন কথা, এত ক্ষমতা কি মানুষের হয়? সুতরাং দেবদর্শন হইয়াছে, এবং দেবতার সহিত পরিচয় হইয়াছে মনে করিয়া তাঁহার আনন্দ ও সন্তোষের সীমা নাই। রমাপতি বাবু স্থির করিয়াছেন, তাঁহার সেই পত্নী অসম্ভাবিত উপায়ে অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার আকৃতি-প্রকৃতি চিরকালই দেবতুল্য ছিল। অধুনা তাঁহার অভুতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাঁহার যে সুকুমারী ছিলেন, তিনি লোকান্তরিত হইয়া দেবক্ষমতা ও দেবকান্তি লাভ করিয়াছেন, এবং লীলা-প্রকাশের নিমিত্ত পুনরায় ভূতলে আবির্ভূতা হইয়াছেন। যাহাই হউক, তাঁহারা সুখী হইয়াছেন।

এইরূপ অবস্থাপন্ন রমাপতি ও সুরবালা নিয়মিত দিনে পরমানন্দে রেলযোগে তীর্থভ্রমণে যাত্রা করিলেন। বাষ্পীয় শকট এই সকল আনন্দপূর্ণ ব্যক্তিকে বহন করিয়া, বায়ুবেগে প্রধাবিত হইল। কত বন, কত কানন, কত জলাশয়, কত প্রান্তর, কত পল্লী, কত ধান্যক্ষেত্র তাঁহাদের নয়ন-সমক্ষে নাচিতে নাচিতে চলিয়া গেল। কতই জনতা, কতই ব্যস্ততা, কতই উৎসাহ তাঁহারা দেখিতে পাইলেন। মাধুরী ও খোকা গজর গজর করিতে করিতে কতই কি বকিতে থাকিল, আর সুরবালা ঈষৎ হাসির সহিত মিশাইয়া কত কথাই রমাপতি বাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সুরবালা বড়ই আনন্দলাভ করিতেছেন জানিয়া রমাপতি মনে করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার এ আয়োজন ও প্রযত্ন সম্পূর্ণরূপ সফল হইয়াছে।

গাড়ী বর্দ্ধমান ছাড়িয়া ক্রমশঃ কর্ড লাইনে প্রবেশ করিল, এবং উপন্যাসবর্ণিত দৈত্যের ন্যায় হুঙ্কার ত্যাগ করিতে করিতে তরঙ্গায়িত বন্ধুর প্রদেশে ও পরম রমণীয় দৃশ্যাবলীর মধ্যে ধাবিত হইল। মেঘমালার ন্যায় পাহাড়-শ্রেণীর দূরাগত অপূর্ব্ব শ্রী, এবং শাল ও পলাশ-বনের অপরূপ শোভা, রমাপতি ও সুরবালাকে বিমোহিত করিতে থাকিল। কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অতি অল্পজলবিশিষ্ট স্রোতস্বতী নদী তাঁহাদিগের প্রীতি-সঞ্চার করিতে লাগিল। কল্যাণেশ্বরী-দর্শনার্থ তাঁহারা প্রথমে বরাকরে অবতীর্ণ হইলেন। বরাকর পাথরিয়া কয়লার ধূলায় আবৃত, এ জন্য গ্রাম হইতে কিঞ্চিদ্দূরে তাঁহাদের বাসা স্থির ছিল। তাঁহারা সেই বাসায় অধিষ্ঠিত হইয়া স্বচ্ছন্দে রাত্রিযাপন করিলেন।

পরদিন প্রাতে সকলে মিলিয়া কল্যাণেশ্বরী-দর্শনে যাত্রা করিলেন। সেই অরণ্য ও পাহাড়বেষ্টিত দেবস্থানের গম্ভীর শ্রী সন্দর্শনে তাঁহাদের হৃদয় নিতান্ত

পুলকিত হইল। তাঁহারা ভক্তিভাবে দেব-পূজা সমাপন করিয়া সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আবাসে প্রত্যাগত হইলেন। প্রত্যাগমনকালে পঞ্চকোটের সুবিস্তৃত শৈলমালা তাঁহাদিগের নয়নমনকে বিমোহিত করিতে থাকিল।

কল্যাণেশ্বরী-সন্নিহিত স্থানসমূহ রমাপতিকে এতই বিমোহিত করিয়াছিল যে, তিনি পুনরায় পরদিন তদ্দর্শনে যাত্রা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। অদ্য তিনি সুরবালা, মাধুরী বা খোকাকে সঙ্গে লইলেন না; তাঁহারাও অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছেন বলিয়া পুনরায় রমাপতির সহিত গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন না।

বিহারী বাবুও শারীরিক অসুস্থতার কারণে রমাপতির সঙ্গে যাইবেন না স্থির হইল। বিশেষতঃ সুরবালা যখন বাসায় থাকিতেছেন, তখন তাঁহার রক্ষকস্বরূপে বাসায় থাকা বিহারী বাবুর পক্ষে আবশ্যক বলিয়া স্থির হইল। কেবল এক জন পাচক, দুই জন দাসী, বিহারী বাবু, সুরবালা ও তাঁহার সন্তানদ্বয় বাসায় থাকিলেন। বাসায় যখন বিহারী বাবু থাকিলেন, তখন আর কাহারও থাকিবার বিশেষ প্রয়োজন কেহই অনুভব করিলেন না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দুই জন ঝি মাধুরী ও খোকাকে লইয়া, সেই সুবৃহৎ বাসার পুষ্পোদ্যানে পরিভ্রমণ করিতেছে। বিহারী বাবু তাহাদের নিকটস্থ হইয়া মাধুরী ও খোকার সহিত অনেকক্ষণ নানা প্রকার ক্রীড়া-কৌতুক করিলেন। তাহারাও মামা বাবুর সহিত ছুটাছুটি করিয়া অনেক খেলা করিল। সুরবালা তখন এক প্রকোষ্ঠের বাতায়ন-সমীপে একখানি বহি লইয়া উপবিষ্টা। পুস্তকে তাঁহার মন নাই; মাধুরী ও খোকা বিহারী বাবুর সঙ্গে যে অপূর্ব্ব খেলা করিতেছে, তাহাই দেখিতে তিনি নিবিষ্ট-চিত্ত। বিহারী বাবু মাধুরী ও খোকার গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া দিয়া ঝিদের বলিলেন,—"তোরা আজি মাধু ও খোকাকে বরাকর নদীতে স্নান করাইয়া আন্। এমন পরিষ্কার স্বাস্থ্যকর জল আর এ দিকে নাই। উহাদের গায়ে অনেক ময়লা হইয়াছে। বেশ করিয়া স্নান করাইয়া আন্ দেখি। দূর তো বেশী নয়। যা, গিন্নীকে জিজ্ঞাসা করিয়া আয়।"

তাহারা মাধুরী ও খোকাকে লইয়া সুরবালার নিকটস্থ হইল। সুরবালা বিহারী বাবুর উপদেশ স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছেন, সুতরাং ঝিরা আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন,—"দাদা যখন বলিতেছেন, তখন আর আমি কি বলিব? তাই নিয়ে যাও।"

অনতিকালমধ্যে ফুলেল তেল, তোয়ালিয়া, সাবান, এবং কাপড়-চোপড় লইয়া ঝিরা মাধুরী ও খোকাকে স্নান করাইতে চলিল। পাচক দূরে পাকশালায় স্বকার্য্যে নিযুক্ত আছে। বলিতে গেলে বিহারী বাবু ও সুরবালা ভিন্ন বাসায় আর কেহ থাকিল না।

তখন বিহারী বাবু মনে করিলেন,—'এমন সুযোগ আর কখনই হইবে না। দ্বাদশ বৎসর যে বাসনা আমাকে দগ্ধ করিতেছে, আজি তাহা মিটাইবার সুন্দর অবসর উপস্থিত। এমন সময় আর জীবনে পাইব না; অনেক চেষ্টা করিয়াছি, এ পাপ-বাসনা নিবারণ করিতে পারি নাই। না, সে চেষ্টা অসম্ভব। যদি ইহা পাপকার্য্য হয়, তাহা হইলে আমাকে পাপী হইতে হইবে। পাপ হউক, দুষ্কর্ম্ম হউক, নরক হউক, এ বাসনা দমিত হইবার নহে। অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে; আমি আজি মনের বাসনা মিটাইব।'

তখন বিহারী বাবুর মূর্ত্তি অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল। তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, এবং মুখের ভাব করুণাশূন্য হইল। তিনি তখন ধীরে ধীরে সুরবালার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্রে সুরবালা ভয়চকিত-ভাবে বলিলেন,—"দাদা! এ কি! তোমার চেহারা এমন হইয়াছে কেন? তোমার কি অসুখ হইয়াছে?"

বিহারী বাবু বলিলেন,—"অসুখ—ওঃ! তাহার কথা আর কি বলিব!—অতি ভয়ানক অসুখ! আমার মন-প্রাণ দগ্ধ করিতেছে। তোমার করুণা ভিন্ন সে অসুখ নিবারণের আর কোনই ঔষধ নাই। আজি তুমি আমাকে রক্ষা কর—আমার প্রাণ যায়।"

তখন সেই সুরসুন্দরী যুবতী নিতান্ত উৎকণ্ঠিত-ভাবে বলিলেন,—"বল, বল দাদা, আমায় কি করিতে হইবে। তোমার অসুখ-শান্তির নিমিত্ত যাহা করা আবশ্যক, আমি তাহাই করিব।"

বিহারী বলিলেন,—

"শুন সুরবালা! বাল্যকালের কথা তোমার মনে পড়ে কি? বাল্যকালে তোমাতে আমাতে একত্র খেলা করিতাম। তখন হইতে এ অভাগা নিরন্তর তোমার সঙ্গেই আছে। তখন হইতে তোমার এ দাস নিয়ত তোমার পূজা করিয়া আসিতেছে। আমি যদি ব্রাহ্মণ হইতাম, তোমার পিতা তাহা

হইলে এই অধমের সহিতই তোমার বিবাহ দিতেন। কিন্তু আমার কপাল মন্দ, তাই আমার প্রাপ্য বস্তু অপরে লাভ করিয়াছে। কিন্তু সুরবালা! তুমি অপরের অঙ্কশায়িনীই হও, আর তোমার যেরূপ মনের ভাবই হউক, তোমার লোভ সংবরণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি মনে করিয়াছিলাম, তোমাকে আমিও যেমন ভালবাসি, তুমিও আমাকে তেমনই ভালবাস। অতএব তুমি যাহারই হও, তোমার প্রেম আমিই লাভ করিব। প্রকাশ্যরূপে না হইলেও গোপনে তোমার প্রেম আমিই ভোগ করিব; কিন্তু আমার সেই আশায় ছাই পড়িয়াছে। অতএব আমি এখন অসদুপায়ে তোমাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি। সুন্দরি! এ লোভ আমার পক্ষে অসংবরণীয়; সুতরাং আমি জ্ঞানশূন্য। আমি মরণাপন্ন। সুরবালা! তুমি আজ আমাকে রক্ষা কর।"

সুরবালার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। তিনি নিতান্ত ভীতভাবে বলিলেন,—

"দাদা! দাদা! সহসা তোমার এ কি মতিভ্রম হইল? যদি তুমি আমাকে এক তিলও ভালবাসিতে, তাহা হইলে এরূপ চিন্তা কদাপি তোমার মনে উদিত হইত না। আমি তোমাকে সহোদর বলিয়াই জানি। তোমার এ মতিভ্রমের কথা শুনিয়া আমি মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইতেছি। যাও তুমি, নির্জ্জনে বসিয়া ভগবানের ধ্যান কর গিয়া। তাহা হইলে তোমার এ দুশ্চিন্তা দূর হইবে।"

তখন সে নরপ্রেত হাসিয়া বলিল,—

"ভগবান্ আমার প্রতি সদয় হইলে তোমার মনও আমারই মত হইত। শুন সুরবালা! যদি তুমি সহজে আমার বাসনা-নিবৃত্তির উপায় করিয়া না দেও, তাহা হইলে আমি বলপ্রয়োগ দ্বারা আমার বাসনা পূরণ করিব। যদি এখন স্বয়ং ভগবান্ স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া আমাকে নিরস্ত হইতে উপদেশ দেন, তাহাও আমি শুনিব না। বারো-বৎসরের চেষ্টায় যে সুযোগ আজি লাভ করিয়াছি, তাহা কদাপি পরিত্যাগ করিব না।"

এই বলিয়া সেই পশু তখন সুরবালার নিকটস্থ হইল। সুরবালা সভয়ে দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া সে ব্যস্ততা সহ দ্বার রুদ্ধ করিল। তাহার পর বলিল,—

"এখনও বলিতেছি, সুরবালা, যদি তুমি স্বেচ্ছায় আমার এই লোলুপ হৃদয়কে শীতল করিতে সম্মত না হও, যদি তুমি আমার এই মত্ততা দেখিয়া দয়ার্দ্র না হও, তাহা হইলে আমি বলপূর্ব্বক তোমাকে আমার আয়ত্তাধীন করবি। আমার শরীরে এখন আসুরিক বল। কাহার সাধ্য, আমাকে নিরস্ত করে?"

তখন রোষকষায়িত-লোচনে সুরবালা বলিলেন—"পাষণ্ড, নরাধম! তুই নিরাশ্রয় অবস্থা হইতে আমার পিতৃ-অন্নে পালিত হইয়া, আমার স্বামীর অকৃত্রিম বন্ধুরূপে পরিগণিত হইয়া, আজি বিশ্বাসের এইরূপ দুর্ব্ব্যবহার করিতেছিস্? ধর্ম্ম, লোকলজ্জা, কৃতজ্ঞতা সকলই তুই আজি বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছিস্? স্বামী ভিন্ন আমার দেবতা নাই, আমি স্বামী ভিন্ন অন্য দেবতার কখন পূজা করি নাই। সেই সাক্ষাৎ সজীব দেবতার চরণে যদি আমার একান্ত মতি থাকে, তাহা হইলে তোর মত শত শত নর-প্রেত একত্র হইলেও আমাকে কলুষিত করিতে পারিবে না।"

সেই পতি-প্রেমপরায়ণা সুন্দরী-শিরোমণি ভিত্তিতে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া রহিলেন। তাঁহার তদানীন্তন শোভা দেখিয়া সেই পাষণ্ড অধিকতর মুগ্ধ ও বিমোহিত হইয়া পড়িল এবং বলিল,—

"কে তোমাকে রক্ষা করে দেখি।"

বিহারী বাহুযুগলের দ্বারা সুরবালাকে বেষ্টন করিয়া ধরিবার উপক্রম করিলে, সেই সতী প্রায় সংজ্ঞাহীন হইয়া তথায় বসিয়া পড়িলেন, এবং বলিলেন,—

"কে কোথায় আছ, আমাকে রক্ষা কর!"

তখন সহসা সেই প্রকোষ্ঠ যেন ঝলসিয়া উঠিল। বিহারী চমকিত হইয়া দেখিল, তাহার সম্মুখে আগুল্ফলম্বিত কেশা, অপার্থিব রূপসম্পন্না এক ত্রিশূলধারিণী সন্ন্যাসিনী আরক্তনয়নে দণ্ডায়মানা। এই অভ্যাগত প্রতিবন্ধক দেখিয়া বিহারী নিতান্ত বিরক্ত হইয়া বলিল,—

"কে তুই? তুই এখানে কেন আসিলি? আমার হাতে তোর মৃত্যু আছে দেখিতেছি।"

এতক্ষণে সুরবালা চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। সেই স্বর্গকন্যাকে সম্মুখে সন্দর্শন করিয়া তিনি বলিলেন,—

"তুমি আমার দিদি নও? দিদি! আমার এই দেহ নরকের কীটে যেন স্পর্শ না করে।"

সেই সন্ন্যাসিনী মধুরস্বরে বলিলেন,—

"ভয় কি বহিন্!"

ইত্যবসরে বিহারী গৃহমধ্যস্থ একগাছি যষ্টি লইয়া সেই সন্ন্যাসিনীর শরীরে প্রচণ্ড আঘাত করিল। সন্ন্যাসিনী হাসিয়া বলিলেন,—

"রে ভ্রান্ত! তুই এখনই না বলের গর্ব্ব করিতেছিলি? দেখি, তোর দেহে কত বল?"

এই বলিয়া সেই কুসুম-কুমারী বামহস্ত দ্বারা বিহারীর দক্ষিণ হস্ত চাপিয়া ধরিলেন। বিহারী তাঁহার হাত ছাড়াইবার জন্য বহুবিধ প্রযত্ন করিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না। সেই কৃশকায়া সুন্দরীর দেহের শক্তি অনুভব করিয়া সে বিস্মিত হইল, এবং কোন উপায়ে তাঁহাকে নিপাত করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

তখন সেই সন্ন্যাসিনী কহিলেন,—"তোমার কোন চেষ্টাই সফল হইবে না। তোমার জন্য জীবন্ত নরকের ব্যবস্থা হইবে।"

তদনন্তর সুরবালার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"উঠ দিদি! আর কোন ভয় নাই।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সেই পবিত্রতাপূর্ণ শান্তি-নিকেতনের একতম সুরম্য কক্ষে সুরবালা, মাধুরী ও খোকা বসিয়া আছেন। সেই কক্ষ কুসুমমালায় সজ্জিত, গন্ধদ্রব্যের সুরভিরাশিতে আমোদিত এবং দীপমালায় উজ্জ্বলিত। শান্তিনিকেতনবাসিনী পুণ্যশীলা নারীগণ সুরবালাকে বেষ্টন করিয়া বহুবিধ বিশ্রম্ভালাপে তাঁহাকে বিনোদিত করিতেছেন। তথায় তাঁহার কোনই অভাব নাই; কোন কারণেই অণুমাত্র অসুখ নাই। সেই দেবীগণের বদন হইতে যে সকল বাক্য বিনির্গত হইতেছে, তাঁহারা মধুরভাবে অপার্থিব কোমলতা সহকারে যে যে কথোপকথন করিতেছেন, তৎসমস্ত সুরবালার হৃদয়-মনকে নিতান্ত আর্দ্র ও প্রশান্ত করিতেছে। তিনি কোথায় আসিয়াছেন, কে কি জন্য তাঁহাকে এখানে আনিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কিছুই তাঁহার মনে নাই। তিনি মনে করিতেছেন, যেন কোন পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যবলে নরদেহ ধারণ করিয়াও তিনি এই দিব্যলোকে আগমন করিয়াছেন। তিনি অপরিসীম সুখে নিমগ্নচিত্ত থাকিলেও এক অভাব তাঁহার প্রাণকে সময়ে সময়ে ব্যাকুলিত করিতেছে। কোথায় রমাপতি? সুরবালার পরম দেবতা, অনন্য উপাস্য, সর্ব্বগুণময় স্বামী এখন কোথায়? সেই নর-দেবতা সঙ্গে না থাকিলে স্বর্গও সুরবালার পক্ষে নরক—স্বর্গও সুখশূন্য। সুরবালা দেবীগণের সংসর্গে অলৌকিক সুখসম্ভোগ করিলেও গুণময়ের অভাবজনিত ব্যাকুলতা হেতু মধ্যে মধ্যে তত্রত্য দেবীগণকে তদ্বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তাঁহারা তাঁহাকে প্রীতিপ্রদ আশ্বাসবাক্যে পরিতুষ্ট করিতেছেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল। তখন সেই শান্তিনিকেতনের এক জন দেবী সুরবালাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"আপনি ক্লান্ত আছেন,—রাত্রিও অধিক হইয়াছে। এক্ষণে বিশ্রাম করুন। আর কোন প্রয়োজন থাকিলে, আজ্ঞা করুন।"

সুরবালা বলিলেন,—"ক্লান্ত যথেষ্টই হইয়াছিলাম সত্য; কিন্তু এ স্বর্গধামে আমার সকল কষ্টই অপগত হইয়াছে। তথাপি আমার চিত্ত অস্থির রহিয়াছে। আমার সেই সর্ব্বগুণাধার দেবতুল্য স্বামী উপস্থিত না থাকিলে স্বর্গও আমার চক্ষে নিতান্ত অসম্পূর্ণ।"

সেই দেবী আবার বলিলেন,—"স্বামীকে দেখিতে পাইলেই আপনার সকল অন্তর-বেদনাই অন্তরিত হয় কি?"

সুরবালা বিষাদ-বিমিশ্রিত হাস্যের সহিত বলিলেন,—"দেবি! আপনারা নিশ্চয়ই অন্তর্যামী। আমার প্রাণের কথা কখনই আপনাদের অগোচর নাই। আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন না কি, ইহসংসারে সেই স্বামি-দেবতার চরণই আমার সার সম্পত্তি, সেই দেবতার সেবা ও বিনোদন আমার জীবনের একমাত্র ব্রত; সেই গুণময়ই আমার একমাত্র অভীষ্ট দেবতা। তাঁহাকে দেখিতে না পাইলে মৃত্যুই আমার অবলম্বনীয়। আপনারা আশ্বাস না দিলে তাঁহাকে না দেখিয়া আমি এতক্ষণ কখনই থাকিতে পারিতাম না। আপনারা সর্ব্বশক্তিসম্পন্না, আপনারা কৃপা করিয়া আমার এ যন্ত্রণা বিদূরিত করিতে পারেন না কি?"

সেই দেবী উত্তর দিলেন,—"মা! তবে এখনই তোমার স্বামীর সহিত মিলন হউক।"

এই বলিয়া তিনি আর এক দেবীকে পার্শ্বের দ্বার খুলিয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন। দ্বার উন্মুক্ত হইল। সুরবালার সম্মুখে সেই দেবকান্তি রমাপতি দণ্ডায়মান। তখন সুরবালা বেগে গিয়া সেই বিশালবক্ষ পুরুষের বক্ষে মস্তক স্থাপন করিলেন; তখন সেই পুরুষবর অগ্রসর হইয়া উভয় হস্তে সেই সুন্দরীকে আলিঙ্গন করিলেন। দেবীগণ এই অবকাশে প্রস্থান করিলেন।

প্রেমিকযুগল তখন তত্রত্য আসনে উপবেশন করিলেন। রমাপতি নিদ্রিত খোকা ও মাধুরীর অঙ্গে প্রেমপুলকিতান্তঃকরণে হস্তাবমর্ষণ করিয়া, সুরবালাকে কত প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সুরবালাও একটা কথার উত্তর দিতে দিতে আবার সাতটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে থাকিলেন। তাঁহাদের

সে প্রণালীর অনুসরণ করিতে হইলে আমাদের স্থান-সঙ্কুলান হয় না; সুতরাং সংক্ষিপ্ততার অনুরোধে আমরা তাঁহাদের বাক্যাবলীর মর্ম্ম নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

সুরবালার কথাই আগে বলি। তিনি একাকিনী বসিয়া যেরূপে মাধুরী ও খোকার খেলা দেখিতেছিলেন, বিহারী যেরূপে তাহাদের সহিত খেলা করিতেছিল, তাহার পর যেরূপ কৌশল করিয়া ঝিদের ও ছেলেদের বাসা হইতে সরাইয়া দিল, যেরূপে উগ্রমূর্ত্তিতে সে তাঁহার সন্নিধানে আগমন করিল, তাহার পর যে জঘন্য প্রস্তাব করিল, যেরূপে তাঁহার দয়ার সে প্রার্থী হইল, তাহার পর যে প্রকার ভয় দেখাইল, তদনন্তর যে প্রকার বলপ্রয়োগে উদ্যত হইল, তখন তাঁহার অবস্থা যেরূপ হইল, রক্ষার কোন উপায় নাই দেখিয়া যেরূপ ব্যাকুল হইলেন, সে তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিবার উপক্রম করিলে তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া যেরূপে বসিয়া পড়িলেন, তদনন্তর সহসা সেই রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে সন্ন্যাসিনীবেশে যেন স্বর্গ হইতে তাঁহার দিদি যেরূপে অবতীর্ণা হইলেন, সেই দয়াময়ীকে বিহারী যেরূপে প্রহার করিল, এবং তিনি যেরূপে বিহারীর হস্তধারণ করিলেন, ইত্যাদি সমস্ত বৃত্তান্ত তিনি বর্ণনা করিলেন।

এই সকল ব্যাপার উত্তীর্ণ হইলে বিহারীর এই দুর্ব্ব্যবহার হেতু দারুণ মনস্তাপে, এবং বিজাতীয় উৎকণ্ঠায় তাঁহার সংজ্ঞা তাঁহাকে ত্যাগ করে। তিনি মূর্চ্ছিত হওয়ার পর তাঁহার কি হইল, তাহা তাঁহার মনে হয় না। সেই সংজ্ঞাহীনতা কতক্ষণ স্থায়ী হয়, তাহাও তাঁহার মনে নাই। মধ্যে এক দিন কি দুই দিন, কি পাঁচ দিন অতীত হইয়াছে, তাহাও তিনি জানেন না। পুনরায় যখন পূর্ণভাবে তাঁহার সংজ্ঞা জন্মিল, তখন তিনি পুত্রকন্যাসহ এই স্বর্গধামে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন বুঝিতে পারিলেন। কি উপায়ে তিনি এখানে আসিলেন, মাধুরী ও খোকাকেই বা কে তাঁহার সঙ্গে আনিল, বিহারীর কি হইল, ঝিরা কোথায় থাকিল, কিছুই তিনি ভাল করিয়া বলিতে পারিলেন না।

এ স্থান কোথায়—ইহা কি পৃথিবীর অন্তর্গত কোন স্থান অথবা স্বর্গরাজ্য, তাহা তিনি এখনও বুঝিতে পারেন নাই। এখানে যে সকল দেবী বাস্ করেন, তাঁহাদের আকৃতি, বেশভূষা ও ব্যবহারাদি আলোচনা করিলে ইহা স্বর্গ ভিন্ন আর কিছুই মনে হয় না।

তাহার পর রমাপতির কথা। রমাপতি সায়ংকালে বাসায় ফিরিয়া দেখিলেন,—ভবন শূন্য,—তথায় সুরবালা নাই, খোকা নাই, মাধুরী নাই, বিহারী নাই।—পাচক ও দুই জন ঝি অধোবদনে বসিয়া আছে। তাহারা অন্যান্য বৃত্তান্ত কিছুই বলিতে পারিল না। কেবল বলিল যে, তাহারা ঠাকুরাণীকে পীড়িতা দেখিয়াছিল। এক জন সন্ন্যাসিনী তাঁহার নিকটে বসিয়াছিলেন, আর বিহারী বাবু সেই শৃঙ্খলাবদ্ধ দশায় দূরে পড়িয়া ছিলেন। তাহার পর তাহারা সেই সন্ন্যাসিনীর আদেশক্রমে এক জন জল গরম করিতে যায়, এক জন নদী হইতে জল আনিতে যায়, এবং এক জন বাজার হইতে ধূনা আনিতে যায়। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া দেখে, বাটীতে কেহই নাই। ঠাকুরাণী ও তাঁহার সন্তান, বিহারী বা সেই সন্ন্যাসিনী কেহই নাই। তাহারা দারুণ উদ্বেগে সমস্ত দিন সেই অপরিচিত প্রদেশের চতুর্দ্দিকে তাঁহাদের সন্ধান করে; কিন্তু কোনই ফল হয় না। অবশেষে তাহারা অনাহারে ও উৎকণ্ঠায় নিতান্ত কাতর হইয়া মৃতকল্প অবস্থায় পড়িয়া আছে।

এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রমাপতি নিতান্ত ব্যাকুলভাবে একাকী গৃহনিষ্ক্রান্ত হন, এবং কোথায় যাইলে কি হইবে, তাহার কিছুই মীমাংসা না করিয়া উন্মত্তবৎ একদিকে প্রধাবিত হইতে থাকেন। দ্বারবানাদি তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছে দেখিয়া তিনি বিরক্তি সহকারে তাহাদের প্রতিনিবৃত্ত হইতে আজ্ঞা করেন। তাহারা চলিয়া গেলে তিনি দামোদর অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ অরণ্যপথে চলিতে চলিতে "বড়তড়ে" নামক ক্ষুদ্র গ্রামের সন্নিকটে উপস্থিত হন। তথায় বিজাতীয় উৎকণ্ঠায় ও যৎপরোনাস্তি দৈহিক কাতরতায় তিনি অবসন্ন হইয়া পড়েন, এবং ক্রমশঃ চেতনাবিহীন হন। তদনন্তর কি ঘটিয়াছে, তাহা তাঁহার মনে নাই। যখন তাঁহার চৈতন্য উদয় হইল, তখন তিনি দেখিলেন, এই অপরিচিত স্থানে ভূলোক-দুর্ল্লভ বহুতর জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছেন। তিনি সংজ্ঞালাভ সহকারে "সুরবালা" "সুরবালা" শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিলে, তাঁহারা তাঁহাকে এই কক্ষে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন।

এই সময়ে গৃহের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সুরবালা বলিলেন,—"আহা, সে দেবীরা এখন কোথায় গেলেন? তুমি তাঁহাদের দেখিতে পাইলে না! প্রাণেশ্বর! সত্যই কি আমরা স্বর্গে আসিয়াছি?"

রমাপতি বলিলেন,—"আমিও ত এখানে আসিয়া অনেক দেব-দেবীর সাক্ষাৎ পাইয়াছি। এ স্থান স্বর্গ বলিয়াই আমারও মনে হইতেছে। ইহাই কি সেই সুকুমারীর লীলাস্থল?"

তাঁহারা যখন বিস্ময় সহকারে এবংবিধ আলোচনায় নিযুক্ত এবং অপার আনন্দে নিমগ্ন, তখন সেই স্থানে এক কৃষ্ণাঙ্গী, জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি বিবিধ আহার্য্য-পূর্ণ স্বর্ণপাত্র হস্তে লইয়া সমাগত হইলেন। ভূ-পৃষ্ঠে সে পদ অতি সন্তর্পণে পতিত হইতেছে, বসুধা যেন সে পাদবিক্ষেপ জানিতেও পারিতেছেন না। তাঁহাকে দর্শনমাত্র দম্পতি সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি বলিবেন,—"আপনারা বড়ই ক্লান্ত হইয়াছেন; এক্ষণে কিছু আহার করিয়া বিশ্রাম করুন।"

রমাপতি সবিনয়ে জিজ্ঞাসিলেন,—"আমরা ভাগ্যবলে অমরলোকে আসিয়াছি। আমাদের আর ক্ষুধাতৃষ্ণা নাই। আপনিই কি এখানকার অধিষ্ঠাত্রী?"

সেই দেবী মধুর হাস্য সহকারে বলিলেন,—"না না, শান্তিদেবী এই পুণ্য-নিকেতনের অধিষ্ঠাত্রী। এ পাপীয়সী তাঁহার দাসী।"

কি সুকণ্ঠ! কি মধুর ভাষা! রমাপতি আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"তবে আপনি কে?"

দেবী উত্তর দিলেন,—"সুরমা।"

নবম পরিচ্ছেদ

আমরা এ পর্য্যন্ত একে একে শান্তিনিকেতনের দেবমন্দির, যোগমঠ, পুষ্পবাটিকা, কারাগার প্রভৃতি নানাস্থান দর্শন করিয়াছি; কিন্তু সকল অংশ এখনও আমাদের নেত্রপথবর্ত্তী হয় নাই। এই সুবিশাল পুরীর এক স্বতন্ত্র অংশের নাম শাসনপুরী। তথায় যে যে ব্যাপার নির্ব্বাহিত হয়, তাহা আলোচনা করিলে সে স্থানকে নরক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই শাসনপুরীর সহিত শান্তিনিকেতনের অপরাপর অংশের নানাবিধ উপায়ে সংযোগ ও সম্বন্ধ আছে; কিন্তু সেই সকল সংযোগের ব্যবস্থা এতাদৃশ সুকৌশল-সম্পন্ন যে, সাধারণ দৃষ্টিতে তাহার নির্ণয় হওয়া সম্পূর্ণরূপ অসম্ভব। উক্ত শাসনপুরীর মূল শান্তিধাম হইতে বহুদূরে অবস্থিত হইলেও অলক্ষিতভাবে যাতায়াতের নানাবিধ সহজ উপায় আছে, এবং তত্রত্য ব্যাপারসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিবার বহুতর ব্যবস্থা আছে।

ঐ শাসনপুরী কৃষ্ণপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত ভূগর্ভান্তরগত বহুবায়ত ভবন। যদিও তাহা সতত ঘনান্ধকারাচ্ছন্ন, তথাপি আবশ্যক হইলে সহজেই তন্মধ্যে আলোক-প্রবেশের উপায় আছে। সেই পুরী বহুদূর ব্যাপিয়া অবস্থিত, এবং তাহার একাংশে যাহা সংঘটিত হয়, অপরাংশে তাহার প্রচার হয় না। সেই পুরীর নানা স্থানে নানাবিধ দণ্ডপ্রয়োজনোপযোগী আয়োজন আছে।

সেই নিবিড় অন্ধকারময় পুরের একতম কক্ষে এক শৃঙ্খল-বদ্ধ পুরুষ অধোবদনে ভূপৃষ্ঠে শায়িত আছে। তাহার কণ্ঠদেশ, বাহুদ্বয়, চরণযুগল এবং কটিদেশ লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ। সে ব্যক্তি শৃঙ্খল ভঙ্গ করিয়া, মুক্তিলাভের জন্য বিস্তর বিফলপ্রযত্ন করিয়াছে। অবশেষে হতাশ ও অবসন্ন হইয়া প্রায় চেতনাহীন অবস্থায় পড়িয়া আছে। বহুক্ষণ এইরূপ মৃতকল্পভাবে পড়িয়া থাকার পর, সে একবার পার্শ্বপরিবর্ত্তনের প্রয়াসী হইল, কিন্তু দেহকে বিন্দুমাত্র স্থানান্তরিত করিতে সাধ্য হইল না। তখন সে নিতান্ত কাতর-স্বরে বলিল,—"মা গো! এ যাতনা আর সহে না। ইহার অপেক্ষা মরণই ভাল।"

তখন সহসা সেই সুবৃহৎ পুরী বিকম্পিত করিয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে প্রশ্ন হইল,—"রে নরাধম! এখন তুই নিজ দুষ্কৃতির জন্য অনুতাপ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিস্ কি? অতঃপর তুই আপনার মনকে ধর্ম্মপথে চালিত করিতে সম্মত আছিস্ কি?"

কাহার এ অত্যুৎকট ভৈরবধ্বনি? মনুষ্যকণ্ঠ হইতে এতাদৃশ রব বিনির্গত হওয়া সম্ভবপর নহে। তখন সেই শায়িত ব্যক্তি বলিল,—"যতক্ষণ এ দেহে জীবন থাকিবে, ততক্ষণ আমি সুরবালালাভের বাসনা পরিত্যাগ করিব না। তুমি আমার যন্ত্রণাদায়ক! তুমি দেবতাই হও বা প্রেতই হও বা মানবই হও, তুমি কেন আমাকে বারংবার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বিরক্ত করিতেছ? আমি সর্ব্ববিষয়ে ধর্ম্মপথে মনকে চালিত করিতে সম্মত আছি, কিন্তু সুরবালার আশা ত্যাগ করিতে আমার সাধ্য নাই। আমি আজীবন জ্ঞানতঃ বা অবজ্ঞানতঃ যত দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, তজ্জন্য চিরকাল অনুতাপ করিতে সম্মত আছি; কিন্তু সুরবালার লোভে যাহা আমি করিয়াছি, তাহা দুষ্কর্ম্ম বলিয়া বোধ হয় না। যদি আবশ্যক ও সুযোগ হয়, তাহা হইলে তদপেক্ষা বহুগুণে অধিকতর দুষ্কর্ম্ম আমি মহানন্দে আবার সম্পন্ন করিব।"

সেই গভীর-স্বরে পুনরায় শব্দ হইল,—"রে কৃতঘ্ন দুর্বৃত্ত বিহারি, যদি এখনও তুই সাবধান হইতে না পারিস্, তাহা হইলে তোর প্রাণদণ্ড হইবে।"

বিহারী বলিল,—"প্রাণদণ্ড! তুমি যেই হও, তুমি আমার পরম মিত্র। যদি সুরবালাকে লাভ করিতে না পারি, তাহা হইলে প্রাণদণ্ডই আমার

পক্ষে অতি প্রার্থনীয় সুব্যবস্থা। কিন্তু যদি যাবজ্জীবন এইরূপে থাকিলে এক দিনও সুরবালাকে লাভ করিতে পারি, তাহাতে আমি সম্মত আছি।"

সেই অত্যুৎকট শব্দে উত্তর হইল,—"এখনই তোর ন্যায় নরাধমের প্রাণদণ্ড করিলে তোর প্রতি করুণা প্রকাশ করা হয়। এবার তোর জন্য যে শাস্তির ব্যবস্থা করিতেছি, তাহা সহ্য করা কাহারও সাধ্য নহে।"

বিহারী বলিল,—"দেও, যে শাস্তি ইচ্ছা দেও। প্রাণ থাকিলে কখন না কখন সুরবালাকে লাভ করিতে পারিব, এই আশায় সকল শাস্তিই আমি সহ্য করিতে সক্ষম।"

তখন বিকটশব্দে আদেশ ব্যক্ত হইল, "দূতগণ! এই নরাধমকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর।"

তৎক্ষণাৎ ছয় জন কৃষ্ণকায় বিকটমূর্ত্তি পুরুষ আবির্ভূত হইল। তাহারা এরূপ ভাবে আগমন করিল, যেন তাহারা ভূতল ভেদ করিয়া উত্থিত হইল অথবা ভিত্তি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। যাহা হউক, তাহারা আসিয়া, বিহারী যে সকল শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল, তাহার অপর প্রান্তগুলি খুলিয়া ফেলিল। বিহারী সেই সুযোগে একবার মুক্ত হইবার চেষ্টা করিলে, এক জন এরূপ বজ্রমুষ্টিতে তাহার হস্ত ধারণ করিল যে, বিহারী নিশ্চয় বুঝিল, এরূপ দৈত্যের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা অসম্ভব।

অতঃপর দূতগণ শৃঙ্খলাবদ্ধ বিহারীকে লইয়া চলিল। বহুদূর যাইতে যাইতে ক্রমে উত্তপ্ত বায়ু বিহারীর অঙ্গস্পর্শ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ সেই উত্তাপ উগ্রতর হইতে লাগিল। তখন দূতেরা পার্শ্বস্থ এক কক্ষের দ্বার খুলিয়া ফেলিল। তথাকার বায়ু অতিশয় উত্তপ্ত। দূতেরা বিহারীকে সেই কক্ষের মধ্যে ঠেলিয়া দিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

দারুণ উত্তাপে বিহারী ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। তাহার দেহ উত্তাপে অবসন্ন হইয়া পড়িল। সে কিয়ৎক্ষণ ব্যাকুলতা সহকারে আর্ত্তনাদ করিয়া শেষে নিশ্চেষ্ট হইল।

তখন সেই বজ্রগম্ভীর-নির্ঘোষে পুনরায় প্রশ্ন হইল, —"রে হতভাগ্য, এখনও পাপ-প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিস্ কি?"

নিতান্ত বিরক্তির সহিত অবসন্ন বিহারী বলিল, —"তুমি যেই হও, তুমি মূর্খের একশেষ! তুমি কেন বারংবার আমার সহিত পরিহাস করিতেছ? যতক্ষণ প্রাণ আছে, ততক্ষণ ঐ বাসনা পরিত্যাগ করিতে আমার সাধ্য নাই।"

সেই বিকট শব্দে পুনরায় আদেশ হইল,— "অতঃপর তোর যে শাস্তি হইবে, তাহা মনে করিলেও শরীর শিহরিতে থাকে। দেখ্ পাপাত্মন্! এখনও অনুতাপ করিতে প্রবৃত্ত হ।"

বিহারী বলিল—"কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া কেহ কদাপি অনুতাপ করে না। আবার যে অপরাধে তোমরা আমাকে এইরূপে শাস্তি দিতেছ, তাহা আমার পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। একবার কেন, সুযোগ উপস্থিত হইলে যতক্ষণ বাসনা-নিবৃত্তি না হয়, ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ আমি সেইরূপ বা তদপেক্ষা গুরুতররূপ ব্যবহার করিব। অনুতাপ! রে মূঢ়! অনুতাপ কিসের।"

সেই অত্যুৎকট শব্দে আদেশ ব্যক্ত হইল,—"দূতগণ! ইহাকে কণ্টকারণ্যে নিক্ষেপ কর?"

তৎক্ষণাৎ সেই কৃষ্ণকায় বিকটমূর্ত্তি ছয় জন দূত বিহারীকে সেই প্রকোষ্ঠ হইতে বাহিরে আনিল, এবং পূর্ব্ববৎ বহুদূর বহন করিয়া লইয়া চলিল। তাহার পর পার্শ্বস্থ এক প্রকোষ্ঠের দ্বার মুক্ত করিয়া তন্মধ্যে বিহারীকে ফেলিয়া দিল। সেই প্রকোষ্ঠের সর্ব্বত্র অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূক্ষ্মাগ্র লৌহ-শলাকা সংলগ্ন। কাতর ও দুর্ব্বল বিহারীকে সেই প্রকোষ্ঠে ফেলিয়া দিলে, তাহার পদদ্বয় অসংখ্য স্থানে বিদ্ধ হওয়ায় সে নিতান্ত ব্যথিত হইল এবং তাড়াতাড়ি হাতে ভর দিয়া পা উঠাইতে গেল। হস্তেও তদ্বৎ যাতনা হওয়ায় সে পড়িয়া গেল। দেহের এক পার্শ্বে অসহনীয় জ্বালা হওয়াতে সে অপর পার্শ্বে ফিরিল। হায়! অভাগা পাপীর কোথাও নিস্তার নাই। বিহারীর সর্ব্বাঙ্গ দিয়া রুধির প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে মরণাপন্ন হইয়া পড়িয়া রহিল। কিয়ৎকাল পরে অসহ্য জ্বালায় অভিভূত হইয়া বিহারী বলিল,—"কোথায় তুমি অদৃষ্টচর পুরুষ! আমার প্রাণ যায়—আমাকে রক্ষা কর।"

তৎক্ষণাৎ সেই বিকট স্বরে প্রশ্ন হইল,—"এতক্ষণে রে নরাধম! তোর হিতাহিত-বোধের আবির্ভাব হইয়াছে কি? তুই অনুতাপ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিস্ কি?"

তখন কাতর বিহারী বলিল,—"অনুতাপ করিতে পারি; কিন্তু সুরবালা-লাভের বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারিব না। না না, তাহা আমার অসাধ্য। প্রাণ যায়; তুমি আমাকে রক্ষা কর।"

সেই স্বরে উত্তর হইল,—"রে পিশাচ! এখনও তোর অদৃষ্টে আরও কঠিনতর শাস্তি আছে। এখনও তুই নিজ অপরাধ প্রণিধান করিয়া অনুতাপ করিতে

প্রস্তুত নহিস্? দেখি, কতক্ষণ তুই এই ভাবে চলিতে পারিস্।"

বিহারী সরোদনে বলিল,—"না না, তুমি যেই হও, তোমার চরণ ধরি, তুমি আমাকে আর শাস্তি দিও না। তোমার বাধ্য হইতে আমার অনিচ্ছা নাই; কিন্তু তুমি অসাধ্য প্রস্তাব করিলে আমি কিরূপে পালন করি?"

সেই স্বরে আবার আদেশ ব্যক্ত হইল,—"দূতগণ!—"

বিহারী বাধা দিয়া বলিল,—"না না, তোমার দূতগণকে আর ডাকিও না। বল, আমি কি করিব? আমার প্রাণ যায়। দেখিতেছি, তুমি সর্ব্বশক্তিমান্—তোমার বিরুদ্ধাচারী হওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য। তুমি সুরবালার লোভ আমাকে ত্যাগ করিতে বলিও না। আর যাহা বলিবে, তাহাই আমি শুনিতে প্রস্তুত আছি।"

পুনরায় সেই স্বরে শব্দ হইল,—"রে নরাধম! তোর অদৃষ্টের ভোগ এখনও ফুরায় নাই। তোকে আরও কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। দূতগণ! এই হতভাগাকে আলোকালয়ে লইয়া যাও।"

তৎক্ষণাৎ সেই বিকটাকার দূতগণ বিহারীর রুধিরাক্ত দেহ সেই প্রকোষ্ঠ হইতে ধরাধরি করিয়া বাহিরে আনিল।

দশম পরিচ্ছেদ

সেই শাসনপুরীর এক আলোকিত অংশে বিহারী মৃতকল্প অবস্থায় শায়িত রহিয়াছে। এক সুগঠিত-কলেবর পুরুষ বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতেছেন। সেই পুরুষ রমাপতি। বিহারী অচেতন; সুতরাং সে জানিতে পারে নাই, কে তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত।

রমাপতি বাবু বহুক্ষণ ধরিয়া নানাপ্রকার যত্ন করিলে পর বিহারীর দেহে চৈতন্যের আবির্ভাব হইল। সে তখন রমাপতিকে দেখিতে ও চিনিতে পারিল। রমাপতি বলিলেন,—"ভাই! তোমার এই অবস্থা দেখিয়া আমি বড়ই কাতর হইয়াছি। কি করিলে তোমার যাতনা-শান্তি হয়, তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছি না। তোমার কি এখন বড়ই কষ্ট হইতেছে ভাই?"

বিহারী বলিল,—"কে তুমি? তুমি কি রমাপতি? তুমি কি আমার এই দুরবস্থার সময় পরিহাস করিতে আসিয়াছ? যাও তুমি! তুমি আমার পরম শত্রু। তোমার জন্য আমি আমার চিরদিনের বাসনা সফল করিতে পারিলাম না। তুমি আসিয়া না জুটিলে, তুমি জলে ডুবিয়া আবার বাঁচিয়া না উঠিলে, সুরবালার অন্য কাহারো সহিত বিবাহ হইত। তাহা হইলে আমি প্রকাশ্যে না হউক, অপ্রকাশ্যেও সেই সুন্দরীর প্রেম উপভোগ করিতে পাইতাম। তুমি আমার পরম শত্রু। তুমি মরণাপন্ন হইয়াছিলে, আমি মনে করিয়াছিলাম, এত দিন পরে ভগবান্ কৃপা করিয়া আমার কণ্টক দূর করিয়া দিবেন। কিন্তু কি ভয়ানক! আমাকে চিরদিন জ্বালাইবার জন্য তুমি সে অবস্থা হইতেও বাঁচিয়া উঠিয়াছ। তোমার কি মৃত্যু নাই? তুমি আমার প্রভু, তুমি আমার প্রতিপালক, তথাপি আমি তোমার প্রবল শত্রু। যাও তুমি। তুমি এখানে মজা দেখিতে আসিয়াছ? তুমি সুখী, তুমি ভাগ্যবান্। সুরবালা তোমার আপনার। যে এত সুখী, সে কি কখন দুঃখীর বেদনা জানিতে পারে? যাও ভাগ্যবান্ পুরুষ, এই হতভাগা যতক্ষণ জীবিত আছে, ততক্ষণ তোমার ভয়ানক শত্রু বর্ত্তমান। এ শত্রুর নিকট হইতে তুমি তোমার সুরবালার নিকট যাও। যে দিন তোমাকে নিপাত করিয়া সুরবালাকে অধিকার করিতে পারিব, সেই দিন আমার যন্ত্রণার শান্তি হইবে। যাও তুমি—আমার সম্মুখ হইতে পলায়ন কর।"

রমাপতি বলিলেন,—

"ভাই বিহারি! তোমার যন্ত্রণার কথা শুনিয়া আমি আন্তরিক দুঃখিত হইতেছি। বুদ্ধির দোষে তোমার এইরূপ ক্ষণিক মতিভ্রম হইয়াছে বুঝিয়া আমি তোমার উপর বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক, বরং যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইতেছি। এরূপ মতিভ্রম একটুকুও অস্বাভাবিক নহে। সকলেরই এরূপ পদস্খলন সম্ভব। তাহা না হইলে তোমার ন্যায় সর্ব্বগুণে গুণান্বিত ব্যক্তিরই বা এরূপ মন হইবে কেন? তুমি আমাকে শত্রু বলিয়া মনে করিলেও আমি তোমাকে এখনও অকৃত্রিম সুহৃদ্ বলিয়া মনে বিশ্বাস করি এবং তোমাকে সহোদরাধিক আত্মীয় বলিয়া জ্ঞান করি। তুমি সম্প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছ, লোকে তাহা অতিশয় দুষ্কর্ম্ম বলিয়া মনে করিলেও আমি তাহা সামান্য মতিভ্রম, ক্ষণিক মোহ এবং নগণ্য মনশ্চাঞ্চল্য বলিয়াই মনে করিতেছি। ভাই! সে ব্যবহার আমার মনেও নাই, এবং কখন মনে থাকিবেও না। এক্ষণে কিসে তুমি সত্বর স্বাস্থ্যলাভ করিতে সমর্থ হইবে, ইহাই আমার একমাত্র চিন্তার বিষয়।"

বিহারী বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল,—

"রমাপতি! তোমাকে অনেক সময় লোকে দেবতা বলে। তোমার প্রকৃতি দেখিয়া তোমাকে দেবতা বলিয়াই মানিতে ইচ্ছা করে; কিন্তু তুমি সুরবালার স্বামী; এই জন্য আমার চক্ষে তোমার অপরাধ অমার্জ্জনীয়। আমার সহিত তোমার মিত্রতা অসম্ভব। তুমি দেব; এ জন্য দেবীলাভ করিয়া সুখী হইয়াছ। আমি নারকী—দিনেকের নিমিত্ত সেই দেবীলাভের আশা করিয়া এই নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। তুমি যাও, তোমার ন্যায় দেবতার এ নারকীর নিকট থাকিবার প্রয়োজন নাই।"

রমাপতি বলিলেন,—

"কেন ভাই, এরূপ মনে করিতেছ? কিসে তুমি নারকী, আর আমি দেবতা? তোমার শরীরে কোন্ গুণ নাই ভাই! তুমি কেন অকারণ কাতর হইতেছ? আমি অপরিসীম ভাগ্যবলে সুরবালার স্বামী হইয়াছি সত্য; কিন্তু ভাই! তুমিও ত অপরিসীম সুকৃতিবলে সেই দেবীর ভাই হইয়াছ! উভয়েরই সম্বন্ধ অতি পবিত্র—অতি নিকট। যদি তুমি সুরবালাকে যথার্থই ভালবাস, তাহা হইলে ভ্রাতৃভাবে তাঁহাকে আদর করিয়া, তাঁহাকে যত্ন করিয়া, তাঁহাকে ভালবাসিয়া, তোমার প্রাণের কি তৃপ্তি হয় না ভাই? তবে তোমার কিসের ভালবাসা বিহারি? সুরবালা যাহার ভগিনী, সুরবালা যাহাকে সহোদর তুল্য ভালবাসে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই সৌভাগ্যবান্। তুমি ভাবিয়া দেখ ভাই, যদি সুরবালা সুখে থাকে, তাহা হইলে সে সুখে তোমার যেমন আনন্দ, আমারও তেমনই আনন্দ। সুরবালার স্বামী যদি দেবতা হয়, সুরবালার ভ্রাতাও দেবতা সন্দেহ নাই। কেন ভাই! তবে তুমি কাতর হইতেছ?"

বিহারী অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল,—"ভাই রমাপতি! আমি তো মরণাপন্ন। আমার যে অবস্থা হইয়াছে, বোধ হয়, আমি আর অধিকক্ষণ বাঁচিব না। তুমি আমাকে বিশ্বাস করিয়া আমার এই মরণকালে একবার সুরবালাকে দেখাইতে পার না কি? আমার আর সামর্থ্য নাই, কোন প্রকার অত্যাচার করিতে আমি অক্ষম। এ অবস্থাতেও তুমি আমাকে বিশ্বাস করিতে পার না কি?"

রমাপতি ঈষদ্ধাস্য সহকারে বলিলেন,—"অবশ্যই পারি—এখনই সুরবালা এখানে আসিবেন। তুমি যদি সুস্থ ও সবল থাকিতে, তাহা হইলেও তোমার প্রস্তাবে আমি একটু আপত্তি করিতাম না। তুমি সুরবালার ভাই, তুমি আমার অভিন্ন-হৃদয় বান্ধব। তোমাকে আমার এতই বিশ্বাস যে, সুরবালা যখন তোমার নিকট থাকিবেন, তখন আমরা কেহই এখানে থাকিব না। তোমার সেই ভগিনী একাকিনী তোমার নিকট অবস্থিতি করিয়া তোমার শুশ্রূষা করিবেন।"

এতক্ষণে বিহারীর চক্ষে জল পড়িল। সে বলিল, —"যথার্থই রমাপতি স্বর্গের দেবতা। ধিক্ আমাকে! আমি এই দেবতার বিরুদ্ধে অত্যাচার করিয়াছি।"

তখন সহসা শাসনপুরীর সেই অংশ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সুরবালাকে বেষ্টন করিয়া বহুতর জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী তথায় আগমন করিলেন। বিহারী এই সকল দেবীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া বলিল,—"আমি যদি মহাপাপী না হইতাম, তাহা হইলে মনে করিতাম, আমার মরণকালে স্বর্গের দেবীগণ দর্শনদানে আমাকে ধন্য করিতে আসিয়াছেন। কিন্তু কোথায় সে দেবী? আমার কৃপাময়ী ভগিনী সুরবালা কোথায়?"

সুরবালা অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"এই যে, দাদা! দাদা! তোমার এত কষ্ট হইয়াছে?"

বিহারী দেখিল, তাহার সম্মুখে সেই অপাপবিদ্ধা, পবিত্রতাময়ী সুন্দরী সাশ্রুনয়নে দণ্ডায়মানা।

রমাপতি বলিলেন,—"সুরবালা! তুমি তোমার দাদার শুশ্রূষা করিতে থাক। আমরা আসি এখন।"

সুরবালার সঙ্গিনীগণ ও রমাপতি পশ্চাদাবর্ত্তন করিবার উপক্রম করিতেছেন দেখিয়া বিহারী বলিল, —"না না, আপনারা যাইবেন না, দয়া করিয়া এ অপবিত্র অধমের নিকটে আর একটু থাকিয়া যান।"

তাহার পর সুরবালার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, —"সুরবালা! তুমি আমার আশ্রয়-দাতার কন্যা, আমার প্রভু-পত্নী। তুমি তোমার এ অন্ন-ভোজী দাসকে চিরদিন সহোদরতুল্য স্নেহ করিয়া থাক, আমি দারুণ দুষ্প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া তোমার প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছি, তাহা প্রায়শ্চিত্তাতীত, এবং ক্ষমার অযোগ্য। অনন্তকাল নরকনিবাসে বা চিরদিনের অনুতাপেও আমার সে কলঙ্ক অপনীত হইবার নহে। এক্ষণে আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত। দেবি! ভগিনি! জননি! আমার এই দুঃসময়ে তুমি যদি আমাকে ক্ষমা কর, তাহা হইলে আমি কথঞ্চিৎ প্রবোধ-লাভ করিয়া মরিতে পারি। দিদি আমার! এরূপ অধমকে ক্ষমা করিতে তোমার প্রবৃত্তি হইবে কি?"

তখন গলদশ্রুনয়না সুরবালা বলিলেন,—"দাদা! আমাদের ছাড়িয়া তুমি কোথা যাইবে? আমি সেবা করিয়া, যেমন করিয়া পারি, তোমাকে ভাল করিব। না দাদা, তুমি ওকথা আর মুখে আনিও না। তুমি

কি করিয়াছ যে, তোমাকে ক্ষমা করিতে হইবে? তোমার কোন দোষের কথা আমার মনেও নাই।"

তখন সেই শয্যাশায়ী বিহারী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"রে নরাধম! তুই এই দেবীকে কলুষিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলি। চিরনরকই তোমার একমাত্র উপযুক্ত শাস্তি! সুরবালা, তবে দিদি, আমার মাথায় তোমার চরণ-ধূলা দেও, আমার পাপ-কলুষিত দেহ-মন পবিত্র হউক্। তুমি ব্রাহ্মণকন্যা, আমি কায়স্থ। আমার এমন সামর্থ্য নাই যে, আমি উঠিয়া তোমার পদধূলি গ্রহণ করি।"

তখন বজ্রগম্ভীর-স্বরে সমস্ত পুরী বিকম্পিত করিয়া শব্দ হইল,—"সামর্থ্য আছে—তুমি যাতনামুক্ত হইয়াছ। এ পুরী আর তোমার যোগ্য স্থান নহে। তুমি এক্ষণে শান্তিনিকেতনে গমন কর।"

বিহারী অনায়াসে গাত্রোত্থান করিলেন, এবং অতীব ভক্তিসহকারে সুরবালার সমীপস্থ হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর নিরতিশয় প্রীত-মনে তাহা স্বকীয় মস্তকে ও দেহের অন্যান্য ভাগে বিলেপিত করিতে থাকিলেন।

তখন তত্রত্য তাবৎ ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—

"জয় শ্যামসুন্দরের জয়!"

একাদশ পরিচ্ছেদ

রমাপতি ও সুরবালা শান্তিনিকেতনের সেই নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে উপবিষ্ট আছেন। শান্তিনিকেতনের আর কোন অংশই তাঁহারা দেখিতে পান নাই। তাঁহাদের এই নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠ আর শাসনপুরীর একাংশমাত্র তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। কিন্তু কি ভয়ানক ব্যাপার! কি অলৌকিক কাণ্ড! কি স্বর্গীয় ভাব! বিহারী বাবুর নিকটস্থ হইয়া তাঁহারা যে যে ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের প্রতীতি হইয়াছে যে, নরলোকে এতাদৃশ বিসদৃশ কাণ্ডের অভিনয় হওয়া নিতান্ত বিচিত্র কথা। বিহারীর সেই ভয়ানক শাস্তি, সুরবালার সহিত তাঁহার দর্শনেচ্ছা হইবামাত্র সুরবালার তথায় গমন, সুরবালার সঙ্গিনী-গণের অপরূপ কান্তি, অশ্রুতপূর্ব্ব ভয়ানক স্বরে বিহারীর প্রতি আদেশ, বিহারীর কাতর ও মরণাপন্ন দেহে সহসা সম্পূর্ণ শক্তি-সঞ্চার প্রভৃতি ব্যাপারসমূহ তাঁহাদিগকে যৎপরোনাস্তি অভিভূত করিয়াছে। এ স্থান যদি স্বর্গ বা স্বর্গের অংশবিশেষ না হয়, তাহা হইলেও তত্রত্য অধিবাসিবর্গ যে দেবশক্তিসম্পন্ন, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের কোনই সন্দেহ নাই। দিব্যকান্তি-বিশিষ্ট অনেক মূর্ত্তি তাঁহাদের দেখা দিয়াছেন, কিন্তু দুই এক জন ব্যতিরেকে আর কাহারও সহিত তাঁহা-দের বিশেষ কথাবার্ত্তা হয় নাই। এই স্থান-সংক্রান্ত কোন রহস্যজালই তাঁহারা ছিন্ন করিতে পারেন নাই। কে এখানকার রাজা, কে পালক ও নিয়ন্তা, কিছুই তাঁহারা জানেন না। তাঁহারা শুনিয়াছেন, শান্তি-দেবী এই স্বর্গের অধিষ্ঠাত্রী। কিন্তু কে তিনি?

কোন বিষয়েই তাঁহাদের কোনই অসুবিধা নাই। নিয়মিত সময়ে স্নান, আহারাদির বিশেষ সুব্যবস্থা, মাধুরী ও খোকার খেলার যথেষ্ট আয়োজন ও তাঁহা-দের ভোগ-বিলাস-সাধনোপযোগী সামগ্রীর অভাব নাই। কে এ সকল দেয়, কেনই বা দেয়, কোথা হইতে এ সকল সংগৃহীত হয়, এ সব সংবাদ কিছুই জানিতে না পারিয়া তাঁহারা নিতান্ত কৌতুহলাবিষ্ট ও বিস্ময়াকুল হইয়াছেন।

তাহার পর তাঁহাদের বিস্ময়ের প্রধান কারণ সুরমা দেবীর ব্যবহার। বহুক্ষণ তাঁহারা এই কথা আলোচনা করিবার পর রমাপতি বলিলেন,—"যেন এই দেবীমূর্ত্তি পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া এক একবার মনে হয়।"

সুরবালা বলিলেন,—"আমারও মনে হয়, যেন আমি ঐ দেবীকে আর কোথাও দেখিয়া থাকিব। কিন্তু অনেক ভাবিয়াও কিছুই আমার মনে পড়িতেছে না। সংসারে এরূপ অপার্থিব রূপগুণসম্পন্না দেবীর দর্শন পাওয়া নিতান্তই অসম্ভব; সুতরাং আমাদের ভ্রম হইয়াছে ভিন্ন আর কিছুই মীমাংসা হয় না।"

এইরূপ সময়ে কালোরূপে দশদিক্ আলো করিয়া সুরমা দেবী সেই স্থলে সমাগতা হইলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র রমাপতি ও সুরবালা ভক্তিসহকারে তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। তখন সেই দেবী নয়ন মুদিয়া শ্যামসুন্দরকে ধ্যান করিতে করিতে বলিলেন,—"শ্যামসুন্দর আপনাদিগকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করুন।"

তখন রমাপতি বলিলেন,—"দেবি! আপনাদের কৃপায় আমরা এখানে সকল প্রকার সুখভোগ করি-তেছি সত্য, কিন্তু আমাদের চিত্ত এই ভূলোক-দুর্লভ স্থানের অশেষ রহস্যজাল বিচ্ছিন্ন করিতে অসমর্থ হইয়া উত্তরোত্তর বড়ই অস্থির হইতেছে। আপনি কৃপা করিয়া আমাদের এই অস্থিরতা বিদূরিত করুন।"

মধুমাখা কোমল স্বরে সুরমা বলিলেন,—"এখানে রহস্য কিছুই নাই। ইহা শান্তিদেবীর নিকেতন।

সেই দেবী সরলার একশেষ। আপনারা ক্রমশঃ জানিতে পারিবেন, শান্তিদেবীর অলৌকিক শক্তিতে এ স্থানের সকল কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়।"

সুরবালা বলিলেন,—"কিন্তু দেবি, অন্য কথা দূরে থাকুক, আমাদের চক্ষে আপনিই যেন অশেষ রহস্যজালজড়িতা। আপনাকে যেন আমরা কোথায় কখন্ দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়; অথচ কিছুই স্মরণ করিতে আমাদের সাধ্য নাই।"

সুরমা বলিলেন,—এক সময় আমি আপনাদের বিশেষ পরিচিতা ছিলাম; আমার কথা মনে পড়া বিচিত্র নহে। শান্তিদেবীর চরণ-ধূলায় পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে। আমার পূর্ব্ব-আকৃতির ছায়া অপগত হয় নাই। এখানে যত লোক আছেন, সকলেরই পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে।"

রমাপতি বলিলেন,—"আপনি আমাদের বিশেষ পরিচিতা ছিলেন! কিন্তু দেবি! আমরা তো তাহা মনে করিতে পারিতেছি না। এরূপ দিব্য জ্যোতিঃ কোন মানুষের শরীরে হয় কি? না দেবি! আপনার সহিত পূর্ব্বপরিচয় নিতান্ত অসম্ভব।"

সুরমা বলিলেন,—"আপনার দেশে শশী ভট্টাচার্য্য নামে এক নিরীহ ব্রাহ্মণ ছিলেন মনে আছে? তাঁহার ব্যভিচারিণী পত্নী তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল মনে পড়ে? আমিই পূর্ব্বজন্মে সেই ব্যভিচারিণী পতিহন্ত্রী ছিলাম!

সুরবালা সবিস্ময়ে বলিলেন,—"তবে—তবে আপনিই কি কালী?"

"কালীর মৃত্যু হইয়াছে। আমি সুরমা।"

"কিন্তু এরূপ জ্যোতিষ্মান্ পুণ্য-প্রদীপ্ত কলেবর কেমন করিয়া হইল? আপনার পূর্ব্বাকৃতির ছায়াও আপনার বর্ত্তমান দেহে আছে কি না সন্দেহ।"

সুরমা বলিলেন,—"শ্যামসুন্দর আর শান্তিদেবী জানেন।"

রমাপতি জিজ্ঞাসিলেন,—"কিন্তু আপনি সেই প্রহরি-পরিবেষ্টিত কারাগার হইতে মুক্ত হইলেন কিরূপে?"

সুরমা উত্তর দিলেন,—"শান্তিদেবীর অসাধ্য কিছুই নাই। তাঁহার কৃপা হইলে সকলই সম্ভব।"

সুরবালা বলিলেন,—"বস্তুতই আপনি দেবত্ব লাভ করিয়াছেন, এবং বস্তুতই আপনাকে দর্শন করিয়া আমাদের দেবদর্শনের ফল হইয়াছে। কিন্তু দেবি! কিরূপে আপনার এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিল?"

সুরমা বলিলেন,—"শান্তিদেবীর এই রাজ্যে বিচিত্র ব্যবস্থা। এখানে কাহারও বা আগমনমাত্র পুনর্জ্জন্ম হয়; কাহারও বা তাঁহাকে দর্শনমাত্র পুনর্জ্জন্ম হয়; কাহারও বা শাসনপুরীতে বিহারীর ন্যায় শাস্তিভোগ করার পর পুনর্জ্জন্ম হয়। পুনর্জ্জন্ম হইবার পূর্ব্বে কালীকে শাসনপুরীতে বহুদিন বাস করিতে হইয়াছিল। শান্তিদেবী কৃপা করিয়া কালীকে বিনষ্ট করিয়াছেন, তাহার অন্তরাত্মা ধৌত করিয়াছেন।"

রমাপতি জিজ্ঞাসিলেন,—"আমরা শাসনপুরীতে যে বজ্রগম্ভীর শব্দে অলৌকিক আদেশ শ্রবণ করিয়াছি, সে শব্দ কাহার?"

সুরমা ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"তিনি ভগবান্। শান্তিদেবীর কর্ম্মে ভগবান্ সহায়।"

তখন সুরবালা বলিলেন,—"কিন্তু দেবি! আমাদের ভাগ্যে কি শান্তিদেবীর দর্শনলাভ ঘটিবে না? কোন্ পুণ্যফলে সেই ভগবতীর সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতে পারে?"

সুরমা বলিলেন,—"অবশ্য ঘটিবে। যে পুণ্যফলে শান্তিদেবীর সহিত সম্মিলন হয়, তাহা আপনাদের প্রচুর প্রমাণে আছে "

সুরবালা বলিলেন,—"তবে কোথায় তিনি? কোথায় গেলে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব?"

সুরমা বলিলেন,—"এই যে।"

তখন সেই কক্ষমধ্যে জ্বলন্ত আলোকপ্রভ, হৈমময়ী, হসন্মুখী শান্তিদেবীর আবির্ভাব হইল। তখন সুরবালা গললগ্নীকৃতবাসে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"কোন্ পুণ্যবলে আমার সশরীরে ভগবতী-সন্দর্শন ঘটিয়াছে? যাহার দিদি ভগবতী, না জানি, তাহার কি অপরিসীম সুকৃতি।"

রমাপতি কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—"সুকুমারি! তুমি যে দেবত্ব লাভ করিয়াছ, তাহা আমি অনেক দিন জানিতে পারিয়াছি। যে অধম এই ভগবতীকে এক সময় আমার বলিয়াছে, তাহার কি অপরিসীম পুণ্য! সুকুমারি! আমরা স্বর্গে আসিয়াছি; আর যেন এ স্বর্গ হইতে নরকে যাইতে না হয়; আর যেন আমাদের তোমার সম্মুখ হইতে কোথাও যাইতে না হয়।"

বহুক্ষণ নয়ন মুদিয়া গুরুচরণ চিন্তা করার পর শান্তি বলিলেন,—"সুকুমারী বারো বৎসর পূর্ব্বে জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। আমি শান্তি। আমি আপনাদেরই। যদি আমার সান্নিধ্যে আপনারা সুখী হন, তাহা হইলে ভগবান্ অবশ্যই আপনাদের সম্বন্ধে সুবিচার করিবেন। আপনারা দেব-দেবী! দেবসেবাই এই স্থানের ব্যবস্থা। শান্তি আপনাদের দাসী।"

তখন মাধুরী ও খোকা খেলা ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল, এবং দুই জনে কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া শান্তিদেবীর দুই হস্ত ধারণ করিল। তদনন্তর সতৃষ্ণনয়নে তাহারা সেই পবিত্রতাপূর্ণ সৌন্দর্য্যসার বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। মধুর হাস্য সহকারে সেই দেবী তাহাদের প্রতি প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তখন খোকা বলিল,—"ধু—ধু। ঠাকুর—নয় ?"

মাধুরী উত্তর দিল,—"না রে, এ এক রকম দুগ্ গা।"

খোকা তখন সুরবালার সমীপে আসিয়া বলিল,—"মা মা, ডুগ্ গা—জেণ্ট নলে !"

সুরবালা বলিলেন,—"প্রণাম কর বাবা !"

খোকা প্রণাম না করিয়াই আবার সেই দেবীর নিকট আসিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিল, এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসিল, "টুমি ডুগ্ গা টাকুল ?"

তখন প্রেমময়ী শান্তিদেবী হাস্যমুখে মাধুরী ও খোকাকে উভয় অঙ্কে গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—

"না বাবা, আমি তোমাদের আর একটা মা।"

যখন শান্তিদেবী উভয় অঙ্কে এই ভুবনমোহন শিশুদ্বয়কে গ্রহণ করিলেন, তখন আর শোভার সীমা থাকিল না। প্রেমে সকলের কলেবর পুলকিত হইল। প্রেমময়ীর প্রেমলীলার তখন অভিনয় কি না !

তখন সুরমা বলিলেন,—"ভগবতি ! অনুমতি কর, আমার ছেলে-মেয়েকে এই সুসংবাদ দিতে যাই !"

শান্তি বলিলেন,—"চল সুরমে, আমরা সকলেই শ্যামসুন্দরকে দর্শন করিতে যাই।"

তখন খোকা ও মাধুরীকে বক্ষে ধারণ করিয়া শান্তিদেবী অগ্রসর হইলেন। তাঁহার এক দিকে রমাপতি ও অপর দিকে সুরবালা চলিলেন। সর্ব্বশেষে সুরমা-দেবী। সকলেরই দেহ কণ্টকিত—নয়নে প্রেমাশ্রু।

এইরূপে তাঁহারা সেই অতি সুবিস্তৃত ভবনের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণপ্রদেশে অবতীর্ণ হইলে হরিমন্দিরে দামামা বাজিয়া উঠিল, এবং আনন্দ-কোলাহলে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত হইতে লাগিল। তখন দিব্যমূর্ত্তি-ধারী বহুতর দেবদেবী বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত হইয়া, শান্তিদেবীর পথাবরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। তখন শান্তিদেবী সেই শিশুদ্বয়কে অঙ্কে ধারণ করিয়া মুদিত-নয়নে একান্তমনে গুরুচরণারবিন্দ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন সেই পুণ্যশ্লোক নর-নারীগণ শান্তিদেবীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া অপূর্ব্ব স্বরসংযোগে ভগবতীর স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন,—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

দেবীগণের স্তোত্রপাঠ সমাপ্ত হইলে জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানানন্দ যোগী সেই স্থলে সমাগত হইলেন। তাঁহার দর্শনমাত্র দেবদেবীগণ আন্তরিক ভক্তিসহকারে ভূতলে মস্তক স্থাপন করিয়া প্রণাম করিলেন। শিশুদ্বয়কে ক্রোড়ে লইয়াই শান্তিদেবী প্রণতা হইলেন, এবং রমাপতি ও সুরবালা ভগবান্ সম্মুখস্থ হইয়াছেন ভাবিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

"শ্যামসুন্দর তোমাদের মঙ্গল করুন।"

এই বলিয়া জ্ঞানানন্দ সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

তাহার পর অঙ্গুলি-সঙ্কেতে রমাপতিকে দেখাইয়া শান্তিদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা ! এই পুরুষ তোমার কে ?"

শান্তি বলিলেন,—"প্রভো, এই পুরুষ আমার কেহই নহেন।"

তাহার পর সুরবালাকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"মা ! এ নারী তোমার কে ?"

"প্রভো ! এই নারী আমার কেহই নহেন।"

তাহার পর মহাপুরুষ আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"মা ! তোমার ক্রোড়স্থ শিশুদ্বয় তোমার কে ?"

"প্রভো ! এই শিশুদ্বয় আমার কেহই নহে।"

আবার মহাপুরুষ জিজ্ঞাসিলেন,—"মা, এই পুরুষ তোমার কে ?"

"প্রভো ! এই পুরুষ আমার সর্ব্বস্ব।"

"মা ! এই নারী তোমার কে ?"

"প্রভো ! এই নারী আমার সর্ব্বস্ব।"

"মা, ঐ শিশুদ্বয় তোমার কে ?"

"প্রভু ঐ শিশুদ্বয় আমার সর্ব্বস্ব।"

মহাপুরুষ আবার জিজ্ঞাসিলেন,—

"তবে মা ! বল, শ্যামসুন্দর তোমার কে ?"

শান্তি বলিলেন,—"বুঝাইয়া বলিতে পারি না, কে ? স্বতন্ত্ররূপে চিন্তা করিতে না পারিলে, স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি হয় না। শ্যামসুন্দর বুঝি আমার সকলই অথবা কেহই নহেন।"

মহাপুরুষ বলিলেন,—"বৎসে! এ অসার সংসারে তুমিই সার। এ সংসারে যে তোমাকে চিনিয়াছে, সে সকলই চিনিয়াছে।

ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্ব্বোধলক্ষণা।
লজ্জা পুষ্টিস্তথা তুষ্টিস্ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ ॥"

তখন রমাপতি, মহাপুরুষের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া বলিলেন,—"ভগবন্! এই শান্তি-নিকেতনে এ অধমদের স্থান হইবে তো ?"

মহাপুরুষ বলিলেন,—"তোমরা দেবতা। তোমাদের নিষিদ্ধ স্থান কোথাও নাই। কিন্তু তোমাদের কর্ত্তব্য এখনও অসমাপ্ত। অতএব বৎস, তোমাদের জন্যই আপাততঃ অনুরূপ ব্যবস্থা হইবে।"

সুরবালা শান্তিদেবীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, নীরবে প্রেমাশ্রু-বর্ষণ করিতেছিলেন।

মহাপুরুষ বলিলেন,—"চল, সকলে হরিমন্দিরে যাই।"

তখন মৃদঙ্গ, দামামা, করতাল, তুরী, ভেরী, প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যযন্ত্র বাজিয়া উঠিল এবং "জয় শ্যামসুন্দরের জয় !" শব্দ দশদিকে নির্ঘোষিত হইয়া উঠিল।

অগ্রে জ্ঞানানন্দ, তৎপশ্চাতে শান্তি, তৎপশ্চাতে রমাপতি ও সুরবালা, এবং উভয় পার্শ্বে দেবদেবীগণ মিলিত হইয়া সেই হরিমন্দিরে উপস্থিত হইলেন। তথায় শ্যামসুন্দরের অপরূপ রূপ দেখিয়া, রমাপতি ও সুরবালা বিমোহিত হইলেন।

তখন সেই মহাপুরুষ করযোড়ে অলৌকিক সুস্বরে গান করিলেন,—

"পীতাম্বরং ঘনশ্যামং দ্বিভুজং বনমালিনম্।
বর্হিবর্হকৃতাপীড়ং শশিকোটিনিভাননম্ ॥
ঘূর্ণায়মাননয়নং কর্ণিকারবতংসিনম্।
অভিতশ্চন্দনেনাথ মধ্যে কুঙ্কুমবিন্দুনা ॥
রচিতং তিলকং ভালে বিভ্রতং মণ্ডলীকৃতম্।
তরুণাদিত্যসঙ্কাশং কুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতম্ ॥
ঘর্ম্মাম্বুকণিকারাজদ্দর্পণাভকপোলকম্।
প্রিয়ামুখার্পিতাপাঙ্গ-লীলয়া চোন্নতভ্রুবম্।
অগ্রভাগন্যস্তমুক্তাস্ফুরদুচ্চসুনাসিকম্।
দশনজ্যোৎস্নয়া রাজৎপক্কবিম্বফলাধরম্ ॥"

সেই মৃদুগম্ভীর সঙ্গীতধ্বনি সর্ব্বত্র আনন্দ ও পবিত্রতা বিকিরণ করিতে করিতে শূন্যে মিশিয়া গেল। যে সৌভাগ্যবানের কর্ণকুহরে সে অপার্থিব ধ্বনি প্রবেশ করিল, সে মহানন্দে মগ্ন হইল।

সঙ্গীত সমাপ্ত হইবামাত্র জ্ঞানানন্দ করতালি দিতে দিতে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। কিন্তু মানবের অক্ষম লেখনী সে শোভার পূর্ণচিত্র প্রদান করিতে অশক্ত। একে একে অন্যান্য দেবদেবীগণ, রমাপতি, সুরবালা এবং মাধুরী ও খোকা সেই নৃত্যে যোগ দিলেন। আহা ! কি রমণীয় ! কি হৃদয়োন্মাদকর ! তখন নয়নজলে রমাপতি ও সুরবালার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। নবজীবন-প্রাপ্ত বিহারী, অভিরাম ও নারায়ণ অলক্ষিতভাবে সেই জনতার মধ্যগত হইয়া উভয় হস্তে তত্রত্য রজঃপুঞ্জ স্ব স্ব কলেবরে প্রলেপিত করিতেছেন। সেই মহাপুরুষ তখন প্রেমপূর্ণ স্বরে ডাকিলেন,—"রমাপতি !"

রমাপতি উত্তর দিলেন,—"দয়াময় !"

"তোমার প্রথমা স্ত্রী কোথায় ?"

"আমার সর্ব্বাঙ্গে। আমার হৃদয়, মন, দেহ, আত্মা সকলই শান্তিময়। সুকুমারী এখন শান্তিরূপে আমার প্রাণ শীতল করিতেছেন।"

"আর তাহার বিরহে তুমি কাতর নহ ?"

"প্রভো, তাঁহার নিকটেই থাকি বা দূরেই থাকি, তাঁহার সহিত আর বিরহ হইবার নহে। এরূপ সর্ব্বাঙ্গীন সম্মিলন আমাদের কখন ছিল না। ভগবন্! আপনার কৃপায় আজি আমরা ধন্য হইয়াছি।"

তখন মহাপুরুষ বলিলেন,—"তবে আইস শান্তি ! আমরা কায়মনোবাক্যে তোমার পূজা করি। এ পাপ-তাপ-পূর্ণ বসুন্ধরায় কেবল তুমিই একমাত্র ও

নিষ্কাম ও উপাস্য। তোমার করুণা লাভ করিলে জ্বালা-যন্ত্রণা থাকে না। তুমিই আশ্রয়, তুমিই সুখ, তুমিই স্বর্গ। তুমি চিরদিনই কুমারী—তুমি চিরদিনই রমাপতির হৃদয়রত্ন—তুমি চিরদিনই সুরবালার আনন্দধাম। প্রেমময়ি! কবে তোমার প্রেমে বিমোহিত হইয়া বসুন্ধরার ভাবল্লোক তোমার শান্তিনিকেতনে আশ্রয় গ্রহণ করিবে?"

"যথা নিত্যো হি ভগবান্ নিত্যা ভগবতী তথা।
স্বমায়য়া তিরোভূতা তত্রেশে প্রাকৃতে লয়ে॥
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং সর্ব্বং মিথ্যৈব কৃত্রিমম্।
দুর্গা সত্যস্বরূপা সা প্রকৃতির্ভগবান্ যথা॥
সিদ্ধ্যৈশ্বর্য্যাদিকং সর্ব্বং যস্যামস্তি যুগে যুগে।
সিদ্ধাদিকো ভগো জ্ঞেয়স্তেন ভগবতী স্মৃতা॥"

অতঃপর আমরা ব্রহ্মবাক্যে গ্রন্থ সমাপ্ত করি—
ইয়ং যা পরমেষ্ঠিনী বাগ্‌দেবী ব্রহ্মসংশ্রিতা।
যয়ৈব সসৃজে ঘোরং তয়ৈব শান্তিরস্তু নঃ॥
ইদং যৎ পরমেষ্ঠিনং মনো বা ব্রহ্মসংশ্রিতম্।
যয়ৈব সংসৃজে ঘোরং তেনৈব শান্তিরস্তু নঃ
ইমানি যানি পঞ্চেন্দ্রিয়াণি
মনঃষষ্ঠানি মে হৃদি ব্রহ্মণা সংশ্রিতানি।
যৈরেব সংসৃজে ঘোরং তৈরেব শান্তিরস্তু নঃ॥

—অথর্ব্ববেদ-সংহিতা।

(পরব্রহ্ম-সম্পাদিতা এই যে পরমেষ্ঠিনী বাগ্‌-দেবী, যাঁহার দ্বারা বিপদেরই সৃষ্টি করিয়া থাকি, তাঁহারই দ্বারা আমাদের শান্তি হউক।

পরব্রহ্ম-সম্পাদিত এই যে পরমেষ্ঠি মন, যাহার দ্বারা বিপদেরই সৃষ্টি করিয়া থাকি, তাহারই দ্বারা আমাদের শান্তি হউক।

পরব্রহ্ম-সম্পাদিত এই যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও ষষ্ঠ মন, যাহাদের দ্বারা বিপদেরই সৃষ্টি করিয়া থাকি, তাহা-দেরই দ্বারা আমাদের শান্তি হউক।)

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সমাপ্ত